শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে

নির্মলকুমার রায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩১৬, সেপ্টেম্বর, ১৯০৯
প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ইম্প্রেসন হাউস
স্বত্ব : গ্রন্থকার

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং,
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ট, কলিকাতা ৭০০০৭৩
মুদ্রাকর : সুরেন্দ্রনাথ দাস, বাণীরূপা প্রেস,
৯এ, মনোমোহন বসু স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের লোকান্তরিত পূজনীয় নবম অধ্যক্ষ

এবং

মদীয় প্রেমময় শ্রীগুরু

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের

অমর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখান

পরম শ্রদ্ধা সহকারে উৎসর্গীকৃত হইল।

—নির্মল

নিবেদন

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন—"ভক্তের হৃদয়, ভগবানের বৈঠকখানা।" আবার মা-ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করতেন—"মা, আমি ভক্তের রাজা হব।" বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থে সেই ভক্ত প্রসঙ্গই করা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই মহানামের অমোঘ আকর্ষণে, অথবা তাঁর প্রতিকৃতি দর্শন করে, অথবা তাঁর মহাভাবের পরিচয় পেয়ে আধুনিককালেও পৃথিবীর অসংখ্য নর-নারী শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট। তাঁর অকপট অবস্থাতেও যদি কেবলমাত্র তাঁর নাম বা কথা শুনেই দেশ-বিদেশে তাঁর ভক্ত বা অনুরাগীর সংখ্যা এতকাল পরেও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তবে তাঁর প্রকট অবস্থায় যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁকে দর্শন করেছিলেন, তাঁকে ভালবেসেছিলেন, অথবা তাঁর কৃপালাভ করেছিলেন, তাঁরা না-জানি কত ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী! যাঁদের এই পরম সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরা কারা? যাঁদের হৃদয়ের বৈঠকখানায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বিরাজ করেছিলেন তাঁরা কারা?

কথামৃত প্রণেতা ভক্তপ্রবর মাষ্টারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভাষায়—"এখন তো কত লোক তাঁর নাম কচ্ছে! কিন্তু যারা ঐদিনে তাকে ভালবাসতো তারা কতবড় লোক! ঐশ্বর্য প্রকাশ হলে তো সকলেই ভালবাসে! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর পড়ে আছেন; সাত টাকা মাইনে—আবার উন্মাদ। তখন যারা তাঁকে চিনেছিল তারা কে গো?—তারা সামান্য লোক নয়।" (শ্রীম-দর্শন, ৮ম খণ্ড)

বলা আবশ্যক, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সেই চেনা-অচেনা, স্মৃত-বিস্মৃত ব্যক্তিদের পরিচয় সংগ্রহ করার ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং অন্তরের প্রেরণায় এই গ্রন্থ রচনার কাজে ব্রতী হই। কিন্তু কাজটি যে কত দুরূহ, তা রচনার কালেই বুঝতে পেরেছিলাম। কারণ তৎকালীন সমাজের সকলশ্রেণীর অজস্র নরনারীর সমাবেশ ঘটেছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। রাজা, জমিদার, মনীষী, মহাত্মা, চিন্তাশীল, কবি, দার্শনিক, গায়ক, বাদক থেকে শুরু করে লম্পট, দস্যু, গুণ্ডা, পতিতা, মেথর অবধি সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এসেছিল—এটা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাবেরই প্রভাব—যুগ-প্রয়োজনেই এটি একটি অলৌকিক ঘটনা। যিনি জন্ম-মৃত্যু রহিত, সেই ভূমার ভূমিতে অবতরণ কেবলমাত্র জীব-

কল্যাণের জন্য। "সম্ভবামি যুগে যুগে"—এই ভাগবত প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই তাঁর মর্ত জীবনলীলা। "যত মত, তত পথ"—এই মহামন্ত্রের উদ্গাতা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সকলের কাছাকাছি—সর্বসাধারণের ঠাকুর—কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বা বিশেষ শ্রেণীভুক্তের নিজস্ব কিছু নন এবং বর্তমানেও ঠিক একই-ভাবে তিনি সকলের ঠাকুররূপেই সমাদৃত বা পূজিত। সুতরাং ঠাকুরের তৎকালীন সমুদয় সান্নিধ্যকারীদের পরিচয় সংগ্রহ করার চেষ্টা বাতুলতারই সামিল। তবুও তাঁর লীলা রসে সমৃদ্ধ মহাভাব-জীবনে তাঁর পূত সঙ্গলাভীদের যে-কয়জনের পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, সেই পরিচয়ের পুষ্পগুলিকে যথাসাধ্য সঞ্চয়ন করে কয়েকটি "স্তবক" রচনার কাজে আমি 'মালী'র ভূমিকা গ্রহণ করেছি মাত্র। পরম উৎসাহ ও ধৈর্য সহকারে এই দুঃসাহসিক, অথচ পবিত্র কাজটিকে সাধনারূপে গ্রহণ করে কয়েক বৎসর যাবৎ আমাকে রামকৃষ্ণ সাহিত্যের মহাসাগরে ডুবে থাকতে হয়। এই উপলক্ষে যদিও বহু মূল্যবান গ্রন্থ পাঠের সুযোগ হয়েছে, কিন্তু সব গ্রন্থেই ভক্তপ্রসঙ্গ পাওয়া যায়নি; যে গ্রন্থগুলিতে পেয়েছি তার একটি তালিকা এই গ্রন্থের শেষাংশে প্রকাশ করা হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থটি কোন মৌলিক রচনা নয় অথবা এতে কোন কাল্পনিক কাহিনী প্রকাশ করা হয়নি। বিভিন্ন গ্রন্থে যা পেয়েছি এবং বিক্ষিপ্তভাবে নানা গ্রন্থে ছড়ানো উপাদানগুলি (কয়েক ক্ষেত্রে মূলভাষাসহ) সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তাছাড়া এটি ভক্তদের জীবনী গ্রন্থ নয়; কারণ এখানে কেবলমাত্র তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু দেওয়া হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে এটিকে "পরিচায়ক-গ্রন্থ" হিসাবে গণ্য করাই সমীচিন হবে।

এই গ্রন্থে এমন কয়েকজনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যাঁদের নাম ঐভাবেই রামকৃষ্ণ সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা:—আগড়পাড়ার আশু, বেলঘোরের তারক, দমদম মাষ্টার, শিবু আচার্যের শ্বশুর, রাখালের বাপের শ্বশুর, অনুকূল মুখুজ্যের জামাইয়ের ভাই, ভূধর চাটুজ্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, যোগীন-মা'র খুড়ী, গোলাপ মা'র ভাই-ভাজ, বিশ্বম্ভরের কন্যা, ছোট নরেন, ছোট গোলাপ, পল্টু, পতু, পাগলী, খেতির মা, বৃন্দার মা, হাবীর মা, রতির মা প্রভৃতি আরও অনেক। ঐ সব নামেই তাঁরা সাহিত্যে বিশেষ স্থান পাওয়ায় সেই নামগুলিই এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি স্তবকে মোটামুটিভাবে সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিচয় সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে পাঠের সুবিধার জন্য। তবুও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমার আপ্রাণ চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও হয়তো কিছু ত্রুটি থাকা সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে ক্ষোভের সঙ্গেই বলছি যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক ভক্ত বা অনুরাগী এখন আমাদের বিস্মৃতির অন্ধকারে মিশে যাচ্ছেন এবং ক্রমশঃ তাঁদের অনেকের কথা হয়তো আমরা একেবারেই ভুলে যাব। যাতে ভুলে না যাই, সেই কারণেই এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াস। এই গ্রন্থে যাঁদের পরিচয় সংগ্রহ করা হয়েছে, তাঁদের সংখ্যা প্রায় ছয়শত। এই সামান্য সংখ্যক ভক্ত ছাড়াও ঠাকুরের সংস্পর্শে আরও কত শত শত ভক্ত বা অনুরাগী এসেছেন, যাঁদের কোন পরিচয় জানতে পারিনি, বা কেউ জানাতে পারেন নি। প্রামাণিক তথ্য সহ যদি কোন ভক্তের বা সান্নিধ্যকারীর পরিচয় পুনরায় পাওয়া যায়, তবে পরবর্ত সংস্করণে তা লিপিবদ্ধ করা হবে।

কেবলমাত্র ভক্ত পরিচয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচিত হলেও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্রমুখী লীলা-মাধুর্যের পরিচয়ও এই ভক্তদের সঙ্গে জড়িত। ভক্তদের নিয়েই ভগবানের নর-লীলা এবং ভক্তদের সম্যক তথ্য জানলে ভগবানের লীলার রস আস্বাদন করাও সহজ হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তিরোভাবের মাঝখানে কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বছর (ইংরাজী ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬ সাল থেকে ১৫ই আগষ্ট ১৮৮৬ সাল অবধি) অযাচিতভাবে সর্বত্র কৃপালোক বিতরণ করে পুনরায় তাঁর গুপ্তলীলায় প্রত্যাবর্তন এবং এই সময়ের মধ্যে তাঁর যেটুকু লীলাবিলাস, তা বিভিন্ন আধারের ভক্ত ও অনুরাগী-দের নিয়েই। সেজন্য তাঁদের মাধ্যমেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহালীলার অপূর্ব পরিচয় স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে।

দ্বিতীয়তঃ, ঠাকুরের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন চরিত্রের ভক্ত ও অনুরাগীদের পরিচয় এবং বহুপ্রকারের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে, তৎকালীন সমাজের একটি চিত্রও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। কারণ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। সেজন্য আধ্যাত্মিক জগৎ ছাড়াও, এই গ্রন্থের একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলে মনে করি।

তৃতীয়তঃ, এই গ্রন্থের মাধ্যমে ঠাকুরের সংস্পর্শে আগত ভক্ত ও অনুরাগীদের একত্র নামাঙ্কিত একটি তালিকারও সৃষ্টি হল। যদিও তথ্যাভাবে তালিকাটিও অসম্পূর্ণ, তবুও এমন একটি প্রাথমিক তালিকার প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া, ইদানীংকালে ঠাকুরের তৎকালীন ভক্তদের সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তিকর প্রসঙ্গ প্রচার করা হয়; সে ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি সেই বিভ্রান্তি দূরীকরণে সহায়ক হবে।

সবশেষে, ঠাকুরের শুভাগমনের স্থানগুলির প্রকাশিত তালিকা, আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে আদরণীয় হবে বলে মনে করি। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ভক্তদের পরিচয় সংগ্রহের সময়, ঠাকুরের শুভাগমনের স্থানগুলির পরিচয়ও নজরে আসে।

এগুলিরও যুগপৎ আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে মনে করি। তাই, ঠিক একই উপায়ে বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত স্থানগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে একটি তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেছি। ঠাকুরের পূত স্মৃতি-বিজড়িত এই স্থানগুলি—দু-একটি বাদে, প্রায় সবই এখনো বিদ্যমান। কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাইয়ের ভাষায়—"সবই মহাতীর্থ; তাঁর চরণরজে সব জীবন্ত। এসব কেউ যদি দেখে বেড়ায়, তাতেই হয়ে যাবে।" (শ্রীম-দর্শন, ১৫শ খণ্ড) এখানে বলা আবশ্যক, ঠাকুরের শুভাগমনের স্থানগুলির মধ্যে যদি কোন স্থানের নাম বাদ পড়ে থাকে, প্রামাণিক তথ্য পেলে পরে আবার সেগুলি প্রকাশ করা হবে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের সময়, প্রথমেই যে মহাত্মার নাম আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-সহকারে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের উদার হৃদয় সন্ন্যাসী—পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দজী (উপেন মহারাজ)। আমি এই শুভকাজে ব্রতী হবার পর থেকেই পূজনীয় উপেন মহারাজ আমাকে বরাবরই আন্তরিক উৎসাহ ও সমর্থন জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর সহানুভূতিকে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদরূপে গণ্য করে, নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেছি। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

সিঁথি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও কর্মযোগী, শ্রদ্ধেয় শ্রীখগেন্দ্র-চন্দ্র দে মহাশয়—সঙ্ঘের গ্রন্থাগার থেকে এই উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বহু পুস্তক নিজে সবসময় আমাকে সরবরাহ করায়, এই গ্রন্থ রচনায় আমার সবিশেষ উপকার হয়। এখানে উল্লেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমার রচিত "ভারত-আত্মা বিবেকানন্দ" গ্রন্থখনি সঙ্ঘের তরফে তিনিই প্রথম প্রকাশ করে আমাকে এই রচনার কাজে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমি সর্ব বিষয়ে তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

আমার ভ্রাতৃতুল্য সহকর্মী শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় "উদ্বোধন মঠ", "বেদান্ত মঠ" প্রভৃতি ধর্মীয় সংস্থাগুলির গ্রন্থাগার থেকে এবং অন্যান্য বহু স্থান থেকে বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করে আমাকে নিয়মিত সরবরাহ করায়, আমি তাঁকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

এ ছাড়া যাঁদের কাছ থেকে নানা বিষয়ে সহযোগিতা পেয়েছি, তাঁরা হলেন—কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকিশোরী গুপ্তের পৌত্র শ্রীপ্রশান্ত গুপ্ত, ঠাকুরের অন্যতম চিকিৎসক প্রখ্যাত কবিরাজ শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেনের প্রপৌত্র কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন সেন, সাহিত্য-সরস্বতী, সিঁথি ভাগবত সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

"তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে"র প্রধান অধ্যাপক ডঃ নরেশ গুহ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিষ্ট্রার শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত ও আবাসন বিভাগের উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার অন্যতম ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার শ্রীঅর্ধেন্দু চৌধুরী, আমার কয়েকজন সহকর্মী শ্রীচিত্ত দে (নাট্যকার ও অভিনেতা), শ্রীগোপালচন্দ্র ব্যবর্তা ও শ্রীসন্তোষ-কুমার সরকার এবং সিঁথি নিবাসী শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীবিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত। এঁদের সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রীসুধাংশুশেখর দে এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় এবং তাঁর সহযোগীরূপে শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য এই কাজে বিশেষ সাহায্য করায়, আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাঁদের মঙ্গল প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং মদীয় গুরুদেবের চরণে কোটী কোটী প্রণাম জানিয়ে, তাঁদেরও প্রণাম করি যাঁদের পরিচয় নিয়ে এই গ্রন্থটি রচিত হল। ক্ষমা প্রার্থনা করি ঠাকুরের সেই সব বিস্মৃত, অজ্ঞাত, অপরিচিত, অনামী ভক্তদের কাছে যাঁদের পরিচয় প্রকাশে অসমর্থ হয়েছি। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি সেইসব রচয়িতাগণের কাছে যাঁদের গ্রন্থের সাহায্য ছাড়া এই গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হত না।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি নিজে অনাবিল আনন্দ লাভ করেছি; এই গ্রন্থ পাঠ করে যদি কেউ মনের প্রশান্তি অনুভব করেন, আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করব।

"এতৎ কর্মফলং শ্রীরামকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু"

বিনীত
নির্মলকুমার রায়

শ্যামলী
৩৪।৭।সি, ডি. গুপ্ত লেন
সিঁথি, কলিকাতা-৭০০০৫০
মহালয়া, ১৩৮৬ সন

মণিলাল মল্লিক—৭০, বিত্তবান যদুলাল মল্লিক—৭১, কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়—৭২, মহাপুরুষ মহেন্দ্রনাথ দত্ত—৭৪, পরিব্রাজক স্বামী কৃষ্ণানন্দ—৭৬।

তৃতীয় স্তবক ঃ (ঠাকুরের আত্মীয় এবং সুপরিচিত ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দ)

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়—৭৯, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়—৮০, রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়—৮২, রামঅক্ষয় চট্টোপাধ্যায় – ৮২, রামলাল চট্টোপাধ্যায়—৮৩, রামতারক চট্টোপাধ্যায়—৮৫, হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়—৮৬, বলরাম বসু—৮৮, চুণীলাল বসু—৯০, রামচন্দ্র দত্ত—৯১, সুরেশচন্দ্র দত্ত—৯৩, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—৯৪, মনোমোহন মিত্র—৯৬, হরমোহন মিত্র—৯৭, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—৯৮, কালীপদ ঘোষ—১০০, নবগোপাল ঘোষ—১০১, দুর্গাচরণ নাগ—১০৩, অধরলাল সেন—১০৫, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল—১০৬, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—১০৭, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১০৮, প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—১০৯, মহিমাচরণ চক্রবর্তী—১০৯, ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়—১১০, হরিশচন্দ্র মুস্তাফী—১১১, কিশোরী গুপ্ত—১১২, হারাণচন্দ্র দাস—১১২, মণিমোহন সেন—১১৩, নবচৈতন্য মিত্র—১১৩, গোপাল সেন—১১৪, আনন্দমোহন ঘোষ—১১৫, রামকানাই ঘোষাল—১১৫, গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী—১১৬, শিবকৃষ্ণ মিত্র—১১৭, নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী—১১৮, রসিকলাল চন্দ্র—১১৮, নৃসিংহচন্দ্র দত্ত—১১৯, রাধামোহন বসু—১২০।

চতুর্থ স্তবক ঃ (কেবল "পদবী" অনুসারে—শ্রীশ্রীমায়ের আত্মীয়, অন্যান্য ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দ.)

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১২৩, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়—১২৩, রাজারাম মুখোপাধ্যায়—১২৪, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১২৫, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—১২৫, শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১২৬, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১২৭, দীননাথ মুখোপাধ্যায়—১২৭, নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১২৮, কালিদাস মুখোপাধ্যায়—১২৮, কালাচাঁদ মুখুজ্যে—১২৮, জয় মুখুজ্যে—১২৮, শৈলজাচরণ মুখুজ্যে—১২৯, নফর বন্দ্যোপাধ্যায়—১২৯, নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১২৯, রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—১৩০, ভবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৩০, ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়—১৩১, শিবরাম চট্টোপাধ্যায়—১৩১, দীননাথ চট্টো-

দশম স্তবক ঃ (নিজ পরিচয়ে, আত্মীয় পরিচয়ে অথবা স্থানের পরিচয়ে নির্দিষ্ট নামের ব্যক্তিগণ)

দশম স্তবক (ক) ঃ (আশ্রিত জীবসকল)

একাদশ স্তবক ঃ (নির্দিষ্ট "একক" নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ)

দ্বাদশ স্তবক : (ঠাকুরের মহিলা গুরু, মাতা, শ্বশ্রূমাতা সমেত বিশিষ্ট ভক্তদের মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি)

ত্রয়োদশ স্তবক : (সুপরিচিতা মহিলা-ভক্তবৃন্দ)

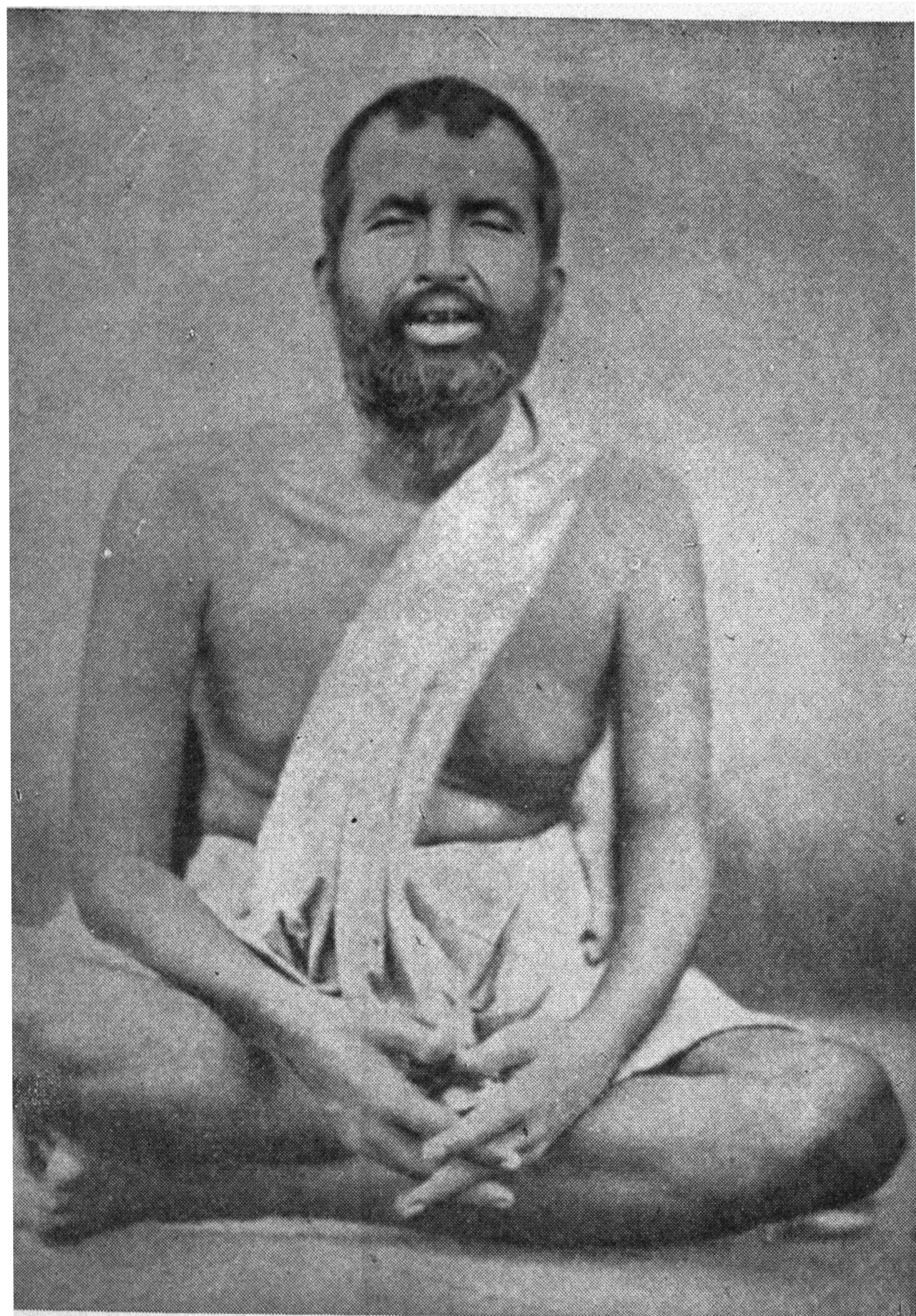
চতুর্দশ স্তবক : (নিজ পরিচয়ে অথবা আত্মীয় পরিচয়ে নির্দিষ্ট নামের মহিলা ভক্তবৃন্দ)

শুদ্ধিপত্র

বই ছাপার পর মুদ্রণ প্রমাদবশতঃ কয়েকটি মারাত্মক ভুল চোখে পড়ায়, তা সংশোধন করে নীচে দেওয়া হল।

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
২	২৭	নির্মাণ করল	নির্মাণ করলে
৭৯	১৪	লক্ষ্মীজাল	লক্ষ্মীজলা
১৬০	২৬	কালানাথ	কালীনাথ
১৮৮	২০	সেবা-সেবকভাব	সেব্য-সেবকভাব
২০৩	১৪	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২০৮	১৭	হাবুহাবু	হাবুবাবু
২৭১	৭	ভৈরতী	ভৈরবী
”	১৩	মঙ্গায়	গঙ্গায়
”	”	যায়	যান
”	২৩	অবস্থান	অবসান
২৭২	৫	উত্ত	উত্তর
”	১২	তার	তাঁর
”	২৩	ইতি	ইনি
২৭৭	১৯	৺খেলা	৺খেলাৎ
২৭৯	২	াকুর	ঠাকুর
২৯৯	২	সাধনকাল	সাধনকালে
৩৭০	১৩	গোপালরূপা	গোপালরূপী

প্রথম স্তবক



শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলার প্রধান-সঙ্গিনী এবং সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে ৮ই পৌষ, ১২৬০ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ), কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে, বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী। ৺নারায়ণ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরামকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তাঁর গৃহে ভূমিষ্ঠ হন, ৺লক্ষ্মীদেবীও তেমন সারদাদেবীর পিতা রামচন্দ্রকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তাঁর গৃহে ভূমিষ্ঠ হন; এই "লক্ষ্মী-নারায়ণে"র যুগলমিলনেই উভয়ে আত্মস্বরূপে একীভূত হয়ে "শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা"রূপে জগতে লীলা করে গেছেন। তবে এ-লীলা অভূতপূর্ব, বৈচিত্র্যময় এবং কল্পনাতীত। বিশ্বপ্লাবিনী মাতৃস্নেহধারার অধিকারিণী শ্রীশ্রীমা আজ শত সহস্র ভক্ত নরনারীর কাছে সাক্ষাৎ জগজ্জননী – আদ্যাশক্তি – মহামায়ারূপে পূজিতা।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদাদেবীর প্রথম সাক্ষাৎ হয় একেবারে শৈশবকালে জয়রামবাটী গ্রামের পার্শ্ববর্তী কামারপুকুরের কাছে শিহড় গ্রামে। সেখানে এক যাত্রাগানের আসরে মাত্র তিন বছর বয়সের শিশুকন্যা সারদাকে জনৈকা আত্মীয়া কোলে তুলে আদর করে রঙ্গচ্ছলে "কাকে বিয়ে করবি" – জিজ্ঞাসা করায়, শিশু সারদা উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের মধ্যে গদাধরকে (পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ) তাঁর ছোট আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন। পরে যখন গদাধরের বিবাহের চেষ্টা করে তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা মনের মতন পাত্রীর সন্ধান করতে বিফল হতে থাকেন, তখন গদাধর স্বয়ং নির্দেশ করেন – "জয়রামবাটীতে রামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে, সেখানে চেষ্টা করো।" গদাধরের মা চন্দ্রমণি সেখানেই গদাধরের বিবাহ দেন। বিবাহের সময় গদাধরের বয়স ২৩ বছর, আর সারদাদেবীর বয়স ৬ বছর।

বিবাহের পর কখনো পিত্রালয়ে, কখনো শ্বশুরালয়ে কয়েক বছর অতিক্রম হওয়ার পর, অবশেষে সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন এবং তাঁর সাধনপথের প্রধান-সহায়িকা হন। সকল প্রকারে সাধনার শেষে এই সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা ভাবমুখে থাকায়, তাঁর সমুদয় সেবার ভার সারদাদেবী গ্রহণ করেন এবং ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর সঙ্গে একই শয্যায় শয়নও করেন। এই সময়েই কাম-কাঞ্চন ত্যাগী স্বামীর সঙ্গে সারদাদেবীর অপূর্ব দৈবলীলা সংঘটিত হয় এবং ঠাকুর স্বয়ং এই সময় জীবনের কঠিনতম অসাধারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঠাকুর একদা সারদাদেবীকে প্রশ্ন করেছিলেন —"তুমি কি আমায় সংসারের পথে টেনে নিয়ে যেতে চাও?" তাতে সারদা-দেবী জানিয়েছিলেন — "সংসারের পথে নয়, তোমার সাধনার পথে সহায় হতে এসেছি।" সারদাদেবীও একদা ঠাকুরের পদসেবা করার কালে তাঁকে প্রশ্ন করেন — "আমি তোমার কে?" ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাঁকে উত্তরে বলেন — "মন্দিরে যে-মা ভবতারিণী, নহবত ঘরে যে-মা গর্ভধারিণী, তুমিও সে-ই আমার আনন্দময়ী মা।" এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর মধ্যে লৌকিক সম্পর্ক।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সর্বসাধনার চরম পরিণতি ঘটে "ফল হারিণী-কালীপূজার" এক রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে। সে রাত্রে ঠাকুর নিজের ঘরে সারদা-দেবীকে ষোড়শোপচারে মাতৃজ্ঞানে "ষোড়শী পূজা" করেন এবং তাঁর অন্তর্নিহিত দিব্যশক্তি উদ্বুদ্ধ করেন। এই দিন সারদাদেবীর চরণে আত্মনিবেদন করে ঠাকুর তাঁর সুদীর্ঘ সাধনার ফলরাশির সঙ্গে, নিজের জপের মালাটিও সারদা-দেবীর পাদপদ্মে চিরকালের জন্য বিসর্জন করেন। প্রকৃতপক্ষে, বিনা সাধনায় সারদাদেবী এই দিন সমস্ত দৈবশক্তি এবং সমস্ত সিদ্ধির অধিকারিণী হন। এই মহাপূজার পরেও সারদাদেবী কিছুকাল ঠাকুরের সঙ্গে একত্রে বাস করেন; কিন্তু সে সময় ঠাকুরের ভাবসমাধিকালে প্রায় সারারাতই সারদাদেবী তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকার ফলে এবং অনিদ্রায় রাত কাটাতে থাকায়, ঠাকুরের নির্দেশে নহবতঘরে মাতা চন্দ্রমণির কাছে তাঁর শোয়ার ব্যবস্থা হয়। পরবর্তীকালে, গৃহীভক্ত শম্ভুচরণ মল্লিক কালীবাড়ীর বাগানের কাছে একটি কুটীর নির্মাণ করল, সেখানেও তিনি কিছুদিন বাস করেন।

পূর্বে কামারপুকুরে থাকাকালীন, বেজাই গ্রাম নিবাসী শ্বশুর বংশের বৃদ্ধ কুলগুরু শ্রীপূর্ণানন্দ ভট্টাচার্যের কাছে সারদা দেবী শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষা নিলেও, পরে ঠাকুর স্বয়ং সারদাদেবীর জিহ্বায় বীজমন্ত্র লিখে দীক্ষা দান করেন। তদবধি সারদাদেবী প্রতিদিন লক্ষ জপ করতেন। ঠাকুর তাঁকে সকল দেব-দেবীর সাধনা করতে শেখানোর ফলে, তিনি বিবিধ অনুভূতির অধিকারিণী হন এবং

শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাকেই ইষ্টপূজা হিসাবে গ্রহণ করেন। একদা নহবতঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ফটো সাজিয়ে তিনি যখন পূজার আয়োজন করছিলেন, সেসময় সহসা ঠাকুর সেখানে প্রবেশ করে ভাবস্থ হন এবং নিজের সেই ফটোর ওপর দু'একটি ফুল রেখে ভবিষ্যৎবাণী করেন – "কালে এই ছবি ঘরে ঘরে পুজো হবে।" বলা আবশ্যক, সারদাদেবী ভাল ভাল ভজন সঙ্গীত গাইতে পারতেন এবং সেই গানে গোপনে ইষ্টের পূজা করতেন।

অন্যান্য অবতার-লীলায় ধর্মপত্নীকে যেমন বর্জন করা হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে ঠিক তার বিপরীত ঘটেছে। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সারদা-দেবী তাঁরই উত্তর সাধিকা রূপে সম্মানিতা, মহাশিষ্যারূপে পালিতা এবং মহা-শক্তিরূপে পূজিতা। সারদাদেবীও শ্রীরামকৃষ্ণকে কখনো গুরু, কখনো ইষ্ট বা পতি, কখনো সন্তান, আবার কখনো মা-ভবতারিণীর সচল বিগ্রহরূপে জ্ঞান করেছেন। দৈহিক-সম্পর্ক বিবর্জিত এই অভূতপূর্ব, অপূর্ব, অদ্ভুত স্বামী-স্ত্রীর লীলা, – জগতে আর কোন অবতার-লীলায় ঘটেনি। তাই সাধারণতঃ লোকে শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বধর্ম সমন্বয়কারী হিসাবে অন্তরে গ্রহণ করলেও, সারদাদেবী তাঁকে শ্রেষ্ঠ কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী রূপেই অধিক স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ঠাকুরের দুরারোগ্য ব্যাধির সময় একদা সারদাদেবী তাঁর জীবন রক্ষার জন্য যখন ৺তারকেশ্বরে হত্যা দিয়ে বিফল হয়ে ফিরে আসেন, তখন তাঁর অস্থিরতা দর্শন করে ঠাকুর তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর লীলা সংবরণের পরেও সারদাদেবীকে আরো কিছুদিন জগতে থাকতে হবে এবং ঠাকুরের অসম্পূর্ণ কাজগুলি তাঁকেই সম্পূর্ণ করতে হবে। ঠাকুর যেদিন মহাসমাধিতে শরীর রক্ষা করেন, সেদিন সারদাদেবী "আমার মা-কালী কোথায় গেলে গো!" – শুধু একবার এই চীৎকার করেই মূর্ছা যান।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পরেও সারদাদেবীর সম্মুখে ঠাকুর বহুবার দেহ ধারণ করে তাঁকে দর্শন দেন এবং তখনো অনেক লীলার প্রকাশ হয়। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সারদাদেবী যেদিন হাতের অলংকার (সোনার বালা) খুলতে যান, সেদিন ঠাকুর তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে স্বয়ং হাত দুটি ধরে তাঁকে সেই বালা খুলতে নিষেধ করেন। ঠাকুরের অদর্শনে সারদাদেবীর জীবন দুর্বহ বোধ হতে থাকায়, পুনরায় ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে বলেন – "না, তুমি থাকো; অনেক কাজ বাকী আছে।" পরবর্তীকালে ভক্তদের সঙ্গে সারদাদেবী যখন তীর্থ দর্শনে যান, তখন বৃন্দাবনে অবস্থানকালে শ্রীরাধিকার মহাবিরহের ভাবে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লে, পুনরায় সেখানে ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে আনন্দ দান করেন এবং এরপর থেকেই তিনি ঘন ঘন ঠাকুরের দর্শন পান। এই সময়

ঠাকুর তাঁকে একদা দর্শন দিয়ে ভক্ত যোগীন্দ্রকে (পরবর্তীকালে স্বামী যোগানন্দ) দীক্ষা দিতে আদেশ করেন এবং যোগীন্দ্রও ঠাকুরের দর্শন ও ঐ বিষয়ে আদেশ লাভ করার পর শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তাঁকে দীক্ষা দান করেন। পরে কামারপুকুরে অবস্থানকালে পল্লীবাসীদের সমালোচনায় শ্রীশ্রীমা পুনরায় দেহের অলঙ্কারাদি ত্যাগ করার চেষ্টা করলে, ঠাকুর তাঁকে দর্শন দিয়ে পুনরায় সেকাজে নিবৃত্ত করেন এবং মহাসাধিকা সন্ন্যাসিনী গৌরীমাতার কাছে এই বিষয়ে বৈষ্ণব তন্ত্রের অভিমত জেনে নিতে আদেশ দেন। পরে গৌরীমাতার শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি চির সীমন্তিনী সধবারূপে জীবনযাপন করতে স্বীকৃত হন। তিনি অধিকাংশ সময় নিজেকে কঠিন তপস্যা, ধ্যান, জপ ও গভীর সমাধির মাঝেই নিযুক্ত রাখতেন।

নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ)—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আশীর্বাদ ও অনুমতি নিয়ে আমেরিকার চিকাগো-ধর্মমহাসভায় যোগদানের পর এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারের পর স্বদেশে ফিরে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠের পত্তন করলে, সারদাদেবীকেই "সঙ্ঘ-জননী"রূপে বরণ করা হয় এবং তদবধি ঠাকুরের সকল সন্তানই তাকে মাতৃরূপে গ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই তিনি সকলের কাছে "শ্রীশ্রীমা"রূপে বিরাজ করেন এবং সমস্ত সন্তানদের কল্যাণার্থে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এমনকি, ঠাকুরের বিদেশী ভক্তেরাও তাঁর কাছে এসে মাতৃমহিমার রসাস্বাদন করে ধন্য হতেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পবিত্র জীবন-লীলা সাধারণ লোকের কল্পনাতীত। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, তেমন সারদাদেবী—দুজনেই অপূর্ব অদ্ভুত। ঠাকুর বাছাই করে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভক্তকে দীক্ষা দিলেও, শ্রীশ্রীমা অগণিত ভক্তদের নির্বিচারে দীক্ষা দিয়ে ও তাঁদের নিজ স্নেহছায়ায় আশ্রয় দিয়ে জগন্মাতা নাম সার্থক করেছেন। স্বামীজী বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে তাঁরই নামে সঙ্কল্পের দ্বারা প্রথম ৺দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন এবং আজ অবধি সারদাদেবীর নামেই সঙ্কল্পের দ্বারা বেলুড়ে এই মহাপূজা সম্পন্ন হয়।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই উত্তর কলকাতার বাগবাজারে উদ্বোধন মঠে (মায়ের বাড়ী) শ্রীশ্রীমা দেহরক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের নিজের ভাষায়:

"আমি মা, জগতের মা, সকলের মা।"

*

স্বামী বিবেকানন্দ

পূর্বনাম শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত অবিবাহিত ত্যাগী ভক্ত সন্তান এবং প্রধানতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ। উত্তর কলকাতার সিমলা পল্লীতে ৩নং গৌর মুখার্জী ষ্ট্রীটে, ২৯শে পৌষ, ১২৬৯ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১২ই জানুয়ারী, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) পৌষ-সংক্রান্তির দিন, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে কায়স্থ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কালনা-মহকুমায় দত্ত-দরিয়াটানা (দেরেটোন) গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন এটর্নী শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী। তাঁর প্রপিতামহ শ্রীরামমোহন দত্ত তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের একজন বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন, পিতামহ শ্রীদুর্গাচরণ দত্তও আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন. পিতাও আইনজীবী ছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথও কিছুদিন আইন শিক্ষার পর আধ্যাত্মিক প্রেরণায় তা ত্যাগ করেন। পিতামহ দুর্গাচরণ অবশ্য পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই নানাগুণে ভূষিত নরেন্দ্রনাথ "এনট্রান্স" পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং পরে জেনারেল এসেমব্লী কলেজে (বর্তমানে স্কটিশচার্চ কলেজ) ভর্তি হন। দর্শন-শাস্ত্রে বি. এ. পাস করার পর তিনি "ল-কলেজে" কিছুদিন আইন বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পরে অত্যন্ত অর্থাভাবের জন্য কিছুদিন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মেট্রোপলিটন স্কুলে প্রধান শিক্ষকের চাকরী গ্রহণ করেন, কিন্তু অবশেষে তা-ও ত্যাগ করেন।

অন্তরের তীব্র ধর্ম পিপাসা মেটাবার জন্য জীবনের প্রথম অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজে এবং ধর্মজগতের প্রায় সমুদয় মহাপুরুষের কাছে যাতায়াত করেও ঈশ্বর দর্শনের অদম্য ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন নি। ঠিক এই ব্যাকুলতার সময়েই স্বীয় সিমলা পল্লীতে ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সুগায়ক নরেন্দ্রনাথ সেখানে ঠাকুরকে অনুপম সঙ্গীতে মুগ্ধ করলে, ঠাকুর তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে যান। পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের উপদেশানুসারে তিনি সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ও অন্যান্য বন্ধুগণসহ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান এবং তাঁর কথামৃত পান করেন। এরপর থেকেই তিনি বার বার দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া শুরু করেন এবং ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করে তাঁর মধ্যে অলৌকিক পরম শক্তির সন্ধান পান। ঠাকুরও নরেন্দ্রনাথকে তাঁর অকৃত্রিম প্রেমের আকর্ষণে ক্রমশঃ নিজের কাছে টানেন। এরপরেই পিতার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় নরেন্দ্রনাথ প্রচণ্ড দারিদ্র্য, আত্মীয় বিরোধ প্রভৃতি নানাবিপদের সম্মুখীন হন এবং ঐ সময়

অনেক ধনীর কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রলোভনও উপস্থিত হয়। বেকারত্বের অভিশাপ, ক্ষুধার জ্বালা, শারীরিক কষ্ট প্রভৃতি উপেক্ষা করে নরেন্দ্রনাথ সেই সময় নিজ আদর্শে অটুট থাকেন এবং অসীম মনোবলের দ্বারা সমগ্র দুর্ভোগকে একে একে পরাস্ত করেন। বলা বাহুল্য, এই অসময়ে একমাত্র প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই সকল বিষয়ে ভরসা লাভ করে, নরেন্দ্রনাথ তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক নির্দেশ পান। মহান গুরু – মহান শিষ্য! মণিকাঞ্চন যোগ! অতঃপর ঠাকুর উপযুক্ত সময়ে নরেন্দ্রনাথকে দীক্ষাদান করেন এবং সমুদয় শিষ্যগণের মধ্যে তাঁকেই সর্বপ্রধান বলে চিহ্নিত করেন। ঠাকুর তাঁকে "ঈশ্বরকোটী" রূপেও নির্দেশ করেন।

নরেন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁকেই জীবনের ধ্রুবতারারূপে বরণ করেন। ঠাকুরও তাঁকে সর্ব-শক্তি প্রদান করে শিবজ্ঞানে জীবসেবা এবং লোকশিক্ষার ভার দেন। দেহ-রক্ষার কয়েকদিন আগে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের কাছে স্বরূপ প্রকাশ করে নিজমুখে ঘোষণা করেন— "যে-রাম, যে-কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং এইদেহে রামকৃষ্ণ"। নরেন্দ্রনাথই ঠাকুরকে সারাবিশ্বে পরমপুরুষ যুগাবতাররূপে প্রচার করেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর নরেন্দ্রনাথ অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের সঙ্গে "সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন এবং "স্বামী বিবেকানন্দ" নামে অভিহিত হন। "স্বামীজী" বলতে প্রধানতঃ বিবেকানন্দকেই বোঝায়।

তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এই সুবিশাল ভারতভূমি একাকী পদব্রজে ভ্রমণ করেন এবং বহু রাজা-মহারাজা থেকে শুরু করে, দীনতম মানুষের সঙ্গেও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করেন। একাধারে আধ্যাত্মিকতা এবং স্বাদেশিকতার মহানমন্ত্রে তিনি সেদিন ভারতবাসীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

এরপর পুনরায় পট পরিবর্তন হয়। আমেরিকার চিকাগো-ধর্মমহাসভায় কোন হিন্দুকে স্থান না দেওয়ার প্রতিবাদে স্বামীজী অতিকষ্টে অর্থ সংগ্রহ করে একাকী সুদূর আমেরিকায় যান এবং সেখানে বহুবাধা অসুবিধা সত্ত্বেও ধর্ম মহাসভায় যোগদান করতে সক্ষম হন। তিনি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে সেখানে বক্তৃতার দ্বারা সকলের মন জয় করেন এবং যুক্তির দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্মকেই উদার ও শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপন্ন করেন। তাঁর সৌম্যকান্তি, বিরাটব্যক্তিত্ব, অগাধ পাণ্ডিত্য, যুক্তিপূর্ণ ভাষণ, তারুণ্যের জোয়ার এবং সর্বোপরি উদার হৃদয়ের পরিচয় – সেখানে বহুলোকের লোভের বস্তু হওয়ায়, অনেক পাশ্চাত্ত্যবাসী দলে

দলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এরপরেও তিনি আরো কয়েকবার পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রধান শহরগুলি ভ্রমণ করেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব প্রচারের মাধ্যমে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে উত্তর কলকাতার বাগবাজারে "বলরাম-মন্দিরে" (ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ী) স্বামীজী তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি, বিশ্ববিখ্যাত "রামকৃষ্ণ মিশনের" প্রতিষ্ঠা করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিরূপে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" (নিজের মুক্তি এবং জগতের হিতসাধনার্থে) কাজ করে যাওয়া—এই ছিল মিশনের মূলমন্ত্র। মিশনের কর্মপদ্ধতিকে তিনি মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করেন: (১) জনগণের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সেবা, (২) শিক্ষাদান, (৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব যেরূপ বিকশিত হয়েছিল, তার প্রচার। প্রকৃতপক্ষে, শিবজ্ঞানে জীবসেবা—বিশেষতঃ দুঃস্থ দরিদ্রদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন এবং জনসাধারণের জন্য আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রসার—এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের ব্রতই ছিল স্বামীজীর কর্মযোগ। পরে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান-বাড়ীতে "মঠ" স্থানান্তরিত হয় এবং এই মঠেই তিনি তাঁর বিদেশিনী শিষ্যা মার্গারেট নোবেলকে দীক্ষা দান করে "সিস্টার নিবেদিতা" নামে ভূষিত করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর স্বামীজী বেলুড়ের নতুন মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বরক্ষিত পূত অস্থিভস্ম নিয়ে যান এবং ঠাকুরের "প্রতিকৃতি" স্থাপন করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী সাধুবৃন্দ বেলুড়ে নতুন মঠে চলে আসেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী অবধি মিশনের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর, স্বামীজী তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মঠ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষরূপে কাজের ভার দেন।

স্বামীজীর ন্যায় একাধারে স্বদেশপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক, গুরুচরণাশ্রয়ী, সত্যানুরাগী, পরমত্যাগী, পরমযোগী, চরম বিজ্ঞান-নির্ভর, হৃদয়বান, নির্ভীক, তেজস্বী, ইন্দ্রিয়জয়ী, আধ্যাত্মিক শক্তিধর, পরিব্রাজক, দরিদ্র-বান্ধব, আর্ত-ত্রাতা, সুপণ্ডিত, সুবক্তা, সঙ্গীতজ্ঞ, লেখক, কবি—সর্বোপরি সৌম্যকান্তি "সৈনিক-সন্ন্যাসী" আজ অবধি বিশ্বে জন্মগ্রহণ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর মত আর একজন বিবেকানন্দের সন্ধান পাওয়া যায় না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত ত্যাগী সন্তানদের একত্রিত করে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে জীবকল্যাণে কাজ করার জন্য "শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের" প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্বামীজী সমগ্র বিশ্ববাসীকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাব-ধারা গ্রহণ করার যে মহাসুযোগ

দিয়েছেন, শুধু সেই কারণেই, অন্যান্য অনেক মূল্যবান কাজ সত্ত্বেও তিনি ভক্ত-হৃদয়ে আজ সত্যকারের মহারাজের আসনে অমর হয়ে বসে আছেন। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ করতে গেলেও, একখানি বৃহৎ গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। ঠাকুরের মত শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতিও তাঁর অসীম ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তিনি শ্রীশ্রীমাকে সঙ্ঘ-জননীরূপে বরণ করেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে তাঁরই নামে সঙ্কল্পদ্বারা বেলুড় মঠে প্রথম ৺দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন। গুরুভ্রাতাদেরও তিনি যেমন নিজের বুকের পাঁজরের মতন জ্ঞান করতেন. গৃহীভক্তদেরও তিনি তেমন পরমপ্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করতেন। সর্বোপরি তিনি মহাপ্রেমিকরূপে যাদের হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর নিজের ভাষা—"আমার প্রেম সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতি, যারা যুগের পর যুগ ধ'রে কেবল তলিয়েই যাচ্ছে, যাদের সাহায্য করার কেউ নেই, যাদের কথা কেউ একবারটি ভাবেও না।"

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার রাত্রি প্রায় ৯টার সময় অপরিণত বয়সে - মাত্র ৩৯ বৎসর ৫ মাস ২২দিনে. বেলুড়মঠে ভারত-আত্মাস্বামী বিবেকানন্দ সমাধিযোগে স্বেচ্ছায় মহাপ্রয়াণ করেন।

তাঁর সারাজীবনের সাধনালব্ধ অনুভূতি এবং শ্রেষ্ঠ বাণী :

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ॥"

*

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

পূর্বনাম শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত বিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সন্তান এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ। চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমায় শিকরা কুলীন গ্রামে, ৮ই মাঘ, ১২৬৯ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ২১শে জানুয়ারী, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) চান্দ্র মাঘ, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে কায়স্থ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীআনন্দ মোহন ঘোষ এবং মাতা শ্রীমতী কৈলাসকামিনী দেবী। প্রথম জীবনে রাখালচন্দ্র নিজ গ্রামে পিতৃ স্থাপিত পাঠশালায় এবং কলকাতার "ট্রেনিং একাডেমী"তে কিছুকাল লেখাপড়া করেন। শিশুকাল থেকেই তিনি ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। হুগলী জেলার কোন্নগরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত-

শ্রীমনোমোহন মিত্রের ভগ্নী বিশ্বেশ্বরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং বিবাহের পর মনোমোহনের সাহায্যেই রাখালচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম মিলিত হন। পরে ঠাকুরের কাছে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে, তিনি ঠাকুরের প্রতি এত অনুরক্ত হন যে, বাড়ীতে আবদ্ধ না থেকে সর্বদাই তাঁর আশ্রয়ে থাকেন এবং উপযুক্ত সময়ে ঠাকুরের কাছ থেকে দীক্ষালাভ করেন। ঠাকুর তাঁকে "ব্রজের রাখাল" জ্ঞানে পরম স্নেহ করতেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয় এবং ঠাকুর তাঁকে "ঈশ্বরকোটি" বলে নির্দেশ করেন। ইতিমধ্যে রাখালচন্দ্রের একটি পুত্র সন্তানও জন্মায়; কিন্তু ঠাকুরের দেহরক্ষার কিছুকাল পরেই তাঁর স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী দেবী এবং একমাত্র দশম বর্ষীয় পুত্র সত্যচরণের মৃত্যু হয়। পিতার বিশাল জমিদারী ও অন্যান্য বিরাট সম্পত্তি ত্যাগ করে রাখালচন্দ্র তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং সম্পূর্ণরূপে রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন। গুরু ভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন "রাজা মহারাজ" বা "মহারাজ"। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি "সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন এবং "স্বামী ব্রহ্মানন্দ" নামে অভিহিত হন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাকেই "রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের" প্রথম অধ্যক্ষরূপে বরণ করেন এবং তিনিও সুদীর্ঘকাল - ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে বাকী জীবন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল অবধি ঐ পদে অধিষ্ঠিত অবস্থায় তাঁর যথাকর্তব্য পালন করেন। ঠাকুরের "মানসপুত্র"রূপে তিনি বহুভক্তকে ধর্মপথে পরিচালিত করেন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি মিশনের শাখা প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহান ভাব-ধারা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তিনি একজন সুগায়কও ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক জগতের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে "বলরাম মন্দিরে" ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তাঁর দেহরক্ষা হয়।

তাঁর অন্যতম উপদেশ :

"কর্মই জীবনের উদ্দেশ্য নয় – জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। বারো আনা মন ভগবানের দিকে রেখে, বাকী চার আনায় জগতের কাজ করলে ভেসে যায়।"

*

স্বামী শিবানন্দ

পূর্বনাম শ্রীতারকনাথ ঘোষাল। তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত বিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সন্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদ। চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমা-সহরে, ২রা অগ্রহায়ণ, ১২৬১ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৬ই নভেম্বর, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) চান্দ্র কার্তিক, কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন বারাসাত আদালতের প্রতিষ্ঠালব্ধ মোক্তার শ্রীরামকানাই ঘোষাল এবং মাতা শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবী। বারাসাত মিশনারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে, তারকনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠ শুরু করেন, কিন্তু প্রবেশিকা শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায় শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই তিনি প্রথম জীবনে পারিবারিক কারণে বঙ্গদেশের বাইরে গাজিয়াবাদ, মোগলসরাই প্রভৃতি অঞ্চলে রেলওয়ে বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন। মাতৃহীনা ভগ্নী নীরদার বিবাহের জন্য বিনিময়-বিবাহে রাজী হয়ে, তারকনাথ বারাসাত মহকুমার মহেশ্বরপুর গ্রামে পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা নিত্যকালী দেবীকে বিবাহ করেন। পরে রেলের চাকরী ত্যাগ করে তিনি কলকাতায় "ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি"র অফিসে পুনরায় চাকরী গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় তা-ও তিনি ত্যাগ করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত শ্রীরামচন্দ্র দত্তের কলকাতার সিমলা পল্লীর বাড়ীতে তারকনাথ প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন এবং পরে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। এই সময় তিনি ঠাকুরের কাছে বিশেষ কৃপা ও দীক্ষালাভের পর তাঁর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং পত্নীর মৃত্যুর পরেই তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করে পিতার অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে সম্পূর্ণভাবে ঠাকুরের আশ্রয়ে চলে আসেন। এখানে ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি "সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন এবং "স্বামী শিবানন্দ" নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন "মহাপুরুষ মহারাজ।"

প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহরক্ষার পর তিনি 'রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের' দ্বিতীয় অধ্যক্ষরূপে মনোনীত হন এবং দীর্ঘকাল — ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে থেকে বাকী জীবন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী অবধি ঐ পদে অধিষ্ঠিত অবস্থায় নানাভাবে মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং বেদান্তের ভাবধারা প্রচারের জন্য সিংহল অবধি গমন করেন। দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে তাঁর সেবাকার্য এবং দানকার্য ছিল অতুলনীয়। অযাচিতভাবে দীক্ষাদানের দ্বারা তিনি প্রচুর ভক্তকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের

মহান ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করেন এবং কয়েকটি গুরুতর বিপর্যয়ের হাত থেকে সেই সময় মিশনকে রক্ষা করেন। তিনি একজন গায়কও ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠে তাঁর দেহরক্ষা হয়।

তাঁর অন্যতম বাণী :
"শ্রীরামকৃষ্ণই এ যুগে সকল জীবের গুরু ও ইষ্ট।"

স্বামী অখণ্ডানন্দ

পূর্বনাম শ্রীগঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সন্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদ। উত্তর কলকাতার আহিরীটোলায় মাণিক বসু ঘাট ষ্ট্রীটের একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে, ১৫ই আশ্বিন, ১২৭১ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) মহালয়ার দিন অমাবস্যা তিথিতে ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন শ্রী শ্রীমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় তর্করত্ন। শৈশবে বাড়ীতেই তিনি লেখাপড়া করেন।

উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ভক্ত দীননাথ বসুর বাড়ীতে গঙ্গাধর প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে তিনি একরাত্রি বাস করেন এবং দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলে ঠাকুর তাঁকে দীক্ষাদান করেন। সেই সময় থেকেই ঠাকুরের কাছে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত শুরু হয় এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি "সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন এবং "স্বামী অখণ্ডানন্দ" নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন "গঙ্গাধর মহারাজ।"

পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের নানা তীর্থ ভ্রমণ ছাড়াও তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহান্ ভাব-ধারা প্রচারে তিব্বত অবধি ভ্রমণ করেন। তিব্বতে ভ্রমণকালে তাঁর স্কন্ধে লামারা খাপ্ সমেত তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে, কিন্তু তিব্বতী পুলিশ তাঁকেই গ্রেপ্তার করে। পরে অবশ্য তিব্বতী ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় তিনি মুক্তি পান। একদা কাশ্মীরের শ্রীনগরে ভ্রমণকালেও বৃটিশ সরকার তাঁকে "গুপ্তচর" সন্দেহে গ্রেপ্তার করে এবং পাঁচদিন বন্দী করে রাখার পর তাঁকে মুক্তি দেয়। আরো একবার বরানগর মঠে আসার সময় হাওড়া জেলার বালী ষ্টেশনে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রমাণাভাবে ছেড়ে দেয়।

দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দের দেহরক্ষার পর তিনি "রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে"র

তৃতীয় অধ্যক্ষরূপে মনোনীত হন এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ থেকে বাকী জীবন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী অবধি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সঙ্ঘবদ্ধভাবে জনগণের সেবাকার্য তিনিই মিশনে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন এবং স্বয়ং অক্লান্ত জনসেবার দ্বারা বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠে তাঁর দেহরক্ষা হয়।

তাঁর একটি অমূল্য উপদেশ :

"মানুষের সেবা করা এবং মানুষকে ভালবাসাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

পূর্বনাম শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সন্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদ। পিতার কর্মস্থল উত্তরপ্রদেশের এটোয়ায়, ১৫ই কার্তিক, ১২৯৫ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ৩০শে অক্টোবর, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী তিথিতে ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগৃহ ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার বেলঘরিয়ায়। পিতা ছিলেন শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীমতী নকুলেশ্বরী দেবী। কার্য উপলক্ষে হরিপ্রসন্নের পিতা উত্তরপ্রদেশের এটোয়ায় থাকার দরুন, শৈশবে তাকে কাশীতে পিতৃগৃহে বিদ্যাভ্যাস করতে হয়; পরে বেলঘরিয়ার আদি পিতৃগৃহ থেকে ট্রেনে যাতায়াত করে তিনি কলকাতায় লেখাপড়া সুরু করেন। হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে প্রথম বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে পাটনা থেকে বি এ. পাশ করে পুণায় গিয়ে তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হন এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি গাজীপুরে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারের সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন।

ছাত্রাবস্থাতেই হরিপ্রসন্ন বেলঘরিয়ায় আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের অবস্থানের সময় একটি বাগান-বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। পরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত শুরু করেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে রাত্রিবাসও করেন। এই ছাত্রাবস্থাতেই ঠাকুর তাঁকে দীক্ষাদান করেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। ঠাকুরের দেহরক্ষার সময় হরিপ্রসন্ন কলকাতায় ছিলেন না; বাঁকীপুরে অধ্যয়ন উপলক্ষে তিনি তখন সেখানে বাস করছিলেন। পরে তিনি ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারের

সরকারী চাকরী ত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন এবং "সন্ন্যাস" গ্রহণের পর তিনি "স্বামী বিজ্ঞানানন্দ" নামে অভিহিত হন। গুরু ভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন "বিজ্ঞান মহারাজ" বা "হরিপ্রসন্ন মহারাজ।"

তৃতীয় অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দের দেহরক্ষার পর, তিনি "রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনে"র চতুর্থ অধ্যক্ষ রূপে মনোনীত হন। ঠাকুরের দীক্ষিত ত্যাগী-সন্তানদের মধ্যে তিনিই মিশনের শেষ অধ্যক্ষ। এই পদে তিনি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ থেকে বাকী জীবন, মাত্র এক বছর – ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকেন এবং মিশনের নানা কাজে অংশ গ্রহণ করেন। ভারতের বহু প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণ করা ছাড়াও তিনি নিজেকে জপ-ধ্যানে নিযুক্ত রেখেছিলেন এবং ভারতের বাইরে রেঙ্গুন ও সিংহলেও তাঁকে মিশনের কার্যাবলী দর্শনের জন্য যেতে হয়েছিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী পৌষ-সংক্রান্তির দিন তিনি, স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব নির্দেশানুযায়ী বেলুড়ে মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ সমাপন করেন এবং ঠাকুরের "আত্মারামের কৌটা" বেদীতে স্থাপন করে সেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মর-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য, এইটিই তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শেষ জীবনে তিনি উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে বাস করতেন, সেখানেই ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তাঁর দেহরক্ষা হয় এবং সেখানকার ত্রিবেণী সঙ্গমে তাঁকে সলিল-সমাধি করা হয়।

তাঁর একটি অমূল্য উপদেশ :

"ছেলেবেলায় 'বর্ণ পরিচয়ে' যা' যা' প'ড়েছ, তাই জীবনে সাধন কর – অর্থাৎ 'সদা সত্য কথা বলিবে', 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়' – এই দুটি নীতি যদি সাধন করতে পার, আর সবই তাহলে সহজ হয়ে যাবে।"

স্বামী প্রেমানন্দ

পূর্বনাম শ্রীবাবুরাম ঘোষ। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সন্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদ। হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে, ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ) চান্দ্র অগ্রহায়ণ – শুক্লা নবমী তিথিতে কায়স্থ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীতারাপদ ঘোষ এবং মাতা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী। তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত বলরাম বসুর

বিবাহ হয়। শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় পাঠ শেষ করে তিনি কলকাতায় তাঁর কাকা শ্রীগুরুচরণ ঘোষের বাড়ীতে থাকাকালীন প্রথমে "এরিয়ান স্কুলে" এবং পরে শ্যামপুকুরের "মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে" অধ্যয়ন করেন। পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার পর তাঁর লেখাপড়ায় তেমন মন না থাকায়, তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হন এবং লেখাপড়া ত্যাগ করেন।

কলকাতার জোড়াসাঁকোর এক হরিসভায় বাবুরাম প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন; কিন্তু তখন তিনি ঠাকুরের পরিচয় জানতেন না। পরে তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বাবুরামকে প্রথম নিয়ে যান এবং তিনিও ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন। এরপর থেকেই তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং ঠাকুরের পূত সঙ্গ লাভ করেন। ঠাকুরও বাবুরামের মাতার কাছ থেকে তাঁকে ভিক্ষা চেয়ে নেন এবং যথাসময়ে বাবুরামকে দীক্ষা দান করে দক্ষিণেশ্বরে নিজের কাছেই রেখে দেন। ঠাকুর তাঁকে "ঈশ্বরকোটী" বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়েছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি "সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন এবং "স্বামী প্রেমানন্দ" নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন "বাবুরাম মহারাজ"।

পরবর্তীকালে সর্বদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ মননে রত অবস্থায় বাবুরামের জীবনে 'ধ্যানে-জ্ঞানে' এবং 'সেবা-ভক্তি'তে চরম অভিব্যক্তি ঘটে। ভক্তসেবায় তিনি ছিলেন প্রেমময় এবং ক্ষমাধর্মে তিনি ছিলেন আদর্শ পুরুষ। ঠাকুরের চাইতেও তিনি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং তাঁকে পরিপূর্ণ ভগবতী জ্ঞানে সেবা করতেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় মঠে অতিবাহিত হলেও, মাঝে মাঝে তিনি তীর্থ ভ্রমণেও যেতেন। পূর্ববঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবধারা প্রচারে তিনি বিশেষভাবে নিজেকে নিযুক্ত করেন এবং তাঁর প্রভাব সেখানকার মুসলমান সমাজেও বিস্তার লাভ করে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই উত্তর কলকাতায় বাগবাজারের বলরাম-মন্দিরে তিনি দেহরক্ষা করেন।

তাঁর একটি প্রত্যক্ষ অনুভূতি:

"শ্রীশ্রীমা মনুষ্যদেহধারিণী হলেও তাঁর অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু; জীবের কল্যাণের জন্য মনুষ্যবৎ লীলা করেছেন।"

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

পূর্বনাম শ্রীনিত্যনিরঞ্জন ঘোষ। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সন্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদ। চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমায় রাজারহাট বিষ্ণুপুর গ্রামে, ইংরাজী ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কায়স্থ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ বা তিথি অজ্ঞাত থাকায়, রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁর আবির্ভাব দিবস পালিত হয়। তাঁর পিতা-মাতার নাম বা পরিচয়ও অজ্ঞাত। বারাসাত নিবাসী পণ্ডিত কালী-কৃষ্ণ মিত্র ছিলেন তাঁর মাতুল এবং সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হরিনাথ দে ছিলেন তাঁর ভাগ্নে। প্রথম জীবনে নিত্যনিরঞ্জন তাঁর মাতুলের কলকাতার বাড়ীতে বাস করতেন এবং লেখাপড়া শিখতেন। সেই সময় তিনি আহিরীটোলার এক প্রেত-তত্ত্বান্বেষী দলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রেতচর্চা শুরু করেন এবং নিজে প্রেতাবিষ্ট অবস্থায় অনেকের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করে অলৌকিক কাজ দেখান।

লোকমুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনে নিত্যনিরঞ্জন প্রথমে দলবলসহ একদা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন এবং সেখানে নিজের রচিত "প্রেত-চক্রে" ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকেও বসাতে সক্ষম হন। কিন্তু পরবর্তীকালে ঠাকুরের উপদেশে তিনি ভৌতিক-চর্চা ত্যাগ করে ভগবৎ-চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। অবশেষে নিত্যনিরঞ্জন সম্পূর্ণরূপে ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করায়, ঠাকুর যথাসময়ে তাঁকে দীক্ষাদান করেন। ঠাকুর তাঁকে "ঈশ্বর-কোটী" বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়েছিল। বীর ভাবাপন্ন সেবক হিসাবে তিনি সব সময় ঠাকুরকে আগলে রাখার, বা পাহারা দেবার ভার গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি "সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন এবং "স্বামী নিরঞ্জনানন্দ" নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন "নিরঞ্জন মহারাজ"।

বলা আবশ্যক, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, তাঁর পূত দেহাবশেষ কাঁকুড়গাছিতে গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে স্থানান্তরের আগেই তিনি গুরু-ভ্রাতা শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) সহায়তায় অর্ধেকেরও বেশী ভস্মাবশেষ গোপনে সরিয়ে রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে সেই ভস্মাবশেষই স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়মঠে সংরক্ষিত করেছিলেন।

তিনি ভারতের বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন এবং শেষজীবনে হরিদ্বারে বাস করা কালীন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে সেখানে তিনি দেহরক্ষা করেন।

তাঁর একটি উপদেশ :

"ঠাকুরের নাম জপ কর।"

স্বামী যোগানন্দ

পূর্বনাম শ্রীযোগানন্দ রায়চৌধুরী। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের -কৃপাপ্রাপ্ত, বিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সন্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদ। চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণেশ্বর গ্রামে, ১৮ই ফাল্গুন, ১২৬৭ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ৩০শে মার্চ, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ) চান্দ্র মাঘ, কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সুবিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরী বংশের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীনবীনচন্দ্র রায়চৌধুরী। যোগীন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনে আগড়পাড়া মিশনারী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেছিলেন।

একদা যোগীন্দ্রনাথ বাড়ীর কাছে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ীর বাগানে ফুল তুলতে গিয়ে, ঠাকুর রামকৃষ্ণকে অন্য পরিচয়ে প্রথম দর্শন করেন; কারণ তার কাছে ঠাকুরের আসল পরিচয় তখন অজানা ছিল। পরবর্তীকালে আবার সেখানে যাওয়ার ফলে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন এবং ঘন ঘন ঠাকুরের কাছে যাতায়াত ও জপ-ধ্যানে সময় অতিবাহিত করেন। এই সময় তাঁর উদাসভাব লক্ষ্য করে পিতামাতা তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করেন এবং একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ও ঠাকুরের সঙ্কলাভ করা সত্ত্বেও তিনি মাতার অত্যন্ত জেদের ফলে বিবাহ করতে বাধ্য হন, কিন্তু কোনদিনই তিনি বিবাহিত জীবন যাপন করেননি। বিবাহের পরেও ঠাকুর তাকে পুনরায় আশ্রয় দেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। ঠাকুর যোগীন্দ্রনাথকে "ঈশ্বরকোটী" বলে নির্দেশ করেছিলেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার দিন অবধি তার পাশে থেকে যোগীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সকলপ্রকার সেবা করলেও, ঠাকুরের জীবদ্দশায় তাঁর কাছ থেকে যোগীন্দ্রনাথের দীক্ষাগ্রহণ হয়নি। পরবর্তীকালে, শ্রীশ্রীমা ও কয়েকজন ভক্তকে নিয়ে তীর্থ-দর্শন উপলক্ষে তাঁর বৃন্দাবনে থাকাকালীন, শ্রীশ্রীমা তাঁকে এক বিশেষ মন্ত্রে দীক্ষা দেবার জন্য ঠাকুরের আদেশ পান এবং ঠাকুরের নির্দেশিত ধারায় যোগীন্দ্রনাথকে শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবনে দীক্ষাদান করেন, এর পূর্বে শ্রীশ্রীমা আর কাকেও দীক্ষা দেননি। তখন থেকেই যোগীন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন এবং দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর মাতৃসেবার পর ইহধাম ত্যাগ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রচেষ্টায় শেষ মুহূর্তে তাঁর 'পূর্বাশ্রমের স্ত্রীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি "সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন এবং "স্বামী যোগানন্দ" নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন "যোগীন

মহারাজ।" ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ, উত্তর কলকাতায় বাগবাজারের বলরাম মন্দিরে তিনি দেহরক্ষা করেন।

তাঁর একটি উক্তি:

"নিতান্ত কঠোর এবং রুচিবিরুদ্ধ হলেও, যা সত্য, তা জানতে হবে।"

বি. দ্র.—১৬ পৃষ্ঠায় 'পূর্বনাম যোগানন্দ' এর স্থলে যোগীন্দ্রনাথ হবে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

পূর্বনাম শ্রীশশিভূষণ চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা-প্রাপ্ত, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত সন্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদ। হুগলী জেলার ময়াল-ইছাপুর গ্রামে, ২৯শে আষাঢ়, ১২৭০ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৩ই জুলাই, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) চান্দ্র আষাঢ়, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন কলকাতার পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক-সাধক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামী সারদানন্দ, তথা শরৎ মহারাজ ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা। গ্রামের বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে শশিভূষণ তাঁর উক্ত ভ্রাতা শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে আসেন এবং এখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করে "বৃত্তি" লাভ করেন, পরে "এ্যালবার্ট কলেজ" থেকে এফ. এ. পাশ করে "মেট্রোপলিটন কলেজে" বি. এ. পড়তে শুরু করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের পুত্রকে কিছুদিন পড়াবার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন।

এই সময় কেশবচন্দ্রের "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকায় ঠাকুর সম্পর্কে অপূর্ব তথ্য অবগত হবার পর, শশিভূষণ প্রথম একদিন শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে যান এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনে ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হন। এরপর ক্রমাগত সেখানে যাতায়াতের ফলে তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং ঠাকুরও যথাসময়ে তাঁকে দীক্ষা দান করেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই সময় তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়েছিল। ঠাকুরের দেহরক্ষার দিন অবধি তিনি অক্লান্তভাবে তাঁর সেবা করেন এবং দেহাবসানের কিছুকাল পরেই লেখাপড়া ত্যাগ করে তিনি সম্পূর্ণরূপে মঠে যোগদান করেন। এই সময় তিনি "সন্ন্যাস" গ্রহণ করায়, "স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ" নামে অভিহিত হন এবং গুরুভ্রাতাগণের কাছে "শশী মহারাজ" নামে পরিচিত হন।

বলা আবশ্যক, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, তাঁর পূত ভস্মাবশেষ তিনি গুরু-

ভ্রাতা নিরঞ্জন মহারাজের (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) সহায়তায়, কাঁকুড়গাছিতে ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে পাঠাবার আগেই, অর্ধেকের বেশী গোপনে সরিয়ে অপর ভক্ত বলরাম বসুর বাগবাজারের বাড়ীতে নিত্য পূজার জন্য পাঠিয়ে দেন। ঠাকুরের ভস্মাস্থিপূর্ণ কলসীতে তিনি ঠাকুরকে জীবন্ত জ্ঞানে পূজা করতেন; ঠাকুরের জীবদ্দশাকালের সেবার ন্যায় নানাভাবে তাঁর সেবা করে গুরুভক্তির একনিষ্ঠ সাধনায় তিনি অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। মঠের পূজার ভারও তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং দাস্যভাবের চরম উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা, পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করেছিলেন। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের অনুরোধে প্রথমে তিনি মাদ্রাজে যান এবং সেখানে ও ব্যাঙ্গালোরে মঠ স্থাপন করে ঠাকুরের পূজা প্রবর্তন করেন। ঠাকুরের মহাভাব প্রচারের জন্য তিনি সমগ্র দক্ষিণ ভারত, রেঙ্গুন, কলম্বো প্রভৃতি স্থানেও ভ্রমণ করেন এবং বহু ভক্তকে আধ্যাত্মিক জগতে আকৃষ্ট করেন। আধ্যাত্মিক ভাবধারা অবলম্বনে তিনি বহু ধর্মীয় গ্রন্থও রচনা করে গেছেন। উত্তর কলকাতায় বাগবাজারের উদ্বোধন-মঠে (মায়ের বাড়ী) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট তিনি দেহরক্ষা করেন।

তাঁর একটি উপদেশ :

"অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে যদি না-ই চলে, তবে ভগবানের সাহায্যই চাওয়া উচিত।"

*

স্বামী সারদানন্দ

পূর্বনাম শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, অবিবাহিত ত্যাগী ভক্ত সন্তান এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ। ৯ই পৌষ, ১২৭২ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে তিনি কলকাতায় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন হুগলী জেলার জনাই গ্রামের অধিবাসী ও কলকাতার একটি ঔষধের দোকানের অংশীদার শ্রীগিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী; মাতা শ্রীমতী নীলমণি দেবী। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, তথা শশী মহারাজ ছিলেন তাঁর খুল্লতাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বিদ্যালয়ের সব পরীক্ষাতেই শরৎচন্দ্র সব সময় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতেন। কলকাতার বাড়ীতে লেখাপড়া করে তিনি "হেয়ার স্কুল" থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং "সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ" থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডাক্তারী পড়ার জন্য "মেডিক্যাল কলেজে" ভর্তি হন; কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার কিছুকাল পরেই তিনি ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দেন। তিনি একজন সুগায়কও ছিলেন।

পল্লীর একটি সমিতির বার্ষিক আনন্দোৎসব উপলক্ষে শরৎচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে ঘটনাচক্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন; কিন্তু তাঁর কাছে ঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় তখনো অজানা থাকায়, সেই সময় কোন আলাপ হয়নি। পরে কলেজে পড়ার সময় তিনি সমবয়সীদের সঙ্গে আবার একদিন দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গেলে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্যের উপদেশ শুনে মুগ্ধ হন এবং এই উপদেশই তাঁর জীবনে পরিবর্তন ঘটায়। অতঃপর তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়মিত যাতায়াত সুরু করেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে রাত্রিবাসও করেন। এই সময় ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার ফলে, ঠাকুর তাঁকে যথা সময়ে দীক্ষাদান করেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবাকেই তিনি সাধনারূপে গ্রহণ করেন এবং সব সময় নিজেকে এই কাজে নিযুক্ত রাখেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার কিছুদিন পরেই তিনি মঠে সম্পূর্ণরূপে যোগদান করেন এবং "সন্ন্যাস" গ্রহণের দ্বারা "স্বামী সারদানন্দ" নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন "শরৎ মহারাজ।" জীবনের শেষদিন অবধি তিনি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সম্পাদকরূপে কাজ করে যান এবং সব কাজই "স্বামী বিবেকানন্দের আদেশ"রূপে পালন করেন। তিনি বহুতীর্থ ভ্রমণ ও কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে ইউরোপ ও আমেরিকাতেও বেদান্ত প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন।

তিনি এতই নির্ভীক ছিলেন যে, ইংরাজ সরকারের কোপ অনিবার্য্য জেনেও তিনি তৎকালীন "মানিকতলার বোমার মামলার" দুই বিপ্লবী আসামী— শ্রীদেবব্রত বসু ও শ্রীশচীন্দ্র সেনকে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদানের অনুমতি দেন এবং তাঁদের সাধু জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিপ্লবী দেবব্রত বসু পরে রামকৃষ্ণ মিশনে "স্বামী প্রজ্ঞানন্দরূপে" পরিচিত হন। অতঃপর ইংরাজ সরকার রামকৃষ্ণ-মিশনের কার্যকলাপে সন্দেহ প্রকাশ করায়, তিনি স্মারকলিপি মারফৎ নির্ভয়ে তারও প্রতিবাদ করেন! একদা বাংলার তদানীন্তন ইংরাজ-গভর্ণর "রোনাল্ড্‌সে" বেলুড় মঠ প্রদর্শনে এসে অভ্যাসবশতঃ পাদুকা সমেত ঠাকুরের মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে, তিনি গভর্ণরকে নিরস্ত করেন এবং দেবমন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিনা দ্বিধায় স্বয়ং তাঁর পাদুকা উন্মোচন করে তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দিয়ে গুরুভক্তির চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত সেবকরূপে তাঁর সকল ভার বহন করার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় "উদ্বোধন" পত্রিকার নিজস্ব বাড়ী নির্মাণ ও সেখানকার দোতলায় শ্রীশ্রীমায়ের বাসস্থান নির্দিষ্ট হওয়ায়, ঐ বাড়ী

"মায়ের বাড়ী" নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির ও আশ্রম তিনিই স্থাপন করেন এবং বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ তাঁরই পরিকল্পনা। তাঁর কর্মময় জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ" নামক পাঁচটি পুস্তকখণ্ডে ঠাকুরের জীবনী রচনা। বস্তুতঃ এই পুস্তক প্রকাশিত না হলে, ঠাকুরের অলৌকিক জীবনসম্পর্কের ধারণা থেকে ভক্তেরা বঞ্চিত হতেন। উত্তর কল্‌কাতার বাগবাজারের উদ্বোধন-মঠে (মায়ের বাড়ী) ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তিনি দেহরক্ষা করেন।

তাঁর একটি সুচিন্তিত অভিমত :

"দিব্যভাবের পূর্ণবিকাশ একমাত্র অবতার পুরুষ সকলেই দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস ঐ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করে। ঐ জন্যই অবতার-চরিত্র আমাদের নিকট চির রহস্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"

স্বামী সুবোধানন্দ

পূর্বনাম শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষ। তিনি ছিলেন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত সন্তান এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ। উত্তর কল্‌কাতার ২৩নং শঙ্কর ঘোষ লেনে ২৩শে কার্তিক, ১২৭৪ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ৮ই নভেম্বর, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) চান্দ্র কার্তিক, শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে কায়স্থ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন কলকাতার ঠনঠনিয়ার ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার সেবক শ্রীশঙ্কর ঘোষের পৌত্র—শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ এবং মাতা শ্রীমতী নয়নতারা দেবী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সুবোধচন্দ্র প্রথমে "এ্যালবার্ট কলেজিয়েট স্কুল" এবং পরে বিদ্যাসাগর মশাই-এর বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন।

ছাত্রাবস্থাতেই সুবোধচন্দ্র প্রথম দক্ষিণশ্বরে যান এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে লেখাপড়া ত্যাগ করেন। দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয়বার গমনের সময়েই ঠাকুর তাঁকে দীক্ষাদান করেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। সুবোধচন্দ্রও ঠাকুরের ওপর তাঁর সমগ্রজীবনের ভার সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করে তাঁর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পূর্বে কোনও একসময়ে সুবোধচন্দ্রের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমনও হয়েছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ রক্ষার পর তিনি "সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন এবং "স্বামী সুবোধানন্দ" নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন "খোকা মহারাজ।" মঠে যোগদানের পর তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং

ঠাকুরের ভাবধারায় সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর বেলুড়মঠে তাঁর দেহরক্ষা হয়।

তাঁর একটি অনুভূতি :

"শ্রীমা ও ঠাকুর যদি ধরা না দেন, কার সাধ্য তাঁদের ধরতে পারে, কিংবা চিনতে পারে!"

স্বামী অভেদানন্দ

পূর্বনাম শ্রীকালীপ্রসাদ চন্দ্র। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সন্তান এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ। উত্তর কলকাতার ২১নং নিমুগোস্বামী লেনে, ১৭ই আশ্বিন ১২৭৩ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ২রা অক্টোবর, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) কৃষ্ণা নবমী তিথিতে বণিক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন "ওরিয়েন্টাল সেমিনারী" স্কুলের ইংরাজীর শিক্ষক শ্রীরসিকলাল চন্দ্র এবং মাতা শ্রীমতী নয়নতারা দেবী। শৈশবে পাঠশালার পড়া শেষ করে কালীপ্রসাদ "ওরিয়েন্টাল সেমিনারী"তে ভর্তি হন এবং পরে এন্ট্রান্স ক্লাশ অবধি পড়ে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় লেখাপড়া ত্যাগ করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনে, তাঁর কাছে যোগশিক্ষার উদ্দেশ্যে কালীপ্রসাদ একদিন একাকী পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে হাজির হন এবং সেরাত্রি সেখানে ঠাকুরের কাছে বাস করেন। পরের দিনই ঠাকুর তাঁকে দীক্ষাদান করেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী ক্রমশঃ তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। তিনি নিয়মিতভাবে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত, যোগচর্চা, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতিতে আত্ম-নিয়োগ করেন এবং ঠাকুরের শেষদিন অবধি তাঁর সেবা করেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি "সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন এবং "স্বামী অভেদানন্দ" নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন "কালী মহারাজ", বা "কালী তপস্বী।"

মঠে যোগদান করার পর তিনি ভারতের এবং ভারতের বাইরে বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং মূলতঃ বেদান্তের ভাবধারা প্রচার করেন। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশ সমূহেও গমন করেন এবং বহুবাধা সত্ত্বেও কেবলমাত্র বাগ্মিতা ও অজস্র বক্তৃতার সাহায্যে বিদেশীদের মধ্যে বেদান্ত প্রচারে সফল হন। তাঁর জীবনের দীর্ঘদিন অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ বৎসর তিনি ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে বেদান্ত সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং যোগশিক্ষা দানে সকলকে উৎসাহিত করেন।

এমনকি, "প্রেততত্ত্ববিদ্" হিসাবেও তিনি বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছিলেন; এবং আধ্যাত্মিকতত্ত্বের বহুগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি একজন উত্তম পাখোয়াজ-বাদক এবং খোল-বাদকও ছিলেন।

শেষজীবনে তিনি দার্জিলিঙে এবং কলকাতায় বেদান্ত-প্রচারের জন্য পৃথকভাবে নিজেই "রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি উত্তর কলকাতার ১৬ নং রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে নিজ প্রতিষ্ঠিত "রামকৃষ্ণ বেদান্ত-আশ্রমে" দেহরক্ষা করেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণের মধ্যে একমাত্র তাঁরই পবিত্র নশ্বর দেহ, তাঁর পূর্ব ইচ্ছানুযায়ী কাশীপুর মহাশ্মশানে ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরের ঠিক পাশেই আহুতি দেওয়া হয়।

তাঁর একটি অমূল্য উপদেশ :

"তুমি যদি ভালবাসা চাও, তবে আগে সকলকে ভালবাস; তারপর তুমি ভালবাসা পাবে। তুমি যদি সকলকে ঠকাও তাহলে জগৎ তোমায় ঠকাবে"।

*

স্বামী অদ্বৈতানন্দ

পূর্বনাম শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, বিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত সন্তান এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ। চব্বিশ পরগণা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমায় জগদ্দলের রাজপুর গ্রামে, ইংরাজী ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সদ্গোপ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ বা তিথি অজ্ঞাত থাকায়, রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক শ্রাবণী কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে তাঁর আবির্ভাব দিবস পালিত হয়।

তাঁর পিতা ছিলেন শ্রীগোবর্ধন ঘোষ। উত্তর কলকাতার সিঁথি নিবাসী ব্রাহ্মভক্ত ও ব্যবসায়ী শ্রীবেনীমাধব পালের কলকাতায় চীনাবাজারে একটি দোকানে গোপালচন্দ্র চাকরী করতেন এবং সেই সূত্রে প্রায়ই সিঁথিতে বাস করতেন।

ব্রাহ্মভক্ত বেনীমাধবের সিঁথির বাড়ীতেই গোপালচন্দ্র প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর গোপালচন্দ্রের জীবনে বৈরাগ্য আসায়, সিঁথির কবিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত শ্রীমহেন্দ্রনাথ পালের সহায়তায় তিনি পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন এবং ঠাকুরও তাঁকে যথাসময়ে দীক্ষাদান করেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী ক্রমশঃ তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়েছিল। ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে গোপাল-

চন্দ্রই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ; এমনকি ঠাকুরের চাইতেও তিনি কয়েক বছরের বড় ছিলেন এবং ঠাকুর তাঁকে "বুড়ো-গোপাল" ব'লে ডাকতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও তিনি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন এবং ৮১ বৎসর বয়স অবধি দেহধারণ করেছিলেন। তিনি ভাল কীর্তন গাইতে এবং তব্‌লা বাজাতেও পারতেন। অক্লান্তভাবে ঠাকুরের সেবা করা ছাড়াও, তিনি ভারতের সমস্ত প্রধান তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

একদা গোপালচন্দ্র, সাধুদের গেরুয়া বস্ত্র দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, ঠাকুরের নির্দেশে তিনি দ্বাদশখানি গেরুয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা ঠাকুরকে অর্পণ করেন; অতঃপর ঠাকুর নিজে ঐগুলি নরেন্দ্র, রাখাল, তারক, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, শশী, শরৎ, গোপাল, কালী ও লাটু—এই ১১ জন উপস্থিত ত্যাগী-সন্তানদের বিতরণ করেন এবং উদ্বৃত্ত দ্বাদশ গেরুয়া বস্ত্রখানি গৃহীভক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষের জন্য তুলে রাখেন; পরে গিরীশচন্দ্র তা' গ্রহণ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে এবং গোপালচন্দ্রের জীবনে এটা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি "সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন এবং "স্বামী অদ্বৈতানন্দ" নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন "গোপাল-দা," বা "বুড়ো-গোপাল মহারাজ." ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর বেলুড় মঠে তিনি দেহরক্ষা করেন।

তাঁর একটি বাণী :

"সর্বভূতে তিনিই বিরাজমান; কাকে নিন্দা করি আর কার-ই বা সমালোচনা করি!"

*

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

পূর্বনাম শ্রীরাখ্‌তু-রাম। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, অ-বাঙালী, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সন্তান এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ। বিহারের ছাপ্‌রা জেলার কোনও এক গ্রামে জনৈক মেষ-পালকের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম-সাল, তারিখ বা তিথি—সবকিছু অজ্ঞাত থাকায়, রামকৃষ্ণ-মঠ কর্তৃক মাঘী পূর্ণিমাতে তাঁর আবির্ভাব দিবস পালিত হয়। প্রথম জীবনে রাখ্‌তু-রাম অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে থাকেন এবং মাত্র পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই পিতা ও মাতাকে হারান। পরে কাকার সঙ্গে জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি কলকাতায় আসেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে গৃহভৃত্যরূপে চাকরী গ্রহণ করেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে, মনিব রামচন্দ্র তাঁকে স্নেহে "লালটু" নামে ডাকতেন।

রামচন্দ্রের সঙ্গে লাটু প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করা মাত্র, ঠাকুর তাঁকে "স্পর্শ" করেন এবং তিনিও সেইদিন থেকেই ঠাকুরের আশ্রিতরূপে পরিণত হন। মনিবের বাড়ী থেকে অপরাপর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই লাটুকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতে হোত। এই সময় রামচন্দ্রের কাছ থেকে ঠাকুর লাটুকে চেয়ে নিয়ে নিজের সেবাকাজের জন্য দক্ষিণেশ্বরে পাকাপাকিভাবে নিযুক্ত করেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঠাকুরের কাছে আগমন করেছিলেন এবং ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ অবধি দীর্ঘকাল তাঁকে সেবার দ্বারা, তাঁর সঙ্গলাভ করেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে "লাটু", বা "লেটো" বলে ডাকতেন। নিরক্ষর লাটুকে বর্ণপরিচয় শেখাতে গিয়ে ঠাকুর বিফল হন। ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের সেবার ভারও লাটু গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের উভয়কে ঈশ্বর-ঈশ্বরীজ্ঞানে নিজের অন্তরে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি উত্তম ভজন গাইতে পারতেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি "সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন এবং "স্বামী অদ্ভুতানন্দ" নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন "লাটু মহারাজ" নিজেকে কঠোর জপধ্যানে নিয়োজিত রেখে এবং ভারতের বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করে তিনি শেষ জীবনে কাশীতে বাস করতেন। সেখানেই ৯৬নং হাড়ারবাগের বাটীতে তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল দেহরক্ষা করেন।

বাংলায় অনুবাদ তাঁর একটি সদুপদেশ :

"পবিত্র হও, পবিত্র হও ; সৎ না হলে সৎ-স্বরূপকে জানতে পারবে না।"

*

স্বামী তুরীয়ানন্দ

পূর্বনাম শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত সন্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদ। উত্তর কলকাতার বাগবাজারের বোসপাড়ায় ২০শে পৌষ, ১২৬৯ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ৩রা জানুয়ারী, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) চান্দ্র পৌষ, শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন "ডাবলিউ ওয়াটসন কোম্পানীর" কর্মচারী শ্রীচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী। হরিনাথ প্রথমে কম্বুলিয়াটোলা বাংলা বিদ্যালয়ে এবং পরে

"জেনারেল এসেম্বলী" স্কুলে শিক্ষালাভ করেন; কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষা দেননি।

নিজ পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত দীননাথ বসুর বাড়ীতে হরিনাথ প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। পরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়মিত যাতায়াত সুরু করেন এবং ঠাকুরও তাঁকে গুরুরূপে বিশেষ কৃপা করেন। এই সময় ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি "সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন এবং "স্বামী তুরীয়ানন্দ" নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন "হরি মহারাজ।" পরিব্রাজক ও সাধকরূপে তিনি বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং কঠোর তপস্যায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় তিনি স্বামীজীর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণের সময় তাঁর সঙ্গী হন এবং বিদেশে বেদান্ত-প্রচারে ব্রতী হন। শেষ জীবনে তিনি কাশীতে বাস করতেন; সেখানেই ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই তিনি দেহরক্ষা করেন এবং তাঁর পবিত্র নশ্বর দেহ মণিকর্ণিকার জাহ্নবী সলিলে "সলিল-সমাধি" করা হয়।

তাঁর একটি অমূল্য উপদেশ :

"সেবা করো, সেবা করো, সেবা করো—এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। নম্র হও, সকলের সেবক হও।"

*

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

পূর্বনাম শ্রীসারদাপ্রসন্ন মিত্র। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সন্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদ। চব্বিশ পরগণা জেলার পইহাটীর নওরা গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮ই মাঘ ১২৭১ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ৩০শে জানুয়ারী, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) চান্দ্র শুক্লা, চতুর্থী তিথিতে কায়স্থ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন কলকাতার নন্দনবাগান নিবাসী শ্রীশিবকৃষ্ণ মিত্র। কলকাতায় পিতৃগৃহে তিনি শৈশবে লেখাপড়া শুরু করেন এবং প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে নিম্নবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন। পরে শ্যামপুকুরে "মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন" থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করার পর, তিনি "মেট্রোপলিটন কলেজ" থেকে এফ. এ. পরীক্ষা পাস করেন।

ছাত্রাবস্থায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রথম সারদাপ্রসন্নকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে যান এবং সেই সময় থেকে বাড়ীর কঠোর শাসন উপেক্ষা করে তিনি প্রবল আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে

যাতায়াত শুরু করেন। এই সময় পিতার নির্যাতনে সারদাপ্রসন্ন বাড়ী থেকে পালিয়ে মাঝে মাঝে কাশীপুরেও অসুস্থ ঠাকুরের কাছে দু-একদিন অবস্থান করতেন। বাড়ীতে তাঁর বিবাহের চেষ্টা হওয়ায়, তিনি গোপনে বাড়ী থেকে পলায়ন করে পুরীতে চলে যান; কিন্তু পুরী থেকে তাঁর পিতামাতা তাঁকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনলেও, তিনি আর সংসারে আবদ্ধ থাকেননি। তিনি বরাবরই ঠাকুরের আশ্রয়ে ছিলেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়েছিল। ঠাকুর তাঁকে "প্রসন্ন" বলে ডাকতেন। তিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন এবং সঙ্গীতকে সাধনার উত্তম সহায়জ্ঞানে, নিজে ভক্তবৃন্দসহ নানাবিধ ভক্তিরসাত্মক গানে ডুবে থাকতেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি অসাধারণ ভক্তি ও বিশ্বাসের চরম পরাকাষ্ঠা দেখান এবং পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকেই দীক্ষালাভ করেন। "সন্ন্যাস" গ্রহণের পর তিনি "স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ" নামে অভিহিত হন এবং গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি "সারদাপ্রসন্ন" বা "প্রসন্ন মহারাজ" নামে পরিচিত হন।

তাঁর পরিচালনাতেই প্রথম রামকৃষ্ণ মিশনের "উদ্বোধন" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর, তিনি আমেরিকায় যান এবং বেদান্ত-প্রচার শুরু করেন। সানফ্রান্সিসকোতে তিনি পাশ্চাত্যজগতের প্রথম "হিন্দু-মন্দির" স্থাপন করেন এবং সাধক-জীবন গঠন করার কাজে ভক্তদের সাহায্য করেন। সেখানে তিনি "ভয়েস অফ ফ্রিডম" নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। একদা বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে তিনি যখন সানফ্রান্সিসকোতে হিন্দু-মন্দির প্রাঙ্গণে বক্তৃতায় রত ছিলেন, তখন "ভাবরা" নামক জনৈক বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি সেখানে বোমা নিক্ষেপ করায়, সে নিজে তৎক্ষণাৎ নিহত হয় এবং সারদাপ্রসন্নও গুরুতররূপে আহত হন। উক্ত আঘাতের ফলেই কিছুদিন পরে—১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তিনি আমেরিকার সানফান্সিসকো সহরে দেহরক্ষা করেন।

তাঁর একটি বাণী:

"বিক্ষিপ্ত মন কখনো লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। চারদিকে ভগবানকেই দেখতে সচেষ্ট থাকো; সর্ববস্তু ঈশ্বরীয় রসে অনুলিপ্ত দেখ; তাহলেই তোমার মন শুধু তাঁরই চিন্তা করবে।"

*

দ্বিতীয় স্তবক

আচার্য কেশবচন্দ্র সেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রসিদ্ধ নেতা, সুপণ্ডিত, সমাজ-সংস্কারক, পরমবাগ্মী এবং সুলেখক। আদিনিবাস ২৪ পরগণা জেলার গরিফা; জন্মস্থান কলকাতার কলুটোলা; জীবদ্দশা ১৮৩৮ থেকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। "আদি ব্রাহ্ম সমাজের" নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে, কেশবচন্দ্র ঐ সমাজ ত্যাগ করে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইংলণ্ডে গিয়ে ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দানের ফলে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। পরবর্তীকালে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের" সঙ্গেও তাঁর মতবিরোধ ঘটায়, তিনি পুনরায় "নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ" প্রতিষ্ঠার দ্বারা নতুন মতবাদ প্রচারে ব্রতী হন। তিনি "ধর্মতত্ত্ব", "সুলভ সমাচার", "নববিধান" প্রভৃতি পত্রিকাগুলি প্রকাশ করেছিলেন এবং "জীবনবেদ" নামক আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন। তাঁর লিখিত ধর্মীয় প্রবন্ধগুলি বাংলা গদ্য সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত এবং কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই শ্রীমহেন্দ্র-নাথ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কীয় এক ভগ্নীর বিবাহ হয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই নিজে প্রথম ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ব্রাহ্ম ভক্ত জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়ার এক বাগান-বাড়ীতে ভাগ্নে হৃদয়ের সঙ্গে যান এবং সেদিন থেকেই তাঁদের উভয়ের মধ্যে এক নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অবশ্য এই মিলনের কয়েকবছর আগে "আদি ব্রাহ্ম সমাজের" উপাসনা গৃহে, ঠাকুর তাঁর অন্যতম ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে বেড়াতে যান এবং সেখানে কেশবচন্দ্রকে উপস্থিত থাকতে দেখলেও, তখন তাঁদের মধ্যে কোন আলাপ-পরিচয় হয়নি। বেলঘরিয়ায় মিলনের ফলে ঠাকুরের উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা এবং সমাধি দর্শনে, কেশবচন্দ্র এতই মুগ্ধ ও ঠাকুরের প্রতি এতই আকৃষ্ট হন যে, প্রায়ই তিনি ঠাকুরের দিব্যসঙ্গ লাভ করার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত সুরু করেন। এই সময় ঠাকুরকে মাঝে মাঝে নিজের কলকাতার বাড়ী—"কমল কুটীরে" এনেও তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতেন।

প্রকৃতপক্ষে কেশবচন্দ্রই ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে আদি এবং প্রধান প্রচারক। তাঁরই প্রচেষ্টায় "সুলভ সমাচার", "ইণ্ডিয়ান মিরার" প্রভৃতি নানা পত্রিকায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূত-চারিত্রিক বিষয় এবং সারগর্ভ বাণী প্রথম প্রকাশিত হতে থাকায়, জনসাধারণ ঠাকুরের কথা ক্রমশঃ জানতে পারে এবং ক্রমে ক্রমে দক্ষিণেশ্বরে বহু ভক্তের সমাগম হয়। উত্তরকালে ঠাকুরের যে সকল ত্যাগী সন্তান বা গৃহীভক্ত ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন, তাঁদের মধ্যে

অধিকাংশই কেশবচন্দ্রের প্রচারের মাধ্যমেই ঠাকুরের সন্ধান পেয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রের প্রেরণাতেই ব্রাহ্ম সমাজের তৎকালীন যে সব নেতা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বা সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, চিরঞ্জীব শর্মা, অমৃতলাল বসু, মণিলাল মল্লিক, জয়গোপাল সেন, বেণীমাধব পাল, কাশীশ্বর মিত্র, গিরিশচন্দ্র সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত হয়েও কেশবচন্দ্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভ করে জীবনে নতুন আলোকের সন্ধান পেয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র ঠাকুরকে এত শ্রদ্ধা করতেন যে, একবার নিজ বাড়ীতে এনে ঠাকুরকে জীবন্ত ধর্ম মূর্তি জ্ঞানে তাঁর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন। তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন, তখন হিন্দুদের দেবদর্শনে যাওয়ার পদ্ধতি অনুযায়ী, ফুল কিংবা একটি ফল সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং গোপনে তা ঠাকুরের কাছে নিবেদন করতেন; আবার, ফিরে আসার সময় ঠাকুরের চরণ-স্পর্শিত কোন দ্রব্য ভক্তি সহকারে নিয়ে আসতেন। কেশবচন্দ্রের পরিবার বর্গের স্ত্রী-পুরুষেরা সবাই ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করতেন। ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন উৎসবেও তিনি ঠাকুরকে শ্রদ্ধা সহকারে নিয়ে যেতেন; এমনকি স্টীমারে করে ঠাকুরকে নিয়ে তিনি গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণও করেছেন এবং তাঁর অমৃতময় উপদেশ লাভ করে ধন্য হয়েছেন।

ঠাকুরও কেশবচন্দ্রকে এমন পরমাত্মীয় জ্ঞান করতেন যে, তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তিনি নিজেই কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন এবং তাঁর রোগমুক্তির জন্য ৺মায়ের কাছে "ডাব-চিনি মানৎ" করেছিলেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ শুনে ঠাকুর এত অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিন দিন তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতে পারেন নি বা শয্যাত্যাগ করেন নি। ঠাকুর বলেছিলেন যে, কেশবচন্দ্রের মৃত্যুতে যেন তাঁর একটা অঙ্গ পঙ্গু হয়ে গেল। এই উক্তির দ্বারাই ঠাকুরের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সম্পর্কের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।

*

আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। তিনি ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্যের বংশধর; স্বয়ং বিখ্যাত পণ্ডিত এবং ধর্ম প্রচারক। জন্মস্থান নদীয়া জেলার শান্তিপুর এবং জীবদ্দশা ১৮৪১ থেকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং আচার্যের পদ অলঙ্কৃত

করেন; কিন্তু পরে ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হওয়ায়, তিনি "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তিনি গয়াতে এক যোগীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সাধন-ভজনে ব্রতী হন।

ব্রাহ্ম সমাজে থাকাকালীন কেশবচন্দ্রের অনুসরণে বিজয়কৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে। ঢাকায় অবস্থানকালে একদিন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ অবস্থায় ধ্যান করার সময়, বিজয়কৃষ্ণ সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন পান; কিন্তু সেটি নিজের মাথার খেয়াল কিনা জানার জন্য সেই মূর্তির শরীর বহুক্ষণ ধরে টিপে টিপে যাচাই করেন এবং "জীবন্ত" সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন। এরপরেই দক্ষিণেশ্বরে এসে তিনি সর্বসমক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে পতিত হন এবং নিজের বক্ষে ঠাকুরের শ্রীচরণ ধারণ করলে ঠাকুর সমাধিস্থ হন। এই সময় বিজয়কৃষ্ণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দেহধারী "ঈশ্বরাবতার" জ্ঞানে অন্তরে গ্রহণ করে বলেছিলেন—"বুঝেছি, আপনি কে! আর বলতে হবে না।"

আমরণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত বিজয়কৃষ্ণের একটি অমূল্য উক্তি—"দেশ-বিদেশ, পাহাড়-পর্বত ঘুরে ফিরে অনেক সাধু-মহাত্মা দেখলাম; কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখলাম না। এখানে যে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখছি, তারই কোথাও দু-আনা, কোথাও এক-আনা, কোথাও এক-পাই, কোথাও আধ-পাই মাত্র; চার-আনাও কোন জায়গায় দেখলাম না।"

ঠাকুরও বিজয়কৃষ্ণকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন; সব সময় তাঁকে ধর্মোপদেশ দিতেন; তাঁর সঙ্গে হরিনামে নৃত্য করতেন এবং সর্বোপরি তাঁকে "পরমহংসের" মত উচ্চ আধার জ্ঞান করতেন। একদা অসুস্থ বিজয়কৃষ্ণকে দেখার জন্য ঠাকুর নিজে বিজয়কৃষ্ণের তৎকালীন ঝামাপুকুর লেনের বাড়ীতে শুভাগমনও করেছিলেন। ঠাকুরের প্রভাবে পরবর্তীকালে বিজয়কৃষ্ণ 'ব্রাহ্ম ধর্ম' ত্যাগ করেন এবং তাঁরই নির্দেশে বৈষ্ণব ধর্মের সাধনায় ব্রতী হয়ে আধ্যাত্মিকতার চরমশীর্ষে উন্নীত হন। শেষজীবনে তিনি পুরীতে সাধন-ভজনে নিযুক্ত ছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রসিদ্ধ মনীষী, পরম সাধক এবং "আদি ব্রাহ্ম সমাজের" বিখ্যাত নেতা। কল্‌কাতার জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ "ঠাকুর বংশে" তাঁর জন্ম; জীবদ্দশা ১৮১৭ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর পিতা ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং অন্যতম পুত্র ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্ম-সভাতে

উপাসনার প্রথা প্রবর্তিত হয়। জনশিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান যথেষ্ট। বীরভূম জেলার বোলপুরে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত "শান্তিনিকেতন" আজ বিশ্ববিখ্যাত।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বেচ্ছায় যোগাযোগ করেছিলেন। মহর্ষি ঈশ্বরচিন্তা করেন শুনে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মনে এই ঈশ্বরপ্রেমিককে দেখার খুব ইচ্ছা হয় এবং ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে একদা তিনি মহর্ষির জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তাঁকে দর্শন করতে যান। সেদিন প্রথম পরিচয়েই তিনি মহর্ষির লক্ষণ দেখার জন্য তাঁকে জামা খুলে গা দেখাতে বলেন এবং গৌরবর্ণের গায়ের ওপর সিঁদুর ছড়ানোর মত সৌন্দর্য লক্ষ্য করেন। মহর্ষির অনেকগুলি ছোট ছোট সন্তানের মধ্যে কোন এক সন্তানের অসুখের জন্য সেদিন ডাক্তার এসে ঔষধপত্র লিখে দিচ্ছিলেন। অত জ্ঞানী হয়েও মহর্ষিকে সংসার নিয়ে থাকতে হয়—আবার সংসারে থেকেও তিনি ঈশ্বর চিন্তা করেন জেনে ঠাকুর তাঁকে বলেন—"তুমি কলির জনক।" এরপর তাঁদের মধ্যে ধর্মপ্রসঙ্গ হয় এবং মহর্ষি তাঁকে বেদ থেকে কিছু কিছু শোনান। বেদের কথার সঙ্গে ঠাকুরের পঞ্চবটীতে ধ্যানের সময়কার দর্শনের মিল হওয়ায়, ঠাকুর মহর্ষির কথায় খুসী হন। মহর্ষিও ঠাকুরের সঙ্গে বহুক্ষণ নানা আলোচনায় মুগ্ধ হন এবং তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের একটি উৎসবে যোগদানের জন্য অনুরাগবশতঃ আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মহর্ষি পরের দিনই শ্রীমথুরানাথকে চিঠি দিয়ে উক্ত উৎসবে ঠাকুরকে যেতে নিষেধ করেছিলেন; কারণস্বরূপ তাতে লেখা ছিল যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্বভাবসুলভ এলোমেলো বেশে ঐ উৎসবে যোগদান করলে, সবাই অসভ্যতা মনে করবে; পাছে ঠাকুরকে সেজন্য কেউ কিছু বললে মহর্ষির মনে কষ্ট হয়, তাই এই নিষেধ। বলা আবশ্যক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যদিও আর যোগাযোগ হয়নি, তবুও বহুবার ঠাকুর তাঁর ভক্তদের কাছে মহর্ষির ধ্যান-ধারণার কথা তুলে তাঁর প্রশংসা করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিশ্ববিখ্যাত সন্ন্যাসী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমজীবনে ঈশ্বরানুসন্ধানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে সঠিক উত্তর পাননি। তবে পরবর্তীকালে চিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর বিজয়বার্তা কলকাতায় পৌছালে, মহর্ষি স্বহস্তে একখানি দীর্ঘপত্র লিখে ৩নং গৌরমোহন মুখার্জী লেনের বাড়ীতে স্বামীজীর আত্মীয়দের কাছে আনন্দের সঙ্গে অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং আমেরিকা থেকে ফেরার পরে স্বামীজীও ভগিনী নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

স্বনামধন্য পুরুষ। জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম এবং জীবদ্দশা ১৮২০ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ। মাতাপিতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি, জনগণের প্রতি অসীম দয়া ও প্রেম, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুষ্যত্ব, অগাধ পাণ্ডিত্য প্রভৃতি গুণাবলীর জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরদিন বাংলার সর্বজন পূজ্য মহামনীষী। আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্বপ্রথম বাংলা "বর্ণমালা" প্রকাশ করেন এবং "সীতার বনবাস," "কথামালা," "বোধোদয়," "শকুন্তলা", "ব্যাকরণ-কৌমুদী," "উপক্রমণিকা" প্রভৃতি নানা পুস্তক প্রণয়নের দ্বারা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন। বিধবা-বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি নানাবিধ সমাজ-সংস্কারমূলক কাজের জন্য তিনি সকল প্রকার বাধা অতিক্রম করেন এবং নিঃস্বার্থভাবে দানশীলতার জন্য সবার কাছে "দয়ার সাগর" নামেও অভিহিত হন। সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি শিক্ষাজগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং নিজে "মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন্" প্রতিষ্ঠার দ্বারা শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি করেন; পরে উক্ত বিদ্যালয়কে তিনি কলেজে পরিণত করেন।

উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, কথামৃত প্রণেতা, শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত মাষ্টার মশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহায়তায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট যোগাযোগ হয়। ছোটবেলা থেকেই দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের কথা ঠাকুর শুনেছিলেন; পরে দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা ঠাকুর প্রকাশ করলে, সেইমত ব্যবস্থা হয় এবং ঠাকুর নিজেই মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে এক সন্ধ্যায় বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাড়ীতে গিয়ে মিলিত হন।

সেদিন বিদ্যাসাগরের কক্ষে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাসাগর মহাশয় দণ্ডায়মান হয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করেন এবং বাড়ীর ভেতর থেকে স্বয়ং মিষ্টান্নাদি এনে ঠাকুরকে মিষ্টিমুখ করান। অতঃপর ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করে এবং তাঁর ভাবাবিষ্ট অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে বিদ্যাসাগর মুগ্ধ হন। সেদিন প্রথম আলাপেই ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন—"খাল, বিল, নদী অনেক দেখেছি; এবার সাগর দেখতে এলাম।" বিদ্যাসাগরও পরিহাস করে উত্তর দিয়েছিলেন—"কিন্তু এ সাগরে শুধু নোনাজল—তাই খানিকটা নিয়ে যান"। ঠাকুর তাতে বলেন—"নোনাজল কেন হবে গো! তুমিতো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর—তুমি ক্ষীর সমুদ্র।" এইভাবে নানা কথায় সেদিন তাঁদের কয়েক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়। অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক

প্রসঙ্গের মধ্যে ঠাকুর সেখানে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে বলেন যে, সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কিন্তু "ব্রহ্ম" আজ অবধি উচ্ছিষ্ট হননি; কারণ, "ব্রহ্ম" কি, তা মুখে বলা যায় না। একথা শুনে বিদ্যাসাগর বিস্মিত হয়ে বলেন "আজ একটি নতুন কথা শিখলাম"। সেদিন শক্তির তারতম্য সম্পর্কে আলোচনাকালে বিদ্যাসাগর ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন—"মহাশয়, তবে কি তিনি কাউকে বেশী, কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন?" ঠাকুর উত্তরে বলেন—"তা দিয়েছেন বৈকি! শক্তি কম বেশী না হলে তোমার নাম এত হবে কেন? তোমার বিদ্যা, তোমার —দয়া এইসব শুনেতো আমরা এসেছি। তোমার তো দুটো শিং বেরোয়নি!" বলা আবশ্যক, বিদ্যাসাগরের মতন অতবড় পণ্ডিতের মুখে শক্তির তারতম্য সম্পর্কে সন্দেহের কথা শুনে ঠাকুর সেদিন দুঃখিত হয়েছিলেন। যাইহোক, বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে সেদিন ঠাকুর অনেকগুলি গান করেন এবং তাঁকে নানাবিষয়ে উপদেশ দেন। গুণগ্রাহী বিদ্যাসাগর সেদিন ঠাকুরের উপদেশাবলী মন দিয়ে শ্রবণ করেন এবং রাত্রে বিদায়কালে প্রণামপূর্বক ঠাকুরকে স্বয়ং বাতির আলো ধরে রাস্তায় নেমে গাড়ীতে তুলে দিয়ে যান। ঠাকুর সেদিন দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার জন্য বিদ্যাসাগরকে আমন্ত্রণ জানালে, তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তা রক্ষা করতে পারেননি; এজন্য ঠাকুর বিদ্যাসাগরের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বিদ্যাসাগর বরাবর "পরমহংস"রূপে শ্রদ্ধা করতেন এবং ঠাকুরও বিদ্যাসাগরকে "গুপ্তভক্ত" হিসাবে জ্ঞান করতেন। নিজের পিতামাতা ছাড়া বিদ্যাসাগর আর কোন দেবতাকে স্বীকার করেন না শুনে ঠাকুর বলেছিলেন—"ঐতেই হবে।" বিদ্যাসাগর সম্পর্কে ঠাকুর বলেছিলেন—"বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নেই। অন্তরে সোনা চাপা আছে; যদি সেই সোনার সন্ধান পেতো, এত বাইরের কাজ যা করছে, সে সব কম পড়ে যেতো—শেষে একেবারে ত্যাগ হয়ে যেতো। অন্তরে হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর আছেন, একথা জানতে পারলে তাঁরই চিন্তায় মন যেতো···ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ করছে, সে খুব ভাল। দয়া খুব ভাল—দয়া সর্বভূতে ভালবাসা।"

বলা বাহুল্য, পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের স্কুলে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত (উত্তরকালে বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ) অভাবের তাড়নায় কিছুদিনের জন্য প্রধানশিক্ষকের পদে কাজ করেছিলেন।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"বন্দেমাতরম্"—মন্ত্রের স্রষ্টা এবং বাংলার সাহিত্যগগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র। জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটীর কাঁঠালপাড়া গ্রাম এবং জীবদ্দশা ১৮৩৮ থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। ছাত্রজীবনে অসাধারণ মেধাবী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট এবং প্রথমস্থান অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্র কর্মজীবনে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী গ্রহণ করেন এবং সাহিত্য সেবাতেও মনোনিবেশ করেন। তাঁর রচিত "আনন্দমঠ," "দেবী চৌধুরাণী," "কপালকুণ্ডলা," "বিষবৃক্ষ," "দুর্গেশনন্দিনী," "সীতারাম," "কমলাকান্তের দপ্তর" প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থ, সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সুধী সমাজে তিনি সাহিত্য সম্রাটরূপে বরণীয় হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্মী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীঅধরলাল সেন ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। একদা অধরলালের কলকাতার বেনেটোলার বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যোগাযোগ হয় এবং উভয়ের মধ্যে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হয়। ঠাকুরের আগমন উপলক্ষেই অধরলাল সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর বাড়ীতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। অধরলালের বাড়ীতে এইদিন মূলতঃ তাঁদের মধ্যে "রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব" সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং লোক সমাজে প্রচারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে অনুরোধ করলে ঠাকুর জানান যে, অধিকারী বুঝে তত্ত্বকথা বলতে হয়। ঈশ্বরকে লাভ করার উপায় সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর তাঁকে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনার সহজ উপায় নির্দেশ করেছিলেন। এই সকল আলোচনার সময় মানুষের জীবনের কর্ত্তব্য সম্পর্কে ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত জানতে চাইলে, বঙ্কিমচন্দ্র পরিহাসচ্ছলে হাল্কাধরণের কিছু অসমীচিন উক্তি করেন; ফলে ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁকে তিরস্কার করে বলেন—"তোমার এ কি রকম কথা! তুমিতো ভারী ছ্যাচড়া! যা সব রাতদিন চিন্তা করছ, কাজে করছ, তাই আবার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। মূলো খেলেই মূলোর ঢেঁকুর ওঠে।" বলা বাহুল্য, এরপরেও অবশ্য সেখানে ঠাকুরের সঙ্গে রসিক বঙ্কিমচন্দ্রের যথারীতি ধর্মালোচনা হয়; কারণ, গুণগ্রাহী বঙ্কিমচন্দ্র দেব-মানব শ্রীরামকৃষ্ণের তিরস্কারে কোন দোষ ধরেননি। পরে সেখানে হরিসঙ্কীর্তনে ঠাকুর নৃত্য করেন এবং দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সমাধিস্থ হন। বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরের এই দৃশ্য দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হন; কারণ, এমন দৃশ্য তিনি এর আগে জীবনে কখনো দেখেননি। ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভ করে অতিশয় তৃপ্ত হৃদয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন বিদায় নেবার সময় ঠাকুরকে তাঁর বাসায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন।

ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হতে না পারায়, আমন্ত্রণ রক্ষার জন্ম তাঁর অনুগত দুই ভক্ত—নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে কিছুদিন পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় পাঠিয়ে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন তাঁদের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেন এবং ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করেন। ঠাকুরকে পুনরায় দর্শন করার ইচ্ছা সেদিন তিনি তাঁদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু কার্যগতিকে আর দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়নি। বলা আবশ্যক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরবর্তীকালে ভক্তদের মুখে বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত "দেবী চৌধুরাণী" পুস্তকের পাঠ শুনে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে প্রশংসা করেছিলেন।

*

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাংলার কবিকুল-গৌরব এবং বাংলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক, বিরাট প্রতিভাশালী এবং নির্ভীক পুরুষ। জন্মস্থান পূর্ববঙ্গের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রাম এবং জীবদ্দশা ১৮২৪ থেকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণের পর তাঁর উপাধি হয় "মাইকেল"। প্রথম জীবনে ইংরাজীতে সাহিত্য রচনা এবং পরে মাতৃভাষা বাংলায় গ্রন্থ, নাটক, কাব্য, প্রহসন প্রভৃতি রচনার দ্বারা পরম মেধাবী মাইকেল তৎকালীন সাহিত্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর রচিত "মেঘনাদ বধ কাব্য", "কৃষ্ণকুমারী নাটক", "বীরাঙ্গনা কাব্য" প্রভৃতি রচনাবলী বাংলা সাহিত্যের অমূল্যসম্পদ। তিনি ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে গমন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ইংলণ্ড থেকে "ব্যারিষ্টারী" পাস করে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। প্রথমে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা সুরু করেছিলেন; কিন্তু পরে তা ত্যাগ করে জীবনের শেষদিন অবধি সাহিত্য-চর্চাকেই সাধনারূপে গ্রহণ করেছিলেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে এক আকস্মিক পরিবেশে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মাইকেলের যোগাযোগ হয়েছিল। ব্যারিষ্টার হিসাবে মাইকেল একদিন রাণী রাসমণির একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বর উদ্যানের পাশেই তৎকালীন বারুদ কারখানার ম্যাগাজিন সাহেবদের সঙ্গে রাণীর এষ্টেটের একটি বিরোধ বাধে এবং সেই উপলক্ষে মোকদ্দমার পরিচালনার ভার রাণীর এষ্টেট কর্তৃক ব্যারিষ্টার মাইকেলের ওপর ন্যস্ত হয়। রাণীর দৌহিত্র ও মথুরানাথ বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারিকানাথের সঙ্গে মাইকেল দক্ষিণেশ্বরে কালী-বাড়ীতে সরেজমিনে সঠিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আসেন এবং দপ্তরখানার

পাশে বড় ঘরটিতে ব'সে মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় রত হন। এই সময় কথাপ্রসঙ্গে যখন মাইকেল জানতে পারেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সে সময় দক্ষিণেশ্বরে বাস করছেন, তখন তিনি ঠাকুরকে দেখার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হন। মাইকেলের আগ্রহের কথা ঠাকুরকে জানালে, তিনি সে সময় তাঁর কাছে উপস্থিত ভক্ত শ্রীনারায়ণ শাস্ত্রীকে প্রথমে মাইকেলের সঙ্গে কথা কইতে পাঠালেও, পরে নিজেও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। শাস্ত্রীজী মাইকেলকে তাঁর স্বধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শাস্ত্রীজীর সঙ্গে তাঁর কিছু কথোপকথন হয়। পরে মাইকেল তাঁর নিকট দণ্ডায়মান ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে কিছু ধর্মোপদেশ শোনার জন্য পীড়াপীড়ি করেন এবং বলেন—"আপনি কিছু বলুন।" তাতে ঠাকুর জানান—"কে জানে, কেন আমার কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না; আমার মুখ কে যেন চেপে ধরছে।" কিছুক্ষণ বাদে ঐ-ভাব চলে যাওয়ার পর ঠাকুর মাইকেলকে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট সাধকদের কয়েকটি পদাবলী সঙ্গীত মধুর স্বরে গেয়ে শোনান এবং তার মাধ্যমেই ভাগ্যবান মাইকেলকে ভগবদ্‌ভক্তির সার কথা শিক্ষা দেন। মহাকবি মাইকেল ঠাকুরের গান শুনে মুগ্ধ হন এবং অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে হৃষ্টচিত্তে বিদায় গ্রহণ করেন।

*

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথিবীর সর্বযুগের কবিসমাজের শ্রেষ্ঠ কবি। কলকাতার জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ "ঠাকুর-বংশে" তাঁর জন্ম। তাঁর জীবদ্দশা ১৮৬১ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ। পিতা ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। বিত্তশালী জমিদার পরিবার। "নোবেল" পুরস্কার, "ডক্টর" উপাধি প্রভৃতি সর্বপ্রকার যশ-খ্যাতি, সম্মান লাভ করে তিনি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ মনীষীরূপে স্বীকৃত হন। তাঁর রচিত "গীতাঞ্জলী," "বলাকা," "গোরা," "চিত্রাঙ্গদা," "প্রভাত সঙ্গীত" প্রভৃতি অজস্র পুস্তক বাংলা সাহিত্যের, তথা বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। পিতৃ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে "বিশ্ব-ভারতী" এবং "শ্রীনিকেতন" তাঁর অন্যতম কীর্তি। বাংলার, তথা ভারতের তিনি একজন মহানায়ক।

রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে একবার মাত্র এসেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বিশ্বকবি হিসাবে তাঁর রচনার মাধ্যমে ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়েছিলেন। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের বহু উৎসবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে

আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হত। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে, কলকাতার নন্দনবাগানে ব্রাহ্মভক্ত ৺কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজের এক উৎসবে ব্রাহ্মভক্তেরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ঠাকুর সেখানে ভক্তদের কাছে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত তরুণ রবীন্দ্রনাথও সেই সভায় সেদিন উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ও তাঁর কথামৃত পান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২২ বৎসর। পরিচয়হীন উদীয়মান কবির সঙ্গে সেদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সরাসরি কোন আলাপের সুযোগ ছিল না; তাই কেবলমাত্র ঠাকুরকে দর্শন ও তাঁর কথামৃত পানের মাধ্যমেই কবির সঙ্গে ঠাকুরের মিলন সীমাবদ্ধ ছিল। বহুকাল বাদে রবীন্দ্রনাথের রচিত গানের সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয় ঘটে এবং তাঁর রচিত "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" গানটি একদা অন্যত্র শুনে, ঠাকুর কবির অন্তরের ভাবটির খুব প্রশংসা করেন। রবীন্দ্রনাথও ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং বিশ্ববিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ হিসাবে পরবর্তীকালে তাঁর হৃদয়ের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গুণগ্রাহীরূপে তাঁর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন —

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা;
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমারি জীবনে অসীমের লীলাপথে :
নতুন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।
দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি;
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।।"

(উদ্বোধন পত্রিকা—ফাল্গুন ১৩৪২)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ-মিশনের উদ্যোগে এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের পরিচালনায় "শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম-শতবার্ষিকী" উপলক্ষে ৩রা মার্চ কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে "পার্লামেণ্ট অফ রিলিজিয়ানস" নামক যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে ভারতের বহু মনীষী ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মূল সভাপতিরূপে ঐ দিন ঐ সভায় যোগদান করে তাঁর ভাষণ দিয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথমজীবনে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান, বিশ্ববিখ্যাত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ যোগাযোগ ছিল এবং তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, গায়ক নরেন্দ্রনাথ দত্ত হিসাবে তিনি ব্রাহ্মসমাজে অনেক ব্রাহ্মসঙ্গীত পরিবেশন করতেন। এমনকি, স্বামীজীর

শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্রীরূপে গণ্য ছিলেন। একদা নিবেদিতার প্রধান নেতৃত্বে বুদ্ধগয়ায় মন্দিরের অধিকার নিয়ে আন্দোলনের সময় যে বিরাট প্রতিনিধিদল বুদ্ধগয়ায় গমন করেছিলেন, সেই দলেও রামকৃষ্ণ-মিশনের কয়েকজন সাধু ও দেশের অন্যান্য মনীষীগণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও যোগদান করেছিলেন। এমন কি, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী "বিবেকানন্দ সমিতি" কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে, বেলুড় মঠে বহু সুধীজনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—"যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও, তবে বিবেকানন্দকে জানো।"

মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অনুরাগী, প্রসিদ্ধ জননেতা, সাহিত্যিক, রাজনীতিক এবং শিক্ষাব্রতী। পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার বাটাজোড় নিবাসী ; জীবদ্দশা ১৮৫৬ থেকে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ। আইন-ব্যবসা, অধ্যাপনা, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা তিনি সমাজে মহাত্মারূপে বরণীয় হন এবং স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। মুক্তিলাভের পর তিনি জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থও রচনা করেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে যান। সেদিন সেখানে আচার্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের নানা ধর্মীয় প্রসঙ্গের পর, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে কীর্তনানন্দে নৃত্য করতে দেখে এবং পরক্ষণেই সমাধিস্থ হতে দেখে অশ্বিনীকুমার মুগ্ধ হন। এরপরেও আরো কয়েকবার তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান এবং তাঁর পূতসঙ্গ উপভোগ করেন। অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে প্রতিবারই ঠাকুর ধর্মালোচনা করেছিলেন এবং তাঁকে গান শোনাবার সময় সমাধিস্থ হয়েছিলেন। একদা ঠাকুরের নির্দেশে দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঠাকুরকে পাখা দিয়ে বাতাস করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ঠাকুর তাঁকে বুদ্ধদেবের একখানি ছবি দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন ; কিন্তু কার্যগতিকে শেষ অবধি তা আর দেওয়া হয়নি ব'লে অশ্বিনীকুমার পরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। একদা ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে ঠাকুর তাঁর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। অশ্বিনীকুমারের পিতা শ্রীব্রজমোহন দত্তও একবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তিনদিন বাস করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী অশ্বিনীকুমারের ঠাকুর সম্পর্কে উক্তি—"যা দেখেছি ও পেয়েছি, তাতে জীবন মধুময় করে রেখেছে।"

সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিয়েছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো।"

মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ

"অমৃতবাজার"-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, সুবিখ্যাত সাংবাদিক, স্বদেশ প্রেমিক এবং বৈষ্ণব ধর্মের মহান সাধক। জীবদ্দশা ১৮৪০ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ। পূর্ববঙ্গের যশোহর জেলার পলুয়া-মাগুরা গ্রামে (পরবর্তী নাম অমৃতবাজার) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরে কলকাতায় এসে তিনি লেখাপড়া করেন এবং কিছুকাল শিক্ষকতাও করেন। বিখ্যাত "অমৃতবাজার"—পত্রিকা প্রতিষ্ঠার পর, তিনি তার প্রধান সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং "অমিয় নিমাই চরিত," "কালাচাঁদ গীতা" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনার দ্বারা সাহিত্য জগতেও তিনি যশস্বী হন। তাঁর ত্যাগ, নিষ্ঠা, ভক্তি এবং স্বদেশসেবার জন্য তিনি জনগণের কাছে মহাত্মারূপে বরণীয় হন। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও "অমৃতবাজার"—পত্রিকার পরবর্তী সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তাঁর সুযোগ্য পুত্র এবং উত্তর সাধক।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের মাধ্যমে শিশির-কুমারের সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়। গিরীশচন্দ্রের সঙ্গে শিশিরকুমারের খুব হৃদ্যতা থাকায়, শিশিরকুমার প্রথমজীবনে একদিন গিরীশচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের অপর ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে ঠাকুরকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন; কিন্তু ঠাকুরের মহিমা সম্পর্কে সে সময় তাঁর সম্যক পরিচয় না থাকায়, তিনি ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ না করেই চ'লে এসেছিলেন। গিরীশচন্দ্রের সেদিন ঠাকুরের কাছে আরো কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছা থাকলেও, শিশিরকুমার "চলো, আর কি দেখবে"—এই বলে জোর করে গিরীশচন্দ্রকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ঠাকুরের সঙ্গে শিশিরকুমার পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দরুন গুণগ্রাহী শিশিরকুমার তাঁর বাগবাজারের বাড়ীতেও ঠাকুরকে দু'বার আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। বলা আবশ্যক, প্রখ্যাত "অমিয় নিমাই চরিত" রচনার পূর্বে শিশিরকুমারের প্রথম জীবনেই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষ, কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ঠাকুরের গৃহী সন্তানগণ ছাড়াও, রামকৃষ্ণ-মিশনের অনেক সাধুর সঙ্গে শিশিরকুমারের হৃদ্যতা ছিল।

মহর্ষি শ্রীমৎ নগেন্দ্রনাথ

আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ও সিদ্ধপুরুষ শ্রীমৎ নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী হাওড়া জেলার মাকড়দহের কাছে পায়রাটুঙ্গী (ধারসা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জীবদ্দশা ১৮৪৬ থেকে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ। আদিনিবাস রাজসাহী জেলা; মাতুলালয় হুগলী জেলার চাতরা (শ্রীরামপুর)। নিজ অধ্যবসায়ে তিনি ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি আটটি ভাষায় সুপণ্ডিত হন এবং শিক্ষাব্রতীরূপে জীবন সুরু করেন। হাওড়া জেলার বালী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়েও তিনি একদা প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং নিজ গ্রামে ও সহরে বিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা সমাজসেবীরূপেও আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি প্রথমে হঠযোগ ও পরে প্রাণায়ামে সিদ্ধ হন এবং আজীবন ব্রহ্মচারী থাকেন। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকর্ষণবশতঃ নগেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং আচার্য ও গায়করূপে সমাদৃত হলেও মহর্ষি-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মত বিরোধের ফলে তিনি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে মুঙ্গেরের পাহাড়ের এক নির্জন গুহায় ঘোর তপস্যার দ্বারা নগেন্দ্রনাথ সিদ্ধিলাভ করেন এবং সংসারে বাস করেও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্মের উন্নতিকল্পে তিনি "সনাতন ধর্ম প্রচারিণী সভা" প্রতিষ্ঠা করেন এবং "সত্য প্রদীপ" নামে মাসিক ধর্ম পত্রিকা প্রকাশ করেন। "প্রতিজ্ঞা-শতক", "সামুদ্রিক বিদ্যা" "পরমার্থ সঙ্গীতাবলী" প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থগুলি তাঁরই রচিত। বর্তমানে কলকাতায় ২বি, রামমোহন রায় রোডে, এই মহাপুরুষের নামাঙ্কিত "শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠ" প্রতিষ্ঠিত আছে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে নগেন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, বহু ভক্ত পরিবেষ্টিত অবস্থায় ঠাকুর সমাধিমগ্ন। সমাধি ভঙ্গের পর ঠাকুর সেদিন অপরিচিত নগেন্দ্রনাথকে এমন-ভাবে সম্ভাষণ করে বসতে বলেন যে, উপস্থিত সকলেরই মনে হয়, যেন নগেন্দ্র-নাথ তাঁর বহু পরিচিত। ঠাকুরের সঙ্গে সেদিন অধ্যাত্ম জীবনের নানাদিক সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথের বহু আলোচনা হয় এবং ঠাকুরের অনুরোধে নগেন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর স্বরচিত কয়েকটি গান গেয়ে ঠাকুরকে শোনান। সুগায়ক নগেন্দ্র-নাথের উচ্চভাবের গান শুনে, ঠাকুর তন্ময় হয়ে সেদিন নগেন্দ্রনাথকে স্নেহে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অনুরাগী, ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা, সুলেখক এবং শিক্ষাব্রতী। জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার চাঙড়িপোতা গ্রামের মাতুলালয়। জীবদ্দশা ১৮৪৭ থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি ব্রাহ্ম-নেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের সহযোগী এবং "সোম প্রকাশ" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে, তিনি "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠন করে তার সভাপতি হন। তিনি ইংলণ্ড পর্যটন করে এসে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকেই ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। সত্যনিষ্ঠা, সরল বিশ্বাস এবং ঐকান্তিকতার জন্য তিনি সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হন। তৎকালীন বহু পত্রিকায় তাঁর রচিত অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার দ্বারা তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেন।

আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের মাধ্যমেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শিবনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়েছিল। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণে শিবনাথ প্রায়ই তাঁর কাছে যেতেন এবং তাঁর কথামৃত পান করে তৃপ্ত হতেন। ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতেও ঠাকুরের সহজ, সরল উপদেশ শোনার জন্য শিবনাথ উপস্থিত হতেন এবং ঠাকুরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ঠাকুরও শিবনাথকে আধ্যাত্মিক জগতের একটি বড় আধারস্বরূপ মনে করতেন এবং শিবনাথের সরলতা ও নিষ্ঠার জন্য তাঁকে পরম স্নেহ করতেন। এমনকি, শিবনাথের মত উচ্চ আধারকে দেখার জন্য ঠাকুর মাঝে মাঝে খুব উতলা হতেন এবং তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে আনন্দ পেতেন। একদা শিবনাথের কাছে ঠাকুর সিংহ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, ঠাকুরকে নিয়ে শিবনাথ আলীপুরের চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখিয়ে এনেছিলেন। সেখানে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে শিবনাথ লক্ষ্য করেন যে, ঠাকুর "বিশেষ ভাব" ধারণ করে আপন মনে বলছেন—"মা, তোর বাহন দেখতে যাবো, মা!" অতঃপর চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করে দেবীর বাহন হিসাবে প্রথমেই গিয়ে সিংহ দর্শন করেন। পরে অবশ্য পশু দর্শন করার জন্য ঠাকুরকে আহ্বান জানালে, ঠাকুর বলেন—"পশুর রাজা দেখলাম, আর কি দেখব!"

বহুদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভের পর শিবনাথের একটি উক্তি :—
"পরমহংসদেব যাহা উপদেশ দেন, সে সকল কথা কোন-না-কোন পুস্তকে লিখিত আছে ; সেজন্য তাঁহার মহত্ত্ব না থাকিতে পারে। তবে মহত্ত্ব কোথায় ? তিনি যে-অনুরাগে গঙ্গা তীরে পতিত হইয়া "মা" "মা বলিয়া কাঁদিতেন, সে-অনুরাগ কাহার আছে ?···প্রকৃত সাধু সাধারণ জীবের বিষয়াত্মক মনে প্রেমশিক্ষা দিয়া তাহাদের বলাধান করিয়া থাকেন, পরমহংসদেবও তদ্রূপ"

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

"আর্য সমাজে"র প্রতিষ্ঠাতা এবং বৈদিক ধর্ম-সংস্কারক সন্ন্যাসী। জীবদ্দশা ১৮২৪ থেকে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি গুজরাটে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্পবয়সে "সন্ন্যাস" গ্রহণ করে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। ধর্ম-ত্যাগীদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি "শুদ্ধি" প্রথা প্রবর্তন করেন এবং বৈদিক ধর্মের পুনরায় প্রচারের জন্য প্রথমে বোম্বাই শহরে এবং পরে লাহোরে আর্যসমাজ স্থাপন করেন।

স্বামী দয়ানন্দের বঙ্গদেশ ভ্রমণের সময়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। একদা উত্তর কলকাতার সিঁথিতে "নৈনালের ঠাকুরদের প্রমোদ-উদ্যানে" দয়ানন্দ এসে কিছুকাল বাস করায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নাম শুনে সেখানে নিজেই একদিন ভক্ত কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে দেখতে যান। কিন্তু সেদিন সেখানে আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের যাওয়ার কথা থাকায়, দয়ানন্দ কেশবের আগমনের প্রতীক্ষায় খুব চঞ্চল ছিলেন এবং "কেশব সেন, কেশব সেন" করে ঘর বাহির করছিলেন। সেদিনকার ঘটনা সম্পর্কে ঠাকুর বলেছিলেন—"সিঁথির বাগানে দেখতে গিয়েছিলাম; দেখলাম—একটু শক্তি হয়েছে; বুকটা সর্বদা লাল হয়ে রয়েছে। বৈখরী অবস্থা—দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই শাস্ত্রকথা কইছে; ব্যাকরণ লাগিয়ে অনেক কথার মানে সব উল্টোপাল্টা করতে লাগল; নিজে একটা কিছু করব, একটা "মত" চালাবো—এ অহঙ্কার ভেতরে রয়েছে।" ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে আরো বলেছিলেন—"খুব পণ্ডিত: বাংলা ভাষাকে বলত—গৌরাণ্ড ভাষা। দেব্‌তা মানতো; কেশব মানতো না—তা বলতো, ঈশ্বর এত জিনিস করেছেন, আর দেব্‌তা করতে পারেন না! নিরাকারবাদী। কাপ্তেন "রাম" "রাম" কচ্ছিল; তা বললে, তার চেয়ে "সন্দেশ" "সন্দেশ" বলো।"

পরে সেখানে আচার্য কেশবচন্দ্র সেন উপস্থিত হলে, ঠাকুর তাঁকে দেখেই সমাধিস্থ হন। ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থা দর্শন করে দয়ানন্দ মুগ্ধ হন এবং তাঁর সম্পর্কে উচ্চধারণা প্রকাশ করেন। কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় দয়ানন্দকে যখন প্রশ্ন করেন যে, তাঁর এইরূপ অবস্থা লাভ হয়েছে কিনা, তাতে দয়ানন্দ স্বীকার করেন—"মেরি পাণ্ডিত্যাভিমান হ্যায়।" তিনি পরে আক্ষেপ করে আরো বলেছিলেন—"আমরা এত বেদ-বেদান্ত কেবল পড়ছি; কিন্তু এই মহাপুরুষে তার ফল দেখছি। এঁকে দেখে প্রমাণ হলো যে, পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন করে ঘোলটা খান—আর এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান।"

বলা আবশ্যক, দুর্ভাগ্যবশতঃ পরবর্তীকালে গোয়ালিয়রে ভ্রমণের সময়

জনৈকা দুষ্ট প্রকৃতির স্ত্রীলোক, ভক্তির ভাণ দেখিয়ে নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে, খাদ্যের সঙ্গে বিষ দিয়ে দয়ানন্দকে হত্যা করে।



শ্রীমৎ চরণদাস বাবাজী

প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধু এবং মহাত্মা পুরুষ। পূর্বনাম শ্রীরাজেন ঘোষ এবং পূর্বাশ্রম বরানগর। তিনি প্রথমে এক জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবের কাজ করতেন এবং হিন্দুদের মূর্তিপূজা মানতেন না। পরবর্তী জীবনে তিনি "সন্ন্যাস" গ্রহণ করে পুরীতে বাস করতেন।

নব্য শিক্ষিত যুবক অবস্থায় প্রথমজীবনে তিনি কয়েকবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁকে দর্শন করেছিলেন। সাধক অবস্থাতেও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল। একদা দক্ষিণেশ্বরে দ্বাদশ শিবমন্দিরের পশ্চিমদিকের ফুলবাগানে এক মালীর ছেলেকে বিষাক্ত গোখুরা সাপ দংশন করলে, ছেলেটির মৃত্যু হয়। যে সব ভক্ত তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে তৎকালে অবস্থিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে, ছেলেটিকে বাঁচাবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। ঠিক সেই সময়ে সেখানে শ্রীচরণদাস বাবাজীর আগমন ঘটায়, ঠাকুর বাবাজীকে সঙ্গে নিয়ে মৃত ছেলেটির কাছে যান এবং তার মাথাটি নিজের কোলে তুলে নিয়ে তার কানে মাতৃনাম শোনাতে থাকেন; সে সময় বাবাজীও ছেলেটিকে প্রদক্ষিণ করে হরিনাম করতে থাকেন। ঠাকুরের মাতৃনাম এবং বাবাজীর হরিনাম—এই দুয়ে মিলে সেখানে এক অপার্থিব পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং সেই ছেলেটি সত্যই পুনর্জীবন লাভ করে। বলাবাহুল্য, ঠাকুরের সঙ্গে বাবাজীর একটি প্রীতির সম্পর্ক ছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পরবর্তীকালে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও কথামৃত প্রণেতা মাষ্টারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত পুরীতে বেড়াতে গেলে, বাবাজীর সঙ্গে তাঁর ৺জগন্নাথ মন্দিরে সাক্ষাৎ হয়েছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই সন্তানের পরিচয় জানতে পেরে বাবাজী তাঁকে তাঁর পুরীর "জাজপেটা"র মঠে আনন্দের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে ঠাকুরের সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে কিছু আলোচনা হলেও, বাবাজী নিজের পূর্বাশ্রমের সব কথা মাষ্টারমশাইয়ের কাছে প্রকাশ না করায়, ঠাকুরের সঙ্গে বাবাজীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা অজ্ঞাত থেকে যায়।



শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী

কাশীর প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী এবং মহাযোগী পুরুষ। দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। মাতৃবিয়োগের পর তিনি গৃহত্যাগ করে সুদীর্ঘকাল যোগশিক্ষা করেন এবং জনৈক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামেশ্বর, নেপাল, তিব্বত, মানস সরোবর প্রভৃতি পর্যটন করার পর, অবশেষে তিনি কাশীতে অবস্থান করেন এবং সেখানেই স্বেচ্ছায় যোগবলে দেহরক্ষা করেন। জীবদ্দশা আনুমানিক ১৬০৭ থেকে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ; অর্থাৎ ২৮০ বৎসর তিনি যোগবলে দেহধারণ করেছিলেন। নানা অলৌকিক ক্রিয়ায় তিনি সকলকে বিস্মিত করেছিলেন এবং জীবন্মুক্ত পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এই মহাপুরুষের সঙ্গে, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের একাধিকবার কাশীতে যোগাযোগ হয়েছিল। একদা ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থাদি ভ্রমণের সময় কাশীতে গমন করেছিলেন। সেখানে মণিকর্ণিকার ঘাটে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তৎকালীন মৌনাবলম্বী মহাযোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে প্রথম দর্শন করতে যান এবং ত্রৈলঙ্গ স্বামীও তাঁর নিজের নস্যদানি ঠাকুরের সামনে এগিয়ে দিয়ে, ঠাকুরকে অভ্যর্থনা ও সম্মান জানান। মৌনী যোগীপুরুষের সঙ্গে ঈশারায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন এবং ত্রৈলঙ্গ স্বামীও ঈশারায় যথাযথ উত্তর দেন। উচ্চমার্গের উভয় ধর্মাত্মার ঈশারায় কথোপকথন, উপস্থিত অন্যান্যেরা বুঝতে অক্ষম হন। কাশীতে থাকাকালীন ঠাকুর একাধিকবার ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং সেখানে মথুরনাথের বাড়ীতে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে এনে, ঠাকুর স্বহস্তে তাঁকে পায়সান্ন খাইয়েছিলেন। মতান্তরে কাশীর পঞ্চগঙ্গা ঘাটে ঠাকুর তাঁকে পায়সান্ন খাওয়ান।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটের পাশে একটি ঘাট বাঁধিয়ে দেবার সঙ্কল্প করেছেন শুনে, ঠাকুর তাঁর সঙ্গী ও ভাগ্নে হৃদয়ের দ্বারা সেখানে কয়েক কোদাল মাটি নিক্ষেপ করেছিলেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে অন্তরের যোগ থাকায় উভয়ে উভয়কে ভালবাসতেন। মৌনী ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মুখে ঠাকুরের সম্পর্কে কোন কথা ব্যক্ত না হোলেও, ঠাকুর তাঁকে "সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর" বা "কাশীর সচল শিব" বলে নির্দেশ করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পরবর্তীকালে ঠাকুরের দেহরক্ষার পর স্বামী বিবেকানন্দও কাশীতে তীর্থভ্রমণে গিয়ে মৌনাবলম্বী ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন ও প্রণাম করে এসেছিলেন।

মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার, দানবীর ও বিদ্যোৎসাহী পুরুষ। জন্মস্থান পাথুরিয়াঘাটা এবং জীবদ্দশা ১৮৩১ থেকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি পিতৃব্য শ্রীপ্রসন্নকুমার ঠাকুরের সমস্ত সম্পত্তিলাভ করে বিরাট ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। তিনি "বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে"র সম্পাদক, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানে তিনি বহু অর্থ দান করেন এবং এদেশে প্রথম থিয়েটারের সূত্রপাত করেন। বিদ্যোৎসাহী হিসাবে বহু পুস্তক সংগ্রহ করে তিনি সেগুলি রক্ষা করেছিলেন। হিন্দুধর্মে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের প্রথম যোগাযোগ হয় দক্ষিণেশ্বরে যদুলাল মল্লিকের বাগানে। ঠাকুর সেখানে যতীন্দ্রমোহনকে "ঈশ্বর চিন্তাই মানুষের কর্তব্য কিনা"—এই প্রশ্ন করায় যতীন্দ্রমোহন বলেন—"আমরা সংসারী লোক, আমাদের কি আর মুক্তি আছে? রাজা যুধিষ্ঠিরই নরক-দর্শন করে-ছিলেন।" এই উত্তর শুনে ঠাকুর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে বলেন—"তুমি কি লোক গা! যুধিষ্ঠিরের কেবল নরক-দর্শনই মনে করে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্যকথা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি—এসব কিছু মনে হয় না?" ঠাকুরের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে এরূপ উক্তি শুনেই সেদিন যতীন্দ্রমোহন "আমার একটু কাজ আছে" ব'লে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁকে ছাড়ার পাত্র নন; তাই পরে একদিন ভক্ত কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে পাথুরিয়া ঘাটায় তাঁর বাড়ীতেই ঠাকুর স্বয়ং গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন; কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য যতীন্দ্রমোহনকে খবর পাঠালেও, যতীন্দ্রমোহন "গলায় ব্যথা" বলে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

*

রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জীবদ্দশা ১৮৪০ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ এবং সাহিত্যানুরাগী হিসাবে তিনি "বেঙ্গল এ্যাকাডেমী অফ্ মিউজিক্" প্রতিষ্ঠিত করেন এবং "মুক্তাবলী" নামে একখানি নাটিকা প্রণয়ন করেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "ডক্টর অফ্ মিউজিক্" উপাধি পান এবং হিন্দু সঙ্গীতের পুনরায় অভ্যুত্থানের জন্য বহু চেষ্টা করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পাথুরিয়া ঘাটার নিজ বাড়ীতে শৌরীন্দ্রমোহনের যোগাযোগ হয়েছিল। একদা ঠাকুর সেখানে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহনের খোঁজে আগমন করায়, শৌরীন্দ্রমোহন তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। ঠাকুর শৌরীন্দ্রমোহনকে বলেন—"তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারব না; কেননা সেটা মিথ্যা কথা হবে।" সেদিন যদিও যতীন্দ্রমোহন "গলায় ব্যথা" বলে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িয়ে গিয়েছিলেন, শৌরীন্দ্রমোহন কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে তাঁর সান্নিধ্যে কিছু সময়ের জন্য থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন।

*

বঙ্গবরেণ্য কৃষ্ণদাস পাল

"হিন্দুপেট্রিয়ট"—পত্রিকার সম্পাদক, বাগ্মী, তেজস্বী এবং রাজনীতিক পুরুষ। জন্মস্থান কলকাতা এবং জীবদ্দশা ১৮৩৮ থেকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। "বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এ্যাসেসিয়েশনের" সহকারী সম্পাদক, কলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যরূপে তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন।

একদা কৃষ্ণদাস দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে গেলে, ঠাকুর তাঁর মধ্যে রজোগুণের লক্ষণ দেখতে পান। ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনাকালে কৃষ্ণদাস তাঁকে বলেন—"বৈরাগ্য-শাস্ত্র এদেশের সর্বনাশ করেছে। সকল বস্তু এদেশে অসার ব'লে শিক্ষা দেওয়া সেকেলে কথা। এরূপ শিক্ষার দোষে আজ ভারতবর্ষ পরাধীন। যাতে নিজের এবং দেশের হিতসাধন হয়, এমন উপদেশ দেবেন। জগতের উপকার করা ছাড়া মানুষের আর কোন ধর্ম নাই।" তাঁর এই উপদেশাত্মক কথা শুনে ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং তাঁকে তিরস্কার করে বলেন—"তোমার মত রাঁড়িপুত বুদ্ধির লোক আর দেখা যায় না। হ্যাঁ গা, তুমি কে? আর কি উপকার করবে? আর জগৎ কতটুকু গা যে, তুমি উপকার করবে? বাবু, গঙ্গায় কাঁকড়ার বাচ্ছা হয় দেখেছ? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি একটি কাঁকড়ার বাচ্ছা বিশেষ; জীবের হিত করবে মনে করলে পাপ হয়।" বলাবাহুল্য, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই নির্ভীক উক্তিতে, তেজস্বী পুরুষ কৃষ্ণদাস নীরব ছিলেন।

*

দেশসেবক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

বিখ্যাত সাংবাদিক, দেশব্রতী, বৈদান্তিক ও মহামনীষী পুরুষ। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন। জন্মস্থান কলকাতা এবং জীবদ্দশা ১৮৬১ থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ। পূর্বনাম শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে তিনি আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং পরে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কয়েকখানি সংবাদপত্রের সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করার পর তিনি ইউরোপে গিয়ে নানাস্থানে বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর তিনি পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। "বঙ্গ-ভঙ্গ" আন্দোলনের সময় তিনি "সন্ধ্যা" নামক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তার মাধ্যমে তৎকালীন অগ্নিযুগে তিনি দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন।

ছাত্রজীবনে ব্রহ্মবান্ধব (ভবানীচরণ) ও কয়েকজন বন্ধু মিলে কলকাতায় "ইয়ং মেন্‌স্ নেষ্ট্" (যুবকদের নীড়) নাম দিয়ে একটি ধর্ম ও সদালোচনার প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন। বিদ্যালয়ের ছুটিতে সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাঝে মাঝে তাঁরা দলবদ্ধ হয়ে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যেতেন এবং সদলবলে গঙ্গায় সাঁতার কেটে বা অন্যভাবে আমোদ-প্রমোদ করে তাঁরা সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দায় ফিরে এসে বসতেন; এই সময় ঠাকুরের সস্নেহ ব্যবহারে ব্রহ্মবান্ধব মুগ্ধ হতেন। তৎকালে ঠাকুরের সম্যক পরিচয় অবগত না হলেও তিনি লক্ষ্য করতেন যে, ঠাকুর তাঁদের জন্য প্রসাদী ফলমূল, মিষ্টান্ন, লেবুর রস প্রভৃতি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। এই সময় ঠাকুরের দেওয়া প্রসাদী জিনিস তিনি কয়েকবার স্বয়ং ঠাকুরের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর তাঁদের "চাঁদের হাট" বলতেন এবং ব্রহ্মবান্ধবসহ সকলকে সমানভাবে স্নেহ করতেন। এর পরেও ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর কয়েকবার যোগাযোগ হয়; কিন্তু পরবর্তীকালে কর্মজীবনে ব্রহ্মবান্ধব অন্য পথের পথিক হন ও ঠাকুরের সান্নিধ্য থেকে দূরে চলে যান।

যদিও কর্মজীবনে ব্রহ্মবান্ধব প্রথম অবস্থায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অসামান্য মহিমার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন পরবর্তী জীবনে কিন্তু তিনি ঠাকুরকে "লোকরক্ষার সেতু" এবং "ভাব সমন্বয়ের সাগর" বলে বন্দনা করেছিলেন। এমনকি, ঠাকুরের মহাভাবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তিনি একদা ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে লিখেছিলেন—"চলো, চলো আজ দক্ষিণেশ্বরে যাই। আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত করিয়াছ; চলো আজ রামকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবনমনকে সার্থক করি। বড় ভাগ্য না হইলে মর্তলোকে

এমন অপূর্বরূপ, এমন আবির্ভাব দেখা যায় না। চলো, চলো বাঙালী! আজ তোমার জাতীয় জীবনের নবজাগরণের শুভ মুহূর্তক্ষণে ঐ নর-দেবতাকে দেখিয়া ধন্য হইয়া আসি।" স্বরাজ পত্রিকায় ঠাকুর সম্পর্কীয় প্রখ্যাত প্রবন্ধে ব্রহ্মবান্ধব লেখেন—"ভগবান রামকৃষ্ণও সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ। এরূপ সাধক ও সিদ্ধ বহু কালাবধি পুণ্যভূমি ভারতে দৃষ্ট হয় নাই।...রামকৃষ্ণ কে? কে তাই জানি না। এই পর্যন্ত জানি যে, এই সোনার বাংলায় এমন সোনার চাঁদ, গোরাচাঁদের পর আর উদয় হয় নাই। চাঁদেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু রামকৃষ্ণচন্দ্রে কলঙ্কের রেখা-টুকুও নাই।"

*

বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের অবিবাহিত, সর্বকনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা। জন্মস্থান কলকাতা এবং জীবদ্দশা ১৮৮০ থেকে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজ বিজ্ঞানী, নৃ-তাত্বিক। এবং চিন্তানায়ক। রাজদ্রোহমূলক রচনা প্রকাশের জন্য তিনি তৎকালীন ইংরাজ সরকার কর্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং কারামুক্তির পরেই তিনি গোপনে আমেরিকায় চলে যান। সেখান থেকে বি. এ; এম. এ—পাশ ও পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করার পর তিনি জার্মানীতে গিয়ে পুনরায় পি. এইচ. ডি. উপাধিলাভ করেন। বিদেশে তিনি "মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের" অনুগামী ও প্রবক্তারূপে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং রাশিয়া-ভ্রমণের পর স্বদেশে ফিরে এসে "নিখিল ভারত কংগ্রেসে" যোগদান করেন। আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্য তাঁকে পুনরায় দুবার কারাবরণ করতে হয়েছিল। বিপ্লবী বারীন্দ্রনাথ ঘোষের সহায়তায় তিনি দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

নিতান্ত শৈশবকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে ভূপেন্দ্রনাথ এসেছিলেন। তিনি যখন ঠাকুরকে দর্শন করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ছ-সাত বছর। তবু তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ভূপেন্দ্রনাথের নিজের রচনার মধ্যে দেখা যায় যে, শৈশবকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলি তাঁর বেশ স্মরণে ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে ঠাকুরের একাধিকবার শুভাগমনকালে, ভূপেন্দ্রনাথ শৈশবে তাঁর মায়ের সঙ্গে সেখানে যেতেন এবং ঠাকুরের ভাষণ ও কীর্তন শ্রবণ করতেন। কাশীপুরেও ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের সঙ্গে অসুস্থ ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নরেন্দ্রনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ) বাড়ীতে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ঠাকুর যে সব কথা তাঁর মাকে

বলেছিলেন, সেগুলি তিনি শুনেছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সের দরুন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর কোন আলাপ হয়নি। সেদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে বাড়ী ফেরার উদ্দেশ্যে কাশীপুর থেকে বাগবাজার অবধি এসে, পুনরায় কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। বালক ভূপেন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। এর কিছুকাল পরেই ঠাকুরের দেহরক্ষা হওয়ায়, পরিণত বয়সে ভূপেন্দ্রনাথ আর ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাননি।

স্বামী বিবেকানন্দ-বিষয়ক এবং অন্যান্য বহু গবেষণা মূলক গ্রন্থ তিনি রচনা করে গেছেন। বেলুড়মঠের কয়েকজন সাধুর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল এবং তিনি একদা কয়েকদিনের জন্য বেলুড়মঠে বাসও করেছিলেন। পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কে তাঁর একটি রচনার অংশ :—"শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—ধর্মের বিশ্বজনীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ। তিনি অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়েই এই বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন।…যদি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত অসাম্প্রদায়িক এবং সর্বজনীন মতবাদ জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত, তা হলে আমাদের দেশে পরবর্তীকালে যে কলঙ্কময় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল, তা সম্ভবতঃ রোধ করা যেত।"

*

সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ রায়

বর্ধমান জেলার মাহাতো-রামচন্দ্রপুর গ্রামের সন্তান। জীবদ্দশা ১৮৪৯ থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। সারাজীবন তিনি সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। নাটক রচনা ছাড়াও বিভিন্ন কাব্য, প্রহসন, উপন্যাস ও গল্প রচনায় তাঁর মত অবিশ্রান্ত লেখক তখন আর কেহই ছিলেন না। "এ্যালবার্ট প্রেসের" ম্যানেজাররূপে এবং "বীণাথিয়েটারের" প্রতিষ্ঠাতারূপেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ করেন এবং ভঙ্গ—অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। তাঁর রচিত "তরণীসেনবধ", "লয়লা-মজনু", "পতিব্রতা", "নাট্যসম্ভব", "দ্বাদশগোপাল", "বামন ভিক্ষা", "হিরণ্ময়ী", "কিরণ্ময়ী" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে রাজকৃষ্ণের খুব হৃদ্যতা থাকায়, তিনি স্বামীজীর (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ) সঙ্গে একদা শ্যামপুকুরের বাড়ীতে অসুস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে যান। নরেন্দ্রনাথ সেদিন ঠাকুরের কাছে রাজকৃষ্ণের ব্যক্তিগত পরিচয় দেন এবং লেখক হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার, বিশেষতঃ "রাধাকৃষ্ণ" সম্পর্কীয় রচনার উল্লেখ করেন। ঠাকুর তখন তাঁর কাছে

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব জানতে চাইলে, রাজকৃষ্ণ সুন্দরভাবে ঠাকুরের কাছে তা বিবৃত করেন। রাজকৃষ্ণের মনে এই বিষয়ে আরো কিছু জিজ্ঞাস্য থাকায়, তিনি তা ঠাকুরের কাছে প্রকাশ করেন এবং ঠাকুরও তাঁকে প্রেম-রাধা, নিত্য-রাধা, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের যথাসাধ্য ব্যাখ্যা কোরে শোনান। রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে রাজকৃষ্ণের সঙ্গে আলোচনা করে এবং সেই বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে, ঠাকুর তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।

*

সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগী ব্রাহ্মভক্ত এবং তদানীন্তন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক। জন্মস্থান বিহারের মোতিহারী জেলা; আদি নিবাস—চব্বিশ পরগণা জেলার হালিশহর। জীবদ্দশা ১৮৬১ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ। "ফিনিক্স্", "ট্রিবিউন", "লীডার", "প্রদীপ", "প্রভাত" প্রভৃতি পত্রিকাগুলির সম্পাদক ও সাংবাদিকরূপে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও তিনি আজীবন সভ্য ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে "লীলা", "জীবন ও মৃত্যু", "অমরসিংহ", "পর্বতবাসিনী" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন তাঁর নিকট আত্মীয়।

প্রথম জীবনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশতঃ নগেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাঁর পূত সঙ্গ উপভোগ করতেন। আচার্য কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যান্য ভক্তগণসহ যেদিন ঠাকুর ষ্টীমারে চেপে গঙ্গায় ভ্রমণ করেন, সেদিন নগেন্দ্রনাথও তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। এই সময় ঠাকুর উচ্চস্তরের ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেছিলেন এবং ষ্টীমারের মধ্যেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন। ঠাকুরের ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ এবং সমাধি, নগেন্দ্রনাথের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করায়, তিনি পরবর্ত্তীকালে তাঁর রচনার মধ্যে সেগুলির বিশেষ উল্লেখ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট ঠাকুরের দেহরক্ষার দিনের একটি অপূর্ব রচনায় নগেন্দ্রনাথ লিখেছেন:—"কলকাতায় এসেছিলাম স্বল্পকালের জন্য। এক অপরাহ্নে শুনলাম, পরমহংস রামকৃষ্ণ মহাসমাধি লাভ করেছেন। তৎক্ষণাৎ গাড়ী করে কাশীপুর বাগান বাটীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। কলকাতার উত্তরাংশে কাশীপুরের বাগান বাটীতেই পরমহংসদেব তাঁর মর্ত্যজীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলাম, বাড়ীর গাড়ীবারান্দার সামনে

ধবধবে সাদা এক শয্যায় তিনি শায়িত এবং বিবেকানন্দ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ অশ্রুরুদ্ধ চোখে খাটটিকে ঘিরে মাটিতে বসে আছেন। পরমহংসদেব ডানপাশে ফিরে শুয়ে, তাঁর সারাদেহে নির্বাণের অনন্ত-নীরবতা ও শান্তি। শান্তি চারিদিকে—শান্তি মৌনবৃক্ষে, বিদায়ী অপরাহ্নে, উপরের নীল আকাশে এবং তার উপরে নীরবে সঞ্চরমান খণ্ড মেঘে। মহামরণের সামনে সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় স্তব্ধ হয়ে যখন আমরা বসে রয়েছি, ঠিক তখনি কয়েকটি বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ল। ঠিক যেন পুষ্প বৃষ্টি; আর্য সাহিত্যে যে-কথা আমরা পড়েছি, দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করেন—যখন তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত কেউ পৃথিবী ত্যাগ করে অমরলোকের উদ্দেশে যাত্রা করেন—এই বারিবিন্দু সেই বিগলিত পুষ্পপর্ণ। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে জীবিতকালে দর্শন করা জীবনের পরম সৌভাগ্য; একই সৌভাগ্য মৃত্যুর অঙ্কে তাঁর শান্ত মুখচ্ছবির দর্শনলাভ।"

*

সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী প্রখ্যাত সাংবাদিক। জীবদ্দশা ১৮৬৬ থেকে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ। জন্মস্থান ভাগলপুর এবং পৈতৃক বাসস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার হালিশহর। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রথমে তিনি সরকারী অফিসে চাকরী গ্রহণ করেন এবং পরে কিছুদিন অধ্যাপনাও করেন। সবশেষে তিনি সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে "বসুমতী", "বঙ্গবাসী", "হিতবাদী", "নায়ক", "সাহিত্য", "রঙ্গালয়" প্রভৃতি পত্রিকাগুলির সম্পাদনায় ব্রতী হন। "রূপলহরী", "উমা" প্রভৃতি উপন্যাস, "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস", "চৈতন্য-চরিতামৃত", "আইন-ই-আকবরী (বঙ্গানুবাদ)" প্রভৃতি নানা ধরণের গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন। তিনি বহু জনহিতকর সভাসমিতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্‌রূপেও পরিচিত ছিলেন।

তিনি প্রথম জীবনে মাত্র দুবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং শেষজীবন অবধি সেই পবিত্র স্মৃতি বহন করে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা থাকায়, তিনি স্বামীজীর প্রতিও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন রচনায় ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা তিনি ব্যক্ত করে গেছেন।

জমিদার মথুরানাথ বিশ্বাস

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত এবং রাণী রাসমণির জামাতা। রাণীর তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ীকে তিনি প্রথম বিবাহ করেছিলেন; কিন্তু করুণাময়ীর মৃত্যু হলে, রাণীর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বার সঙ্গে তাঁর পুনরায় বিবাহ হয়। ইংরাজী বিদ্যায় অভিজ্ঞ মথুরানাথ উচ্চ প্রকৃতি-সম্পন্ন, বুদ্ধিমান, ধীর প্রতিজ্ঞ এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন।

মথুরানাথই সর্বপ্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে নানা অপূর্ব গুণের পরিচয় পেয়ে, তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে মা-ভবতারিণীর পূজকের পদে বরণ করেছিলেন। ঠাকুরের দিব্যোন্মাদের সময় দক্ষিণেশ্বর-এষ্টেটের কর্মচারীদের নানা অভিযোগ থেকে তিনি যেমন ঠাকুরকে মুক্ত করেছিলেন, তেমন আবার বিভিন্নভাবে পরীক্ষার জন্য মথুরানাথ তাঁকে পতিতাদের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কেও স্বয়ং নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। এমনকি, ঠাকুরের নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা গুরুভক্তি স্বরূপ মথুরানাথ লিখে দিতে চাইলে, ঠাকুর সে কাজ থেকে তাঁকে নিবৃত্তি করেছিলেন এবং এই কাম-কাঞ্চন ত্যাগী সত্যকারের মনুষ্যরূপী দেবতার ওপর মথুরানাথের শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ঠাকুরের সাধনকালে ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীমতী যোগেশ্বরী দেবী, ঠাকুরের আচরণ ও দৈহিক লক্ষণ দেখে, তাঁকে প্রথম "অবতার" বলে ঘোষণা করায়, মথুরানাথ এই বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের অভিমত জানবার জন্য এক বিশেষ সভার আয়োজন করেছিলেন। ঐ সভায় ভাগবতাদি-শাস্ত্র অবলম্বনে এবং যুক্তি-তর্ক সহায়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে সমস্ত পণ্ডিতগণের সমক্ষে "অবতার"-রূপে প্রমাণ করায়, মথুরানাথও এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন। প্রকৃতপক্ষে, যুক্তিবাদী মথুরানাথ প্রতিটি বিষয়ে ঠাকুরকে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে নিতেন; তাই "কাম-ত্যাগী" পরীক্ষায় পতিতাদের মধ্যে ঠাকুরকে ছেড়ে দেওয়া, "কাঞ্চন-ত্যাগী" পরীক্ষায় ঠাকুরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার প্রস্তাব এবং "অবতার"রূপে পরীক্ষার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা ধর্মসভার আয়োজন প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে মথুরানাথ ঠাকুরকে যাচাই করে, তবেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে মথুরানাথ একসঙ্গে শিব ও কালী মূর্তিকে দর্শন করে তাঁর চরণে পতিত হন এবং তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করেন। সেদিন থেকেই তিনি ঠাকুরকে তাঁর জীবন-সর্বস্বরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সকল বিষয়েই তাঁর ওপর নির্ভর করতেন। ঠাকুরের সঙ্গে মথুরানাথের এমন এক আন্তরিক সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল যে, ঠাকুরও তাঁর নিজের সব কথা—

এমনকি সাধনার গোপন কথাও মথুরানাথের কাছে প্রকাশ না করে থাকতে পারতেন না। ঠাকুরের কৃপায় মথুরানাথের একদা ভাব-সমাধিও ঘটেছিল। ঠাকুরের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ দর্শন করে মথুরানাথের স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে, তাঁর ইষ্টদেবী মা-জগদম্বা "শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ" ধারণ করে তাঁর সেবা গ্রহণ করছেন এবং তাঁকে সর্ববিষয়ে রক্ষা করছেন। তাই ঠাকুরের আদেশকে তিনি দৈবাদেশরূপে গ্রহণ করতেন এবং নিজের জাগতিক অভ্যুদয়ের মূলে ঠাকুরের কৃপাকে স্বীকার করতেন। একদা জমিদারী সংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নরহত্যা-জড়িত অপরাধে, আদালতে দণ্ডিত হবার ভয়ে তিনি ঠাকুরের কাছে সব দোষ স্বীকার করে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপায় সে যাত্রা রক্ষাও পেয়েছিলেন। ঠাকুরের প্রতি মথুরানাথের এমন বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল যে, নিজের বা স্ত্রীর অসুখের সময় ঠাকুরের কৃপার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিরাময় হতেন।

মথুরানাথ দীর্ঘ ১৪ বৎসর একাদিক্রমে নানাভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুজ্ঞানে সেবা করেন এবং তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভ করে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অধিকাংশ সাধনার সাক্ষী হন। বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরের বিভিন্ন অলৌকিক প্রকাশ তিনি দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর আন্তরিক সাহায্যের ফলেই দক্ষিণেশ্বরে সব রকম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। ঠাকুরের সমগ্র ভরণ পোষণের ভার মথুরানাথ গ্রহণ করায়, ঠাকুর তাঁকে 'প্রধান রসদদার' হিসাবে গণ্য করতেন। মাঝে মাঝে ঠাকুরকে তিনি তাঁর কলকাতার জানবাজারের বাড়ীতে এনেও রাখতেন এবং সস্ত্রীক তাঁকে "বাবা" বলে সম্বোধন করতেন। এমনকি, নিজেদের স্বামী-স্ত্রীর শয্যায় "বাবা"কে নিয়ে শুতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। রাণীরাসমণির সেজ জামাতা হিসাবে মথুরানাথকে ঠাকুর 'সেজবাবু' বলে সম্বোধন করতেন এবং 'সেজবাবু'র ওপর তাঁর সবরকম জোর চল্‌ত। ঠাকুরকে নিয়ে একদা নানা তীর্থ ভ্রমণের সময় ঠাকুরের নির্দেশে মথুরানাথ তীর্থস্থানে দরিদ্রদের অন্ন ও বস্ত্র দান করেছিলেন এবং নিজের জমিদারী মহলে ভ্রমণের সময় তিনি ঠাকুরকে হাতীর পিঠে চড়িয়ে নিজে পাল্কীতে আরোহণ করেছিলেন। বস্তুতঃ মথুরানাথ যেভাবে ঠাকুরের সেবা ও সর্বপ্রকার আদেশ পালন এবং তৎসহ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন, ঠাকুরের আর কোন গৃহীভক্তের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। 'বৈষয়িক-জমিদার' মথুরানাথ সত্যই 'ভক্তির জমিদার'ও ছিলেন।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনের একান্ত সহায়ক এবং প্রধান রসদদার শ্রীমথুরানাথ কলকাতায় ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই দেহত্যাগ করেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত এবং প্রখ্যাত চিকিৎসক। জীবদ্দশা ১৮৩৩ থেকে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. ডি. পরীক্ষা পাশ করার পর, তিনি বহুবাজার নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্তের অধীনে হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করেন। পরে এ্যালোপ্যাথীর বদলে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা শুরু করে তিনি যশস্বী হন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ও জ্যোতিষে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি "ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন" নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য একটি উচ্চমানের শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কলকাতার "সেরিফ" এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও হয়েছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহীভক্ত মনোমোহন মিত্র ছিলেন ডাক্তার সরকারের মামাতো ভায়ের পুত্র।

বিজ্ঞান-জগতের ডাক্তার সরকারের সঙ্গে, মহাভাব-জগতের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন—রামকৃষ্ণ-লীলার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে, বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন মহেন্দ্রলাল পরবর্তী জীবনে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরীয়-ভাবে মগ্ন হয়েছিলেন। ঠাকুরের গলায় "ক্যান্সার"-রোগ চিকিৎসা উপলক্ষে ডাক্তার সরকারের সঙ্গে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়। প্রখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন এবং কয়েকজন বাঙালী ও ইংরাজ এ্যালোপ্যাথী—চিকিৎসকগণের চিকিৎসায় ঠাকুরের রোগের কোন উপশম না হওয়ায়, ভক্তগণের অনুরোধে ডাক্তার সরকার হোমিওপ্যাথীমতে ঠাকুরের চিকিৎসা শুরু করেন। এই চিকিৎসা উপলক্ষেই ডাক্তার সরকার দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠাকুরের কাছে অবস্থান করতেন এবং ঈশ্বরীয় আলোচনায় যোগ দিয়ে তাঁর পূত সঙ্গ উপভোগ করতেন। ঠাকুরের উদার আধ্যাত্মিকতায় ও অমূল্য উপদেশে তিনি এত মুগ্ধ হতেন যে, ঠাকুরকে ও তাঁর ভক্তদের তিনি নিজের আত্মীয়ের মত জ্ঞান করতেন। ঠাকুরের চিকিৎসার খরচ তাঁর ভক্তেরা বহন করে—এই কথা শোনার পর থেকেই তিনি বিনা পারিশ্রমিকে ঠাকুরের চিকিৎসা করতেন। বলা আবশ্যক, ঠাকুরের পরমভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের উদ্যোগে বহু পূর্বে ডাক্তার সরকার একদা দক্ষিণেশ্বরে অন্য সময়ে ঠাকুরের চিকিৎসা করেছিলেন এবং ডাক্তার সরকারের শাঁখারীটোলার বাড়ীতে কোন এক সময়ে ঠাকুরের শুভাগমনও হয়েছিল।

শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে চিকিৎসার সময় বহুদিন ডাক্তার সরকার, সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুরের স্পন্দনহীনদেহ এবং তার লক্ষণাদি পরীক্ষা করে বিস্মিত হন।

ঠাকুরের মানসিক ও দৈহিক অপূর্ব অবস্থা—ডাক্তার সরকারের বিদ্যা, বুদ্ধি বা চিকিৎসা শাস্ত্রের অগম্য থাকায়, তাঁর সম্পর্কে ডাক্তার সরকারের একটি স্বাভাবিক কৌতূহল ছিল এবং এই কৌতূহলই ক্রমশঃ তাঁকে ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগী করে তুলেছিল। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বহুবার ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে তর্কে পরাভূত হয়ে, ডাক্তার সরকার বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অবশেষে ঠাকুরের চরণ ধূলি গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুরের মুখে গান শুনে তিনি ভাবাবিষ্ট হতেন এবং তাঁর সঙ্গলাভের জন্য সর্বদা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। বাইরের বহু কর্ত্তব্যকর্ম ভুলে তিনি ঠাকুরের কাছে তন্ময় হয়ে বসে থাকতেন এবং কিছুদিন ঠাকুরকে দেখতে না পেলে, তাঁর প্রাণের ভেতর ছটফট করত। ঠাকুরও ডাক্তার সরকারকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁকে কাছে পেলে খুব আনন্দ পেতেন। ঠাকুর তাঁকে "গম্ভীরাত্মা" বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং ভাবস্থ অবস্থায় ডাক্তার সরকারের কোলে নিজের চরণস্থাপন করে ঠাকুর তাঁকে কৃপা করেছিলেন। পরে তাঁকে ঠাকুর বলেছিলেন—"তুমি খুব শুদ্ধ! তা না হলে পা রাখতে পারিনা।" প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক, ডাক্তার সরকারের পুত্র অমৃত সরকারও ঠাকুরের কৃপালাভ করে ছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্তদের সঙ্গেও ডাক্তার সরকারের মধুর সম্পর্ক ছিল। দুঃখের বিষয়,—সাধ্যমত চেষ্টা করেও তিনি ঠাকুরের রোগ নিরাময় করতে অক্ষম হয়েছিলেন।

*

নাট্যাচার্য গিরীশ চন্দ্র ঘোষ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্তগণের মধ্যে প্রধান লীলা সহায়ক। তিনি একাধারে প্রখ্যাত অভিনেতা, নাট্যকার ও কবি ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী, উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ১৩নং বোসপাড়া লেনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, মাত্র ১৫ বছর বয়সে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে গিরীশচন্দ্র লেখাপড়া ত্যাগ করেন এবং বাড়ীতেই সাহিত্যচর্চা ও ইংরাজী বিদ্যাশেখা শুরু করেন। ক্রমে কুসঙ্গীদের সংস্পর্শে তিনি মদ্যপায়ী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠায়, তাঁর শ্বশুরের চেষ্টায় প্রথমে তিনি এক সওদাগরী অফিসে এবং পরে অন্যান্য অফিসে চাকরী করেন। এই সময় প্রথমে সখের এবং পরে পেশাদারী থিয়েটারে তিনি অভিনেতারূপে যোগ দেন ও নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতি রচনায় যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। প্রথম জীবনে গিরীশচন্দ্র সম্পূর্ণ নাস্তিক হলেও, ব্যক্তি-

গত জীবনে কয়েকটি আঘাত পাওয়ার পর, তাঁর মন বিক্ষিপ্ত হয়। দুটি ভ্রাতা, দুটি ভগ্নী, একটি পুত্র এবং অবশেষে স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায়, তিনি যন্ত্রণা লাঘরের জন্য বেশীমাত্রায় মদ্যপান ও কাব্যচর্চায় ডুবে থাকতেন। এরপর তিনি পুনরায় বিবাহ করেন এবং পূর্ণোদ্যমে থিয়েটারের কাজে যোগ দেন। এই সময় বঙ্গদেশে গিরীশচন্দ্র একাধারে প্রসিদ্ধ কবি, নাট্যকার ও প্রতিভাশালী অভিনেতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও, তখনো মদ্যপায়ী গিরীশচন্দ্রের ব্যক্তিগত চরিত্রে কোন পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু তারপরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে ও তাঁর কৃপালাভ করে, গিরীশচন্দ্রের জীবনে এমন আমূল পরিবর্তন হয় যে, তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে উপনীত হন। তাঁর রচিত "চৈতন্যলীলা", "প্রভাস-যজ্ঞ", "বুদ্ধদেব-চরিত", "প্রফুল্ল", "বলিদান", "সিরাজদ্দৌলা", "জনা", "তপোবল" প্রভৃতি বহু রচনা বাংলা সাহিত্যজগতে তাঁকে অমর করে রেখেছে।

গিরীশচন্দ্র বাগবাজারের বোসপাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত দীননাথ বসুর বাড়ীতে কৌতূহলবশে প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। এরপর তিনি ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে এবং নিজের থিয়েটার ঘরেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দু'-একবার দর্শন করলেও, তাঁর সম্পর্কে মনে কোন বিশেষ ছাপ পড়েনি। এমনকি, গিরীশচন্দ্রের বিখ্যাত "চৈতন্য-লীলা" নাটক দেখতে এসে ভক্তগণসহ অযাচিতভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে বিফল হন। পরে একদিন ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুরকে তিনি দর্শন করেন এবং স্বেচ্ছায় তাঁর পদধূলি গ্রহণ করেন। এর পরেই ঠাকুরের ভক্ত, কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের পরামর্শে গিরীশচন্দ্র স্বয়ং একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান এবং তাঁর পূত সঙ্গ লাভ করে মনে মনে তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেন। এই ঘটনার পর থেকেই তাঁর চরিত্রের মোড় ঘুরে যায় এবং তাঁর জীবনের সবকিছু ঠাকুরকে 'বকলমা' (সম্পূর্ণ ভার) দিয়ে তিনি ক্রমশঃ দেব-চরিত্রে রূপান্তরিত হন।

ঠাকুরকে নিয়ে গিরীশচন্দ্রের জীবনে এমন সব অলৌকিক, অপূর্ব ঘটনা ঘটেছে, যা ঠাকুরের আর কোন গৃহীসন্তানের জীবনে ঘটেনি। তাই গিরীশচন্দ্রকে বাদ দিয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে ভক্ত গিরীশচন্দ্রের জীবন অসম্পূর্ণ থাকে। ভক্তদের মধ্যে অদ্ভুত চরিত্রের গিরীশচন্দ্র ঠাকুরকে কখনো গালিগালাজ করেছেন, আবার পূজার বেদীতে বসিয়ে "অবতার"রূপে অন্তরের শ্রদ্ধাও নিবেদন করেছেন। ঠাকুরও তাঁকে এত স্নেহ করতেন যে, তাঁর সব অপরাধ ক্ষমা করে, তাঁরই জন্য ত্যাগী

সন্ন্যাসীদের মত গেরুয়া বস্ত্র নির্দিষ্ট করেছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গলাভের পর গিরীশচন্দ্র থিয়েটার ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ঠাকুর তাঁকে নিবৃত্ত করেন, উপরন্তু তাঁর প্রতিভা লক্ষ্য করে, লোকশিক্ষার জন্য থিয়েটারে জড়িয়ে থাকতে ঠাকুর তাঁকে নির্দেশ করেছিলেন। থিয়েটারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে ঠাকুর স্বয়ং তাঁর থিয়েটারও দেখতে যেতেন।

গিরীশচন্দ্র, ঠাকুরকে এত ভক্তি করতেন যে, ঠাকুর বলতেন, তাঁর ওপর গিরীশের "পাঁচ সিকে পাঁচ আনা" বিশ্বাস। ঠাকুর যখন কণ্ঠরোগে আক্রান্ত, তখন তাঁর গলা থেকে পুঁজ-রক্ত ঝরতে থাকায় গিরীশচন্দ্র বলতেন—"এবারে এই সব খেয়ে কীট-পিঁপড়ে অবধি উদ্ধার হয়ে যাবে, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে এই রোগ।" সারাজীবন অনেক রকম গর্হিত কাজ করার পরেও ঠাকুরের অযাচিত করুণা ও পরম আশ্রয় লাভ করে তিনি একদা ঠাকুরকে বলেছিলেন —"তুমি আসবে, আগে জানলে আরো বেশী পাপ করতাম্"—এমনি ছিল তাঁর ঠাকুর সম্পর্কে ধারণা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, ঠাকুরের গলরোগের বিশেষ কারণ সম্পর্কে একদা ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন—"গিরীশের পাপ নিয়ে এই ব্যাধি।" কাশীপুরে ঠাকুরের "কল্পতরু" হওয়ার দিনেও গিরীশচন্দ্র তাঁর বিশেষ কৃপালাভ করেছিলেন এবং সর্বসমক্ষে আন্তরিকভাবে ঠাকুরকে বন্দনা করেছিলেন। একবার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় গিরীশচন্দ্র, ঠাকুরকে তাঁর "পুত্র" হওয়ার জন্য জেদ ধরায়, ঠাকুর তাতে আপত্তি জানান এবং তিনিও ঠাকুরকে ক্রুদ্ধ ও মত্ত অবস্থায় অপমান করে বাড়ী ফিরে যান। কিন্তু তা সত্বেও প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে ক্ষমা করলে, গিরীশচন্দ্র ঠাকুরের আচরণে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং অত্যন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, গিরীশচন্দ্রের সত্যই একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করায় তার আচরণ দেখে গিরীশচন্দ্রের দৃঢ় ধারণা হয় যে, ঠাকুরকে পুত্ররূপে পাওয়ার প্রাণভরা কামনায়, ঠাকুরই তাঁর ঘরে এসেছেন এবং সেই দৃঢ় বিশ্বাসে তিনি পুত্রটিকে "শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানে" আদর ও সেবা করতেন। পুত্রটির আচরণও একটু অদ্ভুত ছিল্। তিন-চার বছর বয়স অবধি সে কারো সঙ্গে কথা বলেনি, "বোবা" অবস্থায় সে হাবভাবে সব জানাতো। একদা বরানগরের এক বাড়ীতে যখন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী অবস্থান করতেন, তখন গিরীশচন্দ্র একদিন সেই ছেলেটিকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই সময় ছেলেটি শ্রীশ্রীমাকে দেখে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করায়, ছেলেটিকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ঐটুকু ছেলে শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে

প'ড়ে নিজেই তাঁকে প্রণাম করে। এরপর সে গিরীশচন্দ্রকেও টেনে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে জোর করে নিয়ে এলে, গিরীশচন্দ্র মায়ের চরণের তলায় সাষ্টাঙ্গে পড়ে কাঁদতে থাকেন। কিন্তু এই ঘটনার কিছুদিন পরেই সেই ছেলেটির অকালে মৃত্যু হয়। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে ইতিপূর্বে লিভারের অসুখে ভুগে গিরীশচন্দ্রের এই ছেলেটি একবার মৃতপ্রায় হলে তাকে প্রাণহীন অবস্থায় কাপড় মুড়ি দিয়ে শুইয়ে রাখা হয় এবং গিরীশচন্দ্র নিতান্ত শোকার্ত অবস্থায় কাঁদতে থাকেন। ঠিক এই সময় স্বামী বিবেকানন্দ গিরীশচন্দ্রের বাড়ীতে প্রবেশ করেন এবং তাঁর এই দুঃখে খুব ব্যথিত হন। পরে স্বামীজী শায়িত শিশুর ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করার পর যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন শিশুটির পুনরায় প্রাণ ফিরে আসে এবং এরপর আরো এক বছর সে বেঁচে থাকে। এক বছর বাদে যখন শিশুটি পুনরায় গুরুতররূপে অসুস্থ হয়, তখন স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে গিরীশ-চন্দ্র শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) এবং নিরঞ্জন মহারাজকে (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) শিশুটির প্রাণে শক্তি সঞ্চারের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বামীজীর পক্ষে যা সম্ভব ছিল, তাঁদের পক্ষে তা সম্ভব নয় বলে তাঁরা অক্ষমতা প্রকাশ করলে, গিরীশচন্দ্র খুব মর্মাহত হন এবং সেবারই ছেলেটির মৃত্যু হয়।

"শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানে" লালিত এই ছেলেটির অকাল মৃত্যুতে শেষজীবনে গিরীশচন্দ্র প্রচণ্ড আঘাত পান। এই সময় গভীর শোক ভুলে থাকার জন্য, অভিনয়াদি ত্যাগ করে তিনি ভগবৎ প্রসঙ্গ নিয়ে দিন কাটাতে থাকেন। তাঁর মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য তাঁকে কামারপুকুর, জয়রামবাটী এবং অবশেষে কাশীতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুদিন কাশীতে থাকার পর তিনি পুনরায় কলকাতায় ফিরে এসে থিয়েটারে যোগদান করেন এবং শেষদিন অবধি অভিনয়ে নিযুক্ত থাকেন। পরবর্তী জীবনে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের একজন অত্যন্ত হিতৈষীরূপে পরিচিত হন এবং সবসময় সাধ্যমত অর্থ ও পরামর্শ দ্বারা মিশনকে রক্ষা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের সমুদয় ত্যাগী সন্তানদের সঙ্গে এবং ঠাকুরের অন্যান্য গৃহীসন্তানদের সঙ্গেও তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-ভৈরব শ্রীগিরীশচন্দ্র কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

*

কথামৃত-প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত পরম ভক্ত এবং গৃহীশিষ্য। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই কলকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে শিবনারায়ণ দাস লেনে পিতৃগৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরে ১৩/২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়ীটি কিনে তাঁর পিতা সেখানে উঠে আসেন এবং বর্তমানে সেটাই "কথামৃত-ভবন" নামে পরিচিত। কৃতী ছাত্র হিসাবে মহেন্দ্রনাথ হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান; এফ. এ. পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই তিনি এক সওদাগরী অফিসে প্রথম চাকরী গ্রহণ করেন এবং পরে শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ এবং বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ভগ্নী-সম্পর্কীয়া শ্রীমতী নিকুঞ্জ দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর মাতামহ ছিলেন হালিশহরের সুপ্রসিদ্ধ মাতৃসাধক শ্রীরামপ্রসাদ সেনের ভ্রাতার বংশধর।

মহেন্দ্রনাথ প্রথমে আচার্য কেশবচন্দ্রের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় জানতে পারেন; কিন্তু তখন ঠাকুরের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। একদা সাংসারিক অশান্তিতে তিনি গৃহত্যাগ করে বরানগরে তাঁর ভগ্নীপতি, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত কবিরাজ শ্রীঈশানচন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই সময়ে নিদারুণ মানসিক অশান্তির জন্য তিনি আত্মঘাতী হওয়ার উদ্দেশ্যে মনে মনে বাসনাও পোষণ করছিলেন। ঠিক এই মানসিক দুর্বলতার সময় একদিন কয়েকটি বাগানে বেড়াবার কালে তাঁর ভাগ্নে-সম্পর্কীয় সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির ও বাগানে বেড়াতে যান। এই প্রথম তিনি সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন এবং তদবধি তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। ঠাকুরও তাঁকে সস্নেহে আহ্বান জানান এবং মহেন্দ্রনাথও ক্রমাগত দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করেন। ঠাকুর তাঁকে মাসাধিককাল নিজের কাছে রেখে নানাবিধ শিক্ষা দেন এবং নানাবিধ গুহ্যসাধন প্রণালীতে ব্রতী করেন। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে মহেন্দ্রনাথের জীবন আধ্যাত্মিক ভাবধারায় ভরপুর হয় এবং ঠাকুরকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান-রূপে অন্তরে গ্রহণ করেন। একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে মহেন্দ্রনাথকে কাছে বসিয়ে নিজের দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা আপন জিহ্বা থেকে মুখামৃত নিয়ে তাঁর জিহ্বায় কিছু লিখে শক্তি সঞ্চার করেন। ফলে মহেন্দ্রনাথ প্রথমে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হন এবং পরে ইষ্টদর্শন করে দীর্ঘসময় সমাধিস্থ থাকেন।

ঠাকুরের নির্দেশানুসারে তিনি "গার্হস্থ-সন্ন্যাস" গ্রহণ করে, সংসারে বাস করেও সংসারের মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন; প্রকৃতপক্ষে মহেন্দ্রনাথের জীবন "শ্রীরামকৃষ্ণময়" ছিল। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের শ্যামপুকুরের মেট্রোপলিটন স্কুলের "হেডমাষ্টার" থাকাকালীন তাঁর প্রেরণায় সেই স্কুলের সুপরিচিত রাখাল, বাবুরাম, সুবোধ, পূর্ণ, পল্টু, তেজচন্দ্র, ক্ষীরোদ, নারায়ণ প্রভৃতি ছাত্রগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে যোগ দেওয়ায়, তিনি সবায়ের কাছে "মাষ্টার মশাই" নামে পরিচিত ছিলেন এবং ঠাকুরও তাঁকে "মাষ্টার" বলে সম্বোধন করতেন। স্কুলের ছাত্রদের ধরে ঠাকুরের কাছে তিনি নিয়ে যেতেন বলে অনেকে তাঁকে রসিকতা করে "ছেলেধরা মাষ্টার" বলত। ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় ভক্তদের মধ্যে মহেন্দ্রনাথই প্রথম, গুরুর জন্মস্থান কামারপুকুর দর্শন করতে গিয়েছিলেন এবং মহেন্দ্রনাথের কম্বুলিয়াটোলার ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ঠাকুরও শুভাগমন করেছিলেন।

পরম মেধাবী মহেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলেই ভক্ত-পরিবেষ্টিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশ এবং কথোপকথনগুলি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং দিন-লিপিসহ প্রতিদিন নিজের ডাইরীতে সেগুসি লিখে রাখতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি সেই লেখাগুলি প্রথমে ইংরাজীতে "গস্‌পেল অফ্ শ্রীরামকৃষ্ণ" নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার অত্যন্ত সমাদর হওয়ায়, ঠাকুরের অপর ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের অনুরোধে বাংলা ভাষায় পাচটি খণ্ডে তিনি বৃহৎ আকারে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" রচনা ও প্রকাশ করেন। এইটিই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ঠাকুর মহেন্দ্রনাথকে "ভাগবতের পণ্ডিত"রূপে চাপরাশ দিয়ে গৃহস্থাশ্রমে রেখে লোকশিক্ষার জন্য এই কাজে নির্দিষ্ট করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই "কথামৃত" প্রকাশিত না হলে, বহু ভক্ত ও ধর্মপিপাসু আজ ঠাকুরের প্রদত্ত এই অমৃতের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হতেন। তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাগবত-কথা প্রকাশের জন্যই তাঁকে "দ্বিতীয় ব্যাসদেব" বলা হয়। নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছার জন্য "কথামৃত" পুস্তকে তিনি নিজের নাম "শ্রীম" হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং মাঝে মাঝে কাল্পনিক নামের সাহায্যে সেখানে নিজের পরিচয় গোপন রেখেছেন। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী মহেন্দ্রনাথের "কথামৃত" শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ ও অন্যান্য গৃহীভক্তেরা একযোগে এই "কথামৃত"কে ঠাকুরের দিব্যজীবনের অমরবাণীরূপে আদরের সঙ্গে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং ভারতীয় ও বিদেশীয় অনেকগুলি ভাষায় এই পুস্তকের অনুবাদ হয়েছে। বলাবাহুল্য, "কথামৃত" প্রকাশের পর থেকে

সহস্র সহস্র ভক্ত আনন্দ উপলব্ধি করছে—কত শত লোক সংসারের শোকতাপে তাপিত হয়ে শান্তি লাভ করছে।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও বহুকাল অবধি মহেন্দ্রনাথ সপ্তাহে তিনদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে বাস করতেন এবং মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে মঠেও বাস করতেন। তিনি ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের পাশে থেকে সবরকমে তাঁদের সাহায্য করতেন এবং মঠের সাধুরাও তাঁকে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতেন। জয়রামবাটি ও কামারপুকুর ভ্রমণ ছাড়াও তিনি কাশী, পুরী, অযোধ্যা, মিহিজাম, হরিদ্বার ও হৃষীকেশে গিয়ে তপস্যা করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ সুন্দর গান গাইতেও পারতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিও মহেন্দ্রনাথ প্রথমাবধি অতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন এবং যথাসাধ্য তাঁর সেবা করেছিলেন। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে তাঁর পৈতৃক বাড়ীতে মাঝে মাঝে তিনি শ্রীশ্রীমাকে এনে রাখতেন। ঐ বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা নিজ হাতে ঘট-স্থাপনা ও ঠাকুরের ছবি প্রতিষ্ঠা করে পূজোর ব্যবস্থা করায় তদবধি মহেন্দ্রনাথের বাড়ী "ঠাকুর বাড়ী" নামে পরিচিত হয়। মহেন্দ্রনাথের বাড়ীর ঠাকুরঘরে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত চটি জুতা, জপের মালা, শ্রীশ্রীমায়ের সিঁদুরকৌটা ও পদচিহ্ন, ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের মস্তকের কেশ এবং শ্রীহস্ত ও শ্রীচরণের নখরাজি এখনও নিত্য পূজিত হয়; মহেন্দ্রনাথের নিজের ঘরে—যেখানে "কথামৃত" রচিত হয়েছিল সেখানে ঠাকুরের ব্যবহৃত জামা, জলের পাত্র, মোলেস্কিনের র‍্যাপার, ঠাকুর প্রদত্ত ছবি প্রভৃতি ভক্তদের দর্শনের জন্য যত্ন সহকারে রক্ষিত আছে। ঠাকুরের গৃহী সন্তানদের মধ্যে একমাত্র মহেন্দ্রনাথের নশ্বরদেহ কাশীপুর মহাশ্মশানে ঠাকুরের সমাধি মন্দিরের পাশেই আহুতি দেওয়া হয়।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন কলকাতায় নিজ বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিরদাস শ্রীমহেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন।

*

"বসুমতী"-প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত পরমভক্ত ও গৃহীশিষ্য। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলকাতার আহিরীটোলায় ৩১নং নিমু গোস্বামী লেনে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই মানুষ হন। তাঁর পিতৃগৃহ হুগলী জেলার বলাগড়ে। মাতুলের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় তিনি শ্যামবাজারের যদুপণ্ডিতের পাঠশালা বঙ্গ বিদ্যালয়ে "কথামালা" অবধি পড়ে লেখাপড়া ছেড়ে দেন এবং প্রথম জীবনে একটি ওষুধের দোকানে শিশি বোতল

ধোওয়ার চাকরী গ্রহণ করেন। পরে সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতার বটতলায় বৃন্দাবন বসাকের পুস্তকের দোকানে দোকান-ঘর ঝাঁট দেওয়া, বই সাজানো প্রভৃতি কাজের জন্য পাঁচ টাকা মাহিনার একটি চাকরী গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে ঐ দোকানটি বিক্রয় হবে জেনে, পঁচাত্তর টাকা ধার করে তিনি নিজেই সেটা ক্রয় করেন এবং চুটকী-বই ছাপিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করেন। অপরের প্রকাশিত পুস্তকও সেই সঙ্গে বিক্রয় করার ফলে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হয়। এই সময় প্রখ্যাত কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের যাবতীয় কাব্যগ্রন্থের বিক্রেতা হিসাবে তিনি সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ও কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গেও পরিচিত হন।

ঠাকুরের অপর ভক্ত অধরলাল সেনের কলকাতার বাড়ীতে উপেন্দ্রনাথ প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন এবং তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। এরপর থেকেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং এই সময় ঠাকুরের বিশেষ কৃপালাভ করেন। দরিদ্র উপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মামীমার কাছ থেকে গৃহদেবতা ⁄নারায়ণের প্রসাদ এনে ঠাকুরকে নিবেদন করলেও, তাঁর অন্তর দারিদ্র্যের জন্য ক্ষোভে পূর্ণ থাকত; কারণ ভক্তদের মত তিনি ঠাকুরকে বিশেষ কিছু দিতে পারতেন না। অন্তর্যামী ঠাকুর তাই তাঁর মানসিক দুঃখ দূর করার জন্য উপেন্দ্রনাথকে একবার দু'পয়সার জিলিপি আনতে আদেশ করেন এবং উপেন্দ্রনাথও তা পালন করেন। বলা আবশ্যক, পরবর্তীকালে ঠাকুরের কৃপায় উপেন্দ্রনাথ ধনবান হওয়া সত্ত্বেও নিজবাড়ীতে ঠাকুরের উৎসবে জিলিপি ভোগ দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে বিবাহে অনিচ্ছুক থাকলেও পরে ঠাকুরের অনুমতিক্রমে ঠাকুরেরই পরিচিতা শ্রীমতী ভবতারিণী দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। প্রচণ্ড দারিদ্র্যের জন্য তিনি একদিন অসঙ্কোচে ঠাকুরের কাছে অর্থ প্রার্থনা করায় ঠাকুর তা মঞ্জুর করেন। ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি একটা ছাপাখানা কিনে পুস্তক প্রকাশক হিসাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং "বসুমতী" নামক পত্রিকা প্রকাশ করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশানুসারে "বসুমতী"র শিরোনামায় "নমো নারায়ণায়" মন্ত্রটি নির্বাচিত হয়, যা আজিও "বসুমতী"র সম্পাদকীয় স্তম্ভের ওপর বহাল রাখা হয়েছে। জীবনের প্রতিষ্ঠা ও অর্থ উপার্জনের মূলে ঠাকুরের আশীর্বাদকে উপেন্দ্রনাথ সবসময় স্মরণ রাখেন এবং এই পত্রিকা-অফিসকে "বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরে" পরিণত করেন। ঠাকুর ও স্বামীজীর উপদেশ ও বাণী প্রচার তখন এই "বসুমতী" মারফৎই হত। পরবর্তীকালে "বসুমতী সাহিত্য-মন্দির"

ঠাকুরের ভক্ত ও অনুরাগীদের উপস্থিতিতে সত্যই মন্দিরের রূপ পরিগ্রহ করে। এমনকি "বসুমতী"র প্রতিষ্ঠাতা থেকে শুরু করে, নিম্নপর্যায়ের কর্মচারী অবধি সবাই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তরূপে পরিচিত ছিলেন।

আজীবন ঠাকুরের অনুগত ভক্ত উপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেহত্যাগের সংবাদে কাশীপুর শ্মশানে উন্মাদের মত যাওয়ার সময় এক বিষধর সর্প তাঁর পায়ে দংশন করে; কিন্তু শ্মশানের উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে ক্ষত স্থানটি পুড়িয়ে দিলে তিনি সে যাত্রায় রক্ষা পান। অবশ্য পোড়ার নীল দাগটি তাঁর পায়ে আজীবন ছিল।

উপেন্দ্রনাথ দানবীর মহাপুরুষরূপেও খ্যাত ছিলেন এবং সব সময় রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক যে, উপেন্দ্রনাথের সমগ্র পরিবারই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর ভক্তিমতী স্ত্রী শ্রীমতী ভবতারিণী দেবী শেষ জীবনে কাশীতে রামকৃষ্ণ-মিশনের সন্ন্যাসীগণের আনুকুল্যে ঠাকুরের সাধন-ভজনে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও ঠাকুরের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে একদা সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য প্রবল আগ্রহী হলে, রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষ তাঁকে অনেক বুঝিয়ে সেই বাসনা থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। উপেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ, তথা সতীশচন্দ্রের স্ত্রীও ঠাকুরের ভাবধারায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন; এই ভক্তিমতী মহিলা তাঁর পরলোকগত স্বামী ও শ্বশুরের স্মৃতিরক্ষার্থে রামকৃষ্ণ-মিশনকে তৎকালে কোম্পানীর কাগজ, নগদ ও জিনিসপত্র প্রভৃতি কয়েক লক্ষ টাকা দান করেন। এছাড়া তাঁদের খড়দহের সন্নিহিত রহড়া গ্রামের চারখানি বাগান-বাড়া সমেত বিরাট সম্পত্তি রামকৃষ্ণ-মিশনকে দান করা হয় এবং ঐ সম্পত্তিতে অনাথ বালকদের জন্য "শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন বালকাশ্রম" স্থাপিত হয়।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য শ্রীউপেন্দ্রনাথ কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

*

সাহিত্যিক মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত এবং প্রখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র-সম্পর্কীয়। প্রথম জীবনে তিনি পিতার কর্মস্থল ভাগলপুরে লেখাপড়া শুরু করেন; কিন্তু পাঠে ক্রমশঃ অমনোযোগী হওয়ায়, বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর বেশী হয়নি।

বিদ্যালয়ের ছুটীর সময় কলকাতায় এসে অন্যান্য সঙ্গীগণের সঙ্গে কয়েকবার আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষে মনীন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। কিন্তু অপরিণত বয়সের দরুন ঠাকুরের সম্পর্কে সে সময় তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। প্রায় তিন বছর পরে ভাগলপুর থেকে তিনি যখন স্থায়ীভাবে কলকাতায় ফিরে আসেন, তখন অসুস্থ ঠাকুরকে দেখবার জন্যে একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে তিনি শ্যামপুকুরে যান। ঠাকুর সেদিন মনীন্দ্রকে ভবিষ্যতে একাকী তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য নির্দেশ করলে, পরের দিনই মনীন্দ্র একা ঠাকুরের কাছে যান এবং ঠাকুর স্নেহভরে বালক মনীন্দ্রকে কোলে তুলে নিয়ে সমাধিস্থ হন। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলার সময় মনীন্দ্রের দেহে ভাবাবেশ উপস্থিত হয়েছিল এবং কয়েকটি অপ্রত্যাশিত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পর তিনি খুব কেঁদেছিলেন। এই ঘটনার পর থেকেই মনীন্দ্র ঘন ঘন শ্যামপুকুরে এসে অসুস্থ ঠাকুরের সেবায় ব্রতী হন এবং অল্পবয়সের দরুন ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলীর কাছে "খোকা" নামে অভিহিত হন। মনে মনে তিনি ঠাকুরকে গুরু এবং ইষ্টরূপে জানলেও, অসুস্থ ঠাকুরের কাছ থেকে তখনো তিনি দীক্ষালাভ করেননি। কিন্তু এই সময় ঠাকুরের অপর ভক্ত মহিমা চরণ চক্রবর্তী স্বপ্নে ঠাকুরের কাছে একটি "মন্ত্র" পান এবং সেই মন্ত্রে মনীন্দ্রকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য আদেশ পান। মহিমাচরণ সেই স্বপ্নের ঘটনা ও মন্ত্রটি ঠাকুরকে শোনালে, ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সমাধিস্থ হন; পরে ঠাকুরের আদেশে মহিমাচরণ সেই মহামন্ত্রেই মনীন্দ্রকে দীক্ষাদান করেন। মনীন্দ্র শ্রীশ্রীমায়েরও বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন।

পরবর্তীকালে, মনীন্দ্র বিবাহ করে সংসারী হন এবং সাহিত্যচর্চায় বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ-প্রভাকর" পত্রিকার সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানের ভারও তিনি গ্রহণ করেন; কিন্তু আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি না হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত দারিদ্র্যের সম্মুখীন হন এবং স্বামী বিবেকানন্দের আর্থিক সাহায্যের দরুন সেই শোচনীয় অবস্থা থেকে সেই সময় তিনি কিছুটা রেহাই পান।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত অনুরক্ত শ্রীমনীন্দ্রকৃষ্ণ কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

*

কবি অক্ষয়কুমার সেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য এবং বিশিষ্ট কবি। জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রাম। ঘন কৃষ্ণবর্ণ, রুগ্ন শরীর এবং কদাকার

আকৃতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ রহস্যপূর্বক তাঁকে "শাঁকচুন্নী" বলে ডাকতেন। প্রথম জীবনে অক্ষয়কুমার কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ছেলেদের পড়াতেন বলে তাঁকে সবাই "অক্ষয় মাষ্টার" বলে ডাকত। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং পরবর্তীকালে "বসুমতী"-পত্রিকার অফিসে চাকরী গ্রহণ করেন।

অক্ষয়কুমার, ঠাকুরের গৃহীভক্ত ও কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার সহ কাশীপুরে ঠাকুরের অপর ভক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাড়ীতে প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন এবং তাঁর চরণে প্রণতি জানিয়ে কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং বহুবার ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভ করেন। কাশীপুরে "কল্পতরু" হওয়ার দিনও অক্ষয়কুমার উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের চরণে দুটি চাঁপা ফুল নিবেদন করেছিলেন। "তোমাদের চৈতন্য হোক্" —এই আশীর্বাদ সকলকে করার পর ঠাকুর সেদিন অক্ষয়কুমারকে নিজের কাছে ডেকে তাঁর বক্ষ স্পর্শ করে, কানে "মহামন্ত্র" দান করেন। সেই অপ্রত্যাশিত স্পর্শের আবেগ সহ্য করতে না পারায় অক্ষয়কুমারের দেহ বেঁকে চুরে অদ্ভুত আকার ধারণ করে এবং তিনি কাঁদতে শুরু করেন; পরে অবশ্য তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার দিনেও তিনি কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত ছিলেন এবং সেদিন গভীর রাত্রে কলকাতায় গিয়ে ভক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও রামচন্দ্র দত্তকে তিনিই ডেকে এনেছিলেন।

পরবর্তীকালে কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের পরামর্শে, স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে এবং শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে অক্ষয়কুমার ঠাকুরের লীলা সম্বলিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি" পদ্যাকারে রচনা করেন এবং এইটিই তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি। আজীবন শ্রীরামকৃষ্ণ পূজারী অক্ষয়কুমার শেষ জীবনে বাঁকুড়ার নিজের গ্রামের বাড়ীতেই খুব নিষ্ঠার সঙ্গে ঠাকুরের পূজা নিয়ে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাঁকুড়ার স্বগ্রামে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত শ্রীঅক্ষয়কুমার দেহত্যাগ করেন।

*

কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত পরমভক্ত, গৃহীশিষ্য এবং বিশিষ্ট কবি। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পূর্ববঙ্গের যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার জগন্নাথপুর গ্রামে মজুমদার-উপাধিধারী বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারও প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।

পিতৃবিয়োগের পর দেবেন্দ্রনাথ কলকাতায় অধ্যয়নের জন্য আসেন; কিন্তু কিছুকাল পরেই লেখাপড়া ত্যাগ করে তিনি সাহিত্যচর্চা ও তার সঙ্গে যোগ-চর্চায় মন দিলেও, মাতার একান্ত জেদের ফলে তিনি বিবাহ করতে বাধ্য হন। প্রথম জীবন তাঁর অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হওয়ায়, তিনি কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী গ্রহণ করেন এবং অধিক পরিমাণে যোগচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনি এগারো বৎসর যাবৎ ৬৪ প্রকারের যোগাভ্যাস করেন এবং এই সময় তাঁর বহু দেবদেবী ও অপরূপ দর্শনাদি হয়। পরবর্তীকালে মধ্য কলকাতার এণ্টালী অঞ্চলে আর এক জমিদারী সেরেস্তায় কাজ নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ সপরিবারে সেখানে বাস করতে থাকেন। তিনি ভালো সেতার বাজাতেও পারতেন।

একদা গুরুপ্রাপ্তির জন্য যখন দেবেন্দ্রনাথের মন খুব ব্যাকুল হয়, সেই সময় একখানি পুস্তকে "পরমহংস রামকৃষ্ণ" কথা দুটি প'ড়ে তিনি এক মহা আকর্ষণে তৎক্ষণাৎ একাকী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন এবং তাঁর দেব দুর্লভ আচরণে মুগ্ধ হন। কিন্তু সেইদিনই তিনি আকস্মিক অসুস্থতা নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং প্রবল জ্বরে বহুদিন শয্যাগত থাকেন; তবু সেই অবস্থাতেই তিনি রোগযন্ত্রণার মধ্যেও, শিয়রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতেন। সুস্থ হবার পর তিনি বাগবাজারে ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে পুনরায় ঠাকুরকে দর্শন করতে যান এবং এরপর থেকেই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। এই সময় ঠাকুরের কাছে দীক্ষালাভের জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করে বিফল হলেও, যখন-তখন ঠাকুরের দর্শন পেতে থাকেন। মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তিনি ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত হন এবং কামিনী-কাঞ্চন সম্পর্কেও ঠাকুরকে গোপনে পরীক্ষা করে তিনি নিশ্চিন্ত হন। এমনকি নিজগৃহে ঠাকুরকে এনে এই সময় তিনি তাঁকে আতিথ্যে পরিতুষ্টও করেন। এর কিছুদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর নিজেই দেবেন্দ্রনাথের জিহ্বায় আঙুল দিয়ে কিছু লিখে শক্তি সঞ্চার করেন; কিন্তু পরে দেবেন্দ্রনাথ "সন্ন্যাস" গ্রহণের জন্য ঠাকুরের চরণতলে পড়ে প্রার্থনা জানালেও, ঠাকুর তাঁকে অনুমতি দেননি।

পরবর্তীকালে, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়" প্রতিষ্ঠা করে দেবেন্দ্রনাথ সেখানে তাঁর স্বরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভজন কীর্তনাদি পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন এবং সেই গানগুলিই "দেব গীতি" নামক পুস্তক মারফৎ পরে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে মধ্য কলকাতায় এণ্টালী অঞ্চলে ৩৯ নং দেব লেনে উক্ত অর্চনালয়ে প্রতিবৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ-মহোৎসব পালিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী

শিবানন্দ, নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষ, কথামৃত প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ এই অর্চনালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

*

ঔপন্যাসিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য জগতের প্রখ্যাত হাস্যরসিক ও ঔপন্যাসিক। জীবদ্দশা ১৮৬৩ থেকে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণেশ্বর। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার আগেই তাঁর চাকরী জীবন শুরু হয় এবং চাকরীর খাতিরেই তাঁকে কিছুকাল চীনদেশেও কাটাতে হয়। তাঁর বড়দাদার সাহচর্যে প্রথম থেকেই তাঁর সাহিত্যে ও রচনায় অনুরাগ জন্মায়। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্যের সংগঠনে এবং "উত্তরা" মাসিক পত্রিকার সঙ্গে তিনি বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। চাকরী শেষ হবার আগেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং শেষ জীবন কাশীতে ও পূর্ণিয়ায় কাটান। তিনি বহু উপন্যাস রচনা করেন; তাঁর রচিত "কোষ্ঠীর ফলাফল", "আই হ্যাজ্" প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বিশেষ বিখ্যাত।

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন প্রথম জীবনে কেদারনাথ সর্বপ্রথম স্বামী বিবেকানন্দের (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ) সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর অনুরাগীরূপে পরিণত হন। পরবর্তী জীবনেও কাশী বা পূর্ণিয়ায় বসবাস কালে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলে বিমল আনন্দলাভ করতেন এবং কোন ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে ঠাকুরের বিষয়েই আলোচনা করে কৃতার্থ হতেন। ঠাকুরের বিষয়ে তাঁর রচিত লেখা দ্বারা তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন।

*

রসরাজ অমৃতলাল বসু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ ধন্য প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী। জীবদ্দশা ১৮৫৩ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ। জন্মস্থান কলকাতা। প্রথম জীবনে এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষার পর অমৃতলাল কিছুদিন ডাক্তারী পড়েন। পরে শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলে শিক্ষকতা, পুলিশের চাকরী গ্রহণ, স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান প্রভৃতি সত্ত্বেও বরাবরই তিনি রঙ্গমঞ্চেই জীবন অতিবাহিত করেন এবং ন্যাশানাল, গ্রেট ন্যাশানাল, বেঙ্গল, ষ্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটারগুলির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত

থাকেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি হয়েছিলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "জগত্তারিণী" স্বর্ণপদক দান করেছিলেন। তিনি বহু নাটক ও প্রহসন রচনা করেন; তাঁর রচিত "হরিশ্চন্দ্র", "তরুবালা", "বিবাহবিভ্রাট", "অবতার", "খাসদখল", "রাজাবাহাদুর" প্রভৃতি নাটক ও প্রহসনগুলি তৎকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রধানতঃ রসরচনার জন্য তিনি "রসরাজ" নামে অভিহিত হন। নাট্যজীবনে তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী; পরবর্তীকালে তিনি নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্রকে গুরুরূপে বরণ করেন এবং গিরীশচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রথমে অভিনেতা ও পরে নাট্যকাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

গিরীশচন্দ্রই প্রথম অমৃতলালকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে যান এবং ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভ করে অমৃতলাল ধন্য হন। ঠাকুর যেদিন গিরীশচন্দ্রের থিয়েটারে "চৈতন্যলীলা" নাটক দেখতে যান, সেদিন অমৃতলাল সেই নাটকে "প্রতিবেশী"র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন; কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে তিনি সেদিন সাক্ষাৎ করেননি। পরে অবশ্য গিরীশচন্দ্রের সহায়তায় তিনি বহুবার ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন; এমনকি একদা ঠাকুরের শ্রীমুখের অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন। প্রথম জীবন তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে কাটলেও পরবর্তীকালে ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি ঠাকুরের চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

শেষজীবনে অমৃতলাল "শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা" নামক ব্রতকথা রচনার দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বিশেষ শরণাগতি প্রকাশ করেন।

*

দানবীর শম্ভুচরণ মল্লিক

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত কর্মযোগী গৃহীভক্ত। তিনি কলকাতার চিৎপুরে সিঁদুরিয়াপটি পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। এক বিদেশী সওদাগরী অফিসে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং "দানবীর" রূপে সমাজ কল্যাণের জন্য অকাতরে অর্থদান করেন।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পাশেই শম্ভুচরণের একটি বাগান-বাড়ী থাকায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়েছিল। ঠাকুর যেমন তাঁর বাগানে প্রায়ই যেতেন, শম্ভুচরণও তেমন ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে এসে মিলিত হতেন। প্রথমদিকে শম্ভুচরণ ব্রাহ্মসমাজ ও আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকলেও পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের ফলে

তিনি মহামূল্য অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন এবং এরপর থেকেই ঠাকুরের কৃপালাভ করে তিনি তাঁকে "গুরুজী" বলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্বোধন করতেন। শম্ভুচরণের দক্ষিণেশ্বরের বাগান-বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক লীলাবিলাস হয় এবং ভাগ্যবান শম্ভুচরণের কাছ থেকে "বাইবেল" ও যীশুর পবিত্র জীবনকথা শুনে ঠাকুর খৃষ্টধর্ম সাধনায় ব্রতী হন। শম্ভুচরণ ও তাঁর স্ত্রী—উভয়েই ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং প্রতি জয়-মঙ্গলবারে শ্রীশ্রীমাকে নিজেদের বাড়ীতে এনে, সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে ষোড়শোপচারে তাঁর শ্রীচরণ পূজা করতেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর ছোট নহবত ঘরে শ্রীশ্রীমায়ের বসবাসের কষ্ট দেখে, ভক্ত শম্ভুচরণ কালীবাড়ীর বাগানের পাশেই একখণ্ড জমি কিনেছিলেন এবং ঠাকুরের অপর ভক্ত, নেপালের উচ্চ-রাজকর্মচারী কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সহায়তায় শ্রীশ্রীমায়ের বসবাসের জন্য সেখানে একটি ঘর তৈরী করে দানপত্র লিখে দিয়েছিলেন। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য সরবরাহের ভার তিনি গ্রহণ করায়, ঠাকুর শম্ভুচরণকে তাঁর "দ্বিতীয় রসদ্দার" রূপে গণ্য করতেন। চার বৎসর একনিষ্ঠভাবে ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করার পর, শম্ভুচরণ মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলে, তাঁর "গুরুজী" প্রেমময় শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের প্রিয়ভক্ত শ্রীশম্ভুচরণ কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

*

দানবীর মণিলাল মল্লিক

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগী, ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ভক্ত। তিনি কলকাতার চিৎপুরে সিঁদুরিয়াপটি পল্লীতে বাস করতেন। ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং "দানবীর" রূপে বিভিন্ন সৎকাজে তিনি বহু অর্থ দান করেন। দরিদ্র ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্য তৎকালে তিনি এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা বন্দোবস্ত করেছিলেন।

ব্রাহ্মনেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের মাধ্যমে মণিলাল দক্ষিণেশ্বরে সরাসরি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁর স্নেহলাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। বরানগরেও মণিলালের একটি বাগান ছিল এবং সেখানে এলেই তিনি ঠাকুরকে দর্শন করতে প্রতিবার দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। কাশীতেও মণিলালের ব্যবসা উপলক্ষে একটি কুঠি ছিল। সেজন্য কাশীতে ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের সঙ্গলাভ করা সত্ত্বেও তিনি ঠাকুর শ্রীরাম-

কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ভক্ত প্রবর মণিলাল তাঁর বাড়ীতে উৎসবাদিতে ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মণিলালের বাড়ীতে ঠাকুর ভাবাবেশে নৃত্য করেছিলেন এবং সমাধিস্থও হয়েছিলেন। ভক্ত মণিলালকে ঠাকুর বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন এবং মণিলালও ঠাকুরকে গুরুরূপে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন।

*

বিত্তবান্ যদুলাল মল্লিক

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত এবং কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার প্রখ্যাত ধনী। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর দক্ষিণ পাশেই তাঁর একটি বাগান বাড়ী ছিল এবং সেই উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়েছিল। ঠাকুর যদুলালকে অত্যন্ত স্নেহ করায়, যদুলাল তাঁর পরমভক্তে পরিণত হন এবং ঠাকুরকে তাঁর নিজের বাগানে বেড়াবার বিশেষ বন্দোবস্ত করে দেন। তাঁর বাগানের প্রধান কর্মচারীর ওপর তাঁর আদেশ ছিল যে, ঠাকুর যখনই তাঁর বাগানে বেড়াতে আসবেন, তখনই সেখানকার গঙ্গার ধারের বৈঠকখানা-ঘর ঠাকুরের বসার জন্য খুলে দিতে হবে। বলা বাহুল্য, যদুলালের আগ্রহে ঠাকুর প্রায়ই সেখানে বেড়াতে যেতেন।

ঠাকুরকে যদুলাল এমন আপনভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে তাঁর নিজের বাগানে তিনি বেড়াতে গেলেই, কর্মচারী মারফৎ পার্শ্ববর্তী রানী রাসমণির বাগানের মন্দির থেকে ঠাকুরকে নিজের বাগানে আসার জন্য আহ্বান জানাতেন এবং ঠাকুরও ভক্ত যদুলালের সেই আহ্বানে তাঁর বাগানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন। গৌর-ভক্ত যদুলাল, ঠাকুরের কাছে গৌরাঙ্গের গান শুনতে চাইলে, ঠাকুর তাঁকে গৌরনাম ও গান শুনিয়ে তাঁর প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করতেন। ভক্ত যদুলাল এই সময় মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে কাঁদতেন এবং তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করতেন। একদা ঠাকুরের কাছে তিনি "পার হওয়ার" জন্য প্রার্থনা করায় ঠাকুরের কৃপালাভ করেন এবং তাঁর কলকাতার বাড়ীতেও ঠাকুরকে নিয়ে যান। যদুলাল এবং তাঁর মা, মাসী প্রভৃতি অনেকেই যেমন ঠাকুরের কৃপালাভে কৃতার্থ হয়েছিলেন, তেমন তাঁর বাগানের কর্মচারী, দারোয়ান প্রভৃতিও ঠাকুরের বিশেষ স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিলেন। একদা যদুলালের বাড়ীতে গৃহদেবী সিংহবাহিনীর পূজা দেখতে গিয়ে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন, পরে সেখানে তিনি কয়েকখানি গান করেছিলেন এবং পূজার প্রসাদও গ্রহণ করেছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একদা যদুলালের দক্ষিণেশ্বরের বাগানের বৈঠকখানায় বসে সেখানকার দেওয়ালে টাঙানো একখানি যীশুখ্রীষ্টের ছবি দর্শন করে ঠাকুর তন্ময় হয়ে যান। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ঐ ছবি যেন জীবন্ত জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে এবং সেখানকার জ্যোতিরশ্মি তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে জন্মগত হিন্দু সংস্কারগুলিকে লয় করে দেয়। এরপর পরিপূর্ণ খ্রীষ্টীয়ভাবে তিনদিন থাকার পর, ঠাকুর পঞ্চবটীতলায় যীশুকে দর্শন করেন এবং তাঁর শরীরে যীশুর প্রবেশ প্রত্যক্ষ করে সমাধিস্থ হন। এই ঘটনা ছাড়াও, যদুলালের ঐ বৈঠকখানা ঘরে একদা ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ) সমাধি অবস্থায় পরম শক্তিতে স্পর্শ করেন এবং নরেন্দ্রনাথের বাহ্যসংজ্ঞা লোপ পায়। সে সময় ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথকে নানা প্রশ্ন করে সেগুলির যথাযথ উত্তর গ্রহণ করেন; পরে নরেন্দ্রনাথের চৈতন্য ফিরে এলে তিনি দেখেন যে, ঠাকুর তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে মৃদুমন্দ হাস্য করছেন। বলাবাহুল্য, ঠাকুরের উপরোক্ত দুটি বিশেষ লীলার স্থান ছিল যদুলালের এই বৈঠকখানা এবং সেজন্য সত্যই যদুলালের বাগান-বাড়ী ধন্য হয়।

*

কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত নেপালী ভক্ত ও গৃহীশিষ্য। তিনি নেপালের রাজার উকিল ছিলেন। রাজার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি কলকাতায় বাস করতেন এবং ঠাকুরের সান্নিধ্যে আগত পরম অনুরাগী এই ভক্তকে ঠাকুর "কাপ্তেন" বলে ডাকতেন। প্রথম জীবনে কাপ্তেন হাওড়া জেলার লিলুয়া ঘুষুড়ীতে নেপালীদের একটি শালকাঠের কারখানায় গোমস্তা-কর্মচারীর চাকরী নিয়ে নেপাল থেকে এসেছিলেন। এই সময় তিনি একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, একব্যক্তি বিষ্ঠার মাঝখানে বসে তাঁকে তত্ত্বজ্ঞান দেবার জন্য ডাকছেন। স্বপ্নভঙ্গের পর তাঁর মনে এই সম্পর্কে নানা তর্ক জাগে—বিষ্ঠার মাঝখানে বসে কোন ব্যক্তির পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান দেওয়া সম্ভব কিনা! এর কিছুদিন পরে হঠাৎ তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন এবং স্বপ্নে দেখা সেই ব্যক্তির মত ঠাকুরকে চিনতে পারেন। দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে কাপ্তেন তখন ঠাকুরের কাছে যেতেই, তিনি কাপ্তেনের সঙ্গে পূর্ব-পরিচিতের মতন ব্যবহার করেন এবং নানা প্রকার আলাপ করেন।

এই ঘটনার পর থেকেই কাপ্তেন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং ঠাকুরের মহাআকর্ষণে তাঁর চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করে ঠাকুরের একান্ত অনুগত

ভক্তরূপে পরিণত হন। এই সময় কাপ্তেনের আগ্রহে তাঁর কর্মস্থল সিলুয়ার কাঠের কারখানাতেও একদা ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁর কর্মস্থলে একটি গোলমাল হয় এবং কারখানার তথাকথিত তহবিল তছরূপের দায়ে তাঁর নামে নালিশ হওয়ায়, কাপ্তেনকে নেপালরাজার দরবারে ডেকে পাঠানো হয়। নির্দোষ কাপ্তেন এই সংবাদে বিহ্বল হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন এবং তাঁর চরণে পড়ে কাঁদতে থাকেন। করুণাময় ঠাকুর কাপ্তেনকে আশীর্বাদ করে বলেন—"৺কালীর ইচ্ছায় আবার তুমি ফিরে আসবে"। বলা বাহুল্য, কাপ্তেনের হিসাব-পত্র দেখে নেপালরাজ তাঁর প্রতি এত সন্তুষ্ট হন যে, কাপ্তেনকে নেপালরাজের প্রতিনিধির উচ্চপদ দিয়ে কলকাতায় পুনরায় প্রেরণ করেন। এই ঘটনার পর থেকেই ঠাকুরের ওপর কাপ্তেনের শ্রদ্ধা ও ভক্তি শতগুণ বৃদ্ধি পায় এবং ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে তিনি ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কাপ্তেন সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও ভগবৎ প্রেমিক ছিলেন। তাঁর পিতা ইংরাজ ফৌজের সুবেদার ছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে একহাতে বন্দুক নিয়ে অপর হাতে শিবপূজা করতেন। নিজ মায়ের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ছিল। মাকে আসনের ওপর বসিয়ে, নীচে মায়ের কাছে বসতেন। মাকে মাঝে মাঝে কাশীতে পাঠাতেন এবং সেখানে মার সেবার জন্য বারো-তের জনের খরচা বহন করতেন। কাপ্তেনের বেদ, বেদান্ত, গীতা প্রভৃতি মুখস্থ ছিল এবং তিনি অতি সুন্দর স্তবপাঠ করতেন। বাড়ীর পূজাও তিনি এত নিষ্ঠার সঙ্গে করতেন যে, তা দেখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও মুগ্ধ হতেন।

আজীবন ঠাকুরের প্রতি ভক্তিমান কাপ্তেন ও তাঁর স্ত্রী বহুবার ঠাকুরকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়ন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং নানাবিধ উপাদেয় আহার্যবস্তু ভোজন করিয়ে নিজেরা কৃতার্থ হয়েছেন। ঠাকুরের প্রতি অসীম ভক্তির পরাকাষ্ঠা হিসাবে—ঠাকুর রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে, কাপ্তেন তাঁর মাথায় ছাতা ধরতেন, বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বাতাস করতেন এবং পদসেবা করতেন। একদা কাপ্তেনের বাড়ীতে পাইখানা ঘরে ঠাকুর "ভাবেতে" বেহুঁস হয়ে গেলে, কাপ্তেন নিজে পরম আচারী ব্রাহ্মণ হয়েও বিনাদ্বিধায় পাইখানা ঘরে ঢুকে ঠাকুরকে সেবা ও যত্ন করেছিলেন। পূর্বে কাপ্তেনের হঠযোগের অভ্যাস থাকায়, ঠাকুরের ভাবাবস্থায় তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। কাপ্তেনের সঙ্গে প্রায়ই ঠাকুরের ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হত এবং ঠাকুর তাঁকে নিজ অন্তরঙ্গের মতন স্নেহ করতেন। পরম অনুগত কাপ্তেনকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর অনেক ভক্তের বাড়ীতে যাওয়ায়, কাপ্তেন

ঠাকুরের নানাবিধ লীলার সাক্ষী হন। ঠাকুরের অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গেও কাপ্তেনের মধুর সম্পর্ক ছিল এবং শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিও তিনি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের বসবাসের জন্য দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পাশেই একখণ্ড জমিতে একটি ঘর তৈয়ারীর সময় ঠাকুরের অপর ভক্ত শম্ভুচরণ মল্লিককে তিনি সাধ্যমত সাহায্য করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় ভক্ত কাপ্তেনের একটি বিশেষ স্থান ছিল।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কাশীপুরে ঠাকুর যেদিন মহাপ্রয়াণ করেন, সেদিন তাঁর ভক্তেরা প্রথমাবস্থায় তাঁর "সমাধিস্থ অবস্থা" মনে করে ঠাকুরকে মহাসমাধি থেকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। ঠাকুরের দেহে তখনো তাপ বিদ্যমান থাকায়, যোগশাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী ঠাকুরের দেহে ঘৃত মালিশ করার জন্য কাপ্তেন উপদেশ দেন। কারণ, যোগশাস্ত্রে বিধি আছে যে, সমাধিস্থ যোগীর গ্রীবা, বক্ষ ও পাদমূলে যদি কোন ব্রাহ্মণ গব্যঘৃত মালিশ করেন, তা হলে সমাধি ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে। কাপ্তেনের নির্দেশ অনুযায়ী ঠাকুরের তিনজন ব্রাহ্মণ শিষ্য—শশীভূষণ চক্রবর্তী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) গ্রীবায়, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ) বক্ষে এবং বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল পাদমূলে ঘৃত মালিশ করতে থাকেন। তিনঘণ্টারও বেশী সময় মালিশ করার পরও ঠাকুরের মহাসমাধি ভঙ্গ না হওয়ায়, তাঁরা সকল আশা ত্যাগ করেছিলেন।

*

মহাপুরুষ মহেন্দ্রনাথ দত্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত একনিষ্ঠ ভক্ত, মহাতপস্বী, মহাপুরুষ এবং স্বামী বিবেকানন্দের অবিবাহিত মধ্যম কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা। জন্মস্থান কলকাতা। জীবদ্দশা ১৮৬৯ থেকে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। আইনবিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য তিনি প্রথমে ইংলণ্ডে যান, কিন্তু সেখানে তৎকালে অবস্থানকারী অগ্রজ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছানুসারে তিনি আইনবিদ্যা শিক্ষা বন্ধ করেন এবং তৎপরে জ্ঞানপিপাসা তৃপ্তির জন্য লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে প্রায় দেড় বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। পরে অর্থাভাবে তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করেন এবং স্বদেশে ফেরার পথে পর্যটকরূপে তিনি উত্তর-আফ্রিকা, দক্ষিণপূর্ব-ইউরোপ, দক্ষিণ-রাশিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করেন ও অবশেষে ভারতে ফিরে কাশ্মীরে প্রবেশ করেন। এই সুদীর্ঘকাল তিনি বাড়ীতে কোন পত্রাদি না দেওয়ায়, সবাই খুব চিন্তিত ছিলেন। অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগ হওয়ায় তিনি কলকাতার বাড়ীতে ফিরে আসেন। তিনি একজন সুগায়কও ছিলেন।

প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতকালে মহেন্দ্রনাথ কয়েকবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন। ঠাকুরের অপরভক্ত রামচন্দ্রের বাড়ীতে তিনি ঠাকুরকে ভক্তদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতে দেখে, তা উপভোগ করতেন। ঠাকুরের কথামৃত পানে, সঙ্গীত শ্রবণে এবং সর্বোপরি ঠাকুরের সরল ব্যবহার ও সমাধি দেখে মহেন্দ্রনাথ যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হতেন। ভক্ত রামচন্দ্রের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন হলেই, এক প্রবল আকর্ষণে মহেন্দ্রনাথ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং তাঁর পূত সঙ্গ লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। একদা রামচন্দ্রের বাড়ীতে ঠাকুর যখন একাকী ছাদের ওপর পাইচারী করছিলেন, তখন অগ্রজ নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথকে ডেকে ঠাকুরের কাছে ছাদে নিয়ে গিয়ে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন এবং সেইদিনই প্রথম ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে মহেন্দ্রনাথ প্রণাম করেন। ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আশীর্বাদ করেন এবং পরম স্নেহভরে তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলেন। এইদিন থেকেই ঠাকুরের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয় এবং তিনি ঠাকুরকে গুরুরূপে অন্তরে বরণ করেন। ঠাকুরের পবিত্র সংস্পর্শে এসে অলক্ষ্যে মহেন্দ্রনাথের ধর্মভাব পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তিনি বহুভাবে ঠাকুরেরই কৃপালাভ করেন।

ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত মহেন্দ্রনাথ জীবনের শেষদিন অবধি ঠাকুরের ভাব-ধারায় নিজেকে ভরপুর রেখেছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই মহেন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করতেন এবং তাঁর দেহ থেকে একটি আভা প্রকাশিত হতে দেখতেন। এমনকি, ঠাকুরের মধ্যে এমন এক আকর্ষণী শক্তির পরিচয় তিনি দেখেছিলেন, যার ফলে যে কোন ব্যক্তি ঠাকুরের কাছে এসে তাঁর নিজের অন্তরের লোক হয়ে যেত। ঠাকুরের এই সকল শক্তি, দেহের আভা, আচরণ প্রণালী, সমাধিস্থ অবস্থা প্রভৃতি নিয়ে মহেন্দ্রনাথ "শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান" নামক যে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং দার্শনিক তত্ত্বের ওপর তা প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ক এবং অন্যান্য বহু ধর্মমূলক গ্রন্থ ও কয়েকখানি জীবনী পুস্তকও তিনি রচনা করেছেন। উদাসী পরিব্রাজক, বহু শাস্ত্রবিদ্ ও বহুদর্শী মহাপুরুষ হিসাবে তিনি গৃহে বাস করলেও, ঋষির ন্যায় জীবনযাপন করেছেন। মহাতপস্বী এবং অন্তর্সন্ন্যাসী মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে বেলুড় মঠের সাধুদের অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। মহেন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদা বলেছিলেন—"মহিন্ (ডাক নাম) আমার সাদা কাপড়ে সন্ন্যাসীরও বাড়া।" সম্পূর্ণ রামকৃষ্ণময়-অবস্থায় মহেন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

পরিব্রাজক স্বামী কৃষ্ণানন্দ

প্রখ্যাত বাগ্মী, দেশপ্রেমিক, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, ধর্মপ্রচারক ও ভারত পর্যটক পুরুষসিংহ। প্রকৃত নাম শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। ১৮৪৯/৫০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ায় বৈদ্যবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ বছর বয়স অবধি অধ্যয়নের পর অর্থাভাবের দরুন বাধ্য হয়ে লেখাপড়া ত্যাগ করে তিনি বিহারের জামালপুরে রেলওয়ে অফিসে প্রথম জীবনে চাকরী গ্রহণ করেন। এই সময় মুঙ্গেরে জনৈক পরিব্রাজক সাধুর কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং "আর্যধর্ম-প্রচারিণী" সভা প্রতিষ্ঠার দ্বারা হিন্দুধর্মকে রক্ষার কাজে ব্রতী হন। "ধর্ম প্রচারক" নামে একটি মাসিক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন এবং বহুবিধ রচনা ও প্রবন্ধের দ্বারা স্বদেশবাসীকে সনাতনধর্মে উদ্বুদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে "সন্ন্যাস" গ্রহণের পর তিনি "স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ" নামে অভিহিত হন এবং মণিপুর থেকে পাঞ্জাব অবধি সমগ্র আর্য্যাবর্ত পরিভ্রমণ ও বক্তৃতার দ্বারা এই পুরুষসিংহ ও বাগবিন্যাস বিশারদ, সকলের অন্তর জয় করেন। প্রায় ৫২/৫৩ বছর বয়সে কাশীধামে তাঁর দেহরক্ষা হলে, মণিকর্ণিকায় ভাগীরথীতে তাঁর দেহ সলিল-সমাধি করা হয়।

পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামী কৃষ্ণানন্দ বঙ্গদেশে এলে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনএবং তাঁর উদার ও সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হন। ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে তিনি তাঁর সমুদয় ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করেন এবং পরে তাঁর "ধর্ম প্রচারক" পত্রিকায় লেখেন—"ইনি গৈরীক কৌপীনধারী নহেন, ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত নহে, তথাচ ইঁহাকে কেন লোকে পরমহংস বলিয়া বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্যে পরমহংস। আশ্চর্য ইঁহার ভাব, আশ্চর্য ইঁহার প্রকৃতি ; যদি কেহ তাঁহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়া যায়। শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে রক্ত চলাচল শক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তাঁহার কর্ণে ঘন ঘন প্রণবধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতনা লাভ হইয়া থাকে। তাঁর কথাগুলি এত সরল, এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী যে তৎশ্রবণে পাষাণ হৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে।...তাঁহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে, তাঁহাকে কেহই কখনও শত্রু বলিয়া ভাবিতে অবকাশ পায় না ; বস্তুতঃ তিনি অজাত শত্রু। তাঁহার নিকট কিয়ৎক্ষণ বসিলে, কথায় কথায় এত উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায় যে বহুদিন শাস্ত্রাধ্যায়ন করিয়াও তত্তাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবন একখানি জীবন্ত গ্রন্থবিশেষ, কল্যাণপ্রার্থী মাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী। তাঁহার সংস্রব ও তাঁহার উপদেশগুণে অবিশ্বাসী নাস্তিকের চিত্তও বিগলিত হইয়াছে।"

তৃতীয় স্তবক

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়

যুগাবতার ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পরম-ভাগ্যবান পিতা। হুগলী জেলার "দেরে" গ্রামে তাঁর আদি বাসভূমি। বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁর পত্নী বিয়োগ হওয়ায়, তিনি পুনরায় সরাটি-মায়াপুর গ্রামের শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবীকে বিবাহ করেন এবং এই চন্দ্রমণির গর্ভেই তিন পুত্র—যথা রামকুমার, রামেশ্বর ও গদাধর (শ্রীরামকৃষ্ণ) এবং দুই কন্যা—যথা কাত্যায়নী ও সর্বমঙ্গলা জন্মগ্রহণ করেন। যাজন-কার্যে নিযুক্ত ক্ষুদিরাম দরিদ্র হলেও সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী ও উন্নত চরিত্রের ব্রাহ্মণ ছিলেন। গ্রামের প্রজাপীড়ক জমিদার রামানন্দ রায় একটি মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ক্ষুদিরামকে পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও, ক্ষুদিরাম মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন এবং তার ফলে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধেই এক মিথ্যা মামলা রুজু করে জমিদার তাঁকে সর্বস্বান্ত করেন। গৃহদেবতা-রঘুবীরকে বুকে নিয়ে ক্ষুদিরাম স্বীয় "দেরে" গ্রাম ত্যাগ করে বিশ মাইল দূরে কামারপুকুর গ্রামে চলে আসেন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু সুখলাল গোস্বামীর দেওয়া কয়েকখানি চালাঘর ও লক্ষ্মীজাল নামক এক বিঘা দশ ছটাক ধানের জমি অবলম্বন করে তিনি নতুনভাবে সংসার যাত্রা শুরু করেন। একদা ক্ষুদিরাম ৺গয়াধামে গমন করে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে শ্রীগদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করার পর, গভীর রাত্রে স্বপ্নে তিনি জ্যোতির্ময় দেহে শ্রীভগবানের দর্শন পান। ক্ষুদিরামের ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে শ্রীভগবান্ তাঁর গৃহে পুত্ররূপে অবতীর্ণ হওয়ার কথা সেদিন প্রকাশ করায়, ক্ষুদিরাম আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়।

৺গয়াধাম থেকে ফিরে আসার পর ক্ষুদিরাম তাঁর ভক্তিমতী স্ত্রী চন্দ্রমণি দেবীর জীবনেও ইতিমধ্যে অনুরূপ অলৌকিক ঘটনার কথা শুনে, শ্রীভগবানের আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন। **১২৪২ বঙ্গাব্দের ৬ই ফাল্গুন—ইংরাজী ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, শুভ ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি-বুধবারে শুভ ব্রাহ্ম-মুহূর্তে কামারপুকুরে ক্ষুদিরামের গৃহে কনিষ্ঠ পুত্ররূপে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হন।** ৺গয়াধামে শ্রীভগবান গদাধরের বিচিত্র স্বপ্নের কথা স্মরণ করে ক্ষুদিরাম তাঁর পুত্রের নাম রাখেন "গদাধর"। আদর করে তাঁকে সকলে "গদাই" ব'লে ডাকতেন।

নবাগত শিশুর পাঁচমাস বয়স অতিক্রম হবার পর, ক্ষুদিরাম তাঁর পরমবন্ধু, গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার সহায়তায় শিশুর অন্নপ্রাশনের কাজ সম্পন্ন করেন এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক গদাধরকে গ্রামের উক্ত লাহাবাবুদের

বাড়ীর নাট-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় লেখাপড়ার জন্য ভর্তি করান। এই সময় আদরের "গদাই"কে নিয়ে ক্ষুদিরাম আনন্দে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন এবং অন্তরের সমস্ত স্নেহ দিয়ে গদাইকে ভরিয়ে তুলতেন। কিন্তু বালক গদাধর যখন মাত্র সাত বছরে উপনীত, তখন ভাগ্নে রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিলিমপুর গ্রামের বাড়ীতে শারদীয়া পূজার সময় ক্ষুদিরামের দেহত্যাগ হয়। পিতার এই আকস্মিক মৃত্যুতে এবং পিতৃস্নেহ থেকে অকালে বঞ্চিত হয়ে, বালক গদাধরের জীবনে বিষাদের ছায়া নেমে আসে এবং এক উন্মনাভাব গদাধরের চিত্তকে অধিকার করে। এই সময় থেকেই গদাধর নির্জনবাস শুরু করেন এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করে শ্মশান প্রভৃতি জনশূন্যস্থানে একাকী উদ্‌ভ্রান্তভাবে বেড়াতে থাকেন। পিতা ক্ষুদিরামের মৃত্যুই বালক গদাধরের জীবনে প্রথম শোক এবং এই শোক থেকেই তাঁর প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতার প্রথম সৃষ্টি। বলা বাহুল্য পরিণত বয়সেও ভক্তদের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে তাঁর পিতা ক্ষুদিরামের কথা স্মরণ করতেন।

*

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং তাঁর প্রথম জীবনের অভিভাবক। কামারপুকুরের নিকটবর্তী গ্রামের এক চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধ্যয়ন শেষ করে তিনি পাণ্ডিত্য লাভ করেন। রামকুমার আদর্শবান, নিষ্ঠাবান, বাকসিদ্ধ, সৎপ্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তথা গদাধরের প্রথম জীবন তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের ব্যক্তিত্বের দ্বারাই প্রভাবিত হয় এবং তিনিই পিতা ক্ষুদিরামের মৃত্যুর পর অভিভাবকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার অন্যতম অংশীদার হিসাবে পরিগণিত হন।

শৈশবে পিতৃবিয়োগের পর থেকেই গদাধরের প্রতিপালনের ভার রামকুমার গ্রহণ করেন এবং উপযুক্ত বয়সে তাঁর উপনয়ন দেন। এই উপনয়নের সময় কুলপ্রথা ভঙ্গ করে গদাধর, শূদ্রানী কামার কন্যা ধনীকে প্রথম ভিক্ষা দেওয়ার জন্য জেদ ধরায় রামকুমার অবশেষে গদাধরের সেই ইচ্ছায় সম্মতি দান করে তাঁর অভিনব লীলার সঙ্গী হন। এর কয়েক বৎসর পরেই রামকুমার অর্থ উপার্জনের জন্য কলকাতার ঝামাপুকুরে এসে যখন বাস করতে শুরু করেন, তখন কনিষ্ঠভ্রাতা গদাধরকেও সঙ্গীরূপে সেখানে নিয়ে আসেন এবং গদাধরও কামারপুকুর ছেড়ে ঝামাপুকুরে এসে দাদার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন।

রামকুমার ঝামাপুকুরে একটি চতুষ্পাঠী খোলেন এবং সেখানে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে গদাধরেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু কিছুদিন বাদেই "চালকলা বাঁধা বিদ্যা" শিখতে গদাধর অসম্মতি জানালে, রামকুমার তা মেনে নেন এবং গদাধরের লেখাপড়া বন্ধ করে দেন। এরপর তিনি গদাধরকে পূজা পদ্ধতি শিক্ষা দিতে শুরু করেন এবং এই শিক্ষার পর তিনি গদাধরকে ঝামাপুকুরে স্থানীয় কয়েকটি বর্ধিষ্ণু পরিবারে নিত্য দেব-সেবার কাজে নিযুক্ত করেন। এই ভাবেই দাদার চেষ্টাতেই গদাধর প্রথম পূজার কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং বলা বাহুল্য যে, পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রধান পূজকের পদ গ্রহণ করে তিনি তাঁর অবতার লীলা শুরু করেছিলেন।

সেই সময় কলকাতার জানবাজারের রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ৺ভবতারিণীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজা উপলক্ষে, দেশের সমুদয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেখানে কোন পূজাদি-ক্রিয়া করতে অস্বীকার করেন, কিন্তু রামকুমারের শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় এবং রানী রাসমণি রামকুমারের ওপরই সকল কাজের ভার অর্পণ করেন। মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার দিন দক্ষিণেশ্বরে বিরাট উৎসব হয় এবং সেদিন রামকুমারের এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের সময় গদাধরও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তখনো তিনি অল্প বয়সহেতু সম্পূর্ণ সংস্কার মুক্ত না থাকায়, শূদ্রানী-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের অন্নগ্রহণে আপত্তি তুলেছিলেন এবং মুড়ি খেয়ে সারাদিন সেখানে কাটিয়ে রাত্রে ঝামাপুকুরে ফিরে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য, যুক্তিবাদী রামকুমারের ব্যক্তিগত প্রভাবে পরবর্তীকালে গদাধর এই সংস্কার থেকে মুক্ত হন এবং নিয়মিত মন্দিরের প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এরপর পূজকরূপে দেবীভক্ত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে বাস করতে থাকায়, গদাধরও দাদার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বাস করতে থাকেন; এই সময়ে প্রথমে ৺ভবতারিনীর বেশ-কারী পদে ও পরে ৺রাধাকৃষ্ণের পূজকের পদে গদাধর নিযুক্ত হন। রামকুমারের প্রচেষ্টাতেই সেই সময় শক্তিসাধক শ্রীকেনারাম ভট্টাচার্য গদাধরকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দান করেন এবং রামকুমার স্বয়ং তাঁকে ৺কালীপূজা ও অন্যান্য দেবদেবীর শাস্ত্রবিহিত পূজা শেখান। পরবর্তীকালে রামকুমার পূজার কাজ থেকে অবসর নিলে, গদাধরই ৺ভবতারিনীর পূজকরূপে নিযুক্ত হন। গদাধরকে পূজার ভার দেবার পর কামারপুকুরে ফেরার সময় পথিমধ্যে অকস্মাৎ রামকুমারের মৃত্যু হয় এবং প্রথম জীবনের প্রধান সঙ্গী ও পিতৃতুল্য অগ্রজকে হারিয়ে গদাধর বিহ্বল হয়ে পড়েন। পিতা ক্ষুদিরামকে শৈশবে হারিয়ে এবং তারপর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারকে অকালে হারিয়ে,

গদাধর প্রথম জীবনেই প্রচণ্ড আঘাত পান। প্রকৃতপক্ষে রামকুমারের মৃত্যুতে গদাধরের অন্তরে পূর্ণমাত্রায় বৈরাগ্যের ভাব আসে এবং আধ্যাত্মিক জীবনের চরম বিকাশের দ্বার মুক্ত হয়। এরপরেই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায় এবং তিনি শাশ্বত সাধনায় ব্রতী হয়ে, অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অভিনব লীলা করে যান।

*

রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যম অগ্রজ ভ্রাতা এবং অত্যন্ত উদার প্রকৃতির পুরুষ। পিতা ক্ষুদিরাম একদা তীর্থ পর্যটন উপলক্ষে পদব্রজে সেতুবন্ধ ৺রামেশ্বরে যান এবং সেখান থেকে "রামেশ্বর" নামক একটি শিবলিঙ্গ নিয়ে আসেন। এরপরেই তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করায়, তিনি তাঁর নাম "রামেশ্বর" রাখেন। দক্ষিণেশ্বরে মা-কালীর পূজকের পদেও তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর পুত্র রামলাল সেখানে সেই পদ গ্রহণ করেছিলেন।

ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের দেহত্যাগের পর রামেশ্বরই ঠাকুরের অভিভাবকরূপে কাজ করেন এবং শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর সঙ্গে তিনি ঠাকুরের বিবাহ দেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরাম তাঁর অন্নপ্রাশন দেন, জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার তাঁর উপনয়ন দেন এবং মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বর তাঁর বিবাহ দেন। শেষবার রামেশ্বর দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে ফিরে যাওয়ার সময়, ঠাকুর রামেশ্বরকে স্বীয় পত্নীর কাছে শুতে নিষেধ করেছিলেন; কিন্তু রামেশ্বর, ঠাকুরের সে নিষেধ না মানায় কিছুদিনের মধ্যেই কামারপুকুরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই রামেশ্বর নিজের মৃত্যুকাল জানতে পেরেছিলেন এবং সেইমত নিজের সৎকার ও শ্রাদ্ধের সকলপ্রকার আয়োজন আগে থেকেই করে রেখেছিলেন। রামেশ্বরের মৃত্যুতে ঠাকুর বিশেষ শোক পান।

*

রাম অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য, ঠাকুরেরই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের পুত্র। সবাই তাঁকে "অক্ষয়" বলে ডাকতেন। শৈশবে মাতৃহীন অক্ষয়কে ঠাকুর দু-তিন বৎসর নিজের কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন। কামারপুকুর থেকে পরবর্তীকালে অক্ষয় দক্ষিণেশ্বরে এলে, তাঁকে শ্রীশ্রীরাধা-

গোবিন্দজীর মন্দিরে পূজকপদে নিযুক্ত করা হয়। অক্ষয়ের ভাব-ভক্তি লক্ষ্য করে ঠাকুর তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং অক্ষয়ও ঠাকুরকে খুব মান্য করতেন। কিন্তু বিবাহ করার কয়েকমাস পরেই দক্ষিণেশ্বরে অক্ষয়ের কঠিন পীড়া হয়; সেই পীড়াতেই অক্ষয়ের মৃত্যু হবে বলে ঠাকুর পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন। অক্ষয়ের অন্তিমকালে ঠাকুর তাঁর শয্যাপার্শ্বে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে অক্ষয়ের দ্বারা তিনবার "গঙ্গা-নারায়ণ" প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করান এবং এই নাম উচ্চারণের পরেই ঠাকুরের সম্মুখেই দক্ষিণেশ্বরে অক্ষয়ের মৃত্যু হয়। এই সময় ঠাকুর সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর স্নেহের অক্ষয়ের অকাল মৃত্যু দর্শন করেন এবং ভাবাবিষ্ট অবস্থায় প্রথমে হাসতে থাকেন। কিন্তু পরের দিন অক্ষয়ের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে ঠাকুরের মন অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয় এবং তিনি অন্তরে বিষম কষ্ট অনুভব করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ভক্তদের কাছে পরে বলেছিলেন যে, যার সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই, সেই ভাইপোর জন্য যদি তাঁর প্রাণের ভেতরটায় গামছা নিংড়াবার মত কষ্ট হয়, তবে মায়াবদ্ধ গৃহীদের না-জানি-শোকের আঘাতে কি নিদারুণ অবস্থা হয়!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক যে, দক্ষিণেশ্বরে মথুরবাবুর (মথুরানাথ বিশ্বাস) কুঠীবাড়ীর বৈঠকখানায় অক্ষয়ের মৃত্যু হওয়ায়, ঠাকুর আর ঐ কুঠীবাড়ীতে বাস করতে পারেননি। অক্ষয়ের বিয়োগজনিত প্রচণ্ড আঘাতে ঠাকুর অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ায়, তাঁর মানসিক কষ্ট লাঘবের জন্য ঠাকুরের পরমভক্ত মথুরবাবু তাঁকে নিয়ে নানাতীর্থে ভ্রমণ করাবার জন্য বেরিয়েছিলেন। কিন্তু অক্ষয়ের মৃত্যুর সাত বছর পরেও, ঠাকুরকে অক্ষয়ের জন্য হু হু করে কাঁদতে কামারপুকুরে অনেকেই দেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, অক্ষয় ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ের ধন।

*

রামলাল চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত, ঠাকুরেরই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বরের পুত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় তিনি অন্যতম সহচররূপে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর পিতা রামেশ্বরের মৃত্যুর পর তিনি দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরের পূজকের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু পূজকের পদ গ্রহণের পর থেকেই রামলাল প্রথমদিকে ঠাকুরকে কিঞ্চিৎ অবহেলা করায়, ঠাকুর কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি ঠাকুরের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি পরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং ঠাকুরের সব রকম সেবা করে কৃতার্থ হন।

ঠাকুরও রামলালকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং সব সময় তাঁকে সদুপদেশ দিতেন। রামলালের ওপর ঠাকুরের এমন বিশ্বাস ছিল যে, মনে কোন বিষয়ে খটকা লাগলে, রামলালকে না বলে, অথবা তাঁর কাছ থেকে কিছু না শুনে, ঠাকুর থাকতে পারতেন না। সুগায়ক রামলালের সঙ্গীত শুনে ঠাকুরের প্রায়ই সমাধি হত; আবার সমাধি ভঙ্গের জন্যও রামলালকে গান গাইতে হত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুযায়ী রামলাল তাঁকে বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন এবং ঠাকুরও রামলালের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আনন্দে গান গাইতেন। এমনকি, রামলালের মুখে অধ্যাত্ম রামায়ণ, ভক্তমাল, প্রহ্লাদ চরিত্র প্রভৃতির পাঠ শুনেও মাঝে মাঝে ঠাকুরের সমাধি হত।

একদা সিঁথির ভক্ত, কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পাল ঠাকুরের সেবার জন্য গোপনে পাঁচটি টাকা রামলালের কাছে রেখে যান; কিন্তু রামলাল ঠাকুরের কাছে সে কথা প্রকাশ করায়, ঠাকুরের নির্দেশানুযায়ী পরের দিনই ঐ টাকা মহেন্দ্র কবিরাজকে ফেরৎ দিয়ে এসে রামলাল দায়মুক্ত হন।

দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর যখন কাশীপুরে চলে গিয়েছিলেন, সেখানেও রামলাল তাঁকে দেখতে বা সেবা করতে যেতেন। কাশীপুরে ঠাকুরের "কল্পতরু" হওয়ার দিনেও রামলাল উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের বিশেষ কৃপালাভ করেছিলেন। এইদিন ঠাকুর রামলালকে স্পর্শ করা মাত্রই সর্বাঙ্গসুন্দর ইষ্টমূর্তি রামলালের হৃদয়পদ্মে সচল অবস্থায় সহসা আবির্ভূত হন। কাশীপুরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নর-লীলার অবসানে, শ্মশানঘাটে রামলালই ঠাকুরের মুখাগ্নি করেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ঠাকুরের মাতা চন্দ্রমণির মৃত্যুতেও ঠাকুরের নির্দেশে রামলাল, পিতামহী চন্দ্রমণির দেহের সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াও সম্পাদন করেছিলেন; কারণ, সন্ন্যাস গ্রহণের মর্যাদা রক্ষার জন্য মাতার মৃত্যুতে ঠাকুর অশৌচাদি গ্রহণ করেননি।

এখানে দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ্য, ঠাকুরের কৃপায় পূর্ণ রামলাল ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি বিশেষ ভাল ব্যবহার করেননি এবং তাঁরই প্ররোচনায় রাণী রাসমণির এষ্টেট কর্তৃক বরাদ্দ সামান্য কয়েকটি টাকা থেকে সেই অসময়ে শ্রীশ্রীমা বঞ্চিতা হন। আত্মবিস্মৃত রামলালের এই গর্হিত আচরণে শ্রীশ্রীমা মনে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন; এমনকি, ঐ বরাদ্দের টাকা বন্ধ না করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ অনুরোধ করলেও, তা পালিত হয়নি। পরবর্তীকালে অবশ্য ঠাকুরের ত্যাগী বা গৃহী সকল ভক্তগণের সঙ্গেই রামলালের প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

*

রামতারক চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, ঠাকুরেরই খুল্লতাত জ্যেষ্ঠভ্রাতা। "হলধারী" নামে তিনি খ্যাত ছিলেন। সুপণ্ডিত, নিষ্ঠাবান্ ও বাক্‌সিদ্ধপুরুষ হিসাবেও তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। ঠাকুরের চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শাস্ত্রগ্রন্থে অসামান্য দখল থাকায়, হলধারী প্রথমাবস্থায় মাঝে মাঝে ঠাকুরকে নানা প্রকার বিদ্রূপ করতেন এবং ঠাকুরের আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাকে প্রথম প্রথম মস্তিষ্কের বিকার বলে সিদ্ধান্ত করতেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে পূজকরূপে প্রথমে নিযুক্ত হলেও, হলধারী পশুবলির বিরোধী ছিলেন এবং তার ফলে তৃপ্তমনে তাঁর দ্বারা ৺মায়ের পূজা হত না। এই সময় মা-কালীর বাণীস্বরূপ তিনি শুনতে পান যে, ক্ষুণ্ণমনে পূজা করতে ৺মা তাঁকে নিষেধ করছেন। কিন্তু উক্ত দৈববাণীকে তিনি নিজের মাথার খেয়াল মনে করে, সেই নিষেধ অমান্য করেন এবং অতৃপ্ত মনেই ৺মায়ের পূজা চালিয়ে যান। এর কিছুদিন পরেই তাঁর একটি পুত্রের আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় তিনি ৺কালীপূজা বন্ধ করে ৺বিষ্ণু মন্দিরের পূজক হন। কিন্তু এই সময় বৈষ্ণব সাধনার একটি বিশেষ প্রথায় তিনি জড়িয়ে পড়ায়, ঠাকুর তাঁকে সাবধান করেন এবং ঠাকুরের সেই কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে বাক্‌সিদ্ধ হলধারী তাঁর (ঠাকুরের) মুখ থেকে রক্ত ওঠার জন্য অভিশাপ দেন। এরপর সত্য সত্যই একদিন ঠাকুরের মুখ থেকে অজস্র রক্ত ওঠায়, ঠাকুর বাক্‌সিদ্ধ হলধারীর অভিশাপে ভীত হয়ে পড়েন; কিন্তু পরে নির্ধারিত হয় যে, ঐ রক্ত ঠাকুরের সাধনকালে মস্তিষ্কে সঞ্চিত রক্ত, যা নাকি কাকতালীয়ের মত ঠিক ঐ সময়েই স্বতঃই নির্গত হয়েছিল এবং ঐ রক্ত-নির্গত হওয়ার প্রয়োজনও ছিল।

পরবর্তীকালে অবশ্য ঠাকুরের প্রতি হলধারী ক্রমশঃ আকৃষ্ট হতে থাকেন এবং ঠাকুরের মধ্যে সাক্ষাৎ ৺জগদম্বার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন। তিনি ঠাকুরের প্রতি এত অনুগত হয়ে পড়েন যে, বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও তিনি ঠাকুরের চরণে ফুলচন্দন দিয়ে একদিন পূজা করেন এবং ঠাকুরও তাঁকে কৃপাদানে ধন্য করেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের বিভিন্ন সাধনকালের সাক্ষী ছিলেন এই হলধারী। ঠাকুর প্রায়ই অনেক জটিল বিষয়ে হলধারীর সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং হলধারীও ঠাকুরের কাছে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতেন। ঠাকুরের অন্যতম গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামীর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে, হলধারীও সেই সময় সেখানে বাস করায়, তাঁদের উভয়ের মধ্যে খুব হৃদ্যতা ছিল। পরবর্তীকালে শারিরীক অসুস্থতার দরুন হলধারী দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।

বছর বয়সে, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় জন্মভূমি শিহড়গ্রামে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ-সেবক শ্রীহৃদয়রাম দেহত্যাগ করেন।



বলরাম বসু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে প্রসিদ্ধ জমিদার ও পরমবৈষ্ণব মহাত্মা কৃষ্ণ বসুর বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বলরামের পূর্ব পুরুষ পরম বৈষ্ণব শ্রীগুরুপ্রসাদ বসু স্বগৃহে শ্রীশ্রীরাধা-শ্যাম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই বিগ্রহের নাম অনুসারে সেই সময় পল্লীর নাম "শ্যামবাজার" হয়। মহাত্মা কৃষ্ণ বসুও মাহেশের রথ প্রতিষ্ঠা, কটক থেকে পুরী অবধি ৫৬ মাইল প্রশস্ত পথ নির্মাণ, কলকাতা, মাহেশ, পুরী, ভদ্রক, কোঠার বৃন্দাবন প্রভৃতি নানাস্থানে সদাব্রত, মঠ, কুঞ্জ প্রভৃতি স্থাপনের মাধ্যমে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। উড়িষ্যায় এই বসু-পরিবারের জমিদারী থাকায় স্বভাবতঃই ধনীর সন্তানরূপে বলরাম পরিচিত হয়েও, সরল, নিরভিমানী, বালক-স্বভাব, লোকরঞ্জন মহাপুরুষ ছিলেন। আবার বৈষ্ণব বংশের ধারানুযায়ী সাত্ত্বিক ও নিষ্ঠাবান্ হলেও বলরামের মধ্যে কোন গোঁড়ামীর স্থান ছিল না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী-সন্তান স্বামী প্রেমানন্দ, তথা বাবুরাম মহারাজের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দেবীর সঙ্গে বলরামের বিবাহ হয়।

উড়িষ্যায় থাকাকালীন লোকমুখে এবং সংবাদপত্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রথম বলরাম জানতে পারেন। পরে তাঁর কলকাতার বাড়ীর পুরোহিত বংশীয় ব্রাহ্মণ এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত রামদয়াল চক্রবর্তীর আহ্বানে, বলরাম উড়িষ্যা থেকে কলকাতার বাড়ীতে চলে আসেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হন। এরপর থেকেই বলরাম ক্রমাগত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং দিন দিন ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে পরিগণিত হন। ঠাকুরের মিষ্ট ব্যবহার এবং পুনঃ পুনঃ ভাবসমাধির পরিচয় পেয়ে তিনি ঠাকুরকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-রূপেই নিজের অন্তরে গ্রহণ করেন; সেজন্য ঠাকুরকে দর্শনমাত্রই তিনি মস্তক লুটিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করতেন। ঠাকুরের কাছ থেকে বিশেষ কৃপালাভের পর বলরামের জীবনে আধ্যাত্মিকভাবের প্রসার ঘটে এবং তিনি নির্লিপ্তভাবে সংসারে অবস্থান করতে থাকেন। ঠাকুরের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং তাঁর কাছে শিষ্যের মতন আচরণে, বলরামের বৈষ্ণব-আত্মীয়বর্গ বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ

করেন এবং তাঁকে প্রথম প্রথম এই কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত বলরাম, ঠাকুরের কৃপায় সকল বাধা উপেক্ষা করায় তাঁরা পরাভূত হন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁরাও ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে, পরবর্তীকালে সবাই ঠাকুরের ভক্তে পরিণত হন ও তাঁদের সংসার প্রকৃত পক্ষে "ঠাকুরের সংসার"রূপে গণ্য হয়। বলরাম নিজেকে ঠাকুরের সেবায় সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার দিন অবধি তাঁর প্রয়োজনীয় আহার্য্যের প্রায় সমস্ত কিছুই বলরাম তাঁকে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলরামের এই অকুণ্ঠসেবার জন্য ঠাকুর তাঁকে "তৃতীয় রসদদার" হিসাবে গণ্য করতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও বলরাম তাঁর ত্যাগী সন্তানদের সর্বপ্রকারে সহায়তা করতেন এবং ঠাকুর-সেবার জন্য তৎকালে প্রতিদিন একটাকা করে দিতেন। শেষজীবনে তিনি ঠাকুরের কাজের জন্য তাঁর কলকাতার বসত-বাড়ীটিও রামকৃষ্ণ মিশনকে উইল মারফৎ দান করে যান।

বলরামের কলকাতার বাগবাজারে ৫৭নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটের (বর্তমানে ৭নং গিরীশ এ্যাভিনিউ) বাড়ীটিকে ঠাকুরের 'লীলা নিকেতন' বললে অত্যুক্তি হয় না। ঠাকুর শতাধিকবার এই বাড়ীতে শুভাগমন করায় এবং বহু লীলা প্রকাশিত হওয়ায় বাড়ীটি ভবিষ্যতে "বলরাম-মন্দির" নামে তীর্থস্থানে পরিণত হয়। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় অন্য জায়গায় যেতেন, তখন একমাত্র রাণী রাসমণির জানবাজারের বাড়ী ছাড়া আর কোথাও রাত্রিবাস বা অন্নগ্রহণ করতেন না; কিন্তু বলরামকে তিনি এত স্নেহ করতেন যে, তাঁর বাড়ীতে ঠাকুর বহুবার রাত্রিবাস করেছেন এবং "বলরামের অন্ন শুদ্ধ" জ্ঞান করে, পরমভক্ত কায়স্থ বলরামের বাড়ীতে বহুবার অন্নগ্রহণ করেছেন। বলরামের বাড়ীতে ঠাকুর এলেই দলে দলে ভক্তদের আগমন হ'ত এবং নানা আনন্দ উৎসবে বাড়ীটি মুখরিত হয়ে উঠত। বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরের উপস্থিতি, রাত্রিবাস, অন্নগ্রহণ, রথ-টানা, হরিসংকীর্তন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, ভক্ত-সঙ্গ, মুহুর্মুহু সমাধি প্রভৃতি বহুপ্রকারের লীলা এই বাড়ীতেই সম্পন্ন হয়েছিল এবং ঠাকুর এই বাড়ীটিকে তাঁর "কেল্লা" বলে উল্লেখ করেছিলেন। এমনকি, অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য ভক্তদের দ্বারা কলকাতায় ভাড়া-করা বাড়ী পছন্দ না হওয়ায়, ঠাকুর প্রথমে বলরামের বাড়ীতেই চলে এসেছিলেন। তাছাড়া, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর এই বাড়ীতেই ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা প্রথমে ঠাকুরের ভস্মাধার এবং ব্যবহৃত জিনিসগুলি রেখে দিয়েছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত "রামকৃষ্ণ-মিশন" এই বলরামের বাড়ীতেই প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্রায় তিন বছর এই বাড়ীতেই মিশনের অধিবেশন বসে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীও বলরামের বাড়ীতে

বহুবার আগমন করেন এবং বহুদিন বাস করেন। এই বাড়ীতেই ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী প্রেমানন্দ দেহরক্ষা করেন। প্রকৃত পক্ষে, পরমভক্ত বলরামের ন্যায় তাঁর বাড়ীটিও ঠাকুরের পরমকরুণায় ভরপুর থাকায়, এই গৃহ-তীর্থটি সত্যই মন্দিরের রূপপরিগ্রহ করে। বলরামের শেষ শয্যার পাশে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকেই তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভাগ্যবান ভক্ত শ্রীবলরাম কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

*

চুণীলাল বসু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর কলকাতার বাগবাজারে নিজবাড়ী ৫৮ বি, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে (বর্তমানে গিরীশ এ্যাভিনিউ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি হিন্দু স্কুলে লেখাপড়া শেখেন এবং পরে কলকাতা কর্পোরেশনে লাইসেন্স বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন। স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ নানাস্থানে সাধু দর্শনের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়ানো তাঁর প্রধান অভ্যাস ছিল।

চাকরীকরা-কালীন জনৈক সহকর্মীর পরামর্শে সত্যকারের সাধু-দর্শনের উদ্দেশ্যে চুণীলাল প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যান এবং সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হন। দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে গেলে, ঠাকুর চুণীলালের সঙ্গে সেখানে সেই সময়ে উপস্থিত তাঁর প্রতিবেশী ভক্ত বলরাম বসুর পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর থেকেই কখনও বলরামের সঙ্গে, কখনও-বা একাকী চুণীলাল নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভ করে ধন্য হন। ইতিপূর্বে কুলগুরুর কাছে চুণীলাল দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন এবং যোগ-সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন ; কিন্তু এই যোগ-সাধনার ফলে তাঁর হাঁপানী রোগ হওয়ায়, তিনি মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। ঠাকুরের কাছে আসার পর তাঁরই নির্দেশে চুণীলাল বিবাহিত জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক এই যোগাভ্যাস ত্যাগ করেন এবং শীঘ্রই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

কাশীপুরে ঠাকুরের "কল্পতরু" হওয়ার দিন সেখানে বিকালে বিলম্বে চুণীলাল উপস্থিত হলে, স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ মতন তিনি বিশ্রামরত ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করে তাঁর কৃপাভিক্ষা চান। সেই সময় ঠাকুর নিজের দেহ চুণীলালকে দেখিয়ে তার ওপর ভক্তি বিশ্বাস রাখার নির্দেশ দিয়ে তাঁকে বিশেষ

কৃপা করেন এবং চুণীলালও আজীবন ঠাকুরের সেই আদেশ পালন করেন। চুণীলালের সম্পর্কে ঠাকুরের উচ্চ ধারণা ছিল এবং তাঁর বাড়ীতেও ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক থাকায়, স্বামীজী চুণীলালকে ভালবেসে "নারায়ণ" বলে ডাকতেন। চুণীলালের স্ত্রীও ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমিক-ভক্ত শ্রীচুণীলাল কলকাতায় নিজ বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন।

*

রামচন্দ্র দত্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর কলকাতার নারিকেলডাঙ্গায় এক উচ্চ বৈষ্ণব বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরের অপর গৃহীভক্ত মনোমোহন মিত্র ছিলেন তাঁর মাসতুতো দাদা এবং স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর আত্মীয়। রামচন্দ্র আজীবন নিরামিষাসী ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি তদানীন্তন "ক্যাম্প্‌বেল মেডিক্যাল স্কুল" (বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) থেকে ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করেন এবং গভর্ণমেণ্টের অধীনে "কুইনাইন" বিভাগে সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। পরে রসায়ন শাস্ত্র আয়ত্ত করে তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের মিলিটারী ছাত্রদের অধ্যাপক এবং সহকারী রাসায়নিক-পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ইংলণ্ডের রাসায়নিক সভার সদস্যও হয়েছিলেন। তিনি আমাশয় রোগের প্রতিষেধক একটি ঔষধও আবিষ্কার করেন এবং নানা-ভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। চাকরীর প্রথম অবস্থাতেই তিনি বিবাহ করেছিলেন এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রে বেশী মনোনিবেশের ফলে ক্রমশঃ নাস্তিক হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর অতি আদরের এক কন্যার মৃত্যুর ফলে তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসে এবং তিনি ঈশ্বরের অনুসন্ধানে নানা ধর্মীয় সমাজে যাতায়াত শুরু করেন।

এই সময় ব্রাহ্মসমাজের নেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ পাঠ করে রামচন্দ্র, পরমপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় জানতে পারেন এবং তাঁকে দেখার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হন। প্রথমদিন তিনি নৌকাযোগে দুই বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করে অকূলে কূল পান। এরপর থেকেই রামচন্দ্র প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া শুরু করেন এবং ঠাকুরের চরণে মন-প্রাণ সমর্পণ করে নিজেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের

ভক্তরূপে জ্ঞান করেন। এই সময় তিনি একদিন নিশাশেষে স্বপ্নে ঠাকুরের কাছ থেকে জপের জন্য "মন্ত্র" পান এবং ঠাকুরকে সেকথা জানান। কিন্তু পরবর্তীকালে ঠাকুর তাঁর কাছ থেকে স্বপ্নপ্রদত্ত মন্ত্রটি ফিরিয়ে নেন এবং ভবিষ্যতে সাধন-ভজনের জন্য তাঁকে "শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রীতির" নির্দেশ দেন; সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের মস্তকের ব্রহ্মতালুর ওপর ঠাকুর তাঁর দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি সংস্পর্শ করায়, রামচন্দ্র ঠাকুর কর্তৃক বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত হন এবং তাঁকে ইষ্ট ও আরাধ্য দেবতারূপে হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম সেবক রামচন্দ্রকে ঠাকুর অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই শুভাগমন করতেন। প্রথম জীবনে রামচন্দ্র অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হলেও, ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেছেন। ঠাকুরের ভাবধারা প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ, বিভিন্ন ধর্মসভায় বক্তৃতা প্রভৃতি শুরু করেন এবং প্রচারকার্যে তৎকালে আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের পরই তাঁর স্থান হয়। সেই সময় "তত্ত্বসার" নামে ঠাকুরের উপদেশপূর্ণ একখানি পুস্তক তিনি প্রকাশ করায়, ঠাকুর তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর জীবনী ছাপাতে নিষেধ করেন; সেজন্য ঠাকুরের দেহরক্ষার পর ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঠাকুরের জীবনী প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া ঠাকুরের জীবদ্দশায় "তত্ত্বমঞ্জরী" নামে একটি মাসিক পত্রিকা মারফৎও তিনি ঠাকুরের উপদেশগুলি প্রকাশ ও প্রচার করতেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁর এত বিশ্বাস ছিল যে, একবার রোগাক্রান্ত অবস্থায় নিজে ডাক্তার হয়েও কোন প্রকার ডাক্তারী ঔষধ না খেয়ে কেবল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাদোদক পানের দ্বারা তিনি রোগমুক্ত হন।

ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে রামচন্দ্র কলকাতার কাঁকুড়গাছির এক নির্জন স্থানে ভক্তদের জন্য একটি সাধন-স্থান প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঠাকুরের উপস্থিতিতে ও শ্রীচরণ স্পর্শে ঐ স্থান মহাতীর্থে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে ঠাকুরের দেহ-রক্ষার পর তাঁর নির্দিষ্ট চিতাভস্ম সেখানে সমাহিত করে তার ওপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির নির্মিত হয় এবং ঐ স্থানটির নাম "যোগোদ্যান" রাখা হয়। এই মন্দিরের সমস্ত কাজ, পূজা, এমনকি ভোগরান্নাও রামচন্দ্র নিজে হাতে করতেন এবং প্রতি রবিবার পল্লীর পথে পথে "রামকৃষ্ণ নাম" কীর্তনের জন্য যুবকদের পাঠাতেন। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের সঙ্গেও তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা থাকায় পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক "যোগোদ্যানে"র ভার গ্রহণ করা হয়।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আজীবন পূজারী শ্রীরামচন্দ্র "যোগোদ্যানে" দেহত্যাগ করেন।

সুরেশচন্দ্র দত্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর কলকাতার হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি বাংলার বাইরে কোয়েটায় ইংরাজ সরকারের সামরিক বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন; কিন্তু তাঁর সততার জন্য কিছু দুর্নীতি পরায়ণ সহকর্মীদের অসুবিধা হতে থাকায়, তিনি স্বেচ্ছায় চাকরী ত্যাগ করেন এবং অশেষ দুঃখের মধ্যে দিন কাটান। বিবাহিত জীবনে কর্মহীন অবস্থায় পোষ্যবর্গের ভরণপোষণের জন্য তাঁকে কুলি সেজে আলু ফেরির কাজও করতে হয়েছিল। পরে আরো কয়েকবার তিনি চাকরী সংগ্রহ করেন বটে, কিন্তু প্রতিবারই তাঁর সততা ও নির্ভীকতার জন্য বেশীদিন তিনি কোন চাকরী করতে পারেননি। পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধনায় তিনি সকল কর্ম ত্যাগ করেন এবং সংসারের ভার থেকে অব্যাহতি নিয়ে নির্জনে বাস শুরু করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত দুর্গাচরণ নাগ, তথা নাগ মশাই সুরেশচন্দ্রকে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী সুরেশচন্দ্র সেদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কোন দেব-দেবীকেই প্রণাম করেননি। এমনকি, এরপর দক্ষিণেশ্বরে বহুবার যাতায়াতের ফলে ঠাকুর তাঁকে দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন বুঝিয়ে দিলেও, সুরেশচন্দ্র সে প্রস্তাবে সম্মত হননি। অবশেষে সাংসারিক জীবনে অনেক সংগ্রামের পর তাঁর মনে দীক্ষা গ্রহণের জন্য তীব্র অভিপ্রায় জাগে; কিন্তু ঠাকুর তখন অসুস্থ অবস্থায় কাশীপুরে অবস্থান করায় ও কিছুদিন বাদেই তাঁর দেহরক্ষা হওয়ায়, সুরেশচন্দ্রের মনোবাসনা অপূর্ণই থেকে যায়। আশাহত সুরেশচন্দ্রের অন্তর এই সময় তীব্র অনুতাপে দগ্ধ হয় এবং তিনি কেঁদে কেঁদে ঠাকুরের উদ্দেশে তাঁর মনোবাসনা সব সময় জানাতে থাকেন।

ঠিক এই সময়েই তিনি একদিন ভোরে ঠাকুরকে স্বপ্নে দর্শন করেন এবং ঠাকুরের অশেষ কৃপাস্বরূপ তাঁর কাছ থেকে "মন্ত্র" লাভ করেন। এই ঘটনার পর থেকেই সুরেশচন্দ্রের জীবনে পরিবর্তন আসে এবং সংসার থেকে মুক্ত হয়ে শেষদিন অবধি তিনি ঠাকুরের আরাধনায় সম্পূর্ণরূপে ব্রতী হন। ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই তিনি "পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি" নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া "শ্রীরামকৃষ্ণ সমালোচনা", "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মসমাজ", "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত", "সাধক সহচর" প্রভৃতি বহু অমূল্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁর প্রকাশিত "শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ" গ্রন্থখানি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃত।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-সন্তান শ্রীসুরেশচন্দ্র কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

*

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য। আনুমানিক ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সিমুলিয়া ষ্ট্রীটে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিলাতী "ডফ্‌ কোম্পানী"র উচ্চপদে নিযুক্ত থেকে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং প্রথম জীবনে সাহেবী ভাবাপন্ন অবস্থায় প্রচণ্ড সুরাপানে অভ্যস্ত হন। কিন্তু সুখের প্রাবল্য থাকলেও, প্রাণে কোন প্রকার শান্তি না থাকায় একদা সুরেন্দ্রনাথ বিষপানে আত্মহত্যা করার জন্য যখন মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর বন্ধুদ্বয়—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত এবং মনোমোহন মিত্রের পরামর্শে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাওয়ার সুযোগ পান।

প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ, ঠাকুরকে প্রণাম না করেই বসে পড়েন এবং সেখানে ভক্তমণ্ডলীর মাঝে উপবিষ্ট ঠাকুরের কথামৃত পান করেন। ঠাকুরের মুখে সেদিন অমৃত বাণী শুনে সুরেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন এবং শান্তির নতুন পথের সন্ধান পান। এরপর থেকেই সুরেন্দ্রনাথের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে এবং তিনি সর্বদাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ মনন করতে থাকেন। তিনিও যেমন বহুবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন, করুণাময় ঠাকুরও তেমন বহুবার তাঁর বাড়ীতে শুভাগমন করে নানাভাবে তাঁকে কৃপা করেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে কখনো "সুরেন্দর", কখনো-বা "সুরেশ" বলে সম্বোধন করতেন; এমন কি এই ভাগ্যবান ভক্তকে একবার ঠাকুর তাঁর কণ্ঠের প্রসাদী মালা পরিয়ে দিয়েও বিশেষ কৃপা করেছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে এই মহামিলনের ফলে, সুরেন্দ্রনাথের অশান্ত জীবন সম্পূর্ণ সংহত হয় এবং তিনি ঠাকুরকে "গুরু"রূপে বরণ করেন। এমনকি, বৈরাগ্য অবলম্বনের জন্য একদা তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে দু-একদিন রাত্রিবাসও করেছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর আপত্তিতে তাঁর বাইরে রাত্রিবাস বন্ধ হয়।

সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে ঠাকুর ও তাঁর ভক্তবৃন্দের বহুবার আগমন ঘটায়, ঠাকুরের কৃপাতে তাঁর বাড়ীটিও পূর্ণ ছিল। তাঁদের তৃপ্তির জন্য সুরেন্দ্রনাথ সবরকম ব্যবস্থা নিতেন এবং অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। এমনকি, ঠাকুরের আগমন উপলক্ষে সঙ্গীতাদি পরিবেশনের ব্যবস্থাও তাঁর বাড়ীতে হত এবং এইরকম এক ঘটনায় সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ)

প্রথম ঠাকুরকে দর্শনের পর গান গেয়ে শোনান ; ঠাকুরও এই প্রথম নরেন্দ্র-নাথের গান শুনে সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে সমাধিস্থ হন। সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা, ৺অন্নপূর্ণা পূজা, ৺কালীপূজা, ৺দুর্গা পূজা প্রভৃতি উৎসবাদিতে ঠাকুর যোগদান করতেন এবং বিচিত্র ঘটনার মাধ্যমে তাঁর বিশ্বাস উৎপাদনে সাহায্য করতেন। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হলেও সুরেন্দ্রনাথ সব সময় ঠাকুরের যে-কোন সেবাকার্যে এগিয়ে যেতেন বলে, ঠাকুর তাঁকে অন্যতম "রসদদার" (সম্ভবতঃ চতুর্থ রসদদার) বলে উল্লেখ করেছিলেন। ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে নিজ ব্যয়ে ও উদ্যোগে সুরেন্দ্রনাথই প্রথম "শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব" প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তীকালেও এই উৎসবের অধিকাংশ খরচ তিনি নিজেই বহন করতেন। ঠাকুরের সেবার জন্য যে সব ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস করতেন, তাঁদের লেপ, বালিশ, বিছানা—এমনকি খাওয়ার জন্য ডাল-রুটির ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। ঠাকুরের অসুস্থতার সময় কাশীপুরের উদ্যান-বাটীর ৮০ টাকা ভাড়া ও অন্যান্য খরচ বাবদ মাসিক ২০০ টাকা তৎকালে তিনি একাই বহন করতেন। এছাড়া কাশীপুরে ঠাকুরের শোয়ার ঘরে ব্যবহারের জন্য খস্ খস্ পর্দা, ঠাকুরের জন্য ফুলের মালা ও ফল প্রভৃতির খরচও তিনি দিতেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর কাশীপুরের উদ্যান-বাটী ছেড়ে ঠাকুরের কয়েকজন ত্যাগী সন্তান যখন অনাথের মতন বিভিন্ন তীর্থ ঘুরে বেড়াতেন, তখন একদিন ভাগ্যবান সুরেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ ঠাকুরের দর্শন পান এবং তাঁর ত্যাগী সন্তানদের সুব্যবস্থার জন্য ঠাকুরের আদেশ পান। এই অলৌকিক ঘটনার ফলে সুরেন্দ্র-নাথ তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বরানগরে গঙ্গাতীরে মাসিক ১১ টাকা ভাড়ায় একটি বাড়ী ঠিক করেন ; এইখানেই প্রথম ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের আগমনে ও উপস্থিতিতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আদি মঠের সূচনা হয়। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের এখানে খাওয়া-থাকা বাবদ মাসিক ১০০ টাকা খরচ তখন তিনি একাই বহন করতেন। পরবর্তীকালে ঠাকুরের মন্দির নির্মাণকল্পে তিনি সেই সময়ে এককালীন ১০০০ টাকা দান করেন এবং আরো অর্থ দেবার প্রতিশ্রুতি দেন ; কিন্তু অকালে দেহত্যাগের ফলে আর তা সম্ভব হয়নি।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন।

*

মনোমোহন মিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি হুগলী জেলার কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা "রায়বাহাদুর" ছিলেন ; তাঁর এক মেশোমশাইও "রায়বাহাদুর" ছিলেন এবং সেই মেশোমশায়ের কলকাতার ঝামাপুকুরের বাড়ীতে বাস করে মনোমোহন প্রথমে "হিন্দু স্কুলে" লেখাপড়া শুরু করেন। এরপর মনোমোহনের পিতা কর্মোপলক্ষে পূর্ববঙ্গের ঢাকায় চলে যাওয়ায়, তিনিও তাঁর সঙ্গে ঢাকায় যান এবং সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে মনোমোহনের বিবাহ হয় এবং শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষের (পরবর্তীকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সঙ্গে তাঁর এক ভগ্নী বিশ্বেশ্বরীর বিবাহ হয়। পিতার মৃত্যুর পর মনোমোহন ঢাকা থেকে ফিরে আসেন এবং রাইটার্স বিল্ডিংস এ তদানীন্তন "বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে" সরকারী চাকরীতে যোগদান করেন। এই সময় তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করায়, আচার্য কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতাদের সংস্পর্শে এসে, ব্রাহ্ম সমাজের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। কিন্তু তাঁর একটি কন্যার মৃত্যুর পর তিনি কোন্নগর পরিত্যাগ করে কলকাতায় ২৩নং সিমুলিয়া ষ্ট্রীটে নতুন বাড়ীতে চলে আসেন এবং ব্রাহ্মদের অনুকরণে উপাসনার দ্বারা অন্তরে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করেন। মনোমোহন এই সময়েই ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রথম জানতে পেরেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন মনোমোহনের মাসতুতো ভাই। রামচন্দ্রের সঙ্গে মনোমোহন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হন। এরপর থেকেই মনোমোহন নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং অবশেষে ঠাকুরের বিশেষ কৃপা লাভ করে ধন্য হন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি প্রার্থনা করলে, ঠাকুর তাঁকে সংসারে থেকেই সাধনার উপদেশ দেন এবং তিনিও আজীবন তা যথাযথ পালন করেন। তিনি ঠাকুরকে "অবতার"রূপে বিশ্বাস করতেন এবং ঠাকুরও তাঁকে আন্তরিক স্নেহ করতেন। ঠাকুরের প্রতি কোন কারণে অভিমানবশতঃ মনোমোহন একসময় দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ করলে, ঠাকুর নিজেই নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর থেকে কোন্নগরে এসে তাঁর পুরাতন বাড়ীতে পদার্পণ করেছিলেন এবং অন্তরের ভালবাসায় তাঁর অভিমান দূর করেছিলেন। মনোমোহনের কলকাতার নতুন বাড়ীতেও ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল এবং ঠাকুর তাঁকে বহুভাবে কৃপা করেছিলেন। কাশীপুরে ঠাকুরের অসুস্থতার সময় তিনি মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করে ঠাকুরের সকলপ্রকার সেবার ভার গ্রহণ

করেছিলেন। এই সময় তিনি অফিসের চাকরী ছেড়ে ঠাকুরের সেবাতেই সর্বদা নিজেকে নিযুক্ত রাখার সঙ্কল্প করলে, ঠাকুর তাঁকে তা থেকে বিরত করেছিলেন। ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ও নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্রের পরামর্শে মনোমোহন প্রমুখ কয়েকজন ভক্তের অর্থ সাহায্যে সেই সময় ঠাকুরের ভাবধারা প্রচারের জন্য "তত্ত্বমঞ্জরী" নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত এবং বিনামূল্যে বিতরিত হত।

মনোমোহন পারিবারিক জীবনে অনেক শোক পেলেও, ঠাকুরের কৃপার ওপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন। প্রথম জীবনেই পিতার মৃত্যু এবং তারপর থেকেই পর পর প্রথমা কন্যার মৃত্যু, মাতার মৃত্যু, দুটি ভগ্নীর মৃত্যু, পুত্রবৎ ভাগ্নে সত্যচরণের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের পূর্বাশ্রমের পুত্র) মৃত্যু, বিবাহিতা কন্যা মাণিক-প্রভার মৃত্যু এবং অবশেষে পত্নীর মৃত্যু—মনোমোহনকে প্রকৃতপক্ষে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিল এবং ঠাকুরের প্রতি আরো আকর্ষণ ঘটিয়েছিল। শেষ জীবনে তিনি কাঁকুড়গাছির "যোগোদ্যানে"র সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং ধর্মপ্রসঙ্গ ও তথাকার নানা কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। এই সময় মাঝে মাঝে অলৌকিক দর্শনাদির ফলে তিনি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।

ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের সঙ্গে মনোমোহনের মধুর সম্পর্ক বজায় থাকায়, তাঁরা মনোমোহনের বাড়ীতে শুভাগমন করতেন এবং মনোমোহনও তাঁদের সঙ্গে ঠাকুরের প্রসঙ্গে আত্মহারা হতেন। মনোমোহনের মৃত্যুশয্যার পাশে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী প্রেমানন্দ অবিরাম তিনদিন অবস্থান করে তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেছিলেন। বলা আবশ্যক, মনোমোহনের একমাত্র পুত্র "গৌরীমোহন" পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন এবং "ব্রহ্মচারী মাতৃকাচৈতন্য"রূপে অভিহিত হন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রিত শ্রীমনো-মোহন কলকাতায় নিজবাড়ীতে দেহত্যাগ করেন।

*

হরমোহন মিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত। তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ও প্রতিবেশী। দারিদ্র্যের জন্য প্রথম জীবনে তিনি কলকাতার সিমলা-পল্লীতে মাতুল শ্রীরামগোপাল বসুর বাড়ীতে মানুষ হন এবং স্বামীজীর (তৎকালে নরেন্দ্রনাথ) সঙ্গে একই শ্রেণীতে লেখাপড়া করেন। হরমোহনের মাতা কয়েকবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর

প্রতি ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। মাতার উৎসাহেই পুত্র হরমোহন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে বহুবার যান এবং অবশেষে বিশেষ কৃপালাভ করে ধন্য হন। একদা ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ করায়, তাঁর ভেতরে দিব্য অনুভূতির সৃষ্টি হয় এবং তাঁর ভ্রূযুগল মধ্যে নানা দেবদেবীর দর্শন হয়।

বিবাহ করার পর হরমোহনের জীবনে কিছুটা ঔদাসীন্য আসে। যদিও তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন, তবুও তাঁর ভেতরে এই ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে ঠাকুর দুঃখ প্রকাশ করতেন। কাশীপুরে যেদিন ঠাকুর "কল্পতরু" হয়ে সবাইকে কৃপা করেছিলেন, সেদিন হরমোহনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু ঠাকুর তাঁর বক্ষ স্পর্শ করে "আজ থাক"—শুধু এই কথা বলে, যে-কোন কারণেই হোক, সেদিন তাঁকে সম্পূর্ণ কৃপা করেননি; পরে অবশ্য আর একদিন হরমোহনকে পৃথকভাবে ঠাকুর কৃপা করেছিলেন।

একজন ক্ষুদ্র পুস্তক-প্রকাশক হিসাবে হরমোহন তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও ঠাকুর এবং স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারের জন্য নিজ-ব্যয়ে পুস্তক ছাপিয়ে তিনি বিনামূল্যে সবাইকে বিতরণ করতেন। মনীষী ম্যাক্সমূলার রচিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী এদেশে তিনিই প্রচার করেন। ঠাকুরের ছবি এবং তাঁর সম্পর্কীয় পুস্তক বিক্রয়ের দ্বারা ঘরে ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি ও ভাবধারা প্রচারে তিনি বিশেষ সহায়ক হন। এমনকি, ঠাকুরের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মতামত খণ্ডনের জন্য তিনি পত্র বা বক্তৃতা মারফৎ প্রতিবাদও করতেন। ঠাকুরের ছবি ও বই বিক্রীর অর্থ, তিনি ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় ব্যয় করতেন। ঠাকুরের অশেষ কৃপার কথা স্মরণ করে তিনি আত্মহারা হতেন এবং শেষদিন অবধি সর্বক্ষণ ঠাকুরের চিন্তা ও নামগানে বিভোর থেকে বহু ভক্তকে আকৃষ্ট করতেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-সন্তান শ্রীহরমোহন, কলকাতার বিডন স্ট্রীটের কাছে ৪০ নং নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীটের বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন।

*

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত। ১৮৭১ অথবা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা "রায়বাহাদুর" ছিলেন।

শ্যামবাজারে "মেট্রোপলিটন স্কুলে" তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কথামৃত-প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে

পূর্ণচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন এবং তাঁর মধুর আপ্যায়নে বিহ্বল হয়ে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেন। প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই পূর্ণচন্দ্র বাড়ীর কড়া শাসন উপেক্ষা করে নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানে হৃদয়ে স্থান দেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় পূর্ণচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন, একথা জানতে পেরে তাঁর পিতা সেই বিদ্যালয় থেকে পূর্ণচন্দ্রকে ছাড়িয়ে অপর বিদ্যালয়ে ভর্তি করান, কিন্তু তাতে পূর্ণচন্দ্রের অন্তরের ভাবের কিছুই পরিবর্তন হয়নি এবং বরাবরই তিনি ঠাকুরের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করেন। এই অবস্থাতেই পূর্ণচন্দ্র, ঠাকুরের বিশেষ কৃপালাভ করেন এবং স্বপ্নেও ঠাকুরকে দর্শন করতে থাকেন। ঠাকুর পূর্ণচন্দ্রকে এত স্নেহ করতেন যে, তাঁকে কিছুদিন দেখতে না পেলে অস্থির হয়ে উঠতেন; নরেন্দ্রনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ) না দেখলে যেমন ঠাকুরের প্রাণ ছট্‌ফট্ করত, পূর্ণচন্দ্রকেও না দেখলে ঠাকুরের একই অবস্থা হত। পিতার ভয়ে দক্ষিণেশ্বরে যেতে পূর্ণচন্দ্রের কিছুদিন দেরী হলেই, ঠাকুর স্বয়ং কলকাতায় এসে, অপর কোন ভক্তের বাড়ীতে পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হতেন। একদা কোনও এক ভক্তগৃহে মিলিত হয়ে ঠাকুর স্বহস্তে পূর্ণচন্দ্রকে আহার করান এবং আরেকবার কলকাতায় এসে রাস্তায় দাঁড়িয়েই পূর্ণচন্দ্রকে আলিঙ্গন করে তার মুখে সন্দেশ তুলে দেন। পূর্ণচন্দ্রের আধ্যাত্মিক আধারের বিরাটত্ব সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের পরেই পূর্ণচন্দ্রের স্থান বলে ঠাকুর উল্লেখ করেছিলেন এবং গৃহীভক্তদের মধ্যে একমাত্র পূর্ণচন্দ্রকেই "ঈশ্বর কোটী" বলে নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে ঠাকুরের এই উচ্চ ধারণা সত্ত্বেও, পরবর্তীকালে সাংসারিক চাপে পড়ে পূর্ণচন্দ্র এই পথ থেকে স'রে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর, ঠাকুরের অনেক ভক্ত-সন্তান সন্ন্যাস গ্রহণ করায় পূর্ণচন্দ্রের পিতা স্বীয় পুত্রের সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়েন এবং জোর করে মাত্র ১৬ বছর বয়সেই পূর্ণচন্দ্রের বিবাহ দিয়ে সংসারে আবদ্ধ করেন। এমনকি, ঠাকুরের অন্যান্য ভক্ত সন্তানদের সংস্পর্শ থেকে পূর্ণচন্দ্রকে দূরে রাখার জন্য তাঁর পিতা তদানীন্তন ভারত সরকারের অধীনে তাঁর চাকরীর ব্যবস্থা করেন এবং সেই চাকরী উপলক্ষে পূর্ণচন্দ্র কলকাতা থেকে বহুদূরে দিল্লী ও সিমলায় থাকতে বাধ্য হন। অবশ্য কলকাতায় এলেই তিনি বেলুড় মঠে ও বলরাম-মন্দিরে নিয়মিত যেতেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ত্যাগী-সন্তানদের সঙ্গে হৃদ্যতা বজায় রাখায় তাঁরাও পূর্ণচন্দ্রকে বিশেষ

সম্মান করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর কলকাতায় থাকাকালীন পূর্ণচন্দ্র কিছুদিনের জন্য "বিবেকানন্দ সোসাইটি"র সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন এবং নিয়মিত সমিতিভবনে গিয়ে সবাইকে ঠাকুরের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করেন। পরম ভক্ত পূর্ণচন্দ্র, ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও, ঠাকুরের দর্শন, স্পর্শ এবং কৃপা লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। একদা নিদারুণ অসুস্থ অবস্থায় পূর্ণচন্দ্র একাকী রাত্রে ঘরের বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে মাথা ঘুরে প'ড়ে যাওয়ার সময়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সেখানে দর্শন দিয়েছিলেন এবং তাঁকে নিজে ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণজ্ঞানী-সন্তান, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেহত্যাগ করেন।

*

কালীপদ ঘোষ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরে প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র অষ্টম শ্রেণী অবধি পড়ার পর তিনি "জন্ ডিকিন্স" নামক এক বিলাতী কোম্পানীর অফিসে চাকরী গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে সেখানকার সর্বোচ্চ পদ লাভ করেন। নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা থাকায়, প্রথম জীবনে দুজনে একই সঙ্গে সুরাপানে মত্ত থাকতেন। এজন্য গিরীশচন্দ্র ও কালীপদকে সাধারণ লোকে "জগাই-মাধাই" বলত, আর এই দানবীয় প্রকৃতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ কৌতুকভরে কালীপদকে "দানা কালী" বলতেন।

কালীপদর দিন দিন অশান্ত জীবন লক্ষ্য করে তাঁর ভক্তিমতী স্ত্রী একদা দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এই কদাচার থেকে তাঁর স্বামীকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা জানান এবং কৃপাময় ঠাকুরও তাঁর প্রার্থনা সফল করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। এমনকি, ঠাকুর তাঁকে জানান—"কালী এখানকারই লোক, সুতরাং একদিন ওর মতিগতি ফিরবেই।"

বন্ধু গিরীশচন্দ্রের সঙ্গে কালীপদ প্রথম যেদিন দক্ষিণেশ্বরে যান, সেদিন তিনি ঠাকুরকে প্রণাম না করেই বসে পড়েন। সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোন আলাপ হয়নি এবং কিছুক্ষণ বাদেই তিনি সেখান থেকে বিদায় নেন। কিন্তু পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার জন্য সহসা তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হওয়ায়, তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে পুনরায় উপস্থিত হন। ঠিক সেই সময়েই ঠাকুর কলকাতায় আসার জন্য গঙ্গায় নৌকাতে আরোহণ করায়

সময়, কালীপদকেও সেই নৌকায় তুলে নেন। সেদিন গঙ্গাবক্ষে নৌকার ভেতরেই ভাগ্যবান কালীপদর জিহ্বায় আঙুল দিয়ে কিছু লিখে, ঠাকুর তাঁকে বিশেষ কৃপাদান করেন এবং সেইদিনই অযাচিতভাবে কালীপদর শ্যামপুকুরের বাড়িতে ঠাকুর প্রথম শুভাগমন করে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। উক্ত ঘটনার পর থেকেই কালীপদর স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয় এবং তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ও শিষ্যরূপে পরিগণিত হন। পরে কালীপদর বাড়ীতে ঠাকুর আরও কয়েকবার শুভাগমন করেন এবং কাশীপুরে "কল্পতরু" হওয়ার দিনেও কালীপদর বক্ষস্পর্শ করে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। শ্যামপুকুরে অসুস্থ অবস্থায় থাকাকালীন ঠাকুরের আদেশানুসারে ৺কালীপূজার রাত্রে সেখানে তিনি ৺কালীপূজার ব্যবস্থা করেন এবং সেদিন ঠাকুরের মধ্যে ৺কালীমাতার ভাবাবেশ দর্শন করে গিরীশচন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তগণসহ ৺কালীমাতা জ্ঞানে ঠাকুরের চরণে তিনিও পুষ্পাঞ্জলি দেন। কালীপদর নিবেদিত "পায়স" গ্রহণ করে ঠাকুর সেদিন তাঁকে কৃতার্থ করেন। সুগায়ক, বেহালা ও বংশীবাদক কালীপদর বাঁশী শুনে একদা ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর কালীপদ কাঁকুড়গাছির "যোগোদ্যানের" সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হন এবং ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের সঙ্গেও নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর চেষ্টায় ভারতের অনেক বড় বড় শহরে "জন্ ডিকিন্স" কোম্পানীর শাখা অফিস খোলা হয় এবং বিলাতী কোম্পানী হলেও তাঁর নির্দেশে তৎকালে সব অফিসেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি টাঙানো হয়, এমনকি অফিসের চাকরীতেও তিনি ঠাকুরের ভক্তদেরই নিয়োগ করতেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকালীপদ দেহত্যাগ করেন।

*

নবগোপাল ঘোষ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেলার বেগমপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ কুলীন কায়স্থ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি কলকাতায় বাদুড়বাগানে বাস করতেন এবং "হেণ্ডারসন" কোম্পানীতে উচ্চপদে চাকরী করতেন।

নবগোপাল তাঁর পত্নী ও সন্তানাদিসহ প্রথমদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এলে, ঠাকুর তাঁকে নিত্য কীর্তন করার জন্য নির্দেশ দেন। এরপর প্রায় তিন বৎসর, ঠাকুরের নির্দেশানুযায়ী নবগোপাল প্রত্যহ

নিজ পরিবারের বালক-বালিকাদের নিয়ে খোল-করতাল সহযোগে কীর্তন করলেও ইতিমধ্যে তিনি আর দক্ষিণেশ্বরে যাননি। পরে অপর এক ভক্তের মাধ্যমে ঠাকুর তাঁকে ডেকে পাঠালে, নবগোপাল পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে যান এবং এই সময় ঠাকুর তাঁর কাছে যাওয়া-আসার জন্য নবগোপালকে উপদেশ দেন। এরপর থেকেই নবগোপাল স্ত্রী-পুত্রাদি সহ পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেশ্বরে যেতে শুরু করেন এবং বিভিন্নভাবে ঠাকুরের কৃপালাভ করে কৃতার্থ হন। একদা নিজবাড়ীতে ঠাকুরের পদার্পণের উদ্দেশ্যে নবগোপাল উৎসবের আয়োজন করেন এবং ঠাকুর সেই সময় তাঁর বাড়ীতে শুভাগমন করেন। সেইদিন ঠাকুরের দেহে কয়েকটি অলৌকিক ক্রিয়া দর্শন করে নবগোপাল ধন্য হন এবং ঠাকুরকে নিজবাড়ীতে আহার করাতে সমর্থ হন। কাশীপুরে ঠাকুর যেদিন "কল্পতরু" হন, সেদিন নবগোপাল উপস্থিত থাকায় ঠাকুরের বিশেষ কৃপা লাভ করেন; ঠাকুর নবগোপালকে সেদিন "রামকৃষ্ণ নাম" করার জন্য বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর থেকেই পরবর্তী সারাজীবন নবগোপাল "শ্রীরামকৃষ্ণ নামে" মগ্ন ছিলেন। পল্লীর বালক-বালিকাদের উৎসাহ দেবার জন্য তিনি "জয় রামকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করে তাদের মধ্যে বাতাসা বিতরণ করতেন এবং তারাও তাঁকে দেখলে উচ্চৈঃস্বরে ঠাকুরের নাম করে বাতাসা গ্রহণ করত। এই নাম প্রচারের ফলে, নবগোপাল নিজ পল্লীতে "জয়রামকৃষ্ণ" নামে সুপরিচিত হয়েছিলেন।

শেষজীবনে নবগোপাল কলকাতার বাদুড়বাগান ত্যাগ করেন এবং ঠাকুরের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায়, বিশেষ আকর্ষণবশতঃ হাওড়ার "রামকৃষ্ণপুর" গ্রামে বাড়ী কিনে, সেখানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। নবগোপালের আমন্ত্রণে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ৮১ নং রামকৃষ্ণপুর লেনের নতুন বাড়ীতে গিয়ে স্বহস্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেন; সেখানে আজও ঠাকুরের নিয়মিত পুজা হয়। ঠাকুরের উদ্দেশে বিখ্যাত প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য" ইত্যাদি মন্ত্রটি সেদিন স্বামীজী, নবগোপালের পূজার ঘরে বসে মুখে মুখে রচনা করেছিলেন এবং ঐ মন্ত্রে ঠাকুরকে প্রণতি জানিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণপুরে আসার পরেও নবগোপাল যতদিন বেঁচেছিলেন, প্রত্যহ গঙ্গাস্নানের পর বাড়ী ফেরার পথে পূর্বের মতন নিজে "রামকৃষ্ণনাম" কীর্তন করতেন এবং অপরকেও "জয় রামকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিয়ে বাতাসা বিতরণ করতেন। নবগোপালের স্ত্রী-ও ঠাকুরের প্রতি অতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন এবং তাঁর একপুত্র "নীরদ" সন্ন্যাস গ্রহণ করে বেলুড় মঠে "স্বামী অম্বিকানন্দ" নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নামানুরাগী শ্রীনবগোপাল হাওড়া জেলায় দেহত্যাগ করেন।

*

দুর্গাচরণ নাগ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট তিনি পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জ শহরের কাছে "দেওভোগ" নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি "নাগমশাই" নামে পরিচিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ বাংলা-বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী অবধি পাঠ শেষ করে দুর্গাচরণ ঢাকা শহরের "নর্ম্যাল স্কুলে" লেখাপড়া করেন এবং পিতার কর্মস্থল কলকাতায় এসে তদানীন্তন "ক্যাম্প্‌বেল মেডিক্যাল স্কুলে" (বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) ডাক্তারী পড়া শুরু করেন; কিন্তু সেই পড়া অসমাপ্ত রেখেই তিনি জনৈক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করে এই শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হন এবং হোমিওপ্যাথ ডাক্তাররূপে চিকিৎসা জগতে প্রতিষ্ঠিত হন। কলকাতায় আসার আগেই যদিও তাঁর বিবাহ হয়েছিল, তবু স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি সর্বদা দূরে থাকতেন। কলকাতায় আসার পরেই গ্রামে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায়, পিতার চাপে তিনি গ্রামে ফিরে গিয়ে পুনরায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, কিন্তু জীবনে তিনি কোনদিনই স্ত্রী-সঙ্গ করেননি, বরং স্ত্রীকে আধ্যাত্মিক জীবন অনুসরণে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেও, সংসার-বিমুখ দুর্গাচরণ সর্বদাই আধ্যাত্মিকভাবে মগ্ন থাকতেন এবং বিনা পয়সায় হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করতেন। প্রথম অবস্থায় কুলগুরুর কাছে সস্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেবার পর, দুর্গাচরণ পিতার সঙ্গে গ্রামের বাড়ীতে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে কলকাতায় বসবাস করে পিতার কর্মস্থলে যোগদান করেন।

একদা সাধুদর্শন উপলক্ষে দুর্গাচরণ তাঁর বন্ধুসহ প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে গেলে, ঠাকুরের নির্দেশে তিনি সেখানে পঞ্চবটীতে ধ্যান করেন। পুনরায় দ্বিতীয়বার বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে গেলে, ঠাকুরের নির্দেশে সেবারেও তিনি পঞ্চবটীতে ধ্যান করেন। তৃতীয়বার তিনি একাকী দক্ষিণেশ্বরে যান এবং এই সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁর বক্ষে চরণ অর্পণ করে তাঁকে বিশেষ কৃপা করেন; ফলে, তিনি অন্য এক অনুভূতির রাজ্যে উপস্থিত হয়ে দিব্যজ্যোতি দর্শন করেছিলেন। এরপর থেকেই দুর্গাচরণ

নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া শুরু করেন এবং বিভিন্নভাবে ঠাকুরের সেবা করে ধন্য হন। ক্রমে ক্রমে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা এবং পিতার কাজও ত্যাগ করে দুর্গাচরণ অন্তরে বৈরাগ্যের স্পৃহা নিয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন; কিন্তু ঠাকুর তাঁকে গৃহস্থাশ্রমে থেকেই গৃহীদের ধর্মশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করার নির্দেশ দিলে, তিনি যথাযথভাবে আজীবন তা পালন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি "গার্হস্থ-সন্ন্যাস" গ্রহণ করায়, তাঁকে "সাধু নাগমশাই" বলা হত। অহিংসা ও করুণার প্রতীক হিসাবে যদিও দুর্গাচরণ সংসারে বাস করতেন, তবু গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দাবাদ শুনলে, নিন্দাকারীকে প্রহার করতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। পরদুঃখে কাতর দুর্গাচরণ সব সময় দীন দরিদ্রদের যথাসাধ্য সাহায্য করতেন এবং প্রাণপণে অতিথি সেবা করতেন। প্রয়োজনবোধে তিনি যোগবলে অনেক অসাধ্য সাধন করেছিলেন এবং কয়েকবার সমাধিমগ্নও হয়েছিলেন। তপস্যার জন্য সর্বপ্রকার উগ্রকৃচ্ছ্র সাধন করে, তিনি গৃহস্থজীবনে উদাহরণ স্বরূপ সন্ন্যাসীর ন্যায় বিরাজ করতেন।

কাশীপুরে অসুস্থ অবস্থায় গাত্রদাহ কমাবার উদ্দেশ্যে ঠাকুর একদিন দুর্গাচরণের শীতলদেহ স্পর্শের জন্য তাঁকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ বসেছিলেন। সে সময় ঠাকুরের রোগযন্ত্রণা দুর্গাচরণের কাছে দুর্বিসহ হওয়ায়, তাঁকে সুস্থ করার জন্য দুর্গাচরণ যোগবলে নিজের শরীরে ঠাকুরের রোগ ধারণ করার জন্য উদ্যত হলে, ঠাকুর তাঁকে সে কাজ থেকে নিবৃত্ত করেন। অতঃপর ঠাকুরের দেহরক্ষা হলে, দুর্গাচরণ নিদারুণ শোকে আহার-নিদ্রা, এমনকি শৌচাদিও পরিত্যাগ করে শয্যাগ্রহণ করায়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের একান্ত চেষ্টায় তাঁকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়। ঠাকুরের প্রতি দুর্গাচরণের অপরিসীম ভক্তির নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য যে, ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণকালে দুর্গাচরণ প্রসাদের সঙ্গে প্রসাদ-রাখার পবিত্র পাতাটিও ভক্তি সহকারে ভক্ষণ করতেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতিও তাঁর অসীম ভক্তি ছিল; একদা বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর ভাড়া বাড়ীতে দুর্গাচরণ শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে, শ্রীশ্রীমা স্বহস্তে তাঁকে প্রসাদ খাওয়ান এবং মায়ের দেওয়া একখানি বস্ত্র তিনি ভক্তি সহকারে নিজের শিরোভূষণ করে রাখেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায়, শেষজীবনে তিনি স্বীয় গ্রাম দেওভোগে বাস করলেও, স্বামী সারদানন্দ কার্য উপলক্ষে ঢাকায় গিয়ে শেষ সময়ে তাঁর বাড়ীতে যান এবং স্বীয়কণ্ঠে তাঁকে গান শোনান। মৃত্যুর তিন দিন আগে তিনি স্বামী সারদানন্দের কাছে তাঁর দেহত্যাগের নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে জানিয়ে

দিয়েছিলেন। ১৯০১ সালে পূর্ববঙ্গ সফরের সময় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বাসগৃহ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন; অবশ্য দুর্গাচরণ তখন জীবিত ছিলেন না।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সন্তান শ্রীদুর্গাচরণ তাঁর স্বগ্রাম দেওভোগে দেহত্যাগ করেন।

*

অধরলাল সেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ তিনি কলকাতার আহিরীটোলায় সুবর্ণ বণিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি বাড়ী হুগলী জেলায় সিঙ্গুড়গ্রামে। পিতার নতুন বাড়ী ২৭নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীটে তিনি বাস করতেন। বারো বছর বয়সে মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার পরই তাঁর বিবাহ হয়। পরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করে তিনি "বৃত্তি" পান এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে ইংরাজী সাহিত্যে তিনি "ডাফ্-স্কলারশিপ" পান। এরপর তিনি বি. এ. পাশ করেন এবং ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী গ্রহণ করেন; শেষ অবধি তিনি ঐ পদেই বহাল ছিলেন। কর্মজীবনে সাহিত্য সম্রাট ও ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা ছিল। অধরলাল প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফ্যাকালটি-অফ-আর্টসের" সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরে ভারত সরকার কর্তৃক "ফেলো" মনোনীত হন। কবি হিসাবেও প্রথম জীবন থেকেই তাঁর প্রতিষ্ঠা হয় এবং "ললিতা-সুন্দরী", "মেনকা", "নলিনী", "কুসুমকানন" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

"ইণ্ডিয়ান মিরার", "সুলভ-সমাচার" প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পাঠ করে অধরলাল প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় জানতে পারেন এবং একদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে দর্শন করতে যান। প্রথম দর্শনের দিনই অধরলাল, ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং তাঁকেই সমস্ত মন-প্রাণ সমর্পণ করেন। এরপর থেকেই নানা কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও অধরলাল প্রায়ই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত শুরু করেন এবং মনের সকল প্রকার সংশয় দূর করেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে অধরলালের জিহ্বায় ঠাকুর কিছু লিখে তাঁকে বিশেষ কৃপা করেন এবং দিব্যানন্দের আস্বাদ দান করেন। অধরলালের বেনিয়াটোলার বাড়ীতেও ঠাকুরের বহুবার শুভাগমন হয়েছিল। অধরলালের বাড়ীর আনন্দ উৎসবাদিতে

ঠাকুর যোগদান করতেন এবং তাঁর বৈঠকখানায় বহু ভক্তের সঙ্গে মিলিত হতেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অধরলালের বাড়ীতেই ঠাকুরের মিলন হয়েছিল। সুবর্ণবণিক অধরলালের বাড়ীতে অনেক ব্রাহ্মণ আহারাদিতে আপত্তি জানালেও, ঠাকুর নিজে ভক্তের বাড়ীতে বিন জাতি-বিচারে উৎসবের সময় প্রসাদ গ্রহণ করতেন এবং অপর ব্রাহ্মণ ভক্তদের সংস্কার ত্যাগ করার জন্য উপদেশ দিতেন।

ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী উপলক্ষে সরকারী কাজে মাঝে মাঝে অধরলালকে অশ্বারোহণ করতে হত এবং এই অশ্বারোহণ সম্পর্কে ঠাকুর বহুবার তাঁকে সাবধান করেন। কিন্তু ঠাকুরের নিষেধ সত্ত্বেও সরকারী কাজে অশ্বারোহণ করে অবশেষে একদিন অধরলাল সত্যই অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে যান এবং তাঁর বাম হাতের কব্জি ভেঙে যায়। এই দুর্ঘটনার ফলে তাঁর "ধনুষ্টঙ্কার" শুরু হয় এবং তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেন। কৃপাসিন্ধু ঠাকুর এই সংবাদ শুনে নিজেই অধরলালকে দেখতে যান এবং অশ্রুপ্লাবিত চোখে তাঁর অঙ্গে হাত বুলিয়ে দেন; অবশেষে তাঁর মৃত্যু হলে ঠাকুর নিদারুণ শোকে মুহ্যমান হন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী, ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য শ্রীঅধরলাল, ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই অকালে কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

*

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য। তাঁর বাড়ী ছিল নদীয়া জেলায়। কার্য উপলক্ষে তিনি কলকাতায় বাস করতেন; পরে বাগবাজারে নিজে বাড়ী কিনেছিলেন। তিনি সরকারী ষ্টেশনারী অফিসে অল্প বেতনের কর্মচারী ছিলেন এবং অতিকষ্টে সংসার চালাতেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে বৈকুণ্ঠনাথ ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর পূত সঙ্গ লাভ করে ধন্য হন। এই সময় ঠাকুর যোগদৃষ্টি সহায়ে বৈকুণ্ঠনাথের জন্ম-জন্মাগত মানসিক সংস্কারগুলি অবলোকনের দ্বারা, তাঁকে যথানির্দিষ্ট "মন্ত্র" দান করে পরম কৃপা করেন এবং বৈকুণ্ঠনাথও তাঁর পরমভক্তে পরিণত হন কাশীপুর উদ্যান বাটীতে ঠাকুরের "কল্পতরু" হওয়ার দিনেও বৈকুণ্ঠনাথ উপস্থিত থাকায়, ঠাকুর তাঁর বক্ষস্থল স্পর্শ করেন এবং বৈকুণ্ঠনাথ অপূর্ব অনুভূতির অধিকারীরূপে সর্বত্র ঠাকুরের প্রসন্ন মূর্তি দর্শন করতে থাকেন। এমনকি, ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও বৈকুণ্ঠনাথ যখন-তখন ঠাকুরের সেই মূর্তি দর্শন করে স্তম্ভিত হতেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে

নরেন্দ্রনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ) দেখার জন্য আকুল হয়ে ঠাকুর, বৈকুণ্ঠনাথের কাছে শিশুর মতন ক্রন্দন করেন এবং নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের এই অসীম স্নেহ দেখে তিনি বিস্মিত হন। যেদিন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর ঘরে গিয়ে বিবেক-বৈরাগ্য প্রার্থনা করেছিলেন, ঠিক তার পরের দিনই বৈকুণ্ঠনাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলে, ঠাকুর আনন্দের সঙ্গে তাঁকে জানান যে, নরেন "কালী মেনেছে।" সেদিন নরেন্দ্রনাথও সেখানে উপস্থিত থাকায়, বৈকুণ্ঠনাথের সামনেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় নরেন্দ্রনাথের শরীর এবং নিজের শরীর পর পর দেখিয়ে বলেন, "এটাও যা, ওটাও তা; ওটাও আমি, এটাও আমি।" এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরূপে বৈকুণ্ঠনাথ সেদিন ঠাকুর ও স্বামীজীর অভেদাত্মার পরিচয় জানতে পারার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনিও পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ, তথা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। স্বামীজীর প্রতি তাঁর এত গভীর ভালবাসা ছিল যে, স্বামীজী বিদেশে চ'লে গেলে, বৈকুণ্ঠনাথও হিমালয়, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থান ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন; অবশ্য সকলের উপদেশে পরে তিনি পুনরায় নিজের কর্মে ফিরে এসেছিলেন।

রামকৃষ্ণ-মঠের সাধুদের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল এবং তাঁদের সঙ্গেও বৈকুণ্ঠনাথ বহু তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন। স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে তিনি অধিকাংশ জীবন একত্রে অতিবাহিত করায় জীবনের শেষদিন অবধি দুজনের মধ্যে অসীম হৃদ্যতা বজায় ছিল। পরিণত বয়সে তিনি "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত" নামক পুস্তক রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে 'সন্ন্যাস' অবলম্বন করায় তিনি "স্বামী কৃপানন্দ" নামে অভিহিত হন; গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন "সাণ্ডেল মশাই"।

*

কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার হালিশহর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং সরকারী উচ্চপদে চাকরী করতেন।

প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মসমাজ, কর্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যোগদান করেন এবং অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় ঠাকুর তাঁকে পরম কৃপাদান করে সত্যকারের সাধন পথে আকর্ষণ করেন। কেদারনাথ "অবতার' রূপে ঠাকুরকে অন্তরে গ্রহণ করেন এবং তাঁর নির্দেশিত সাধন-ভজনে নিজেকে সর্বদা নিযুক্ত

রাখেন। তাঁর কর্মস্থল ঢাকা থেকে কলকাতায় এলেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং তাঁর কথামৃত পান করতেন। ভজন-কীর্তন শুনে কেদারনাথের চোখে অশ্রু বইতো এবং ঠাকুর তাঁকে "উচ্চথাকের লোক" ব'লে বিশেষ স্নেহ করতেন। ঢাকায় থাকাকালীন তিনি ভক্তসঙ্গে ঠাকুরের প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে থাকতেন এবং ঠাকুরের মুখেও কেদারনাথের প্রশংসা প্রায়ই শোনা যেত। ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) বা নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্রের সঙ্গে কেদারনাথের নানা বিষয়ে তর্ক বাধিয়ে বেশ আনন্দ উপভোগ করতেন। ঠাকুরের প্রতি কেদারনাথের অসীম ভক্তি লক্ষ্য করে একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন কেদারনাথের পায়ের ধুলো নিতে।

একদা কলকাতায় ভক্ত অধরলাল সেনের বাড়ীতে ঠাকুরের সঙ্গে উৎসবে যোগদান করে, কেদারনাথ তাঁর বাড়ীতে আহার করতে আপত্তি জানান; কারণ কেদারনাথ ব্রাহ্মণ আর অধরলাল স্বুবর্ণ বণিক; তাই সামাজিক সংস্কার অনুযায়ী স্বুবর্ণ বণিকের বাড়ীতে ব্রাহ্মণের পক্ষে আহার করা অনুচিত। কিন্তু ভক্তের জাতিভেদ ভুলে যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন, তখন কেদারনাথও সামাজিক প্রথার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সেখানে আহার করেন এবং গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান।

*

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য। তিনি ছিলেন কলকাতার ঠন্‌ঠনিয়ার অধিবাসী এবং সরকারী কর্মচারী। তিনি এ. জি. বেঙ্গল অফিসে স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ঈশানচন্দ্র পরম দয়ালু, দানবীর, ভগবৎ-প্রেমিক এবং জপ-পরায়ণ ছিলেন। তাঁর প্রতিটি পুত্রই ছিলেন কৃতবিদ্য; তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র গোপালচন্দ্র ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মধ্যমপুত্র শ্রীশচন্দ্র ছিলেন জেলাজজ এবং কনিষ্ঠপুত্র সতীশচন্দ্র ছিলেন গাজীপুরের সরকারী কর্মচারী। সতীশচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সহপাঠী ছিলেন এবং ভাল পাখোয়াজ-বাদক ছিলেন। তাঁরই গাজীপুরের বাড়ীতে স্বামীজী সন্ন্যাসী হবার পর কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে থাকাকালীন প্রখ্যাত পওহারী বাবাকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। ঈশানচন্দ্রের দয়ার কথা উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছিলেন যে, তাঁর দয়া—বিদ্যাসাগরের চাইতে কিছুতেই কম ছিল না। অপরের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে, ঈশানচন্দ্র সাধ্যমত সাহায্য করতেন এবং যখন সাধ্যে কুলাতো না, তখন তিনি অশ্রু

বিসর্জন করতেন। স্বামীজী স্বচক্ষে দেখেছিলেন যে, ঈশানচন্দ্র নিজের অন্ন কতদিন অভুক্ত ভিখারীদের দান করে, নিজে সারাদিন উপবাসে কাটিয়েছেন। ঈশানচন্দ্র এমন দান করতেন যে, শেষে দেনাগ্রস্ত হয়ে দিন কাটাতেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে, ঈশানচন্দ্র ঠাকুরের আশ্রিতরূপে পরিগণিত হন। একবার দক্ষিণেশ্বরে উদয়াস্ত জপ সমাপনের পর ঈশানচন্দ্র যখন ঠাকুরকে প্রণাম করতে যান, তখন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ঈশানচন্দ্রের মস্তকে চরণ স্থাপন করে তাঁকে বিশেষ কৃপা করেন। ঠাকুরের প্রতি পরমভক্তিপরায়ণ ঈশানচন্দ্রের বাড়ীতেও ঠাকুর শুভাগমন করেছিলেন এবং তাঁর সুখকর গার্হস্থ জীবনের প্রশংসা করেছিলেন। ঈশানচন্দ্র শেষ জীবনে ভাটপাড়ায় গঙ্গাতীরে গিয়ে, মাঝে মাঝে নির্জন সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

*

প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত এবং হুগলী জেলার জনাইগ্রাম নিবাসী মুখুজ্যেদের বংশধর। তিনি ম্যাকেঞ্জিলায়ালের এক্সচেঞ্জের বড়বাবুর পদে কাজ করতেন। প্রাণকৃষ্ণ বৈদান্তিক হয়েও, ঠাকুরের ভক্তিভাবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে, ঠাকুরের কৃপালাভ করেছিলেন। প্রাণকৃষ্ণকে ঠাকুর খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁর স্থূলকায় শরীরের দরুন তাঁকে "মোটা বামুন" বলে ডাকতেন। প্রাণকৃষ্ণের কলকাতার শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের বহুবার ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হয়েছিল।

একদা ঠাকুরের কাছে অপুত্রক প্রাণকৃষ্ণ একটি পুত্রসন্তানের জন্য কামনা জানালে, ঠাকুর তা পূর্ণ করেন। ঠাকুরের আশীর্বাদে প্রাণকৃষ্ণের দ্বিতীয়া পত্নীর একটি পুত্রসন্তান হওয়ার পর থেকেই, ঠাকুরের প্রতি তাঁর ভক্তি আরো বৃদ্ধি পায় এবং সেজন্য তিনি ঠাকুরকে নিয়ে খুব উৎসব করতেন।

*

মহিমাচরণ চক্রবর্তী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী এবং উত্তর কলকাতার কাশীপুর নিবাসী জ্ঞানমার্গের সাধক। কিছু পৈতৃক সম্পত্তি থাকায় তিনি স্বাধীনভাবে বাস করতেন এবং কোন চাকরী বা অন্য কর্মও করতেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের

সংস্পর্শে এসে তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হন এবং বহুদিন যাবৎ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করেন। ঠাকুরের সঙ্গে তিনি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে যোগদান করতেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) কাছে প্রতি বিষয়ে তিনি তর্কে পর্যুদস্ত হতেন। তিনি একজন সুগায়কও ছিলেন এবং মাঝে মাঝে ভক্তিমূলক সঙ্গীত গেয়ে ঠাকুরকে শোনাতেন। ঠাকুরও ভাগ্যবান্ মহিমাচরণের কাশীপুরের বাড়ীতে শুভাগমন করে উৎসবে আহারাদি করেছিলেন এবং নৃত্যগীতে সবাইকে মাতিয়েছিলেন ও নিজে সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই একদা মহিমাচরণ স্বপ্নে ঠাকুরের কাছ থেকে একটি "মন্ত্র" পান এবং সেই মন্ত্রে ঠাকুরের অপর ভক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তকে দীক্ষাদানের আদেশ পান। মহিমাচরণ সেই স্বপ্নের ঘটনা ও মন্ত্রটি ঠাকুরের কাছে প্রকাশ করলে, ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সমাধিস্থ হন এবং পরে ঠাকুরের আদেশে ভাগ্যবান্ মহিমাচরণ সেই মহামন্ত্রেই মণীন্দ্রকৃষ্ণকে দীক্ষাদান করেন। শেষ জীবনে জ্ঞানমার্গের সাধক মহিমাচরণ শাক্ত-সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

*

ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত বরাহনগর নিবাসী তরুণ ভক্ত। প্রিয়দর্শন এবং ভক্তিমান্ ভবনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে প্রায়ই যেতেন এবং তাঁর কথামৃত পান করে মুগ্ধ হতেন। ঠাকুরও ভবনাথকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁকে "নিত্যসিদ্ধ" রূপে গণ্য করতেন। সুগায়ক ভবনাথের গান শুনে ঠাকুরের সমাধি হত এবং তিনি ভবনাথের হাতে আহারও করতেন। নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে ভবনাথের অসাধারণ ভালবাসা দেখে ঠাকুর রহস্য করে ভবনাথকে বলতেন—"জন্মান্তরে তুই নরেন্দ্রের জীবন-সঙ্গিনী ছিলি বোধহয়!" ভবনাথ ঠাকুরের কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছিলেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুমন্দিরের সিঁড়িতে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে অবস্থান করার সময়, ভবনাথ তাঁর বন্ধু ফটোগ্রাফার অবিনাশ চন্দ্র দাঁ-কে আনিয়ে ঠাকুরের সেই অবস্থার একটি ফটো তোলান; পরে এই ফটো ঠাকুরকে দেখালে তিনি বলেছিলেন—"এই ছবি একদিন ঘরে ঘরে পূজা হবে।" বলা বাহুল্য, ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থায় বসা, প্রচলিত যে-ছবিখানি এখন সর্বত্র পূজা হয়, তা ভবনাথের উদ্যোগে তোলা সেই বিখ্যাত ছবি।

পরবর্তীকালে মাতা-পিতার আগ্রহে ভবনাথ বিবাহ করলেও, পত্নী যাতে ধর্মপথের সহায় হন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি পত্নীকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে

আসেন এবং ঠাকুরও নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেন। ভবনাথের বিবাহের বিষয়ে ঠাকুর বলেছিলেন—"ভবনাথ বিয়ে করেছে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ধর্ম কথা কয়; ঈশ্বরের কথা নিয়েই দুজনে মেতে থাকে। আমি বললুম, পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি;—তখন রেগে রোক কোরে বললে, কি! আমরাও আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে থাকবো?" শেষের দিকে অবশ্য ঠাকুরের সঙ্গে ভবনাথের যোগাযোগ অনেক কমে যায় এবং দোসর নরেন্দ্রনাথের সঙ্গেও তিনি সম্পর্কহীন হয়ে পড়েন। তাই একবার শ্যামপুকুরে অসুস্থ ঠাকুরকে দেখতে গিয়ে তিনি "কেমন আছেন" বলে, পরে আর কোন খবর না রাখায়, ঠাকুর ভবনাথের আচরণে মর্মাহত হয়েছিলেন।

*

হরিশচন্দ্র মুস্তাফী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত এবং কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের মাতুল। ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণাতেই হরিশ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত শুরু করেন এবং তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বাড়ীতে সুন্দরী স্ত্রী, পুত্র, অন্নের সংস্থান থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে হরিশ বৈরাগ্যপ্রবণ হয়ে ওঠেন এবং সকল কিছু ত্যাগ করে দক্ষিণেশ্বরেই বাস করতে থাকেন। হরিশের সরল স্বভাব, একনিষ্ঠা এবং শান্তভাব দেখে ঠাকুর তাঁকে আশ্রয় দান করেন এবং হরিশও ঠাকুরের সেবা ও জপ ধ্যানে বেশীর ভাগ সময় নিজেকে নিযুক্ত রাখেন।

হরিশের এই বৈরাগ্যভাবের ফলে তাঁর বাড়ীর সকলেই অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁর স্ত্রী কান্নাকাটি করে অন্নজল ত্যাগ করেন। এই ঘটনায় ঠাকুর হরিশকে বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য বার বার উপদেশ দিয়েও বিফল হয়েছিলেন; কিন্তু পরে সংসারের লোকের চাপে হরিশ, ঠাকুরের আশ্রয় ছেড়ে সংসারে ফিরে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু পুনরায় যদি তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে চলে যান—এই আশঙ্কায় হরিশের স্ত্রী, স্বামীকে স্বীয় বশে রাখার জন্য "বশীকরণ ঔষধ" প্রয়োগ করেন; ফলে, হরিশের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং তিনি সর্বত্র উন্মাদের আচরণ শুরু করেন। বলাবহুল্য, এই মর্মান্তিক অবস্থায় ঠাকুরের সঙ্গে হরিশের সম্পর্ক ছেদ হয়।

পরবর্তীকালে, বহুদিন বাদে হরিশ যখন একবার কামারপুকুরে যান, তখনও তাঁর মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ অসুস্থ থাকায়, সেখানে গিয়ে তাঁর পাগলামী আরো বৃদ্ধি পায়। সেখানে একদিন উন্মাদ হরিশ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে কু-ভাবে আক্রমণ

করার চেষ্টা করলে, শ্রীশ্রীমা তাঁকে প্রতিহত করেন ; তিনি হরিশকে শুইয়ে তাঁর বুকে হাঁটু রেখে জিহ্বা টেনে বার করেন ও গালে চড় মেরে তাঁর পাগলামীর প্রতিকার করতে বাধ্য হন। এই ঘটনার ফলে, উন্মাদ হরিশের কিছু সম্বিৎ ফিরে আসে এবং তিনি ভয়ে এদেশ ত্যাগ করে সুদূর বৃন্দাবনে চলে যান ও সেখানে গিয়ে ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠেন।

*

কিশোরী গুপ্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত। তিনি ছিলেন কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বশতঃ তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতেন এবং সুযোগ পেলেই ঠাকুরের সবরকম সেবা করতেন। একদা ঠাকুর পরমস্নেহে তাঁর বক্ষে হাত দিয়ে তাঁকে কৃপা করেন।

অল্প মাহিনার চাকরীতে নিযুক্ত থাকায় কিশোরী তাঁর ছেলেপুলে নিয়ে অতিকষ্টে সংসার প্রতিপালন করেন শুনে, কৃপাসিন্ধু ঠাকুর স্বয়ং অন্যান্য ভক্তদের কাছে কিশোরীর একটি ভাল চাকরীর জন্য অনুরোধ করে তাঁর কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করেন। কিশোরী আজীবন ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

শেষ বয়সে তিনি একাকী বাড়ীতে বাস করতেন এবং তপস্যায় নিযুক্ত থাকতেন। বিনা ব্যাধিতেই তিনি যখন সেখানে দেহত্যাগ করেন তখন কেউই কাছে ছিলেন না।

*

হারাণচন্দ্র দাস

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত। তিনি কলকাতার বেলেঘাটায় বাস করতেন এবং "ফিন্‌লে মিওর কোম্পানীর" অফিসে কাজ করতেন। ঠাকুরের কাছে যাতায়াতের ফলে তিনি তাঁর ভক্তে পরিণত হন।

কাশীপুরে ঠাকুরের "কল্পতরু" হওয়ার দিন, অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে হারাণচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপালাভের জন্য তাঁর কাছে অগ্রসর হয়েছিলেন। হারাণচন্দ্র ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে প্রণাম করামাত্রই, সেদিন ঠাকুর তাঁর মস্তকে চরণ স্থাপন করে বিশেষ কৃপা করেন এবং হারাণচন্দ্র অকস্মাৎ এই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হন।

*

মণিমোহন সেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত ও পরম সেবক। তিনি ছিলেন চব্বিশ পরগণা জেলার পানিহাটীর অধিবাসী। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং ঠাকুরের পূতসঙ্গ লাভ করে আনন্দ পেতেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়ায়, তিনি কখনো একাকী, বা কখনো কয়েকজন বন্ধু ও ভক্তসহ দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সেবার জন্য তদারকী করতেন। ঠাকুরের পরমভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস, ঠাকুরের "প্রধান রসদদার" হিসাবে প্রথমে দেখাশোনা করতেন; কিন্তু মথুরানাথের দেহত্যাগের পর মণিমোহনই ঠাকুরের "অন্যতম রসদদার" হিসাবে ঠাকুরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দক্ষিণেশ্বরে পাঠিয়ে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করতেন; পরে অবশ্য ঠাকুরের অপরভক্ত শম্ভুচরণ মল্লিক ঐ কাজের ভার গ্রহণ করায়, মণিমোহন বেশীদিন সেবা করার সুযোগ পাননি।

এই সেন পরিবারের উদ্যোগেই চব্বিশ পরগণা জেলার পানিহাটীতে বৈষ্ণবদের বিখ্যাত "রাঘব পণ্ডিতের চিড়া মহোৎসবের" আয়োজন হত এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁরা প্রতিবছর মহোৎসবে নিয়ে যেতেন। উৎসব আনন্দের পর ঠাকুর মণিমোহনের বাড়ীতে বিশ্রাম করতেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করতেন। মণিমোহনকে ঠাকুর অত্যন্ত স্নেহ করায়, তাঁর বাড়ীতে বসে তিনি ভগবৎ-প্রসঙ্গ করেছিলেন এবং মণিমোহনের বৈঠকখানায় ঠাকুরের সমাধিও হয়েছিল। একদা উৎসব-শেষে পানিহাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে ফেরার জন্য মণিমোহন গাড়ী-ভাড়া এবং ঠাকুরকে প্রণামীস্বরূপ পাচটাকা দিতে চাইলে, ঠাকুর তা নিতে অস্বীকৃত হন। ঠাকুরের প্রতি অসীম ভক্তির জন্য মণিমোহন বরাবর ঠাকুরের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন।

*

নবচৈতন্য মিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য। তিনি ছিলেন ঠাকুরের অপর ভক্ত মনোমোহন মিত্রের পিতৃব্য এবং হুগলীজেলার কোন্নগরের অধিবাসী। সাধারণতঃ তিনি "নবাই চৈতন্য" নামে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বশতঃ তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং তাঁর কথামৃত পান করতেন। তিনি উত্তম কীর্তন গাইতে পারতেন এবং তাঁর উচ্চকণ্ঠে মনোহর কীর্তন শুনে ঠাকুর আনন্দে নৃত্য করতেন।

একদা পানিহাটীতে বৈষ্ণবদের "চিড়া মহোৎসবে" নবচৈতন্য যোগদান করেন এবং সেখানে ঠাকুরের আগমন বার্তা পেয়ে তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁর

কাছে ছুটে যান। সেদিন ঠাকুরের চরণে আছড়ে পড়ে নবচৈতন্য "কৃপা করুন" বলে প্রাণের আবেগে ক্রন্দন করতে থাকায়, তাঁর আন্তরিক ব্যাকুলতা ও অসীম ভক্তিতে ঠাকুর তাঁর ওপর প্রসন্ন হন এবং সেখানেই ভাবাবেগে নবচৈতন্যকে স্পর্শদ্বারা বিশেষ কৃপা করেন। ঠাকুরের কৃপালাভ করার পর থেকেই তাঁর জীবনে বিশেষ পরিবর্তন আসে এবং ক্রমশঃ তিনি সংসারে উদাসীন হয়ে পড়েন।

পরবর্তীকালে, নবচৈতন্য সমগ্র সংসারের ভার পুত্রের ওপর অর্পণ করেন এবং নিজগ্রাম কোন্নগরের গঙ্গাতীরে একটি পর্ণকুটীর তৈরী করে সেখানে সাধন-ভজন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম গানে জীবন অতিবাহিত করেন।

*

গোপাল সেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বরানগর নিবাসী তরুণ এবং "বিশেষ" ধরণের ভক্ত। তিনি তাঁর বন্ধু গোবিন্দ পালের সঙ্গে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং ভাবে সমাধিস্থ হতেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী তলায় ভাবস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গোপালের বুকে পা দিলে, গোপালও ভাবাবস্থায় ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে বলেন—"আমি আর এ সংসারে থাকতে পারছি না; আপনার এখন অনেক দেরী—আমি তবে যাই"। ঠাকুরও ভাবাবস্থায় তাঁকে বলেন—"আবার এস।" তিনিও "আবার আসব" বলে, ঠাকুরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদিন বাড়ী চলে যান। কিন্তু কিছুদিন পরেই ঠাকুর শোনেন যে, গোপাল সেন দেওঘরে গিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

এই ঘটনার সুদীর্ঘ কয়েক বছর পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে "নিত্যগোপাল" নামে বিশেষ শ্রেণীর এক ভক্তের আগমন হয়। নিত্যগোপালকে দেখেই ভাবাবস্থায় ঠাকুর জানতে পারেন যে, সেই গোপাল সেন নামক ছেলেটিই ইদানীং জন্মান্তরে নিত্যগোপালরূপে দেহধারণ করে পুনরায় ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। বলা আবশ্যক, গোপাল সেনের আত্মহত্যার সংবাদে ঠাকুর বলেছিলেন যে, ঈশ্বর দর্শন করার পর যদি কেউ স্বেচ্ছায় শরীর ত্যাগ করে, তবে তাকে আত্মহত্যা বলে না। এখানে উল্লেখ্য, ভক্ত গোপাল সেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করার পর আত্মহত্যা করেছিলেন এবং ঠাকুরের কাছে পুনরায় ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

*

আনন্দমোহন ঘোষ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, তথা শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষের পিতা। তাঁর অপর নাম ছিল হারাণচন্দ্র। তিনি ছিলেন চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিক্‌রা কুলীন গ্রামের সম্পত্তিসম্পন্ন জমিদার। তাঁর কুটুম্ব শ্রীমনোমোহন মিত্রও ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। পুত্র রাখালচন্দ্রের বিষয় নিয়েই আনন্দমোহন প্রধানতঃ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

পুত্র রাখালের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত, অথবা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বাস করা,—পিতা আনন্দমোহন মোটেই পছন্দ করতেন না। তাই রাখাল গৃহত্যাগ করে দক্ষিণেশ্বরে চলে গেলে, আনন্দমোহন স্বয়ং পুত্রের খোঁজে দক্ষিণেশ্বরে যান এবং সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করে ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হন। ঠাকুরের মুখে পুত্র রাখালের প্রশংসা শুনে আনন্দমোহন হৃষ্ট চিত্তে গৃহে ফিরে আসেন, কিন্তু ঠাকুরকে প্রার্থনা জানিয়ে আসেন যে, তিনি যেন রাখালকে বুঝিয়ে গৃহে পাঠিয়ে দেন। এরপর সত্য, সত্যই ঠাকুর, রাখালকে গৃহে পাঠিয়ে দিলেও রাখাল বার বার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ফিরে আসেন। আনন্দমোহনও কয়েকবার রাখালকে নিয়ে যাবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং এই উপলক্ষে কয়েকবার ঠাকুরের সঙ্গে মিলিতও হন। অবশেষে রাখালের গৃহে ফিরে যাওয়া সম্পর্কে হতাশ হয়ে আনন্দমোহন, ঠাকুরের কাছেই সেখানকার অনুপম স্বর্গীয় পরিবেশে রাখালকে রেখে আসেন এবং নিজেও ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। এমনকি, তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের শ্বশুর মশাইকেও তিনি ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন; কারণ, সেই শ্বশুর মশাই সাধক ছিলেন।

পরবর্তীকালে ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, আনন্দমোহন পুনরায় বরানগর মঠে গিয়ে রাখালকে ফিরিয়ে আনার জন্য শেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু সেবারেও তিনি বিফল হন এবং রাখালকে সংসারে আটকে রাখার সকল আশা ত্যাগ করেন।

*

রামকানাই ঘোষাল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ, তথা শ্রীতারকনাথ ঘোষালের পিতা। তিনি নিজেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত। চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত শহরের অধিবাসী রামকানাই উন্নত শক্তি-সাধক ছিলেন। তিনি বারাসাত শহরে রাণী রাসমণির

কাছারী-বাড়ীতে বাস করতেন এবং বারাসাত-আদালতে মোক্তারী করতেন। যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের পর তিনি রাণী রাসমণিরও মোক্তার নিযুক্ত হন এবং নানা কাজ উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে আসা-যাওয়া করেন। এই সময়েই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন।

দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের প্রথমাবস্থায় কিছুদিনের মধ্যেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচণ্ড গাত্রদাহ শুরু হয়; মাথায় ভিজা গামছা রেখে বা গঙ্গার জলে শরীর ডুবিয়ে রেখেও তাঁর শান্তি হত না। এমনকি, বুকের ভেতর এক মালসা আগুন জ্বালিয়ে রাখার মত প্রচণ্ড উত্তাপে ও যন্ত্রণায় ঠাকুর তখন অস্থির হয়ে পড়তেন। ঠিক সেই সময়েই দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকানাই ঐ দাহ নিবারণের জন্য ঠাকুরকে ইষ্টকবচ ধারণ করার পরামর্শ দেন এবং ঐ কবচ ধারণের পর থেকেই তাঁর শরীরের কষ্ট একেবারে নিবারণ হয়। এজন্য ঠাকুর রামকানাইয়ের ওপর খুব প্রসন্ন ছিলেন।

পরবর্তীকালে রামকানাইয়ের পুত্র তারকনাথ (স্বামী শিবানন্দ) যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন, তখন তাঁর পিতৃপরিচয় শুনে ঠাকুর তাঁর পিতা—পূর্বপরিচিত রামকানাইকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য অভিপ্রায় জানান। ঠাকুরের আহ্বানে রামকানাই দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে, ঠাকুর ভাবাবস্থায় রামকানাইয়ের স্কন্ধে একখানি চরণ তুলে দিয়ে তাঁকে বিশেষ কৃপাদান করেন। সে সময় রামকানাই, ঠাকুরের কাছে আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য প্রার্থনা জানালে, ঠাকুরও তা মঞ্জুর করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তারকনাথের পত্নী বিয়োগের পর, তারকনাথ সংসার ত্যাগ করে চিরদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের আশ্রয়ে থাকার ইচ্ছা পিতাকে জানালে, রামকানাই অশ্রুসিক্ত নয়নে পুত্রের মাথায় হাত দিয়ে ভগবান লাভের জন্য আশীর্বাদ করেন এবং সংসার ত্যাগ করার জন্য পুত্রকে সরল মনে, বিনা ঝঞ্ঝাটে অনুমতি দিয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, পিতা-পুত্র উভয়েই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করে ধন্য হন এবং একজন গৃহীভক্ত ও একজন ত্যাগীভক্তরূপে বিরাজ করেন।

*

গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী সারদানন্দ, তথা শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর পিতা। তিনি সঙ্গতি সম্পন্ন, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক ব্রাহ্মণ

ছিলেন। পুত্র শরৎচন্দ্রের বিষয় নিয়েই গিরীশচন্দ্র, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

পুত্র শরৎচন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) সংসার ত্যাগ করে কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত থাকায়, পিতা গিরীশচন্দ্রের মনে আশঙ্কা জাগে এবং তিনি শরৎচন্দ্রকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে ঠাকুরের সঙ্গে গিরীশচন্দ্রের কয়েকবার যোগাযোগ হয়।

একদা গিরীশচন্দ্র তৎকালীন স্বনামধন্য পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সঙ্গে কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন এবং তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কাছে পাণ্ডিত্যে ঠাকুরকে হার স্বীকার করিয়ে, পুত্রকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নেবার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রভাবে, তর্কালঙ্কার মহাশয় এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি গিরীশচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন—এমন গুরুর শিষ্য হওয়া তাঁর পুত্রের পক্ষে ভাগ্যের কথা! পরে আর একদিন গিরীশচন্দ্র, ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানান যে, তিনি যেন শরৎচন্দ্রকে বিবাহ করতে রাজী করান। কিন্তু সেদিন শরৎচন্দ্র স্বয়ং পিতার ঐ প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করায়, ঠাকুরও গিরীশচন্দ্রের কাছে ঐ বিষয়ে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য, এই বিষয় নিয়ে গিরীশচন্দ্র আর ঠাকুরকে পীড়াপীড়ি করেননি।

*

শিবকৃষ্ণ মিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, তথা শ্রীসারদাপ্রসন্ন মিত্রের পিতা। তিনি কলকাতার নন্দনবাগানে বাস করতেন। পুত্র সারদাপ্রসন্নের বিষয় নিয়েই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল।

পুত্র সারদাপ্রসন্ন (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ), কলেজের পড়া অবহেলা করে দক্ষিণেশ্বরে "পাগলা বামুন" শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করছে জানতে পেরে, পিতা শিবকৃষ্ণ, সারদাপ্রসন্নের ওপর খুব নির্যাতন করতেন। পরে পুত্রকে চিরদিনের মতন সংসারে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি যখন পুত্রের বিবাহের পাকাপাকি ব্যবস্থা করেন, সে সংবাদ জানতে পেরেই সারদাপ্রসন্ন গৃহত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রথমেই পালিয়ে আসেন; পাছে সেখানেও তাঁর পিতা তাঁর খোঁজে আসেন, সেজন্য অবশেষে সেখান থেকেও তিনি অবিলম্বে পুরীতে পালিয়ে যান। এদিকে

পলাতক পুত্র নিশ্চয়ই ঠাকুরের কাছে আছেন—এই ধারণা নিয়ে বিক্ষুব্ধ পিতা শিবকৃষ্ণ কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে পুত্রের সন্ধানে সত্যিই আসেন এবং পুত্রের পলায়নের বিষয়ে ঠাকুরকে নানারূপ দোষারোপ করেন। অবিচলিত ঠাকুর, বিক্ষুব্ধ পিতার মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং সারদাপ্রসন্নের পুরীতে পলায়নের কথা প্রকাশ করেন, এমনকি, সেদিন অশান্ত শিবকৃষ্ণকে ঠাকুর জলযোগ করিয়ে আপ্যায়িত ও শান্ত করেছিলেন। শিবকৃষ্ণ তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়ে, পুত্রকে পুরী থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে যান।

বলা বাহুল্য, শিবকৃষ্ণ পুরী থেকে সারদাপ্রসন্নকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেও, বিবাহ দিয়ে সংসারে আবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হন।

*

নবীনচন্দ্র রায়চৌধুরী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী যোগানন্দ, তথা শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর পিতা। তিনি ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সুবিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরী বংশের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার। যোগীন্দ্রনাথ (স্বামী যোগানন্দ) ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার বহু পূর্বেই, ঠাকুর কথকথা, শাস্ত্রকথা প্রভৃতি শুনতে ধনাঢ্য নবীনচন্দ্রের বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন এবং সেই উপলক্ষেই উভয়ের মধ্যে বিশেষ পরিচয় ঘটে।

যে-সময় ঠাকুর, নবীনচন্দ্রের বাড়ীতে যেতেন, সে সময় তাঁর পুত্র যোগীন্দ্রনাথের সম্ভবতঃ জন্মই হয়নি, অথবা তাঁর খুব শৈশব অবস্থা ছিল। সেজন্য প্রথম যখন যোগীন্দ্রনাথ, ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন, তখন কেহই পরস্পরকে চিনতে পারেননি। পিতা নবীনচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ের কথা, পুত্র যোগীন্দ্রনাথের কাছে ঠাকুরই প্রকাশ করেছিলেন। বলা আবশ্যক, নবীনচন্দ্র তাঁর পুত্র যোগীন্দ্রনাথকে বিবাহ দিয়ে সংসারী করার পাকা ব্যবস্থা করেছিলেন বটে, কিন্তু বিবাহের পরেই যোগীন্দ্রনাথও পাকাপাকিভাবে সংসার ত্যাগ করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

*

রসিকলাল চন্দ্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ, তথা শ্রীকালীপ্রসাদ চন্দ্রের পিতা। তিনি কলকাতার "ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী"

নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের পিতা এটর্ণী বিশ্বনাথ দত্ত, নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষ, বঙ্গবরেণ্য কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। পুত্রের বিষয় নিয়েই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে রসিকলালের যোগাযোগ হয়েছিল।

পুত্র কালীপ্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দ) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেদিন প্রথম যান এবং তথায় রাত্রিবাস করেন, তার পরের দিনই তাঁকে খুঁজতে রসিকলাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান। সে সময় রসিকলাল, ঠাকুরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন তাঁর পুত্র কালীপ্রসাদকে বিবাহ করে সংসারী হতে রাজী করান; কিন্তু ঠাকুর রসিকলালকে জানান যে, কালীপ্রসাদ পরম যোগী—তাকে জোর করে বিবাহ দিয়ে লাভ হবে না।

পরবর্তীকালে পুনরায় একদিন রসিকলাল কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে আসেন এবং কালীপ্রসাদের মাতা অত্যন্ত কান্নাকাটি করতে থাকায় পুত্রকে গৃহে ফিরিয়ে দেবার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানান। ঠাকুর তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং কালীপ্রসাদকে গৃহে ফিরে যাবার জন্য অনুমতি দেন। কালীপ্রসাদ গুরুর আদেশ পালন করে গৃহে ফিরে গেলে, রসিকলাল ও তাঁর স্ত্রী উভয়ে কালীপ্রসাদকে প্রচুর আদর-যত্ন করেন; কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই কালীপ্রসাদ পিতা-মাতাকে ছেড়ে পুনরায় কাশীপুরে ফিরে এলে, রসিকলালের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

*

নৃসিংহচন্দ্র দত্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত এবং গৃহী-শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র দত্তের পিতা। তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আত্মীয়। পুত্র রামচন্দ্রের আহ্বানে নিজ বাড়ীতে ঠাকুরের বহুবার আগমনে, তিনি ঠাকুরকে বহুবার দর্শন করেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান।

একদা ঠাকুরের অসুস্থতার সময় কাশীপুরে অবস্থানকালীন স্বামীজী (নরেন্দ্রনাথ) অপর দুজন গুরুভ্রাতা (স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ) সহ তপস্যার জন্য বুদ্ধগয়ায় চলে গেলে, স্বামীজীর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁর পুত্র নরেন্দ্রনাথের জন্য খুব উদ্বিগ্ন হন এবং সে সময় নৃসিংহচন্দ্রই ভুবনেশ্বরী দেবীকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে, ঠাকুরের সঙ্গে কাশীপুরে মিলিত হবার সুযোগ লাভ করেন।

*

রাধামোহন বসু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত এবং গৃহী-শিষ্য শ্রীবলরাম বসুর ভক্তিমান পিতা। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। পুত্র বলরাম, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়ে এসে নিজের জীবন ধন্য করার পর, বৃন্দাবনবাসী তাঁর পিতা রাধা-মোহনকেও কলকাতায় আনিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। বৃদ্ধ রাধামোহন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং বহুবার ঠাকুরের কাছে যাতায়াতের ফলে, তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বৈষ্ণবের গোঁড়ামী ত্যাগ করে উদারভাবের আশ্রয় নেবার জন্য ঠাকুর তাঁকে উপদেশ দান করেন এবং রাধামোহনও তা যথাযথ পালন করে ঠাকুরের প্রতি তাঁর অনুরাগ বজায় রাখেন।



চতুর্থ স্তবক

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ভাগ্যবান পিতা এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগ্যবান শ্বশুর। বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামের এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ অল্প জমিজমার উৎপন্ন ফসল, যজন-যাজন ও পৈতার সুতো কেটে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ৺নারায়ণ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরামকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তাঁর গৃহে ভূমিষ্ঠ হন, ৺লক্ষ্মীদেবীও তেমন সারদাদেবীর পিতা রামচন্দ্রকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তাঁর গৃহে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। গদাধরের (পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ) বিবাহের চেষ্টা ক'রে তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা মনের মতন পাত্রীর সন্ধান করতে বিফল হওয়ায়, গদাধর স্বয়ং নির্দেশ করেন—"জয়রামবাটীতে রামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে, সেখানে চেষ্টা করো।" অতঃপর ঠাকুরের মাতা চন্দ্রমণির আগ্রহে, ঠাকুরের মধ্যম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর জয়রামবাটী গিয়ে রামচন্দ্র মুখুজ্যের কন্যার সঙ্গে ঠাকুরের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। এই বিবাহে রামচন্দ্রের সম্পূর্ণ সম্মতি থাকায়, তিনশত টাকা পণ নিয়ে (তখনকার প্রথানুযায়ী) রামচন্দ্র তাঁর কন্যা সারদাদেবীর সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের (তৎকালীন গদাধর) বিবাহ দেন। বিবাহের সময় ঠাকুরের বয়স ছিল ২৩ বছর, আর সারদাদেবীর বয়স ৬ বছর। পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অস্বাভাবিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জয়রামবাটী গ্রামের লোকেরা যখন সারদাদেবীর দেবতুল্য স্বামীকে উন্মাদরূপে ধারণা করত এবং তাঁকে "পাগলের স্ত্রী" বলে করুণা বা উপেক্ষার পাত্রীরূপে বিবেচনা করত, সেই সময় পিত্রালয় থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসার জন্য সারদাদেবীর মনোভাব বুঝতে পেরে, রামচন্দ্র তাঁকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে জামাতার কাছে উপস্থিত হন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। কিন্তু অসুস্থা সারদাদেবীর প্রতি ঠাকুর তখন এমন যত্ন নেন এবং স্বাভাবিক আচরণ করেন যে, তা দেখে রামচন্দ্রের চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটে যায় এবং গ্রামের লোকের রটনা মিথ্যা জেনে, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে দক্ষিণেশ্বর থেকে জয়রামবাটী ফিরে আসেন।

*

প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর অন্যতম কনিষ্ঠভ্রাতা এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্যালক। তিনি যাজনাদি কাজ করার জন্য কলকাতায় বাস করতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

একদা জয়রামবাটীতে নিজেদের বাড়ীতে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে

প্রসন্নকুমার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে আনতে গেলে, ঠাকুর আনন্দের সঙ্গে বলে ওঠেন—"মা আসবেন, মা আসবেন, বেশ—বেশ! তোদের বড় খারাপ অবস্থা ছিল যে রে!" প্রসন্নকুমার পরম অনুরাগবশতঃ ঠাকুরকে জয়রামবাটীতে পূজা উপলক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করায়, ঠাকুর তাঁকে বলেন—"এই আমার যাওয়া হল। যা—বেশ পূজা করগে, তোদের ভাল হবে।" ঠাকুরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে প্রসন্নকুমার জয়রামবাটীতে ফিরে গিয়ে পূজার আয়োজন করেন।

বলা আবশ্যক, ঠাকুর সে সময় ৺জগদ্ধাত্রী পূজায় যোগদান করতে না পারলেও, ঠাকুরের আশীর্বাদে সত্যই পরবর্তীকালে প্রসন্নকুমারদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার অবসান হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ঠাকুরের জয়রামবাটীর শ্বশুর-বাড়ীর অবস্থা পূর্বে মোটেই ভাল ছিল না এবং অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে প্রথমাবস্থায় সবাই—এমন কি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীও খুব কষ্টে জীবন কাটিয়েছিলেন।

*

রাজারাম মুখোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ভাগ্নে-সম্পর্কীয়। তিনি ছিলেন ঠাকুরের পিসতুতো দিদি শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র এবং ঠাকুরের সহচর শ্রীহৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠভ্রাতা। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল এবং ঠাকুরকে তিনি বিশেষ ভক্তি করতেন।

একদা শিহড়গ্রামে ভাগ্নে হৃদয়ের বাড়ীতে ঠাকুরের কিছুদিন অবস্থানকালে রাজারামের সঙ্গে গ্রামের এক ব্যক্তির বিষয়কর্ম নিয়ে বচসা হয় এবং সেই সময় ঠাকুরের সাক্ষাতেই রাজারাম ঐ ব্যক্তিকে হুঁকার আঘাতে আহত করেন। ফলে, ঐ আহত ব্যক্তি বন-বিষ্ণুপুরের আদালতে রাজারামের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা করেন এবং ঠাকুরকে সাক্ষী মানেন। এই সাক্ষ্য দেবার জন্য ঠাকুরকে বন-বিষ্ণুপুরে যেতে হয়েছিল। সত্যবাদী ঠাকুর সত্যকথা ছাড়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেবেন না এবং তার ফলে রাজারামের মোকদ্দমার ফল খারাপ হবে—এই মর্মে ঠাকুর রাজারামকে বিশেষভাবে বোঝান এবং আপোষে মোকদ্দমা মিটিয়ে নেবার জন্য রাজারামকে বিশেষ চাপ দেন। ফলে, ঠাকুরের উপদেশমতন বিরোধী ব্যক্তির সঙ্গে রাজারাম আপোষে মোকদ্দমা মিটিয়ে নিয়ে ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আনুগত্য প্রদর্শন করেন এবং নিজেও বিপদ মুক্ত হন।

*

সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের তৎকালীন ইয়ারবন্ধু। তিনি জাষ্টিস্ অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট-আত্মীয় ছিলেন এবং যুবা বয়সে সাংবাদিকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মদ্যপায়ী গিরীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব থাকায়, তিনিও প্রথম জীবনে খুব মদ্যপায়ী ছিলেন।

একদা রাত্রে ষ্টার-থিয়েটারে অভিনয় দেখার পর মদ্যপান করে গিরীশচন্দ্র প্রমুখ মাতাল বন্ধুদের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ একটি গাড়ী ভাড়া করেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করার খেয়ালে মত্ত অবস্থায় গভীর রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে হাজির হন। তাঁরা সেখানে ঠাকুরের ঘরের সামনে গিয়ে চীৎকার শুরু করায়, ঠাকুর তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেন। তখন ঠাকুরকে মধ্যস্থলে বসিয়ে সুরেন্দ্রনাথ মত্ত অবস্থায় বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুরকে ঘিরে সারারাত নৃত্য করেন এবং অবশেষে ভোরবেলায় কলকাতায় ফিরে আসেন।

পররবর্তীকালে এই সুরেন্দ্রনাথের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে এবং ধর্মজগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি "বাবা প্রেমানন্দ ভারতী" নামে খ্যাত হন। কিছুদিন তিনি বরানগর মঠেও বাস করেছিলেন।

*

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য পরম ভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রথমে কালীবাড়ীর মুহুরীর পদে ও পরে খাজাঞ্চীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন তিনি অধিকাংশ সময়েই ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভ করার সুযোগ পান। ঠাকুরের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি পরায়ণ ভোলানাথ ঠাকুরের অকৃত্রিম স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। তিনি প্রায়ই ঠাকুরকে মহাভারত পাঠ করে শোনাতেন এবং মহাভারতের কথা আলোচনা করতেন। ঠাকুরের মনে কোন বিষয়ে খট্‌কা লাগ্‌লে, তিনি ভক্ত ভোলানাথের কাছে সে সব প্রশ্ন উত্থাপন করতেন এবং ভোলানাথও মহাভারতের দৃষ্টান্তে সেগুলির সমাধান করে ঠাকুরকে বুঝিয়ে দিতেন। দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সাময়িক অদর্শনে ঠাকুর যখন অধীর হতেন, তখন অনেক সময় ভোলানাথের হাত ধ'রে তিনি নরেন্দ্রনাথের জন্য কাঁদতেন এবং ভোলানাথ নানাভাবে তাঁকে শান্ত করতেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর দক্ষিণপ্রান্তে যদুলাল মল্লিকের বাগানের পাশে "পাইখানা" প্রস্তুত করা নিয়ে কালীবাড়ীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যদুলালের

মোকদ্দমা হয়; এই মোকদ্দমায় ভোলানাথ কালীবাড়ীর মুহুরী হিসাবে বিচারপতির কাছে এজাহার দেন এবং সেই কারণে তাঁর মনে ভয় উপস্থিত হয়। সেই ঘটনার কথা ভোলানাথ ঠাকুরকে জানালে, ঠাকুর চিন্তিত হয়ে তাঁর ভক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধরলাল সেনকে সবকথা বলে তাঁর অভিমত জানতে চান, অধরলাল সব শুনে যখন বলেন—"এ বিষয়ে ভয়ের কিছু নেই," তখন ভোলানাথের সম্পর্কে ঠাকুর নিশ্চিন্ত হন।

ঠাকুরের অসুখের সময় ভোলানাথ ঠাকুরের সেবার জন্য খুব উদগ্রীব হতেন এবং তাঁর কষ্টলাঘবের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করতেন। অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর কাশীপুরে চ'লে গেলেও, ভোলানাথ তাঁর অসুখের জন্য তেল পাঠিয়ে দিতেন এবং কিভাবে লাগাতে হবে, তার নির্দেশও দিতেন। ভোলানাথের পাঠানো তেল, ঠাকুর সযত্নে ব্যবহার করতেন এবং ঠাকুরকে সেবা করতে পেরে ভক্ত ভোলানাথ নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করতেন।

*

শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মধ্যমপুত্র। কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন তাঁর আশৈশব সহপাঠী। শ্রীশচন্দ্র ছাত্রজীবনে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান ও এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন! এম. এ., বি. এল. পাশ করার পর কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি আলিপুরে ওকালতি করতেন, কিন্তু পরে জেলাজজের চাকরীতে নিযুক্ত হন। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনি বিনয় ও খুব শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি।

ভক্ত পিতা ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায়, তাঁদের বাড়ীতে ঠাকুরের কয়েকবার শুভাগমন হয় এবং সেই উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম যখন শ্রীশচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি ওকালতী করতেন শুনে ঠাকুর বলেছিলেন যে, অমন শান্ত লোক ওকালতী করে কি ভাবে? ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে শ্রীশচন্দ্র তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হন এবং তাঁর ভক্তে পরিণত হন। শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে ঠাকুর খুব তৃপ্তিলাভ করেছিলেন এবং তাঁকে সেব্য-সেবকভাবে থাকার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন।

*

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য পরমভক্ত। তিনি ছিলেন চব্বিশ পরগণা জেলার কাদিহাটীগ্রামের অধিবাসী। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে রাজবল্লভ পাড়ায় ৺মদনমোহনজীর মন্দিরের কাছে তাঁদের আর একটি বাড়ী ছিল এবং হাতীবাগানে ব্যবসা উপলক্ষে তাঁর একটি ময়দার কল ছিল।

৩৬।৩৭ বছর বয়স্ক, গৌরবর্ণ, সদা হাস্যমুখ, ব্যবসায়ী মহেন্দ্রনাথ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে তাঁর ভ্রাতা ইঞ্জিনীয়ার প্রিয়নাথকে সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করতেন। সরলতা, উদারতা, ও ঈশ্বরভক্তির জন্য ঠাকুরও মহেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে আনন্দ পেতেন। মহেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের গাড়ীটি ব্যবহার করার জন্য মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দিতেন। একদা ভক্ত মহেন্দ্রনাথ নিজের গাড়ীতে চড়িয়ে ঠাকুরকে তাঁর হাতীবাগানের ময়দার কলে নিয়ে যান এবং সেখানে তাঁকে বিশেষ আপ্যায়ন করেন। মহেন্দ্রনাথকে জপ-ধ্যান করার জন্য ঠাকুর উৎসাহ দিতেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে মহেন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পরেও তাঁর ভক্তিমতী স্ত্রী, রামকৃষ্ণমিশনের সাধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এমনকি, আলমবাজার মঠে প্রথমাবস্থায় যখন ঠাকুর-সেবার জন্য সাধুরা খুব আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হতেন, তখন এই ভক্তিমতী মহিলা ঠাকুর-সেবার জন্য নানাবিধ দ্রব্য স্বেচ্ছায় বহুবার মঠে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। এজন্য তাঁর প্রতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রমুখ সাধুদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল।



দীননাথ মুখোপাধ্যায়

উত্তর কলকাতার বাগবাজার নিবাসী ভক্তিমার্গের গৃহীসাধক। বাগবাজারের পোলের কাছে তাঁর বাড়ীতেই তিনি গোপনে ভক্তিপথে সাধন করায়, বহির্জগতের লোকেদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল না; কিন্তু তাঁর ভক্তির কথা কোন প্রকারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কানে পৌছায়। ঠাকুর তখন ভক্ত দীননাথের সঙ্গে স্বেচ্ছায় আলাপ করার জন্য ব্যস্ত হন এবং এই বিষয়টি পরমভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসকে জানান।

অতঃপর একদিন মথুরানাথ তাঁর বিরাট এক গাড়ীতে করে ঠাকুরকে নিয়ে সহসা দীননাথের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং ঠাকুর স্বেচ্ছায় দীননাথের

সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ীতে পদার্পণ করেন। কিন্তু সেদিন দীননাথের বাড়ীতে একটি ছেলের উপনয়ন হচ্ছিল; তাই ঠাকুরও সেখানে হঠাৎ গিয়ে যেমন অপ্রস্তুত হন, বাড়ীর লোকেরাও ঠাকুরকে হঠাৎ সেখানে দেখে মহা অপ্রস্তুত হন। তাঁরা পরম সমাদরে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা জানালে ও একটি পৃথক ঘরে বসাবার চেষ্টা করলেও, ঠাকুর তাঁদের ব্যতিব্যস্ত না করে ফিরে আসেন এবং গুপ্তভক্ত দীননাথের সঙ্গে পরিচয়ও অসম্পূর্ণ থাকে।

*

নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। কৈশোরে তিনি ঠাকুরকে তাঁদের কলকাতার বাড়ীতে কয়েকবার দর্শন করেছিলেন।

*

কালিদাস মুখোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত কলকাতা নিবাসী জনৈক ভক্ত। সিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসবে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল।

*

[illegible]

হাওড়া জেলার বালীনিবাসী ভক্ত। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং তাঁর স্নেহ অর্জন করেন। যাত্রাগান, হরিসভায় অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষ করে ঠাকুর যেমন বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতেন, তেমন বালীর হরিসভা দেখার জন্যও ঠাকুর একদা ভক্ত কালাচাঁদের বালীর বাড়ীতে শুভাগমন করেছিলেন।

*

জয় মুখুজ্যে

বরানগর নিবাসী ভক্ত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল এবং তিনি ঠাকুরকে খুব মান্য করতেন। একদা বরানগরের গঙ্গার ঘাটে ঠাকুর যখন এসেছিলেন, তখন তিনি সেখানে জয় মুখুজ্যেকে বসে জপ করতে দেখেছিলেন। কিন্তু ঠাকুর লক্ষ্য করেছিলেন যে, তিনি জপ করলেও—বড় অন্যমনস্ক ছিলেন। এই ঘটনায় ঠাকুর ব্যথিত হন এবং অন্যমনস্কভাবে জপ

করার দরুন, তাঁর কাছে গিয়ে দুই চাপড় দেন। ফলে, ঠাকুরের করাঘাতে জয় মুখুজ্যের সম্বিৎ ফিরে আসে এবং জপের প্রতি নিষ্ঠাও ফিরে আসে। ঠাকুরের পূতস্পর্শে সেদিন তাঁর চৈতন্যের উদয় হয়েছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, একদা দক্ষিণেশ্বরে ৺কালীমন্দিরে বসে, ভক্তিমতী রাণী রাসমণি একটি মোকদ্দমার বিষয়ে চিন্তা করতে থাকায়, সেদিনও ঠাকুর তাঁকে করাঘাত করে তাঁর চৈতন্য উদয়ে সহায়তা করেছিলেন এবং রাণীও নিজের অপরাধ স্বীকার করে মা-ভবতারিণীকে স্মরণ করেছিলেন।

*

শৈলজাচরণ মুখুজ্যে

কলকাতার বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটের ৺শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবক। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

*

নফর বন্দ্যোপাধ্যায়

হুগলীজেলার শিহড়গ্রাম নিবাসী ভক্ত। তিনি সন্ততিসম্পন্ন ভক্তিমান পুরুষ ছিলেন এবং তাঁর বাড়ীতে "শ্রীধর" নামে নারায়ণ-শিলার নিত্য পূজা হত। একদা ভাগ্নে হৃদয়ের শিহড় গ্রামের বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হয় এবং সেখানে তিনি যাওয়ার দিন থেকেই ভক্ত নফর তাঁর সেবা ও সঙ্গ করা শুরু করেন।

শিহড়গ্রামে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন সেখানকার কয়েকজন ভক্তকে একটি করে তুলসীমালা দান করেন এবং নারায়ণ-শিলায় সেই মালা স্পর্শ করিয়ে সকলকে ধারণ করার জন্য উপদেশ দেন। ভাগ্যবান নফরও সেই সময় ঠাকুরের কাছ থেকে একটি তুলসীমালা পান। নফরের ঘরে "শ্রীধর"—নারায়ণ-শিলা বিদ্যমান ছিলেন বটে, কিন্তু নফর সেদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গেই "শ্রীধর" রূপ দর্শন করেন এবং সেই মালাটি ঠাকুরের শ্রীচরণে রেখে প্রণাম করে নিজের কণ্ঠে ধারণ করেন। সেদিনের এই ঘটনায় ঠাকুর সমাধিস্থ হন এবং নফরের ভক্তি আরো বৃদ্ধি পায়।

নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন সংস্কৃতের অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভক্তিমান পুত্র, প্রথমাবস্থায় ভূটান, উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি নানাস্থানে

ভ্রমণ করার পর, ২৯।৩০ বছর বয়সে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হন। বাড়ীতে নানাকারণে বনিবনা না হওয়ায়, নরেন্দ্র শ্যামপুকুরে আলাদা বাসা করে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকতেন এবং ঠাকুরকে তাঁর দুঃখের কথা জানাতেন। তাঁর সরলতার জন্য ঠাকুর তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং শরণাগত হওয়ার জন্য তাঁকে উপদেশ দিতেন। ঠাকুরের প্রতি গভীর অনুরাগ বশতঃ তিনি নিজের ঘরে ঠাকুরের ছবি রেখেছিলেন। ধ্যানে অভ্যস্ত নরেন্দ্র, ধ্যানের সময় ঘণ্টা-নিনাদ শুনতে পেতেন ও রূপ দর্শন করতেন এবং তা ঠাকুরকে জানাতেন। শেষজীবনে এলাহাবাদে বাস করার সময় ৫৮ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

*

রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর কলকাতার বাগবাজারের অধিবাসী এবং রেলওয়ে বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি বাংলার বাইরে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। একদা তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে দেওঘর থেকে কাশীতে রেলযোগে আসার সময়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রাম কার্যগতিকে মোগলসরাই ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামেন; কিন্তু তাঁদের পুনরায় ট্রেনে ওঠার আগেই ট্রেনটি ষ্টেশন ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এই ঘটনায় ঠাকুর যখন খুব বিব্রত বোধ করেন তখন কিছুক্ষণ বাদেই রাজেন্দ্রলাল বিশেষ কাজ উপলক্ষে একটি পৃথক গাড়ীতে সেখানে আসেন এবং ঠাকুরের এই অসুবিধার কথা জানতে পেরে, রাজেন্দ্রলাল তাঁদের উভয়কে নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়ে কাশীতে নামিয়ে দেন। এইভাবে ঘটনাচক্রে রাজেন্দ্রলাল সেদিন ঠাকুরের অসুবিধা দূর করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

*

ভবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের বরানগর নিবাসী বন্ধু। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রায়ই যেতেন এবং তাঁর অমায়িক প্রকৃতির জন্য ঠাকুর তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও ভবনাথ অবসর সময়ে আলমবাজার মঠে এসে সকলের সঙ্গে আনন্দ করতেন। পরবর্তীকালে তিনি সরকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের চাকরী নিয়ে অন্যত্র চলে যান।

*

ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়

আদি ব্রাহ্ম সমাজের ভক্ত। একদা কলকাতার নন্দনবাগানে ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যোগদান করায়, ভৈরব সেদিন ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। সেদিন ভৈরবই বেদীতে বসে উপাসনার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। উপাসনার শেষে ঠাকুর সেখানে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন এবং ভৈরবাদি ভক্তগণ তা উপভোগ করেন।

*

শিবরাম চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য, নিজেরই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি খুব সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং শৈশবে ঠাকুরের খুব প্রিয় ছিলেন। ছোটবেলায় ঠাকুরের কাঁধে চেপে বা দু' হাতে তাঁর কান ধরে খুব ব্যস্ত করতেন এবং ঠাকুরও তাঁর এই ছেলেমানুষীতে খুব আনন্দ পেতেন।

*

দীননাথ চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য জ্ঞাতিসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর পিতা কালিদাস ছিলেন ঠাকুরের খুল্লতাত ভ্রাতা এবং হুগলী জেলার মুকুন্দপুরের অধিবাসী। দীননাথ একসময়ে দক্ষিণেশ্বরে ৺রাধাগোবিন্দের পূজারী থাকায় সাধারণতঃ তিনি "দীনু পূজারী" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং তাঁর মুখে ভক্তিমূলক গান শুনে ঠাকুর মুগ্ধ হতেন। যেদিন ৺ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে ৺ষোড়শী জ্ঞানে পূজা করেছিলেন, সেদিন দীনুই পূজার দ্রব্য যথারীতি সাজিয়ে ঠাকুরকে সাহায্য করেছিলেন।

পরবর্তীকালে দীনু অকস্মাৎ কলেরায় আক্রান্ত হলে, শ্রীশ্রীমা নিজের চরণ-ধূলি, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণধূলি এবং মা-কালীর স্নানজল দিয়ে দীনুকে আরোগ্য করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হয়ে স্নেহাস্পদ দীনুর মৃত্যু হওয়ায় ঠাকুর অন্তরে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন।

*



হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতি পাড়ার অধিবাসী এবং স্বামী বিবেকানন্দের (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ) দরিদ্র সহপাঠী। বি. এ. পরীক্ষার সময় কলকাতায়

ভুবনমোহন সরকারের গলির বাসায় হরিদাসের অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথ যেমন তাঁর বাসায় যেতেন, হরিদাসও তেমন নরেন্দ্রনাথের তৎকালীন ৭নং রামতনু বসু লেনের মাতামহীর বাড়ীতে যেতেন। সেই বাড়ীতে দোতলার ওপর একটি ছোট নির্জন ঘরে নরেন্দ্রনাথ লেখাপড়া করতেন এবং সেই ঘরটিকে "টঙ্" আখ্যা দিয়েছিলেন।

একদিন সকালে হরিদাস যখন অপর সহপাঠী দাশরথি সান্ন্যালের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে "টঙে" বসে কথাবার্তা কইছিলেন, সে সময় হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে সঙ্গে নিয়ে "নরেন" "নরেন" বলে সেখানে গিয়ে হাজির হন; অনেকদিন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে না যাওয়ায় সহপাঠীদের সামনেই ঠাকুর সেদিন অশ্রু বিসর্জন করেন। ঠাকুরের সঙ্গে আনীত কয়েকটি সন্দেশ ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে খাওয়াবার চেষ্টা করলে, নরেন্দ্রনাথ তার থেকে আগে তাঁর বন্ধুদের খাইয়ে পরে নিজে খান। ভাগ্যবান হরিদাস সেদিন ঠাকুরের আনীত সেই সন্দেশ খেয়েছিলেন এবং সেদিন সেখানে নরেন্দ্রনাথের গান শুনে ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থাও হরিদাস প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

*

ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা নিবাসী উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভক্তিমান পুত্র। দীর্ঘায়ু ঈশানচন্দ্র প্রথমজীবনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

*

চন্দ্র চাটুজ্যে

"কর্তাভজা" সম্প্রদায়ের জনৈক প্রবীণ ভক্ত, তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৬০/৬৫ বছর। তিনি মুখে সব সময় "কর্তাভজা"দের শ্লোক আওড়াতেন। তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। কিন্তু একদিন অনুরাগবশতঃ তিনি ঠাকুরের পদসেবা করতে যাওয়ায়, বিশেষ কোন কারণে ঠাকুর তাঁকে পা স্পর্শ করতে দেননি।

*

নবকুমার চাটুজ্যে

দক্ষিণেশ্বর নিবাসী খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি প্রায়ই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁর পূত সঙ্গলাভ করে আনন্দ পেতেন। ঠাকুরের প্রতি অসীম

অনুরাগবশতঃ তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আহার করাতেন। ভক্ত নবকুমারের বাড়ীর রান্না খেয়ে ঠাকুর খুব তৃপ্ত হতেন এবং বলতেন—"আহা কী রান্না! প্রত্যেকটি জিনিস যেন ওজন করে রেঁধেছে।" ভাগ্যবান নবকুমার ঠাকুরকে আহার করিয়ে কৃতার্থ হতেন।

মাঝে মাঝে কাউকেও পূর্বে না জানিয়ে বাইরে থেকে আহারাদি সমাপ্ত করে ঠাকুর নিজস্থানে ফিরে এলে, তাঁর সেবক-ভাগ্নে হৃদয়রাম খুব অসন্তুষ্ট হতেন। একদা ঠাকুর নবকুমারের বাড়ীতে আহার সেরে ফিরে এলে, হৃদয়রাম বাইরে খাওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করায় ঠাকুর বলেছিলেন—"যখন পরমহংস অবস্থা হয়, তখন এমনি হয়ে থাকে; কোথায় খাবে—তার কাছে ঠিক-ঠিকানা থাকে না।"

*

ভূধর চাটুজ্যে

কলকাতার পটলডাঙ্গা নিবাসী ভক্ত; তিনি প্রখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণির শিষ্য ছিলেন। তাঁর কলকাতার বাড়ীতে শশধর কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন এবং সেই উপলক্ষেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ভূধরের যোগাযোগ হয়। শশধরের সঙ্গে আলাপ করার জন্য ঠাকুর একদা ভূধরের বাড়ীতে শুভা-গমন করেছিলেন; আবার শশধরকে নিয়ে ভূধরও ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বরেও শশধরকে নিয়ে ভূধর, ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন। ভূধরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত ছিলেন।

*

রাম চাটুজ্যে

দক্ষিণেশ্বরের পার্শ্ববর্তী আলমবাজারের অধিবাসী এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ৺রাধাগোবিন্দ মন্দিরে পূজারী ছিলেন। ঠাকুরের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান রাম চাটুজ্যের আলমবাজারের বাড়ীতে মাঝে মাঝে ঠাকুর স্বেচ্ছায় উপস্থিত হয়ে সেখানে আহার করতেন। ঠাকুর তাঁর কর্তব্যজ্ঞানের জন্য সকলের কাছে প্রশংসা করতেন; কারণ, ভক্তেরা কোথাও ধ্যানে বসে থাকলে রাম চাটুজ্যেই সবাইকে ডেকে-ডুকে খাওয়াতেন, বা তাঁদের প্রতি যত্ন নিতেন। একদা কলকাতার বড়বাজারে অন্নকূট মহোৎসবে যোগদান করে ৺ময়ূর-মুকুটধারীর বিগ্রহ দর্শনের পর ঠাকুর ভক্ত রাম চাটুজ্যেকে ধারণ করে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ হন। দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর কাশীপুরে যাওয়ার পরেও ভক্ত রাম চাটুজ্যে ঠাকুরের খবর নিতে সেখানে যেতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

*

ফকীর ভট্টাচার্য

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত। তাঁর অপর নাম 'যজ্ঞেশ্বর"। তিনি ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীর পুরোহিত ছিলেন এবং বলরামবাবুর শিশুপুত্রের লেখাপড়ার ভারও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুরকে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং ঠাকুরও তাঁর মুখ থেকে বিভিন্ন স্তোত্র পাঠ শুনতে ভালবাসতেন। ফকীর বা যজ্ঞেশ্বর ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দের (তৎকালীন কালীপ্রসাদ চন্দ্র) সহপাঠী ছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ রহস্য করে তাঁকে "ফকিরুদ্দীন" বলে ডাকতেন।

একদা রথ-উৎসবের সময় ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে ফকীরকে নিজের কাছে ডেকে এনে অযাচিতভাবে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ দ্বারা ঠাকুর তাঁকে কৃপা করেন এবং ধ্যান করার উপদেশ দেন। এর ফলে, ফকীরের অদ্ভুত দর্শনাদি হয় এবং তিনি ঠাকুরের প্রতি আরো অধিক অনুরক্ত হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ছাত্রাবস্থায় স্বামী অভেদানন্দের (তৎকালীন কালীপ্রসাদ চন্দ্র) মনে যোগ সাধনার প্রবল ইচ্ছা জাগে, অথচ ঠিকমত গুরুর সন্ধান তিনি তখনো পাননি। তাঁর এই মানসিক অস্থিরতার কথা সহপাঠী বন্ধু ফকীরের কাছে তিনি প্রকাশ করায়, ফকীরই তাঁকে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে অদ্ভুতযোগী পরমহংসদেবের কাছে যেতে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং ফকীরের কথামতই তিনি যোগসাধন শিক্ষা উপলক্ষে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। শেষ দিন অবধি ফকীর, নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অনুগত ছিলেন এবং তাঁদের সেবা করতেন। অবশেষে যক্ষারোগে তাঁর মৃত্যু হয়

*

কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য

দক্ষিণেশ্বরের পার্শ্ববর্তী আড়িয়াদহের অধিবাসী এবং পরম ভক্ত। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তি ছিল এবং "রাম" নামের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। এমনকি, "মরা" "মরা" শব্দটিও তিনি মহামন্ত্র জ্ঞানে গ্রহণ করতেন এবং "নাম"কেই ঈশ্বর জ্ঞান করতেন। কৃষ্ণকিশোরের একটি পুত্র যারা

যাওয়ার সময় "রাম" নাম উচ্চারণ করায় তিনি বলেছিলেন যে, ও "রাম" বলেছে ওর আর ভাবনা নেই। একদা বৃন্দাবনে তীর্থ পর্যটনকালে কৃষ্ণকিশোরের খুব জল তৃষ্ণা পায় এবং সেই সময় এক মুচিকে "শিব" নাম উচ্চারণ করিয়ে, নিজে আচারী ব্রাহ্মণ হয়েও তার হাতে জল খান—এমনই ছিল তাঁর নামের ওপর জলন্ত বিশ্বাস।

কৃষ্ণকিশোর ও তাঁর সহধর্মিণী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। কৃষ্ণকিশোরের ইষ্টনিষ্ঠা এবং নামের ওপর পরম নির্ভরতার জন্য ঠাকুর তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং তাঁর পরমভক্তির কথা অনেকের কাছে উল্লেখ করতেন। ভাগ্যবান কৃষ্ণকিশোরের বাড়ীতে ঠাকুর বহুবার শুভাগমন করেছেন।

একদা গলায় পৈতাবিহীন (উপবীতবিহীন) ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে কৃষ্ণকিশোর প্রশ্ন করেন—"পৈতা ফেললে কেন?" ঠাকুর তাতে তাঁর সাধনকালে উন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে, সে সময় তাঁর পরণের কাপড়েরই ঠিক থাকত না, তা পৈতা থাকবে কেমন করে? পরে কৃষ্ণকিশোরকে ঠাকুর বলেন—"তোমার একবার উন্মাদ হয়, তাহলে তুমি বোঝো!" এই কথার পর সত্যই কৃষ্ণকিশোরের উন্মাদ-দশা হয় এবং তিনি একটি ঘরে বসে শুধু ওঁ-কার ধ্বনি করতে থাকেন। তাঁর মাথা গরম হয়েছে মনে করে, সকলে নাটাগড়ের বিখ্যাত রাম কবিরাজকে আনিয়ে তাঁর চিকিৎসা করায়; পরে অবশ্য তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। বলাবাহুল্য, ঠাকুর ও কৃষ্ণকিশোরের মধ্যে বরাবরই বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং কৃষ্ণকিশোরের পুত্র রামপ্রসন্নও ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন।

রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

দক্ষিণেশ্বরের পার্শ্ববর্তী আড়িয়াদহের অধিবাসী এবং ভক্তবর কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্যের পুত্র। রামপ্রসন্ন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রায়ই যেতেন এবং পিতা কৃষ্ণকিশোরের মতন তাঁকেও ঠাকুর বিশেষ স্নেহ করতেন। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর রামপ্রসন্ন মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে বসে নিজেই প্রাণায়াম করতেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে জনৈক হঠযোগী সাধু আশ্রয় গ্রহণ করায়, সাধুর খরচের ব্যবস্থার জন্য রামপ্রসন্ন ঠাকুরকে অনুরোধ করতেন—যাতে ঠাকুরের সান্নিধ্যে আগত ভক্তেরা সেই হঠযোগীকে কিছু আর্থিক সাহায্য করেন। রামপ্রসন্নের অনুরোধে ঠাকুর সত্যই তাঁর ভক্তদের পঞ্চবটীতে হঠযোগীর কাছে

পাঠিয়েও দিতেন। কিন্তু রামপ্রসন্নের মা সেই সময় দুঃখে দিন কাটালেও, রাম-প্রসন্ন তাঁর মায়ের খবর না রেখে কেবল হঠযোগী নিয়েই মত্ত থাকায় ঠাকুর তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

*

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

হাওড়া জেলার বালীর অধিবাসী এবং "কর্তাভজা" সম্প্রদায়ের উচ্চ সাধক। একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মনে "কর্তাভজা" সাধনের প্রবল ইচ্ছা জাগায়, তিনি এই সাধনায় ব্রতী তারাপ্রসন্নের কাছে কয়েকবার তাঁর বালীর বাড়ীতে আসেন এবং তাঁর কাছ থেকে এই সাধন প্রণালী শিক্ষা করেন।

*

রামদয়াল চক্রবর্তী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীশিষ্য বলরাম বসুর বাড়ীর পুরোহিত-বংশীয় ব্রাহ্মণ। তিনি "হোরমিলার ষ্টীমার কোম্পানীর" একজন ঠিকাদার ছিলেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশতঃ রামদয়াল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ), মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গে ভাগ্যবান রামদয়াল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের আশ্রয়ে রাত্রিবাস করারও সুযোগ পেয়েছিলেন। ঠাকুর স্নেহভরে রামদয়ালকে নানা উপদেশ দিতেন এবং তাঁর সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতেন। বলা আবশ্যক, রামদয়ালের আহ্বানেই ভক্ত বলরাম বসু উড়িষ্যা থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেছিলেন।

*

চারুচন্দ্র চক্রবর্তী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী সারদানন্দের তথা শরৎ মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। একদা কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরকে চারুচন্দ্র দর্শন করতে গেলে, ঠাকুর তাঁকে দেখে খুব প্রসন্ন হন এবং নিজের কাছে বসিয়ে তাঁকে ধর্মবিষয়ক নানা উপদেশ দেন। এমন কি সেখানে শরৎ মহারাজ উপস্থিত থাকায় ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ছোট ভাই চারুচন্দ্রকেও তিনি কাছে টেনে নেবেন কিনা! শরৎ মহারাজ তাতে সম্মতি জানালেও, পরক্ষণেই ঠাকুর বলেন যে,

শরৎচন্দ্রের মতন যদি চারুচন্দ্রকেও তিনি সংসার থেকে টেনে আনেন, তবে তাঁদের মা-বাপের বড় কষ্ট হবে। তাই ঠাকুর সেদিন চারুচন্দ্রকে নানা সদুপদেশ দান করে এবং কিছু জলযোগ করিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন।

*

কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ববঙ্গ নিবাসী ভক্ত। ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিদ্গাঁয়ে তাঁর বাড়ী ছিল। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে তাঁর খুব সখ্যতা থাকায়, তাঁদের সঙ্গেই কালীপ্রসাদ প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যান এবং ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তাঁর ভক্তে পরিণত হন।

পরবর্তীকালে, কালীপ্রসাদের নেতৃত্বে বিক্রমপুরে "নীলখোলার মাঠে" ঠাকুরের উৎসবের এক বিরাট আয়োজন হয় এবং বিদ্গাঁয়ের সেই মহোৎসবে, ভক্ত কালীপ্রসাদের আহ্বানে ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দ যোগদান করেছিলেন।

*

নটবর গোস্বামী

হুগলী জেলার বেলটে গ্রামের বৈষ্ণব ভক্ত। একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রামের শিহড় গ্রামের বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেলে, ভক্ত নটবর সেখানে ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁকে এনে স্বীয় বাড়ীতে সাতদিন রাখেন। এই সময় ঠাকুরকে কীর্তন শোনাবার জন্য নটবর বিশেষ আগ্রহী হন এবং রামজীবনপুরের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া ধনঞ্জয় দে এবং কৃষ্ণগঞ্জের সুবিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক রাইচরণ দাসকে আনিয়ে ঠাকুরকে আনন্দদান করেন। ঠাকুর নটবরের বাড়ীতে কীর্তনানন্দে মুগ্ধ হন এবং তাঁর অপূর্ব ভাব দর্শন করে নটবর সমেত সেখানকার বৈষ্ণবগণ তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

*

রাধিকা গোস্বামী

প্রখ্যাত অদ্বৈত গোস্বামী বংশের বৈষ্ণব ভক্ত। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। তিনি যেদিন প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করতে যান, তখন তাঁর বয়স আন্দাজ তিরিশ বছরের মধ্যে। কিন্তু

প্রখ্যাত গোস্বামীবংশীয় ব্রাহ্মণ বলে তাঁর পরিচয় জানার পর, ঠাকুর তাঁকে সেদিন পূজনীয় হিসাবে হাত জোড় করে প্রণাম জানিয়েছিলেন। গোস্বামীর সঙ্গে ঠাকুরের বহু ধর্মীয় আলোচনা হয়েছিল এবং ঠাকুর স্বয়ং সর্বধর্ম সমন্বয়কারী-রূপে তাঁকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। সেদিন ঠাকুরের কণ্ঠে সুমধুর গৌর-কীর্তন শুনে গোস্বামী মুগ্ধ হন এবং বিদায়কালে ঠাকুরকে প্রণাম করে যান।

*

নবদ্বীপ গোস্বামী

চব্বিশ পরগণা জেলার পানিহাটীর ভক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী মণিমোহন সেনের বৈষ্ণব-গুরুদেব। পানিহাটীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত "চিঁড়া-মহোৎসব" উপলক্ষে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতি বৎসর পানিহাটীতে এসে এই উৎসবে যোগদান করায়, নবদ্বীপ গোস্বামী তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেতেন। সেখানে নবদ্বীপ গোস্বামী পরিচালিত হরি-সঙ্কীর্তন দলে যোগ দিয়ে ঠাকুর নৃত্য করতেন এবং গোস্বামীও তাঁকে নিয়ে আনন্দে বিহ্বল হতেন। একদা নৃত্য ও কীর্তন করার সময় ঠাকুর সমাধিস্থ হওয়ায়, ভাগ্যবান গোস্বামী অতি যত্নে তাঁকে ধারণ করেছিলেন এবং ভক্ত মণিমোহনের বাড়ীতে এনে ঠাকুরকে প্রসাদ গ্রহণ করিয়েছিলেন ঠাকুর গোস্বামীকে নানা উপদেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনার সময় মুহুর্মুহু সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

*

মহেন্দ্র গোস্বামী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগী বৈষ্ণব ভক্ত। তিনি কলকাতার সিমুলিয়া পল্লীর অধিবাসী ছিলেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বশতঃ তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন, অথবা কলকাতায় কোন ভক্ত গৃহে ঠাকুরের আগমন হলে, সেখানে গিয়েও অনেক সময় তিনি ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন। পরম ভক্ত মহেন্দ্রকে ঠাকুর বিশেষ স্নেহ করায়, তাঁর সিমুলিয়ার বাড়ীতেও তিনি শুভাগমন করেছিলেন। একদা মহেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে কয়েক মাস বাস করায় সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং সেখানে তাঁর মহাভাব প্রত্যক্ষ করে তিনি ধন্য হন।

*

কমলাপতি গোস্বামী

হাটখোলার বিখ্যাত গোস্বামী বাড়ীর সন্তান। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা থাকায় তিনি প্রথম জীবনে স্বামীজীর সঙ্গে তাস খেলতেন এবং ব্রাহ্মদের উৎসবাদিতে যোগদান করতেন। ব্রাহ্মদের এই উৎসবগুলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মাঝে মাঝে শুভাগমন হওয়ায়, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করার ও তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন।

*

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ ভক্ত এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতা। তিনি সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে "চিরঞ্জীব শর্মা" নামে পরিচিত ছিলেন। অপর ব্রাহ্মভক্তদের মতন তিনিও দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর অত্যন্ত অনুগতরূপে পরিণত হন। এমন কি, ঠাকুর কোন ভক্তের বাড়ীতে শুভাগমন করলে, ত্রৈলোক্যনাথও সেখানে গিয়ে ঠাকুরের কথামৃত পান করতেন, অথবা তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে যোগদান করতেন। তাঁর স্বরচিত গান সুমিষ্টকণ্ঠে গেয়ে তিনি ঠাকুরকে মুগ্ধ করতেন এবং কখনো কখনো তাঁর গান শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। তাঁর রচিত উচ্চভাবের গানগুলির প্রশংসা করে ঠাকুর তাঁর প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করতেন। ঠাকুর তাঁর গান শুনতে খুব ভালবাসতেন বলে, ঠাকুরের দেহরক্ষার দিন কাশীপুর মহাশ্মশানেও তিনি ঠাকুরের চিতাগ্নির সম্মুখে বসে সময়োচিত সঙ্গীত পরিবেশন করে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন।

ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার পর, ত্রৈলোক্যনাথ যে সকল ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে নিম্নলিখিত সঙ্গীতগুলি সাধন জগতে বিখ্যাত। যথা:—

"আমায় দে মা পাগল করে।"
"নিবিড় আঁধারে মা তোর, চমকে অরূপরাশি।"
"গভীর সমাধি-সিন্ধু অনন্ত অপার।"
"চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয়।"
"চিদানন্দ-সিন্ধুতীরে প্রেমানন্দের লহরী।" প্রভৃতি।

বলাবাহুল্য, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী—উভয় ভক্তদের কাছেই তিনি বিশেষ প্রিয় ছিলেন।

*

দাশরথি সান্যাল

স্বামী বিবেকানন্দের (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ) বরানগর-নিবাসী সহপাঠী। বি. এ. পরীক্ষার সময় কলকাতার চোরবাগানের বাসায় দাশরথির অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথ যেমন তাঁর বাসায় যেতেন, দাশরথিও তেমন নরেন্দ্রনাথের তৎকালীন ৭নং রামতনু বসু লেনের মাতামহীর বাড়ীতে যেতেন। সেই বাড়ীতে দোতলার ওপর একটি ছোট নির্জন ঘরে নরেন্দ্রনাথ লেখাপড়া করতেন এবং সেই ঘরটিকে "টঙ" আখ্যা দিয়েছিলেন।

একদিন সকালে দাশরথি যখন অপর সহপাঠী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সেই "টঙে" বসে কথাবার্তা কইছিলেন, সে সময় হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে সঙ্গে নিয়ে "নরেন" "নরেন" বলে সেখানে গিয়ে হাজির হন; অনেকদিন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে না যাওয়ায় সহপাঠীদের সামনেই ঠাকুর সেদিন অশ্রু বিসর্জন করেন। ঠাকুরের সঙ্গে আনীত কয়েকটি সন্দেশ, ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে খাওয়াবার চেষ্টা করলে, নরেন্দ্রনাথ তার থেকে আগে—তাঁর বন্ধুদের খাইয়ে, পরে নিজে খান। ভাগ্যবান দাশরথি সেদিন ঠাকুরের আনীত সেই সন্দেশ খেয়েছিলেন। এরপর ঠাকুরের অনুরোধে নরেন্দ্রনাথ গান গাইতে শুরু করলে, ঠাকুর সমাধিস্থ হন। সমাধি-সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথের বন্ধুদের পূর্বে কোন ধারণা না থাকায়, ঠাকুর অজ্ঞান হয়েছেন মনে করে দাশরথি খুব ভীত হয়ে পড়েন এবং ঠাকুরের চোখে-মুখে জল দেবার জন্য তাড়াতাড়ি জল আনতে যান; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ, ঠাকুরের সমাধি-অবস্থার কথা জানিয়ে তাঁকে জল আনতে নিরস্ত করেন। বলা বাহুল্য, ভাগ্যবান দাশরথি সেদিন ঠাকুরের ঐ মহাভাব দর্শন করে ধন্য হন। সমাধি-ভঙ্গের পর ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথের আরো কয়েকখানি গান শোনেন এবং অবশেষে তাঁকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে চলে যান।

পরবর্তীকালে, দাশরথি হাইকোর্টের স্বনামধন্য উকীল হয়েছিলেন; কিন্তু বরানগর মঠে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।



গণেশ ঘোষাল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুর নিবাসী অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু। ছোটবেলায় কামারপুকুরে তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের খুব সখ্যতা ছিল। বৃদ্ধ বয়সে একদা গণেশ ঘোষাল জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে দর্শন করতে গেলে, শ্রীশ্রীমা গলায় আঁচল দিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে যান; কিন্তু বৃদ্ধ গণেশ ঘোষাল বন্ধু-

পত্নীকে মাতৃ সম্বোধনে পরম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন এবং "আমার মা, আমার মা, এতে অকল্যাণ হয়"—বলে তিনি শ্রীশ্রীমাকে নিবৃত্ত করেন। বাল্যলীলার সহচর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এবং জগন্মাতা সারদাদেবীকে ঠিক ঠিক চিনতে পেরে গণেশ ঘোষাল ধন্য হন।

*

জানকী ঘোষাল

জনৈক ব্রাহ্মভক্ত। একদা কলকাতার নন্দনবাগানে ব্রাহ্মসমাজের এক উৎসবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যোগদান করায়, সেখানে বহু ব্রাহ্মভক্তের সমাগমে জানকী ঘোষালও উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ঠাকুরের মুখে তিনি সেদিন ঈশ্বরীয় কথা শোনেন এবং পরে তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে যোগদানও করেন। সে সময় জানকী ঘোষাল "মহাভাব" সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করায়, ঠাকুর অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

*

জ্ঞান চৌধুরী

জনৈক এম এ. পাশ ব্রাহ্মভক্ত। তিনি তৎকালে তিন-চার শত টাকা মাহিনার রাজ্য সরকারের কর্মচারী ছিলেন। পত্নীবিয়োগের পর কিছুদিনের জন্য তাঁর মনে বৈরাগ্য আসে এবং শান্তির অন্বেষণে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত শুরু করেন।

একদা পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর নিবাসী প্রখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসবেন শুনে, জ্ঞান চৌধুরী সেদিন ঠাকুরের কাছে যাওয়া স্থগিত রাখেন এবং ঠাকুরের অপর ভক্ত মনোমোহন মিত্র মারফৎ খবর পাঠান যে, "বাঙাল" শশধর আসবেন বলে তিনি সেদিন যাবেন না। ঠাকুর শিক্ষিত জ্ঞান চৌধুরীর এই উক্তিতে খুব অসন্তুষ্ট হন এবং পণ্ডিত শশধরকে "বাঙাল" বলে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করায় ঠাকুর ভক্তদের কাছে বলেন—"কি হীন বুদ্ধি! বিদ্যার অহঙ্কার, তার ওপর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিবাহ করেছে, ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।"

এম. এ. পাশ জ্ঞান চৌধুরীকে ঠাকুর বিদ্যার অহঙ্কার ত্যাগ করে ভক্তিপথে থাকার নির্দেশ দেন এবং তিনিও পরবর্তীকালে ঠাকুরের নির্দেশ পালন করেন। তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেও ঠাকুরের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিলিত হতেন এবং ঠাকুরও তাঁকে সদুপদেশ দান করতেন। একদা জ্ঞান চৌধুরীর বাড়ীতে

আয়োজিত ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসব উপলক্ষে ঠাকুর শুভাগমন করেছিলেন এবং কেশবাদি ব্রাহ্মভক্তগণের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, নৃত্য, গীত প্রভৃতির দ্বারা তাঁর বাড়ী মাতিয়ে তুলেছিলেন। জ্ঞান চৌধুরী সেদিন তাঁর বাড়ীতে ঠাকুরকে জলযোগে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন।

*

হারাণচন্দ্র চৌধুরী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত বলরাম বসুর বাল্যবন্ধু। ঠাকুরের সান্নিধ্যে বলরামের আসার আগেই হারাণচন্দ্র, ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তাঁর ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। উড়িষ্যা থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলরামকে যখন কলকাতায় পাঠানো হয়, তখন ৺জগন্নাথ অদর্শনে বলরামের অন্তর দগ্ধ হতে থাকে। সেই মানসিক অস্থিরতার কথা বলরাম তাঁর বন্ধু হারাণচন্দ্রের কাছে প্রকাশ করলে, ঠাকুরের দর্শনকারী ও ভক্ত হারাণচন্দ্র, সাক্ষাৎ ৺জগন্নাথ দর্শনের জন্য বলরামকে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে বিশেষ উপদেশ দেন। যদিও বলরাম ইতিপূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম আরো দু-একজনের কাছে শুনেছিলেন, কিন্তু ৺জগন্নাথ দেবের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের তুলনার কথা এই প্রথম হারাণচন্দ্রের কাছে শুনে, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য বিশেষ উৎসাহী হন। বন্ধু হারাণচন্দ্রের উপদেশানুযায়ী বলরাম যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান, সেদিন ঠাকুরকে দর্শন করা মাত্রই তিনি বিভোর হন এবং বুঝতে পারেন যে, দারুব্রহ্ম সেদিন জীবন্ত পূর্ণব্রহ্মরূপ দেখাবার জন্যই তাঁকে সেখানে এনেছেন।

*

বরদাকান্ত শিরোমণি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জনৈক পরমভক্ত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল এবং ঠাকুরও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলায় "বন-ভোজন" উপলক্ষে আরো কয়েকজন ভক্তসহ বরদাকান্ত যখন "খিচুড়ী" প্রস্তুত করছিলেন, তখন ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হয়ে স্নেহভরে তাঁর জন্য "ভাত" রেঁধে খাওয়াতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ভক্তদের কাছে ভাত রাঁধার জন্য পৃথক হাঁড়ী না থাকায়, বরদাকান্ত বড় মুস্কিলে পড়েন; এই সময় ঠাকুরের নির্দেশে তাঁরই ঘর থেকে একটি সন্দেশের শূন্য হাঁড়ী এনে তিনি তাতে ঠাকুরের জন্য পৃথকভাবে ভাত রাঁধার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সন্দেশের

হাঁড়ীটি ভাত রাঁধার পক্ষে মজবুত না থাকায়, আগুনের স্পর্শে ফেটে ভাতের জল পড়তে থাকে এবং সেজন্য রান্নারও দেরী হতে থাকে। ইতিমধ্যে বেলা বাড়তে থাকায়, ক্ষুধার্ত ঠাকুর বার বার রান্নার সম্পর্কে খোঁজ নিতে থাকেন। তখন অপ্রস্তুত বরদাকান্ত মনে মনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকেই ডাকতে থাকেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। এরপরেই তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেন যে, ফুটা হাঁড়ীর জল বহির্গত হয়ে গেলেও, ভাতগুলি বেশ সুসিদ্ধ হয়েছে। ভক্ত বরদাকান্তের রান্না-করা সেই ভাত ঠাকুর সেদিন তৃপ্তি সহকারে আহার করেন এবং এই ঘটনায় বরদাকান্ত কৃতার্থ হন। সেদিন মনে মনে বরদাকান্ত, ঠাকুরকে স্মরণ করে বাধামুক্ত হওয়ায়, অন্তর্যামী ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন—"তোমার আরূঢ় ভক্তিতে এই ভাঙ্গা হাঁড়ীতে রাঁধতে পেরেছ; তা না হলে কখনই হত না।"

*

গোলক শিরোমণি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা সম্পর্কীয়। তাঁর বাড়ী ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার হালিসহরে। তিনি ভাল কথকথা করতেন। ভক্ত কেদারনাথের সঙ্গে গোলক প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন ও তাঁর কথামৃত পান করতেন।

ঠাকুরও তাঁকে বিশেষ স্নেহ করায়, তিনি ঠাকুরের পরমভক্তে পরিণত হন। এমনকি, ঠাকুরের অপর কোন ভক্তের সঙ্গে তাঁর অন্য কোথাও সাক্ষাৎ হলেই, তিনি কেবলমাত্র ঠাকুরের কথাই আলোচনা করতেন এবং তাঁর প্রতি অসীম ভক্তি প্রদর্শন করতেন।

পরবর্তীকালে, চব্বিশ পরগণা জেলার খড়দহে একদিন কথকথা উপলক্ষে যোগদানের পর, গোলকের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সেখানে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তাঁকে সুস্থ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, ঘটনাচক্রে সেই বাড়ীতে সেই সময় ঠাকুরের ত্যাগী-সন্তান ও অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দ উপস্থিত থাকায়, গোলক নিজের শরীরের জ্বালা নিবারণের জন্য স্বামী অখণ্ডানন্দের শীতল দেহ বার বার জড়িয়ে ধরেন। পরে ঠাকুরের সন্তান অখণ্ডানন্দজীর উপস্থিতিতেই, ঠাকুরের পরম ভক্ত গোলক সেখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন।

*

রাধানাথ রায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত উচ্চ শিক্ষিত পরম অনুরাগী ভক্ত। আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেনের সঙ্গে তিনি যখন এম এ. পাশ করেন, তখন তাঁদের দেখবার জন্য অনেক লোক যেত। এই সময় "পরমহংস-দেবের" নাম শুনে রাধানাথ ঠাট্টা করে বলতেন—"রাজহংস, পাতিহংস শুনেছি, পরমহংস কিরে বাবা!" পরে একদিন কৌতূহলবশে রাধানাথ সত্যই দক্ষিণেশ্বরে "পরমহংস" দর্শন করতে যান। সেদিন ঘর-ভর্তি লোকের মধ্যে ঠাকুর তাঁর প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং এই ঘটনায় তিনি ঠাকুরের দাসানুদাসে পরিণত হন।

পরবর্তীকালে, রাধানাথ যখন পূর্ববঙ্গের বরিশালে "স্পেশ্যাল সাব-রেজিষ্ট্রারের" পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন একদিন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত ও শয্যাগত অবস্থাতেও তিনি ঠাকুরের প্রতি অগাধ বিশ্বাসে—ঠাকুরের একখানি ফটো মাথায় নিয়ে উদ্দাম নৃত্য করতে থাকেন এবং বিকালে তাঁর জ্বর ছেড়ে যাবে বলে নিজেই ঘোষণা করেন। বলা আবশ্যক, সত্যই সেদিন বিকালে তাঁর জ্বর ছেড়ে যায় এবং সেইদিনই তিনি অন্ন আহার করেন।

*

রাজেন রায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বেহালানিবাসী ভক্ত। তিনি প্রথম জীবনে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করে তাঁর ভক্তে পরিণত হন এবং পরিণত বয়সে তিনি ঠাকুরের সম্পর্কে "শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবত" রচনা দ্বারা ঠাকুরের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

*

রজনীনাথ রায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জনৈক ব্রাহ্মভক্ত; ঠাকুরের পরমভক্ত মণিলাল মল্লিকের কলকাতার সিঁদুরিয়াপটীর বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে ঠাকুরের শুভাগমনকালে যে-কয়েকজন পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী যোগদান করেন, রজনীনাথ তাঁদের মধ্যেই একজন। তিনি সেদিন ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে তাঁর কথামৃত পান করেছিলেন।

*



সীতানাথ পাইন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামের স্বর্ণ বণিক পল্লীর অধিবাসী। ধনী গৃহস্থ সীতানাথ খুব ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং ঠাকুরের কামারপুকুরের বাড়ীর সঙ্গে খুব হৃদ্যতা বজায় রেখেছিলেন। ফলে ঠাকুরের, তথা তৎকালীন বালক গদাধরের, তাঁর বাড়ীতে অবাধ যাতায়াত ছিল। এমনকি, সীতানাথের বাড়ীর অন্দরমহলে মহিলাদের সঙ্গেও বালক গদাধর অসঙ্কোচে মিশতেন এবং তাঁরাও বালককে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সীতানাথের অনেকগুলি যুবতী কন্যা থাকায়, গদাধরের সে-বাড়ীতে যাতায়াত অনেকের কাছে অপছন্দ হত; কিন্তু সীতানাথ দেব-মানব গদাধরের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং নিজের ইষ্টের মতন জ্ঞান করে তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর কন্যারাও গদাধরকে এমন ভগবতজ্ঞানে গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁদের বাড়ীতে পাঠ বা সঙ্গীত করার সময় কখনো কখনো গদাধরের ভাবাবেশ উপস্থিত হলে, তাঁরা বালক গদাধরকে শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন্ত বিগ্রহজ্ঞানে পূজা করতেন।

গদাধর প্রতিদিন সীতানাথের বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন এবং কোনদিন যেতে না পারলে, সীতানাথ গদাধরের খোঁজ নেবার জন্য লোক পাঠাতেন। পাঠশালায় কিছুদিন পড়ার ফলে গদাধর যেটুকু লেখাপড়া শিখেছিলেন, তার সাহায্যেই তিনি নানা ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করে অথবা ধর্মমূলক গান গেয়ে সীতানাথের বাড়ীর সবাইকে পরিতৃপ্ত করতেন। একদা সীতানাথের বাড়ীতেই শিবরাত্রি উপলক্ষে যাত্রার আসরে শিব সেজে গদাধর সমাধিস্থ হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, ঠাকুরের বাল্যলীলা-দর্শনে সীতানাথের সমগ্র পরিবার ধন্য হয়।

*

দুর্গাদাস পাইন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামের স্বর্ণ বণিক পল্লীর অধিবাসী। তিনি ছিলেন ঐ পল্লীরই অপর অধিবাসী, ধনী গৃহস্থ ও ধর্মনিষ্ঠ সীতানাথ পাইনের খুল্লতাত ভ্রাতা। দুর্গাদাস সীতানাথের মতন উদার প্রকৃতি না হয়ে, প্রথম জীবনে বরং খুব রক্ষণশীল ছিলেন এবং বাড়ীর মহিলাদের কঠোর অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্য ঠাকুরের, তথা তৎকালীন বালক গদাধরের পক্ষে তাঁর বাড়ীর অন্দরমহলে যাওয়ার উপায় ছিল না; বরং প্রতিবেশী-আত্মীয় সীতানাথের বাড়ীর অন্দরমহলে মহিলাদের সঙ্গে গদাধর অবাধ মেলামেশা করতেন বলে, দুর্গাদাসের সে বিষয়ে প্রবল আপত্তি ছিল এবং সেজন্য তিনি সীতানাথকে হীন চোখে দেখতেন।

দুর্গাদাসের এহেন মনোবৃত্তির জন্য একদা গদাধর তাঁর ভুল ভাঙাবার উদ্দেশ্যে তাঁকে যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করে বিফল হন। উপরন্তু গদাধরকে কোনক্রমেই তাঁর বাড়ীর অন্দরমহলে প্রবেশ করতে দেবেন না বলে দুর্গাদাস অহঙ্কার প্রকাশ করেন। দুর্গাদাসের এই অহঙ্কার চূর্ণ করার জন্য একদিন অপরাহ্নে গদাধর জনৈকা তাঁতী-রমণীর ছদ্মবেশে দুর্গাদাসের কাছে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে একরাত্রি আশ্রয় দেবার জন্য প্রার্থনা জানান; দুর্গাদাস ছদ্মবেশী গদাধরকে চিনতে না পেরে বরং বিপন্না রমণী জ্ঞানে তাঁকে অন্দরমহলে যাওয়ার ও থাকার অনুমতি দেন। সেই অনুযায়ী গদাধর বিনা বাধায় রমণীবেশে দুর্গাদাসের বাড়ীর অন্দরমহলে প্রবেশ করেন এবং তাঁর বাড়ীর মহিলাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় যোগ দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাত্রি হওয়ায় এবং গদাধর বাড়ীতে ফিরে না আসায়, গদাধরের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বর বণিক পল্লীতে এসে গদাধরের নাম ধরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে থাকেন; গদাধরও "যাই দাদা" বলে দ্রুতপদে সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলে, দুর্গাদাস হতভম্ব হয়ে যান। গদাধর কৌশলে এই ভাবে দুর্গাদাসের অহঙ্কার চূর্ণ করায়, দুর্গাদাস সেদিন থেকে বাড়ীর অবরোধ প্রথা তুলে দেন এবং গদাধরকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেন। বলাবাহুল্য, ঠাকুরের বাল্যলীলার এই কৌতুকপূর্ণ অধ্যায়টি দুর্গাদাসের বাড়ীকে ধন্য করে।

*

লক্ষ্মণ পাইন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামের সুবর্ণ বণিক পল্লীর অধিবাসী এবং ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত। তিনি মাঝে মাঝে কামারপুকুর থেকে কলকাতায় এসেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং তাঁর খোঁজ-খবর রাখতেন।

যে সময় ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে যান এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল মা-কালীর পূজকরূপে নিযুক্ত হন, সে সময় রামলালের দ্বারা হৃদয়ের মতন ঠাকুরের ঠিক ঠিক সেবা হত না; বরং প্রথম প্রথম রামলাল তাঁর কোন খবরই নিতেন না। ফলে, ঠাকুরের সেই সময় খুব অসুবিধা ও কষ্ট হত। এই সময় একদিন লক্ষ্মণ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসায়, ঠাকুর তাঁর মারফৎ দেশে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে তাঁর এই কষ্টের কথা জানান এবং যে-কোন উপায়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে শ্রীশ্রীমাকে চলে আসার জন্য আহ্বান করেন। বিশ্বস্ত ও অনুগত লক্ষ্মণ, ঠাকুরের আদেশ যথাযথভাবে পালন করেন এবং ঠাকুরের কষ্টের কথা শুনেই শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের

কাছে চলে আসেন। বলাবাহুল্য, ঠাকুরের কষ্টলাঘবের জন্য ভক্ত লক্ষ্মণের এই কাজে সেই সময় ঠাকুরের বিশেষ উপকার হয়েছিল।



দ্বারিকানাথ বিশ্বাস

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। তিনি ছিলেন রাণী রাসমণির জামাতা জমিদার মথুরানাথ বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দ্বারিকানাথকে ঠাকুর বিশেষ স্নেহ করতেন এবং পিতা মথুরানাথের মতন দ্বারিকানাথেরও ঠাকুরের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল।

একদা দক্ষিণেশ্বরে জনৈকা নেপালী ব্রহ্মচারিণীর কণ্ঠে "গীত-গোবিন্দে"র গান শুনে দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সামনেই রুমালে চোখের জল মুছতে থাকায়, ঠাকুর তাঁর ভক্তির প্রশংসা করেছিলেন। আর একবার দক্ষিণেশ্বরে একটি মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ব্যারিস্টার হিসাবে দ্বারিকানাথের সঙ্গে আলোচনার জন্য উপস্থিত হলে, দ্বারিকানাথের উদ্যোগে মহাকবির সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎকার হয়েছিল।

একদা ঠাকুর, ভক্ত মথুরানাথকে জানান যে মথুরানাথ যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিনই ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বাস করবেন এবং তার পরেই দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যাবেন। ঠাকুরের সে কথায় মথুরানাথ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী জগদম্বা ও পুত্র দ্বারিকানাথও ঠাকুরকে সমভাবে ভক্তি করেন। ঠাকুর মথুরানাথের সে কথা স্বীকার করে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁদের দু'জনের জীবদ্দশায় ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যাবেন না। প্রকৃতপক্ষে রাণী রাসমণি ও মথুরানাথের দেহত্যাগের পরেও ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন; কিন্তু জগদম্বা ও দ্বারিকানাথের মৃত্যুর পর তিনি আর বেশীদিন দক্ষিণেশ্বরে বাস করেন নি। মাত্র ৪০ বছর বয়সে, ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই ভক্ত দ্বারিকানাথের দেহত্যাগ হয়।



ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস

রাণী রাসমণির জামাতা, জমিদার মথুরানাথ বিশ্বাসের কনিষ্ঠপুত্র। তিনি পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরের সেবাইতের কাজের ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং আজীবন ঐ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের আমলে প্রথমদিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, তবে অসুস্থ হওয়ায় বেশীদিন তাঁর সেখানে থাকা সম্ভব হয়নি।

ঠাকুরের সংস্পর্শে আগত ত্রৈলোক্যনাথ, তাঁর পিতা মথুরানাথের মতন সম্পূর্ণ ভক্তি জগতের লোক ছিলেন না; তাই মথুরানাথ, ঠাকুরকে যে ভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন, ত্রৈলোক্যনাথ, ঠাকুরের অবতারত্ব সম্পর্কে সে ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। ঠাকুরের জ্ঞান, ভক্তি, সমাধি প্রভৃতি গুণ দর্শনে তিনি ঠাকুরকে সাধারণভাবে ভক্তি করতেন বটে কিন্তু মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাজগুলি সমালোচনার চক্ষেও দেখতেন। সেজন্য তাঁর পিতা মথুরানাথের মৃত্যুর পর ঠাকুরের জন্য বরাদ্দ পাঁচ টাকা ছাড়া, মথুরানাথ-প্রবর্তিত ঠাকুরের জন্য অপর সকল প্রকার বাড়তি খরচ তিনি বন্ধ করে দেন এবং এই কারণে ঠাকুরকে সাময়িক অসুবিধায় পড়তে হয়। পরবর্তীকালে ঠাকুর যখন পূজা করতে পারতেন না, তখন অবশ্য ঠাকুরের বরাদ্দ মাসিক ঐ সামান্য টাকা বন্ধ না করে, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে তা দেওয়ার জন্য ত্রৈলোক্যনাথ ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠাকুরের দেহরক্ষার পর সে টাকা দেওয়াও বন্ধ হয়।

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ভাগ্নে এবং মা-কালীর পূজক হৃদয়রাম একটি গর্হিত কাজ করায়, ত্রৈলোক্যনাথ তৎক্ষণাৎ হৃদয়রামকে অপমান করে মন্দির থেকে চিরদিনের মতন বহিষ্কার করেন, সেই সময় ত্রৈলোক্যনাথের দ্বারবান ভুল করে ঠাকুরকেও চলে যেতে বলায়, ঠাকুরও হৃদয়রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দির ত্যাগ করার জন্য অগ্রসর হন। এই ঘটনায় ত্রৈলোক্যনাথ স্বয়ং দ্রুতপদে গিয়ে ঠাকুরকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে আনেন এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ঠাকুরের কাছে তাঁর ভক্তগণের আগমনকাল থেকে পরবর্তী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি প্রতি বছর ঠাকুরের জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বরেই পালন করা হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, "বিলাত-প্রত্যাগত" স্বামী বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে প্রবেশ করতে দিলে মন্দির কলুষিত হবে—এই নিদারুণ অজুহাতে ত্রৈলোক্যনাথ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব করার অনুমতি দেননি। সুতরাং সেই বছর থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুগণ কর্তৃক দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মোৎসব বন্ধ রাখা হয় এবং প্রথমে বেলুড়ের "দাঁয়েদের রাসবাড়ীতে" এবং পরে বেলুড়মঠেই তা প্রবর্তন করা হয়।



অম্বিকাচরণ বিশ্বাস

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ মহিলা ভক্ত, উত্তর কলকাতার বাগবাজারের শ্রীমতী যোগীন্দ্রমোহিনী দেবী, তথা যোগীন-মা'র স্বামী। তিনি ছিলেন চব্বিশপরগণা জেলার খড়দহের প্রসিদ্ধ জমিদার মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বংশের পোষ্যপুত্র এবং ঠাকুরের অন্তরঙ্গ গৃহীভক্ত বলরাম বসুর ভাগ্নে সম্পর্কীয়। প্রথম জীবনে অম্বিকাচরণ উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় বংশের মর্যাদা, বা সম্পত্তি রক্ষা করতে না পারায় এবং শত প্রচেষ্টাতেও স্বামীকে সৎপথে ফেরাতে না পেরে, যোগীন-মা তাঁর সংস্রব ত্যাগ করেন ও একমাত্র কন্যা "গণু"কে নিয়ে খড়্‌দহের শ্বশুরবাড়ী থেকে, বাগবাজারের পিতৃগৃহে চলে আসেন।

পরবর্তীকালে, ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গরূপে গৃহীতা হবার পর যোগীন-মা'র জীবনে এক নবীন আনন্দের সঞ্চার হয়। ঠাকুর যোগীন-মাকে বলেছিলেন যে, স্বামী উন্মার্গগামী হলেও তাঁর প্রতি সতী-স্ত্রীর একটি অপরিহার্য কর্তব্য আছে। ঠাকুরের সেই উপদেশ বাস্তবে পরিণত করার জন্য যোগীন-মা'রই ঐকান্তিক আকর্ষণে অম্বিকাচরণ অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন। এরপর থেকেই তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভ করে নিজেকে সংশোধনের দ্বারা সৎপথে চলতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু শীঘ্রই একটি ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে অম্বিকাচরণ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কিছুদিন বাদেই তাঁর মৃত্যু হয়। বলা আবশ্যক যে, যোগীন-মা শেষ ক'টাদিন অসুস্থ স্বামী অম্বিকাচরণকে নিজের কাছে রেখে তাঁর যথাসাধ্য সেবা করেছিলেন এবং ঠাকুরের উপদেশের মর্যাদা দিয়েছিলেন।

*

নীলমাধব সেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত গাজীপুর নিবাসী ভক্ত। তিনি গাজীপুরের প্রখ্যাত "পওহারী বাবাকে" দর্শন করার পর, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসে সে কথা বলেন। পওহারী বাবা নিজের ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন—এই কথা নীলমাধবের কাছে শুনে ঠাকুর ঈষৎ হেসে নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন—"খোলটা!"

*

জয়গোপাল সেন

কলকাতার মাথাঘসা পল্লীর অধিবাসী ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ভক্ত। চব্বিশপরগণা জেলার বেলঘোরিয়াতেও সাধন-ভজনের জন্য তাঁর "তপোবন" নামক একটি বাগানবাড়ী ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বেলঘোরিয়ার বাগানে একদা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে, সেখানে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেই জয়গোপাল অভিভূত হন। এরপর থেকেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন এবং ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী ভক্তে পরিণত হন।

ঠাকুরের প্রতি জয়গোপাল যেমন শ্রদ্ধাবান ছিলেন, ঠাকুরও তাঁর প্রতি সেইরূপ স্নেহশীল ছিলেন; সেজন্য ঠাকুরকে মাথাঘসা পল্লীর নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসার সৌভাগ্য জয়গোপালের হয়েছিল। ঠাকুর তাঁর বাড়ীতে শুভাগমন করে ধর্মপ্রসঙ্গ, কীর্তনাদির দ্বারা জয়গোপালকে আনন্দ দান করেছিলেন এবং সেখানে সমাধিস্থও হয়েছিলেন। বলা আবশ্যক, জয়গোপালের পরিবারের সবাই ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন।

*

নন্দলাল সেন

স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী, আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং কলকাতার কলুটোলা নিবাসী ব্রাহ্মভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে বা অন্যান্য ভক্তগৃহে বহুবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করেন এবং তাঁর কলুটোলার বাড়ীতেও ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল। নন্দলালকে ঠাকুর খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন।

একদা ষ্টীমারে চেপে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করার পর ঠাকুর যখন ভক্তগণের সঙ্গে গাড়ী করে কলকাতায় ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে তাঁর হঠাৎ জলতৃষ্ণা পাওয়ায়, ঠাকুরের সেই সময়ের অন্যতম সঙ্গী নন্দলাল "ইণ্ডিয়া ক্লাবের" কাছে গাড়ী থামিয়ে ক্লাব থেকে একটি কাঁচের গ্লাসে করে জল এনে ঠাকুরকে দেন। তৃষ্ণার্ত ঠাকুর সেদিন ভক্তিমান নন্দলালের আনীত জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করেন।

পরবর্তীকালে, ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও নববিধান ব্রাহ্মসমাজে নন্দলাল ঠাকুরের সম্পর্কে আলোচনায় যোগদান করতেন এবং ঠাকুরের স্মৃতিকথায় নিজের অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন।

*

দুর্গাপ্রসাদ সেন

পূর্ববঙ্গীয় প্রখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের ভ্রাতা। দক্ষিণেশ্বরে সাধন কালের প্রথম অবস্থায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে ও মনে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুরের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন; কিন্তু শত চেষ্টাতেও তিনি কবিরাজীমতে চিকিৎসাশাস্ত্রের আয়ত্বের বাইরে ঐ অস্বাভাবিক ক্রিয়াগুলি নিরাময় করতে ব্যর্থ হন এবং ঠাকুরের তথাকথিত রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় একদিন গঙ্গাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদ, ঠাকুরের দৈহিক দৈবক্রিয়া-গুলি প্রত্যক্ষ করে ও সেগুলির সম্যক্ পরিচয় পেয়ে এটি "যোগজ-ব্যাধি" ব'লে সিদ্ধান্ত করেন এবং গঙ্গাপ্রসাদ তখন দুর্গাপ্রসাদের অভিমত স্বীকার করে, ঠাকুরের কবিরাজী চিকিৎসা বন্ধ করে দেন। এখানে উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে ঠাকুরের মহিলা-গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীদেবীও ঠাকুরের ব্যাধি সম্পর্কে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এবং ঠাকুরের অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ, তথা তারকনাথ ঘোষালের পিতা, সাধক রামকানাই ঘোষালও ঠাকুরের দেহের জ্বালা নিবারণের জন্য ইষ্টকবচ ধারণের পরামর্শ দিয়ে সফল হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, দুর্গাপ্রসাদই সর্বপ্রথম ঠাকুরের "যোগজ-ব্যাধিকে" আবিষ্কার করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

*

মোহিত সেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত দুটী-পাশকরা যুবক ভক্ত। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর খুব অনুরাগ ছিল। মোহিত কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন। ঈশ্বর প্রীতির দরুণ মোহিতকে ঠাকুর স্নেহ করলেও, মোহিত উচ্চঘরের ভক্ত ছিলেন না বলে ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে উক্তি করেছিলেন।

*

যোগেন সেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত কৃষ্ণনগরের অধিবাসী এবং রাজ্য সরকারের কর্মচারী। তিনি কলকাতায় "রাইটার্স বিল্ডিংস"-এ চাকরী করতেন এবং ঐ বাড়ীরই নীচের তলায় একটি কোয়ার্টারে বাস করতেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণে তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং সরল ও অমায়িক প্রকৃতির জন্য যোগেনকে ঠাকুর খুব স্নেহ করতেন।

একদা যোগেনকে পাশে বসিয়ে ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—ভগবানের কোন্ রূপ দেখে তাঁর আনন্দ হয়। যোগেন জানান যে, বারোয়ারী পূজায় "চতুর্ভুজ নারায়ণ" তাঁর ভাল লাগে এবং এক্ষণে ঠাকুরের মধ্যেই তিনি সেই "রূপ" দর্শন করছেন। এইভাবে ঠাকুরের মধ্যে নারায়ণের রূপ দর্শন করেই তিনি সেদিন ঠাকুরের দুর্লভ কৃপালাভ করেছিলেন।

ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বশতঃ ভাগ্যবান্ যোগেন কৃষ্ণনগর থেকে সরভাজা ও সরপুরিয়া এনে দ্বারবানের মারফৎ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্য সেগুলি পাঠিয়ে দিতেন এবং ভক্তের প্রেরিত মিষ্টান্ন, পরম আনন্দের সঙ্গে ঠাকুর গ্রহণ করতেন। ঠাকুরের অনেক ভক্ত মাঝে মাঝে যোগেনের "রাইটার্স-বিল্ডিংস্"-এর কোয়ার্টারে গিয়েও তাঁর সঙ্গে তৎকালে আনন্দ করতেন।

*

গিরীশচন্দ্র সেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ব্রাহ্মভক্ত। তিনি বহুবার ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত ছাড়াও, ভক্তদের গৃহে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, সে সব স্থানে গিয়েও তিনি ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন ঠাকুরের দেহরক্ষার সংবাদ শুনে, শেষদিনেও তিনি ঠাকুরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করে, তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে, গিরীশচন্দ্র তাঁর স্বচক্ষে দেখা ঠাকুরের আচরণ, ভক্তসঙ্গে মেলামেশা, কথাবার্তা প্রভৃতি বিষয়ে ঠাকুরের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে রচনা প্রকাশ করেছিলেন।

*

বৈকুণ্ঠ সেন

কলকাতার মাথাঘসা পল্লীর অধিবাসী ব্রাহ্মভক্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী জয়গোপাল সেনের ভ্রাতা। তিনি ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করতেন এবং তাঁর কথামৃত পানে কৃতার্থ হতেন।

একদা ভক্ত জয়গোপালের বাড়ীতে বৈকুণ্ঠ, ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হলে, ঠাকুর তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করেছিলেন। সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে ভক্ত বৈকুণ্ঠকে ঠাকুর বলেছিলেন, ঈশ্বরের পাদপদ্মে একহাত রেখে, আর এক হাতে সংসারের কাজ করতে।

ঠাকুরদাস সেন

জনৈক ব্রাহ্মভক্ত। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন ও ঠাকুরকে বিশেষ মান্য করতেন। ঠাকুরও তাঁকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করতেন।

*

বিপিন সেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত অধরলাল সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র। দশ-এগারো বছর বয়সে তিনি ঠাকুরকে তাঁদের নিজেদের বাড়ীতে প্রথম দর্শন করেছিলেন এবং চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করেছিলেন। এরপরেও তিনি কয়েকবার ঠাকুরের সঙ্গলাভ করেন এবং তাঁর অনুরাগী ভক্তে পরিণত হন। পরবর্তী জীবনেও তিনি ঠাকুরের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্তগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন।

*

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী প্রখ্যাত ব্রাহ্মনেতা এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। জীবদ্দশা ১৮৪০ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। জন্মস্থান হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া। তিনি বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন এবং বহু ধর্মগ্রন্থ ইংরাজীতে রচনা করেছিলেন। তিনি আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য সারা ভারতবর্ষ ছাড়াও, তিনি জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকাতেও গিয়েছিলেন।

আচার্য কেশবচন্দ্রের মাধ্যমেই তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন এবং বহুবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাঁর পূত সঙ্গলাভ করেন। ঠাকুরও প্রতাপচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গও করতেন। প্রখ্যাত ব্রাহ্মনেতা হওয়া সত্বেও এবং ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করা সত্বেও, তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। এমনকি, ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে তিনি প্রবন্ধও লিখেছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, পরবর্তীকালে আমেরিকার চিকাগোতে ধর্ম মহা সম্মেলনে প্রতাপচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের অসীম ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবে তিনি তাঁর প্রতি

প্রথমদিকে কিছুটা ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন। এমন কি, সেই সময় আমেরিকায় থাকাকালীন তিনি স্বামীজীকে কিছুটা হেয় করার চেষ্টাও করেন; কিন্তু তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল এবং সমগ্র আমেরিকা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহান্ ভাবধারাকে বরণ করে স্বামীজীকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দান করেছিল।

*

সিদ্ধেশ্বর মজুমদার

বরানগর নিবাসী, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। তিনি ছিলেন কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভাগ্নে-সম্পর্কীয়।

একদা পারিবারিক কলহের ফলে মাষ্টার মশাই সস্ত্রীক গৃহত্যাগ করে তাঁর ভগ্নিপতী কবিরাজ ঈশানচন্দ্র মজুমদারের বরানগরের বাড়ীতে এসে ওঠেন এবং নৈরাশ্যপূর্ণ মনে আত্মঘাতী হবার চিন্তা করেন। এই সময় ভাগ্নে সিদ্ধেশ্বর তাঁর মামার মনকে প্রফুল্ল করার উদ্দেশ্যে, মাষ্টার মশাইকে নিয়ে বেড়াতে বার হন এবং কাছাকাছি এ-বাগান, সে-বাগান বেড়িয়ে অবশেষে "পরমহংসদেবকে" দেখাবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির বাগানে গিয়ে তাঁকে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত করেন। সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁরা দর্শন করেন এবং পরে উভয়ে, নিভৃতে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ করেন। বলা বাহুল্য, মাষ্টার মশাইকে আনন্দ দান করা উপলক্ষেই সিদ্ধেশ্বর, ঠাকুরের সান্নিধ্যে সরাসরি আসার সৌভাগ্য লাভ করেন, আবার অপরপক্ষে সিদ্ধেশ্বরের সাহচর্যেই মাষ্টার মশাই এই প্রথম ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান এবং পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ গৃহী-শিষ্যে পরিণত হন।

*

শ্রীরাম মল্লিক

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু ও কামারপুকুরের অধিবাসী। প্রথম জীবনে ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীরামের ১৬।১৭ বছর অবধি খুব ভালবাসা ছিল। রাতদিন তাঁরা একসঙ্গে খেলা করতেন, একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন এবং মাঝে মাঝে একসঙ্গে শুতেন। এঁদের এই ভালবাসা লক্ষ্য করে সেখানকার লোকেরা বলত যে, এদের ভেতর একজন মেয়ে হলে, ওদের দুজনের বিয়ে হত। বলা আবশ্যক, এরপর পরিণত বয়সে দুজনেরই জীবনধারা বদলে যায়; ঠাকুর অবতার-রূপে লীলা সুরু করেন এবং শ্রীরাম ব্যারাকপুরের কাছে চানকে এসে দোকান খুলে ব্যবসা সুরু করেন।

একদা বাল্যলীলার সাথী শ্রীরামকে দেখার জন্য, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মনে খুব বাসনা জাগে এবং তিনি কয়েকবার শ্রীরামের কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসেন। ঠাকুরের আহ্বানে শ্রীরাম, দক্ষিণেশ্বরে দুদিন বাসও করেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে কেবল নিজের সাংসারিক কথাই বলেন। ইতিমধ্যে শ্রীরাম বিবাহ করে সংসারী হয়েছিলেন; কিন্তু কোন সন্তানাদি না হওয়ায়, তাঁর ভাইপোটিকে মানুষ করেছিলেন. অবশেষে সেই ভাইপোটিরও মৃত্যু হওয়ায় তিনি খুব শোক পান এবং সেই সব দুঃখের কথাই ঠাকুরকে জানান। সংসারের মায়ায় বাল্যসখা শ্রীরামকে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ দেখে, ঠাকুর তাঁকে এড়িয়ে চলেন; এমন কি পূর্বের মতন আর তিনি শ্রীরামকে বন্ধুরূপেও স্পর্শ করতে পারেন নি। বলা বাহুল্য, শ্রীরাম কিন্তু ঠাকুরকে প্রথম জীবনের বন্ধুহিসাবে সহজরূপে গ্রহণ করে, অজ্ঞাতসারে "অবতার-শ্রীরামকৃষ্ণের" সান্নিধ্যলাভে ধন্য হন।

*

ঈশানচন্দ্র মল্লিক

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী বৈষ্ণবভক্ত। তিনি ছিলেন কামারপুকুরের কিছুদূরে শ্যামবাজার গ্রামের অধিবাসী। একদা ঠাকুর তাঁর ভাগ্নে হৃদয়ের বাড়ী শিহড়গ্রামে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেলে বৈষ্ণব ঈশান চন্দ্র, ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর পূত সঙ্গ লাভে মুগ্ধ হন। ভক্ত ঈশানচন্দ্রের আন্তরিক আহ্বানে ঠাকুর তাঁর বাড়ীতেও শুভাগমন করেন।

*

কুঞ্জ মল্লিক

কলকাতার কলুটোলা নিবাসী বৈষ্ণব ভক্ত। কলুটোলায় কালী দত্তের বাড়ীতে তাঁদের হরিসভা ছিল এবং সেখানে পবিত্র "চৈতন্য আসন" স্থাপিত ছিল। বর্তমানে ট্রপিক্যাল স্কুলের উল্টোদিকে ৩২/২ দেবেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীটে উক্ত হরিসভা বিদ্যমান ছিল। এখানেই একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্য-সভায় যোগদান করে ভাবাবস্থায় সেই "চৈতন্য-আসনে" উঠে সমাধিস্থ হওয়ায়, তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে এই ঘটনার পক্ষে ও বিপক্ষে সাময়িক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। যে স্থানটিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন, সেই স্থানটি তখন কুঞ্জ মল্লিকের অংশেই ছিল। কুঞ্জ মল্লিক মাত্র ১০।১২ বছর বয়সে এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। পরে ১৬ বছর বয়সে তিনি ঠাকুরের পরমভক্ত মণিলাল মল্লিকের সঙ্গে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের

সান্নিধ্যে উপস্থিত হলে, ঠাকুর নিজহাতে তাঁর মুখে সন্দেশ তুলে খাইয়ে দিয়েছিলেন। এর পরেও মাঝে মাঝে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলেই, ঠাকুর তাঁর মস্তকে হাত বুলিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করতেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও কুঞ্জ মল্লিক দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন এবং ঠাকুরের কোন ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই পূর্বের কথা ও ঘটনা স্মৃতিচারণ করে শোনাতেন এবং ঠাকুরের প্রসঙ্গে আত্মহারা হয়ে অশ্রুবিসর্জন করতেন।

*

নিতাই মল্লিক

চব্বিশ পরগণা জেলার পানিহাটী নিবাসী বৈষ্ণবভক্ত। একদা পানিহাটীর "চিঁড়া-মহোৎসবে" ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমনকালে, পরম বৈষ্ণব ও গৌর-ভক্ত নিতাই সেখানে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বশতঃ উৎসব-প্রাঙ্গণের নিকটস্থ নিজ বাড়ীতে ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভক্ত নিতাইয়ের আন্তরিকতায় ঠাকুর অন্যান্য ভক্তগণসহ নিতাইয়ের পানিহাটীর বাড়ীতে শুভাগমন করেন এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত "গৌর-নিতাই মূর্তি" দর্শন করেন।

ভাগ্যবান নিতাইয়ের বাড়ীতে সেদিন ঠাকুর সমাধিস্থ হওয়ায়, উৎসবের কীর্তনীয়ারা দলে দলে এসে ঠাকুরকে বেষ্টন করে হরিনাম সঙ্কীর্তন করেছিলেন। পরে ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হয়ে তাঁদের সঙ্গে কীর্তন ও উদ্দাম নৃত্যের দ্বারা নিতাইয়ের বাড়ী মাতিয়ে তোলেন এবং তাঁর বাড়ীতে জলযোগও করেন।

*

রাজেন সরকার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাঠ্যজীবনের গুরুমশাই। কামারপুকুরের জমিদার লাহাবাবুদের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় রাজেন সরকার গুরু মশাইয়ের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রাজেন সরকারের পাঠশালাতেই ঠাকুর, তথা বালক গদাধর প্রথম জীবনে লেখাপড়া শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি লেখাপড়া ছেড়ে দেন; কারণ পাঠশালার "শুভঙ্করী অঙ্কে" তাঁর ধাঁধাঁ লাগত। গুরুমশাই রাজেন সরকার এই পাঠশালায় গ্রামের অনেক ছেলেকে পড়িয়ে মানুষ করেছিলেন; কিন্তু গদাধরের মতন তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি তিনি জীবনে আর কোন ছাত্রের মধ্যে দেখেননি। তিনি অপর ছাত্রদের সঙ্গে যেমন ব্যবহারই করুন-না কেন,

গদাধরকে কখনো তিনি তিরস্কার করেন নি। বালক গদাধরের মুখে রামায়ণ-মহাভারতের ছড়া, যাত্রাদলের গান প্রভৃতি শুনে তিনি মুগ্ধ হতেন। বলা বাহুল্য, অবতার-পুরুষের গুরুমশাই রূপে রাজেন সরকারের জীবন ধন্য হয়েছিল।

*

অমৃত সরকার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত তরুণ ভক্ত। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পুত্র। ঠাকুরের অসুখের চিকিৎসার সময়, পিতা ডাঃ সরকারের সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং পিতার ন্যায় তিনিও ঠাকুরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। অমৃত যদিও "অবতার" স্বীকার করতেন না, তবুও ঈশ্বরে পরম বিশ্বাসের জন্য ঠাকুর তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং তাঁর সরলতার প্রশংসা করতেন।

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে অসুস্থ ঠাকুর একদা অমৃতকে দেখতে চান এবং সেজন্য পরের দিনই ডাঃ সরকার তাঁর পুত্র অমৃতকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন। সেদিন অমৃতকে দেখা মাত্রই অসুস্থ ঠাকুর তাঁর হাত ধরে অন্য ঘরে চলে যান এবং নিজ মুখে প্রকাশ করেন—"বাবা, আমি তোমার জন্য এখানে এসেছি।" ঠাকুরেব পূত কর-স্পর্শে এবং গূঢ় তথ্য সম্পর্কীয় উক্তিতে সেদিন অমৃত, ঠাকুরের কৃপালাভ করেন।

*

বিপিন সরকার

হুগলীজেলার কোন্নগর নিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে ইনি যেদিন প্রথম আসেন, সেদিন ঠাকুর তাঁকে আসন দেবার জন্য এবং পান দেবার জন্য উপস্থিত ভক্তদের অনুরোধ করে তাঁকে বিশেষ আপ্যায়ন কবেছিলেন।

*

রসিকলাল সরকার

কামারপুকুর গ্রামের অধিবাসী এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু। রসিকলাল দক্ষিণেশ্বরে মা-কালীর ঘরের সমস্ত কাজের যোগানদার ছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরের দপ্তরখানার চিলে-কোঠায় বাস করতেন। সেই সূত্রেই তিনি ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন।

কালিদাস সরকার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত কলকাতা নিবাসী জনৈক ভক্ত সিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসবে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল।

*

অমৃতলাল বসু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ব্রাহ্মভক্ত। আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের মাধ্যমে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হন। ভক্ত অমৃতলালকে ঠাকুর খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁকে দেখার জন্য মাঝে মাঝে খুব ব্যাকুল হতেন।

একদা ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে তাঁর গলায় একটি ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে অমৃতলাল ধন্য হন। আর একবার, আচার্য কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, অমৃতলালের বিশেষ অনুরোধে ঠাকুর, কেশবচন্দ্রের বড় ছেলেটির গায়ে হাত বুলিয়ে অমৃতলালের ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

একদিন অমৃতলাল একটি মুসলমানের দোকান থেকে উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন কিনে এনে ঠাকুরকে নিবেদন করলে, ঠাকুর অমৃতলালকে বলেছিলেন—"সন্তান বাৎসল্যে গোরস যেমন দেবভোগ্য দুধে পরিণত হয়, তোমার অকপট ভক্তিতে এটিও সেইরূপ পবিত্র হয়েছে।" বলা আবশ্যক, ঈশ্বরানুরাগী প্রকৃত ভক্তের নিবেদিত আহার্য বস্তু ঠাকুর বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতেন এবং সেজন্য অমৃতলালের অকপট ভক্তিতে ঠাকুর সেদিন খাবারের কোন বিচার করেননি।

*

নন্দলাল বসু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, উত্তর কলকাতার বাগবাজার নিবাসী সম্ভ্রান্ত সৌখীন ব্যক্তি। নন্দলালের বাড়ীতে অনেক দেব-দেবীর ভাল ভাল ছবি আছে শুনে, ঠাকুর একদিন সেই ছবিগুলি দেখার জন্য কয়েকজন ভক্তসহ স্বেচ্ছায় সেখানে শুভাগমন করেন এবং সেই উপলক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে নন্দলাল ও তাঁর বাড়ীর লোকদের যোগাযোগ হয়। ঠাকুরকে তাঁরা সেদিন বিশেষ সমাদর করেন এবং নন্দলালের ভ্রাতা পশুপতি, বাড়ীর হলঘরে ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন ছবি দর্শন করান। বিষ্ণু, রামচন্দ্র, হনুমান, কৃষ্ণ, বামনাবতার, নৃসিংহ প্রভৃতি মূর্তিগুলির ছবি দেখে ঠাকুর "আহা" "আহা" বলতে থাকেন। পরে কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ষোড়শী, ধূমাবতী প্রভৃতি মূর্তিগুলির ছবি দেখে

ঠাকুর মন্তব্য করেন যে, এইসব উগ্র মূর্তি গৃহীদের বাড়ীতে না রাখাই ভাল; কারণ, রাখলে পূজা করতে হয়। এর পরেও আরো কতকগুলি ছবি দর্শন করে, ঠাকুর গৃহস্বামীর রুচির তারিফ করেন এবং ছবিগুলিরও প্রশংসা করেন।

সেদিন নন্দলাল ও তাঁর ভ্রাতা পশুপতির সঙ্গে ঠাকুরের ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হয়েছিল। নন্দলাল ঈশ্বরের শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে, ঠাকুর তাঁকে ভর্ৎসনাছলে নানা উপদেশ দিয়েছিলেন এবং "মো-সাহেব"দের পাল্লায় পড়তে নিষেধ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, নন্দলাল সেদিন ঠাকুরের জন্য মিষ্ট মুখ করবার কোন ব্যবস্থা না করায়, করুণাময় ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে খেয়াল করিয়ে দেন যে, কিছু খেয়ে না গেলে গৃহস্থদের অমঙ্গল হয়। ঠাকুরের এই হুঁশিয়ারীতে নন্দলাল তৎক্ষণাৎ কিছু মিষ্টি আনিয়ে ঠাকুরকে আহার করান এবং সেবা-অপরাধ থেকে মুক্ত হন। নন্দলালের বাড়ীতে ঠাকুর সেদিন মায়ের গান করেন এবং সংসারে থেকেও ঈশ্বরের প্রতি মন রাখার জন্য নন্দলালকে উৎসাহিত করেন।

*

পশুপতি বসু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, উত্তর কলকাতার বাগবাজার নিবাসী সম্ভ্রান্ত সৌখীন ব্যক্তি নন্দলাল বসুর ভ্রাতা। ঠাকুর তাঁদের বাড়ীতে রক্ষিত কতকগুলি ঈশ্বরীয় ছবি দেখবার জন্য শুভাগমন করায়, ঠাকুরের সঙ্গে পশুপতির যোগাযোগ হয়। নন্দলালসহ পশুপতি সেদিন ঠাকুরকে বিশেষ সমাদর করেছিলেন। পশুপতি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর হলঘরে বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবি দর্শন করালে, ঠাকুর খুব আনন্দিত হন। ঠাকুর সেদিন পশুপতির সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেছিলেন এবং ঈশ্বরে মন রেখে চৈতন্যলাভের জন্য তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন। ফেরার সময় পশুপতি বাড়ীর দ্বারদেশ অবধি ঠাকুরকে নিজে পৌছে দিয়ে, তাঁর প্রতি বিশেষ ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করেন।

*

রামকৃষ্ণ বসু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ গৃহীভক্ত বলরাম বসুর একমাত্র পুত্র এবং ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দ, তথা বাবুরাম মহারাজের ভাগিনেয়। ভক্ত বলরামের বাড়ীতে ঠাকুরের বহুবার আগমন ও অবস্থান উপলক্ষে তাঁর ভক্তিমান্ পুত্র রামকৃষ্ণ প্রথম জীবনেই ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান এবং তাঁর দর্শন ও কৃপালাভে ধন্য হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ

করা আবশ্যক যে, ঠাকুরের কৃপালাভের পর বলরামের এই পুত্রটি জন্মগ্রহণ করায় পুত্রের নাম "রামকৃষ্ণ" রাখা হয়েছিল, যেহেতু পুত্রকে ঐ নামে ডাকলে, ঠাকুরেরই নাম করা হবে।

পরবর্তীকালে, বলরাম-পুত্র রামকৃষ্ণ, ঠাকুরের ভক্ত ও পার্ষদগণের যথাসাধ্য সেবা করেছিলেন। এমনকি, ঠাকুর ও অন্যান্য পার্ষদগণের বহু স্মৃতি বিজড়িত কলকাতার বাগবাজারের ৫৭নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটের (অধুনা ৭নং গিরীশ এ্যাভিনিউ) পৈতৃক বাসভবন, তথা "বলরাম-মন্দির", ঠাকুরের ভাবধারা প্রচারের জন্য, পিতা বলরামের অন্তরের ইচ্ছানুযায়ী তিনি রামকৃষ্ণ মিশনকে উৎসর্গ করে ধন্য হন। ভক্ত রামকৃষ্ণ বসুর শেষ ইচ্ছানুসারে বলরাম-মন্দির ভবনটিতে প্রধানতঃ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মাচ, জনসাধারণের কল্যাণ-ব্রতী একটি "ট্রাষ্ট" গঠিত হয় এবং ট্রাষ্ট দলিলে অন্যান্য শর্তাবলীর মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু, ব্রহ্মচারী ভক্তদের বসবাস প্রভৃতি ব্যবস্থার জন্য নির্দেশ থাকে। বর্তমানে বলরাম মন্দিরের বহির্বাটীটি রামকৃষ্ণ-মিশনের একটি পূর্ণাঙ্গ মঠে পরিণত হয়েছে এবং মিশনের একটি কর্মকেন্দ্রও সেখানে স্থাপিত হয়েছে।

*

দীননাথ বসু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাগবাজার নিবাসী পরম ভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে প্রায়ই যেতেন এবং তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। ঠাকুরও দীননাথকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং তাঁর বাড়ীতে কয়েকবার শুভাগমনও করেছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ঠাকুরের অনেক ভাবী ভক্ত সন্তান ও অন্তরঙ্গগণ, দীননাথের বাগবাজারের বাড়ীতে পূর্বেই ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন।

একদা দীননাথের বাড়ীতে ঠাকুরের ভাবসমাধি হয় এবং সেখানে ঠাকুরের মুখে "নাচ গো শ্যামা" গানটি শুনে সবাই মুগ্ধ হয়। এমনকি, সে সময় পাড়ার লোকেরা সকল জায়গায় ঐ গানটি গেয়ে আনন্দ লাভ করত।

*

কালানাথ বসু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী, বাগবাজার নিবাসী উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী। তিনি ছিলেন ঠাকুরের অপর ভক্ত দীননাথ বসুর সহোদর ভ্রাতা। আচার্য

কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে কালীনাথের খুব হৃদ্যতা থাকায়, কেশবচন্দ্রই প্রথম কালীনাথের বাড়ীতে ঠাকুরকে নিয়ে আসেন। এই উপলক্ষে কালীনাথ তাঁর বাগবাজারের বাড়ীতে একটি উৎসবের আয়োজন করেন এবং ঠাকুরকে যথাসাধ্য আপ্যায়ন করেন।

*

দেবেন্দ্রনাথ বসু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাগবাজার নিবাসী কৃপাধন্য ভক্ত। সাধারণতঃ তিনি "ব্যাং বাবু" নামে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুরকে তিনি বাল্যকালে বাগবাজারে ভক্ত দীননাথ বসুর বাড়ীতে প্রথম দর্শন করেন এবং তারপর বহুকাল বাদে তিনি ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য হন।

*

শ্যাম বসু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স্ক ভক্ত। তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশতঃ মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে যেতেন এবং ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে যোগদান করে আনন্দ পেতেন। ঈশ্বর চিন্তার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হওয়ায়, ঠাকুর তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন এবং নির্জন স্থানে গিয়ে ধ্যান করার জন্য তাঁকে উপদেশ দেন।

*

মনোমোহন বসু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণে তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যেতেন এবং ঠাকুরের কীর্তন গানে ও কথামৃত পানে মুগ্ধ হতেন।

*

শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গার নিকটবর্তী সদরদি গ্রাম নিবাসী ভক্ত। প্রথম জীবনে তিনি কিছুকাল পুলিশের চাকরী করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর কয়েকটি অলৌকিক উপলব্ধি হওয়ায়, তিনি সদ্‌গুরুর সন্ধানে নানা স্থানে ঘুরতে থাকেন এবং অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন। ঠাকুরের

কাছে শ্রীধর দীক্ষা গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে, ঠাকুর তাঁকে আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নেবার জন্য উপদেশ দেন। আচার্য বিজয়কৃষ্ণ তখন ঢাকাতে থাকায়, ঠাকুরের উপদেশমত শ্রীধর তৎক্ষণাৎ ঢাকাতে গিয়ে সেখানকার ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে প্রচারক নিবাসে বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দীক্ষা গ্রহণের পর বিজয়কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গীরূপে পরিণত হন।

*

তুলসীরাম ঘোষ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দের তথা বাবুরাম মহারাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ঠাকুরের পরমভক্ত বলরাম বসু ছিলেন তাঁর ভগ্নীপতি। বাবুরামকে প্রথম জীবনে সাধুর অন্বেষণে নানা স্থানে ভ্রমণ করতে দেখে, তুলসী রামই প্রথম বাবুরামকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধান দেন এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে উৎসাহ দেন; কারণ তুলসীরাম ও তাঁর মাতা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী—ভক্ত বলরাম বসুর সহায়তায় ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং উভয়েই ঠাকুরের ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন।

*

শান্তিরাম ঘোষ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দের, তথা বাবুরাম মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ঠাকুরের পরমভক্ত বলরাম বসু ছিলেন তাঁর ভগ্নীপতি। বাড়ীর অপরাপর ভক্তদের ন্যায় শান্তিরামও ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে তাঁর ভক্তে পরিণত হন। বাবুরাম মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবেও শান্তিরাম ঠাকুরের বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন এবং বাবুরাম মহারাজ নিজেও তাঁর এই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিশেষ স্নেহ করতেন।

*

উপেন্দ্রনাথ ঘোষ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী গৃহীভক্ত। তিনি উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারের সুপ্রসিদ্ধ ভূপেন্দ্রনাথ বসুর এক আত্মীয়াকে বিবাহ করেছিলেন এবং মফঃস্বলে মুন্সেফের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

একদা বড়দিনের ছুটিতে উপেন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে, নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁর নিজের বন্ধু অতুলচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় তিনি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার প্রথম সুযোগ পান। সেই সময় শ্যাম-পুকুরে অসুস্থ ঠাকুরকে দর্শন করতে গিয়ে উপেন্দ্রনাথ তাঁর মাধুর্যময় আচরণে মুগ্ধ হন এবং তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। পরেও আর একবার উপেন্দ্রনাথ তিনটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন; কিন্তু প্রথম প্রশ্নটির উত্তর ঠাকুরের কাছে শুনে তিনি বুঝতে পারেন যে, ঐ একটি উত্তরের মধ্যেই ঠাকুর বাকী দুটি প্রশ্নেরও যথাযথ উত্তর দিয়েছেন। সেজন্য আর কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করেই সেদিন প্রসন্নচিত্তে উপেন্দ্রনাথ ফিরে আসেন এবং ঠাকুরের অনুরাগীরূপে পরিণত হন।

*

মন্মথনাথ ঘোষ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত ভক্ত। তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভ করে ধন্য হন। একদা সন্ধ্যার সময় কলকাতার গেঁড়াতলার মসজিদের কাছে মন্মথ দেখেন যে, একজন মুসলমান ফকীর মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছেন এবং প্রেমের স্বরে আর্তভাবে ডাকছেন—"প্যারে আযাও, আযাও"। এমন সময় মন্মথ দেখেন যে, ঠাকুর একটি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে করে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল প্রভৃতি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাট থেকে সেই পথে ফিরছেন। সহসা ঠাকুর গাড়ী থেকে নেমে, সেই মুসলমান ফকীরের কাছে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে প্রেমে জড়িয়ে ধরেন এবং আলিঙ্গন অবস্থায় কিছুক্ষণ দুজনে দাঁড়িয়ে থাকেন। বলাবাহুল্য, ভাগ্যবান্ ফকীরের সঙ্গে প্রেমেব ঠাকুরের এই অপূর্ব মিলন দৃশ্য দেখে, ভাগ্যবান্ মন্মথও মুগ্ধ হন।

*

জয়গোপাল ঘোষ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত নবগোপাল ঘোষের মধ্যমভ্রাতা। নবগোপালের কলকাতার বাদুড়বাগানের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমনকালে জয়গোপাল তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশতঃ তিনি অন্যান্য ভক্তদের গৃহেও ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষে উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

*

তারাপদ ঘোষ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি ঠাকুরের পরমভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের সঙ্গে সরকারী ষ্টেশনারী অফিসে কাজ করতেন এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতা ছিল।

*

দেবেন্দ্র ঘোষ

উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর নিবাসী ভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন এবং তাঁর পূত সঙ্গলাভ করে আনন্দ পেতেন। একদা ভক্ত বলরাম বসুর পিতা রাধামোহন বসুর সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলে, ঠাকুর তাঁদের উভয়কেই নানা উপদেশ দেন এবং ঈশ্বরীয় পথে এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ দেন।

*

গিরীন্দ্র ঘোষ

কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী ভক্ত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি যাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে যোগদান করতেন। কামজয়ের উপায় সম্পর্কে একদা তিনি ঠাকুরকে বলেছিলেন যে, কাম-ক্রোধাদি রিপু জয় করা সহজ নয়—তাই তাদের মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়। গিরীন্দ্রের এই কথায় ঠাকুর খুব সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

*

রাজেন্দ্রনাথ মিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত। তিনি ঠাকুরের গৃহীভক্তদ্বয় রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্রের মেসোমশাই। তদানীন্তন বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের উচ্চপদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন এবং "রায়বাহাদুর" উপাধি লাভ করেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশতঃ রাজেন্দ্রনাথ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে যেতেন এবং কলকাতায় কোন ভক্ত-গৃহে ঠাকুরের আগমন হলে, সেখানে গিয়েও তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন। ঠাকুরও রাজেন্দ্রনাথকে অতিশয় স্নেহ করতেন এবং তাঁর বাড়ীতেও শুভাগমন করেছিলেন।

একদা কলকাতার বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটের নিজ বাড়ীতে ঠাকুরকে এনে

রাজেন্দ্রনাথ এক উৎসবের ব্যবস্থা করেন এবং এই সময়েই ঠাকুরের অপর পরম ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র কলকাতার রাধাবাজারে "বেঙ্গল ফটোগ্রাফারের" ষ্টুডিওতে ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে তাঁর ফটো তুলিয়েছিলেন। রাজেন্দ্রনাথের বাড়ীতে ঠাকুর কেশবাদি বহু ভক্ত সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, নৃত্য-গীত প্রভৃতির দ্বারা আনন্দ বিতরণ করেন এবং মুহুর্মুহু সমাধিস্থ হন। তাঁর বাড়ীতে আহার গ্রহণ করে ঠাকুর রাজেন্দ্রনাথকে কৃতার্থ করেন এবং ঠাকুরের চরণস্পর্শে রাজেন্দ্র-ভবন ধন্য হয়।

*

গোপালচন্দ্র মিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত ভক্ত। ঠাকুরের অপর ভক্তদ্বয় রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্র যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান, গোপালচন্দ্রও সেদিন তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন এবং প্রথম ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

*

গিরীন্দ্রনাথ মিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের কনিষ্ঠভ্রাতা। পূর্বে তিনি আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজে মিশতেন; পরে ঠাকুরের অপর পরমভক্ত মনোমোহন মিত্রের সঙ্গে তিনি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান এবং এরপর থেকেই তাঁর কাছে নিয়মিত যাতায়াত সুরু করেন। ঠাকুরের কাছে নানা জটিল প্রশ্ন নিয়ে তিনি উপস্থিত হলে, ঠাকুর সেগুলির সহজভাবে মীমাংসা করে দিতেন। একদা ঠাকুর উপদেশছলে তাঁকে বলেছিলেন—"মা দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ করবে না।"

ঠাকুরের কাছে যাতায়াতের ফলে গিরীন্দ্রনাথ এমনই তাঁর অনুরাগী ভক্তে পরিণত হন যে, একদা ঠাকুরকে নিয়ে উল্টোরথের দিনে মাহেশের রথযাত্রা, ৺জগন্নাথ, ৺দ্বাদশগোপাল; ব্যারাকপুরের চানকে ৺অন্নপূর্ণা, এবং পানিহাটীর পাটবাড়ী প্রভৃতি একযোগে দর্শন করিয়েছিলেন এবং পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন।

*

কাশীশ্বর মিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ব্রাহ্ম ভক্ত এবং কলকাতার নন্দনবাগানের অধিবাসী। ব্রাহ্মসমাজের অপর ভক্তদের সহায়তায় তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং নন্দনবাগানের নিজবাড়ীতে ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য

অর্জন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কাশীশ্বর মিত্রের নন্দনবাগানের বাড়ীতে আয়োজিত একটি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে তরুণ বয়সে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর কথামৃত পান করেছিলেন।

*

শ্রীনাথ মিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ব্রাহ্মভক্ত। তিনি ছিলেন কলকাতার নন্দনবাগানের ব্রাহ্মনেতা কাশীশ্বর মিত্রের অন্যতম পুত্র। দক্ষিণেশ্বরে এবং নিজেদের বাড়ীতে তিনি কয়েকবার ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীনাথ ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলে, ঠাকুর শ্রীনাথের বিষয়ে উল্লেখ করে সমাগত অন্যান্য ভক্তদের বলেছিলেন—"এই যে এঁর চক্ষু দিয়ে ভেতরটা সব দেখা যাচ্ছে, সার্সির দরজার ভেতর দিয়ে যেমন ঘরের ভেতরকার জিনিস সব দেখা যায়!" বলা আবশ্যক যে, পিতা কাশীশ্বরের মৃত্যুর পরেও তিনি ও তাঁর ভাই যজ্ঞনাথ ঠাকুরকে তাঁদের নন্দনবাগানের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আনন্দ উৎসব করতেন।

*

যজ্ঞনাথ মিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ব্রাহ্মভক্ত এবং কলকাতার নন্দনবাগানের ব্রাহ্মনেতা কাশীশ্বর মিত্রের অন্যতম পুত্র। নিজেদের বাড়ীতে ছাড়াও তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে কয়েকবার আসেন। যজ্ঞনাথ ও তাঁর ভ্রাতা শ্রীনাথ উভয়েই ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ সম্মান করতেন। পিতা কাশীশ্বরের মৃত্যুর পরও তাঁদের নন্দনবাগানের বাড়ীতে ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে তাঁরা আনন্দ উৎসব করতেন।

*

হীরালাল মিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত বাগবাজার নিবাসী ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের প্রসিদ্ধ মহিলা-ভক্ত যোগীন-মা'র ভ্রাতা। তরুণ বয়সে তিনি ঠাকুরের মহিমা সম্পর্কে পুরাপুরি অবহিত না থাকায়, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যোগীন-মার প্রথমদিকে যাতায়াতে তাঁর আপত্তি ছিল। একদা যোগীন-মা তাঁর বাড়ীতে ঠাকুরকে আনার ব্যবস্থা করায়, তরুণ হীরালাল সেদিন বাগবাজারের তৎকালীন নাম করা "মন্মথ গুণ্ডার" দ্বারা ঠাকুরকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে বিফল হন। পরে অবশ্য হীরালাল নিজেই ঠাকুরের ভক্তে পরিণত

হন এবং যোগীন-মাকেও ঠাকুরের পথে অগ্রসর হতে বিশেষ সাহায্য করেন। ভাগ্যবান হীরালালের বাড়ীতে (তথা যোগীন-মার পিতৃগৃহে) ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল এবং সেখানে ঠাকুর দু একখানি গানও গেয়েছিলেন। ভারত সরকারের কলকাতাস্থিত "কন্ট্রোলার অফ্ কারেন্সী"র (বর্তমানে এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল, ওয়েষ্টবেঙ্গল) অফিসে চাকরী করা কালীন সহৃদয় হীরালাল নিজ পল্লীর বহু লোককে চাকরী করে দিয়েছিলেন এবং নানাভাবে নিজ মিত্র-পরিবারের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

*

বেনীমাধব পাল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মভক্ত এবং ব্যবসায়ী। উত্তর কলকাতার সিঁথিতে তাঁর একটি উদ্যান বাটী ছিল এবং সেখানে ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসবাদি হোত। ব্রাহ্মসমাজের অপর ভক্তদের সহায়তায় বেনীমাধব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বেনীমাধবকে ঠাকুর অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁর আমন্ত্রণে সিঁথির বাগানে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগদান করতেন। ঠাকুর তাঁর বাগানে আধ্যাত্মিক জগতের কত নিগূঢ় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, হরিনামে মাতোয়ারা হয়ে কত নৃত্য করেছেন, আবার সমাধিস্থও হয়েছেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান বেনীমাধবের সিঁথির এই বাগান নানা লীলায় ধন্য হয়েছিল। বর্তমানে সিঁথিতে এটি "পালের বাগান" নামে পরিচিত।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বেনীমাধবের কলকাতায় চীনা বাজারে একটি দোকানের কর্মচারী হিসাবে ঠাকুরের ত্যাগী-সন্তান ও অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীগোপাল চন্দ্র ঘোষ, তথা বুড়োগোপাল মহারাজ (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) এই সিঁথির বাগানেই ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে কর্মত্যাগ করে সিঁথির অপর ভক্ত, কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পালের সহায়তায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ভাগ্যবান মালিক বেনীমাধব পাল এবং পরমভাগ্যবান কর্মচারী গোপালচন্দ্র ঘোষ— উভয়েই যথাক্রমে ঠাকুরের গৃহীভক্ত ও ত্যাগীভক্তরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

*

গোবিন্দ পাল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বরানগর নিবাসী তরুণ ভক্ত। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ঈশ্বরে খুব মন ছিল এবং বিবাহের কথায় তিনি ভয়ে আকুল হতেন। গোবিন্দ তাঁর বন্ধু গোপাল সেনের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতেন এবং উভয়েই ঠাকুরের স্নেহলাভ করতেন। কিন্তু গোপাল পরে আত্মহত্যা করায়, গোবিন্দ এসে ঠাকুরকে সে কথা জানিয়ে যান। কিছুদিন পরে গোবিন্দও দেহত্যাগ করেন এবং ঠাকুর তাঁর মৃত্যুতে খুব দুঃখিত হন।

*

বরদাসুন্দর পাল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা নিবাসী পরমভক্ত। স্বামী সারদানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা ছিল এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁর অস্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। কলকাতায় থাকাকালীন তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে প্রায়ই যেতেন এবং তাঁর সঙ্গলাভ করে আনন্দ পেতেন। তিনি ঠাকুরকে এত ভক্তি করতেন যে, ঠাকুর কবে কোন্ ভক্তের বাড়ীতে যাবেন তার খবর রাখতেন এবং সেখানে অযাচিতভাবে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন। ঠাকুর এই সম্পর্কে প্রশ্ন করে যখন জানতে পারেন যে, কেবলমাত্র তাঁকে দেখার জন্যই বরদাসুন্দর সব জায়গায় অযাচিতভাবে যান, তখন এই অহেতুকি ভক্তির জন্য ঠাকুর তাঁর ওপর বিশেষ প্রসন্ন হন।

*

শরৎ সামন্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত এগারো বছর বয়সের ভক্ত। তিনি ছিলেন দক্ষিণেশ্বর এস্টেটের কর্মচারী পীতাম্বর ভাণ্ডারীর (সামন্ত) পুত্র। তিনি লেখাপড়া জানতেন এবং ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। যে সময় শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী পরমসাধিকা শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী একত্রে দক্ষিণেশ্বরে নহবত ঘরে বাস করতেন, সে সময় তাঁদের কিছু লেখাপড়া শেখানোর কথা ঠাকুরের মনে উদয় হয়। ঠাকুর উক্ত বালক শরতের ওপর তাঁদের পড়াবার ভার দিলে, ভাগ্যবান শরৎ শ্রীশ্রীমা ও শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবীকে বাংলা প্রথমভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ পড়ানো শেষ করেন। এবং সামান্য লিখতেও শেখান। এরপর ঠাকুর তাঁদের লেখাপড়া বন্ধ করিয়ে দেন এবং ঐ বিদ্যার সাহায্যেই ধর্মপুস্তকগুলি নিজে নিজে পড়ার জন্য তাঁদের উপদেশ দেন। বলা বাহুল্য, ঠাকুরের নির্দেশ পালনের মাধ্যমে ভক্ত বালক শরৎ একযোগে তিনজনের – ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীমতীলক্ষ্মী দেবীর স্নেহলাভে ধন্য হন।

শশীভূষণ সামন্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত দক্ষিণেশ্বর নিবাসী গৃহীভক্ত। তিনি অল্প বয়স থেকেই তাঁর পিতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ঠাকুরের কাছে যাতায়াতের ফলে, তাঁর ভক্তে পরিণত হন। পরবর্তীকালে শশীভূষণ "রামকৃষ্ণ লীলাতত্ত্ব" নামে একটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন এবং সেই অমূল্যগ্রন্থে ঠাকুরের তৎকালীন অনেক হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যের নাম ও বর্ণনা দেন। হিন্দু ছাড়াও, ঠাকুরের মুসলমান শিষ্যদের কথা একমাত্র সেই গ্রন্থেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে সেই অমূল্য গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

*

নকুড় বাবাজী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুর গ্রামের বৈষ্ণবভক্ত। কলকাতার ঝামাপুকুরে তাঁর একটি দোকান থাকায়, তিনি কলকাতাতেই বাস করতেন।

ঝামাপুকুরে বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটে—সিটি কলেজের একটু আগে, রাস্তার ডানদিকে কয়েকখানা বাড়ীর পরেই ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের একটি চতুষ্পাঠী ছিল এবং সেখানে একটি খোলার ঘরে ঠাকুর প্রথম জীবনে রামকুমারের সঙ্গে বাস করতেন। সে সময় তিনি রামকুমারের সহায়তায় পল্লীর কয়েকজন গৃহীর বাড়ীতেও পূজা করতেন। পূজার শেষে মাঝে মাঝে ঠাকুর এসে নকুড় বাবাজীর দোকানে বসতেন এবং আনন্দ-আলাপ করতেন। দেশের লোক হিসাবে নকুড় বাবাজীও ঠাকুরকে বিশেষ আপ্যায়ন করতেন; এমনকি পরে দক্ষিণেশ্বরেও ঠাকুরের কাছে নকুড় বাবাজীর যাতায়াত ছিল। নকুড় বাবাজী ভাল কীর্তন গাইতে পারতেন এবং পানিহাটীর রাঘব পণ্ডিতের বিখ্যাত চিঁড়া-মহোৎসবেও যোগদান করতেন। ফলে, ঠাকুরের সঙ্গে প্রতিবৎসর পাণিহাটীর উৎসবেও তাঁর মিলন হত এবং নকুড় বাবাজী নিজে সেখানে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পূর্বপরিচয় অক্ষুন্ন রাখতেন।

*

সদয় বাবাজী

হুগলী জেলার ফুলুই-শ্যামবাজার গ্রাম নিবাসী বৈষ্ণব ভক্ত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রামের সঙ্গে একদা উক্তগ্রামে শুভাগমন করায়, সদয় বাবাজী ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্কীর্তন করেছিলেন।

*

গয়াবিষ্ণু লাহা

কামারপুকুর গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু। গয়াবিষ্ণুর সঙ্গে গদাধরের (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ) বাল্যকালে এত সখ্যতা ছিল যে, তাঁরা পরস্পরকে "স্যাঙাৎ" বলে ডাকতেন। একসঙ্গে ভ্রমণ, ভোজন, শয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে দু'জনের মধ্যে পরম আসক্তি লক্ষ্য করে তাঁদের অভিভাবকেরা আনন্দিত হতেন।

একদা শিবরাত্রি উপলক্ষে দুজনে একত্রে উপবাস করার পর, তাঁরা প্রথম প্রহরের শিবপূজা সাঙ্গ করেন; কিন্তু এরপরেই গ্রামবাসী সীতানাথ পাইনের বাড়ীতে সেদিন ঘটনাচক্রে গদাধরকে শিবের যাত্রার আসরে শিব সাজতে হয় এবং গয়াবিষ্ণুই তাঁকে সেদিন শিবের সাজে সজ্জিত করে যাত্রার আসরে নিয়ে যান। কিন্তু সেই আসরে সেদিন গদাধর সমাধিস্থ হওয়ায়, যাত্রা পণ্ড হয়।

পরবর্তীকালে, ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে বসবাসকালীন তাঁর দেশের সংসারের কষ্ট দেখে এবং তাঁরই অনুরোধক্রমে গয়াবিষ্ণু, গ্রামের কাছে ডোমপাড়ায় তাঁদের জন্য এক বিঘা জমি কিনে দেন এবং তার দ্বারা কামারপুকুরের সংসারের দুরবস্থা কিছুটা লাঘব হয়।

*

গঙ্গাবিষ্ণু লাহা

কামারপুকুর গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার সহোদর ভ্রাতা নিধিরাম লাহার জ্যেষ্ঠপুত্র। গঙ্গাবিষ্ণুর সঙ্গে বাল্যকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যন্ত সখ্যতা ছিল। মতান্তরে বলা হয়, ধর্মদাসের পুত্র গয়াবিষ্ণুর বদলে, গঙ্গাবিষ্ণুর সঙ্গেই বাল্যকালে ঠাকুর "স্যাঙাৎ" পাতিয়েছিলেন।

*

উমানাথ গুপ্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভে ধন্য, আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ব্রাহ্মভক্ত। ঠাকুর যেদিন অসুস্থ কেশবচন্দ্রকে তাঁর কলকাতার বাড়ী "কমল-কুটিরে" দেখতে যান, সেদিন উমানাথ উপস্থিত থেকে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। কেশবচন্দ্রের বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে ঠাকুর যখন কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন কেশবচন্দ্রের মা, ঠাকুরকে ঘরের দ্বারদেশ থেকে প্রণাম জানান; কিন্তু ঠাকুর সেদিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় উমানাথ উচ্চৈস্বরে ঠাকুরকে বলেন—"মা আপনাকে প্রণাম করছেন।" ঠাকুর সে কথায় হাসতে থাকেন। পুনরায় উমানাথ বলেন—"মা বলছেন, কেশবের অসুখটি যাতে

সারে।" সে কথায় ঠাকুর বলেন—"মা-সুবচনী আনন্দময়ীকে ডাক, তিনি দুঃখ দূর করবেন।" পুনরায় যখন উমানাথ বলেন—"মা বলছেন, কেশবকে আশীর্বাদ করুন",—তখন গম্ভীর স্বরে ঠাকুর জানান—"আমার কি সাধ্য! তিনিই আশীর্বাদ করবেন। তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।" বলা আবশ্যক, এই ঘটনার কিছুকাল পরেই কেশবচন্দ্রের দেহত্যাগ হয়েছিল।

※

কুঞ্জবিহারী কর্মকার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুর গ্রাম নিবাসী বাল্যবন্ধু। ছোটবেলায় কামাপুকুরে তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের খুব সখ্যতা ছিল। অধিকাংশ সময় দু'জনে খেলাধূলায় মেতে থাকতেন, এমনকি তাস খেলায় কুঞ্জকে হারাতে পারলে, বালক গদাধর আনন্দের আতিশয্যে উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করতেন। বাল্যলীলার ঘটনাগুলির স্মৃতিচারণ করে বৃদ্ধবয়সেও কুঞ্জ নিজে আনন্দ পেতেন এবং সবাইকে শুনিয়েও আনন্দ দিতেন।

※

প্রতাপচন্দ্র হাজরা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী এবং কামারপুকুর গ্রামের নিকটবর্তী মড়াগোড় গ্রামের অধিবাসী। স্ত্রী-পুত্র এবং কিছু বিষয়-সম্পত্তি থাকা সত্বেও, যৌবনকাল থেকেই তাঁর বৈরাগ্যের ভাব ছিল। তিনি দীর্ঘদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বাস করেছিলেন এবং তাঁর পূত সঙ্গ লাভ করে-ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে "হাজরা" বলে সম্বোধন করতেন।

ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন হাজরা সর্বদা মালা নিয়ে জপ করতেন এবং ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে অত্যন্ত তর্ক করতেন। সাংসারিক অবস্থা বিশেষ ভাল না থাকায় এবং বাজারে প্রচুর দেনা হওয়ায়, ধর্মজগতে থেকেও তিনি অর্থের কামনা করতেন। নিজের সম্পর্কে তাঁর মনে কিছু অহঙ্কারের ভাব থাকায়, তিনি সব সময় ঠাকুরের উপদেশমত প্রথমদিকে চলতে পারতেন না। কখনো তিনি ঠাকুরকে মহাপুরুষ জ্ঞানে প্রণাম করতেন, আবার কখনো সাধারণ মানুষ জ্ঞানে তুচ্ছ করতেন।

নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে হাজরার খুব হৃদ্যতা ছিল। নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে এলে, হাজরার সঙ্গে আলাপ করে খুশী হতেন। একদিন ঠাকুর, "জীব ও ব্রহ্মের" ঐক্যসূচক অনেক কথা নরেন্দ্রনাথকে বলা সত্বেও, নরেন্দ্রনাথ তা অবিশ্বাস করেন এবং ঠাকুরের অসাক্ষাতে হাজরার সঙ্গে ঐ

বিষয়ে আলোচনা করেন। ঐ আলোচনার সময় নরেন্দ্রনাথ, ঠাকুরের কথায় উপহাস ছলে হাসাহাসি করেন। এবং হাজরাও উচ্চরবে হাস্য করে নরেন্দ্রনাথকে সমর্থন করেন। সেই হাসির আওয়াজ শুনে ঠাকুর তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হন এবং নরেন্দ্রনাথের বক্ষ স্পর্শ করেন। ফলে, নরেন্দ্রনাথের ভেতর অদ্বৈত-জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করতে থাকেন। ঠাকুরের এই প্রকার কাজে সেদিন হাজরা বিস্মিত হয়েছিলেন

ঠাকুরের সঙ্গে দীর্ঘদিন বাস করেও প্রথমদিকে হাজরা ঠাকুরকে সম্যকরূপে বুঝতে অপারাগ হয়েছিলেন। তবুও হাজরার ভক্তি ও নিষ্ঠা লক্ষ্য করে ঠাকুর তাঁকে খুব স্নেহ করতেন, নিজের কাছে রাখতেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড কিনিয়ে দিতেন এবং সব সময় তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কইতেন। এই রকমে হাজরা নানাভাবে ঠাকুরের কৃপালাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কোন এক কারণে হাজরা দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী ত্যাগ করে চলে যান এবং ঠাকুরের আশ্রয়চ্যুত হন। তবুও ঠাকুরের করুণার ধারা হাজরার ওপর নিয়ত বর্ষিত হয় এবং মৃত্যুকাল অবধি তিনি ঠাকুরের প্রতি অদ্ভুত বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় রেখে যান।

*

অন্নদা গুহ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভে ধন্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের ধনবান বন্ধু। প্রথম জীবনে তিনি কিছু অসংলোকের সঙ্গে মিশতেন এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধু নরেন্দ্রনাথও (স্বামী বিবেকানন্দ) সেই অসৎ সঙ্গে গিয়ে পড়েন ও মাঝে মাঝে গুহদের বাগানে বেড়াতে যান। এই সংবাদ শুনে, ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের ওপব অসন্তুষ্ট হন এবং কিছুদিন তাঁর হাতে খাওয়া বন্ধ করেন। অবশ্য সাময়িকভাবে কুসঙ্গীদের মধ্যে গিয়ে পড়লেও, পুরুষ সিংহ নরেন্দ্রনাথের ওপর তাদের কোনই প্রভাব পড়েনি এবং নরেন্দ্রনাথ নিজেই নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। উপরন্তু এই অন্নদাকে নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসার ফলে, অন্নদা তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পান এবং তাঁর পূতসঙ্গ লাভ করে ক্রমে ক্রমে সাত্ত্বিক জীবন ধারার পথে অগ্রসর হন।

অন্নদার ওপর ঠাকুরের এমন স্নেহের টান হয় যে, নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগের দরুন যখন তাঁর মা-ভায়েরা প্রায় অনশনে দিন কাটাচ্ছিলেন, তখন নরেন্দ্রনাথের কষ্ট লাঘবের জন্য আর্থিক সাহায্য করতে ঠাকুর একদা নরেন্দ্রনাথের সামনেই ধনী অন্নদাকে অনুরোধ করেন। এই ঘটনায় নরেন্দ্রনাথ খুব বিব্রত বোধ

করেন এবং অন্নদা চলে যাওয়ার পর তিনি ঠাকুরকে তিরস্কার করেন। বলা আবশ্যক, নরেন্দ্রনাথ কর্তৃক তিরস্কৃত ঠাকুর কাঁদতে কাঁদতে নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—"ওরে তোর জন্যে যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি।"

*

নটবর পাঁজা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত। দক্ষিণেশ্বরের পাশে আলমবাজারে তাঁর বাড়ী ছিল। প্রথম অবস্থায় নটবর দক্ষিণেশ্বরের বাগানে অপরের গরু চরাতেন এবং ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসতেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর এমন ঘনিষ্ঠতা হয় যে, তিনি স্বহস্তে তামাক সেজে ঠাকুরকে খাওয়াতেন এবং নিজেও খেতেন। ঠাকুরকে তিনি যেমন খুব ভক্তি করতেন, ঠাকুরও তাঁকে তেমন স্নেহ করতেন এবং তাঁর আলমবাজারের বাড়ীতেও যেতেন। পরবর্তীকালে, নটবর গরু চরানোর কাজ ছেড়ে দিয়ে আলমবাজারে রেড়ির কলের ব্যবসা সুরু করেছিলেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

*

নবীন নিয়োগী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর নিবাসী ভক্ত। ঠাকুরের কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল এবং ঠাকুরও ভক্ত নবীনের বাড়ীতে শুভাগমন করতেন। নবীনের বাড়ীতে উৎসবাদিতে ঠাকুরকে মাঝে মাঝে আহ্বান করা হোত এবং এই উপলক্ষে একবার তাঁর বাড়ীতে ঠাকুর বিখ্যাত যাত্রাগায়ক নীলকণ্ঠের যাত্রাগান শুনতেও গিয়েছিলেন। একদা ৺দুর্গাপূজার সময় ঠাকুর নবীনের বাড়ীতে পূজা দেখতে গিয়ে, নবীনও তাঁর ছেলেকে চামর করতে দেখে খুব খুশী হন এবং সেকথা অন্যান্য ভক্তদের কাছে গল্প করেন। ভক্ত নবীনের সম্পর্কে ঠাকুর বলেছিলেন যে, নবীনের যোগ ও ভোগ দুই-ই আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ঠাকুরের মহিলা-গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবী যখন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন, তখন ঠাকুরের পরামর্শে তিনি আড়িয়াদহের দেবমণ্ডলের ঘাটে থাকার ব্যবস্থা করেন। ঐ সময় ৺নবীন নিয়োগীর ধর্মপরায়ণা পত্নী, ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে তাঁর ইচ্ছায় ঘাটের চাঁদনীতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং তক্তপোশ, চাল-ডাল, ঘি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ মারফৎ ভৈরবীর অসুবিধা লাঘবের চেষ্টা করেছিলেন।

ব্রজমোহন দত্ত

পূর্ববঙ্গের বরিশালের বাটাজোড়ের অধিবাসী এবং মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের পিতা। তিনি পূর্বে সাব্‌জজের পদে চাকরী করতেন; চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর পরিণত বয়সে তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে যান এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তিনদিন অবস্থান করেন। ব্রজমোহনের স্বভাবটি খুব ভাল ছিল ব'লে, ঠাকুর তাঁকে সমাদর করেছিলেন এবং ঠাকুরের সমাধি দর্শন, কথামৃত পান প্রভৃতির মাধ্যমে ব্রজমোহনও মুগ্ধ হয়েছিলেন।

একদিন ঠাকুর সমাধিস্থ হলে, ব্রজমোহন সেই ঘরে অপর ভক্তদের সঙ্গে অন্যান্য কথা আলোচনা করতে থাকায়, সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর ঐ সব আজে বাজে আলোচনা শুনে বিরক্ত হন। ব্রজমোহনের সম্পর্কে ঠাকুর ব'লেছিলেন-"বেশ লোক, তবে মাঝে মাঝে হিজিবিজি বকে।" প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক যে, ব্রজমোহনের পুত্র স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্তও পরবর্তীকালে ঠাকুরের পূত সঙ্গ লাভ করেছিলেন।

*

হরিশ কুণ্ডু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য কলকাতার গড়্‌পার-নিবাসী পরম ভক্ত. বৃত্তিতে ব্যায়াম-শিক্ষক হরিশের আকৃতি লৌহসম হলেও, প্রকৃতি তাঁর অতি কোমল ছিল এবং ঠাকুরের সেবায় তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। হরিশ মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং কখনো কখনো ঠাকুরের কাছে রাত্রিবাসও করতেন। ঠাকুর তাঁর অনুরাগ দেখে তাঁকে ধ্যান করতে বসিয়ে দিতেন এবং ধ্যানের সময় তাঁর ইষ্টদর্শন হোত। আন্দাজ দেড়ঘণ্টা রাত থাকতে ঠাকুর শয্যাত্যাগ করে যখন প্রণবধ্বনি করতে করতে সমাধিস্থ হতেন, তখন ভাগ্যবান হরিশ সুমধুর কণ্ঠে দুর্গানাম, শিবনাম প্রভৃতির দ্বারা ঠাকুরের ঘর ও আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলতেন। এজন্য, তিনি ঠাকুরের অকৃত্রিম স্নেহলাভ করেছিলেন।

*

প্রেমচাঁদ বড়াল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক। তিনি কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর পরিবারটি

পরবর্তীকালে সংগীত সাধনার কেন্দ্ররূপে পরিচিত হয়। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ লাল-চাঁদ বড়াল ছিলেন তাঁর পৌত্র এবং সঙ্গীত সাধক রাই চাঁদ বড়াল তাঁর প্রপৌত্র।

একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় সিঁদুরিয়া পটিতে ব্রাহ্মভক্ত মণিলাল মল্লিকের বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগদান করায়, প্রেমচাঁদও তাঁর বন্ধু মণিলালের আমন্ত্রণে অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত থাকেন ও ঠাকুরকে দর্শন করেন। সেখানকার উৎসবে সেদিন ঠাকুরের কথামৃত পান ও ভাব সমাধি দর্শনের সুযোগ প্রেমচাঁদের হয়েছিল।

*

হেমচন্দ্র কর

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অল্প বয়স্ক পরমভক্ত পল্টুর পিতা। উত্তর কলকাতায় চাঁপাতলার ট্যাঙ্ক মুলিয়া টোলায় তাঁর বাড়ী ছিল এবং তিনি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ঠাকুরের কাছে ছাত্রাবস্থায় পল্টুর যাতায়াতের বিষয় নিয়েই প্রধানতঃ ঠাকুরের সঙ্গে হেমচন্দ্রের যোগাযোগ হয়।

ঠাকুরের কাছে পল্টুর যাতায়াতে হেমচন্দ্রের প্রবল আপত্তি থাকায়, তিনি পল্টুকে কড়া শাসন করতেন। কিন্তু সকল বাধা অগ্রাহ্য করে তবুও পল্টু ঠাকুরের সঙ্গে মেলামেশা করায়, হেমচন্দ্র অগত্যা নিজেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসেন এবং বলেন যে, তাঁর কাছে এলে ছেলের ভালই হবে, তবে সে যাতে সংসার-বিরাগী না হয়, সে বিষয়ে ঠাকুর যেন পল্টুকে উপদেশ দেন। এই অবস্থায় ঠাকুর, পিতার সঙ্গে বিবাদ করতে পল্টুকে নিষেধ করেছিলেন, পাছে দক্ষিণেশ্বরে আসা পল্টুর একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের সমাধি দর্শন করে একদা হেমচন্দ্র রহস্য করে বলেছিলেন—মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য লোকমান্য হওয়া।

*

চণ্ডীচরণ বর্ধন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কলকাতার বহুবাজার-নিবাসী অনুরাগী ভক্ত। বহুবাজারের সার্পেনটাইন লেনে নিজ বাসভবনে তিনি "হিন্দু বয়েজ স্কুল" নামে একটি বিদ্যালয় নিজেই পরিচালনা করতেন; পরবর্তীকালে সেটি "চণ্ডীচরণ এ্যাকাডেমী" নামে পরিবর্তিত হয়।

চণ্ডীচরণ তাঁর প্রথম জীবনেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর পূত সঙ্গলাভ করে, তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ঠাকুরের স্নেহধন্য

চণ্ডীচরণ, ঠাকুরকেই গুরুরূপে হৃদয়ে বরণ করেন এবং তাঁর ভাবধারায় পুষ্ট হন। শেষজীবনে তিনি ঠাকুর, স্বামীজীর ও ভারতীয় সংস্কৃতির কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন এবং এই পাঠ-কর্মেই শেষদিন অবধি নিজেকে প্রধানতঃ নিযুক্ত রাখেন। স্বনামধন্য মেজর (ডাঃ) পি. বর্ধন তাঁরই পুত্র।

*

তুলসী সাধুখাঁ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, উত্তর কলকাতার বাগবাজার নিবাসী বৈষ্ণব ভক্ত। তিনি সর্বক্ষণ হরিনাম সাধনায় রত থাকায়, পল্লীর সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। ঠাকুরও তাঁকে দেখে, তাঁর উচ্চ অবস্থার প্রশংসা করলেও, স্ত্রী-সঙ্গে তাঁর পতন হবার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, কিছুদিন পরেই ঠাকুরের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় এবং অতবড় বৈষ্ণব ভক্ত তুলসীর সত্যই অবনতি ঘটে।

*

দিগম্বর বাউল

হরিনামে সিদ্ধ, কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বিভূতি সম্পন্ন ভক্ত। বাংলা, হিন্দী ও ফার্সীতে ছড়া গেয়ে কাঠি বাজিয়ে শেষে "হরি হরি বল্" বলতেন ও পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে বেড়াতেন। শেষ বয়সে তিনি বাগবাজারে একটি বাড়ীতে ভক্তদের সহায়তায় বাস করতেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল এবং ঠাকুরের মুখে দিগম্বর বাউলের গল্প শুনে, ঠাকুরের কয়েকজন ভক্ত তাঁকে দর্শন করতে বাগবাজারের বাড়ীতে যেতেন। একদা স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর কাছে গিয়ে কয়েকটি বিভূতির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হন।

*

চুণীলাল শীল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত। তিনি ছিলেন হাওড়া জেলার রামকৃষ্ণপুর ঘাট রোডের প্রসিদ্ধ শীল বংশের সুসন্তান। অতিশয় সুপুরুষ এবং ভক্তিমান চুণীলাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং তাঁর পূতসঙ্গ লাভ করে আনন্দ পেতেন। পরমভক্ত চুণীলাল অবশেষে ঠাকুরের কৃপালাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং তাঁর একনিষ্ঠ সেবকে পরিণত হন।

*

মনোমোহন দে

কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিশেষ বন্ধু। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোমোহন প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং তাঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হতেন।

একদা ঠাকুরের মুখে "নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতন ঈশ্বরকে ডাকার" কথা শুনে মনোমোহন মুগ্ধ হন। ঠাকুরের ভাবটি প্রকাশের জন্য তিনি প্রায়ই ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত "অবিশ্রান্ত ডাকো তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে" - গানটি উচ্চৈঃস্বরে গাইতেন এবং ঠাকুরের ভাবে আনন্দ প্রকাশ করতেন।

*

রাখাল হালদার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ভক্ত। তিনি প্রায়ই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং তাঁর কথামৃত পান করে মুগ্ধ হতেন। ঠাকুরের কাছে যাতায়াতের ফলে তাঁর মানসিক অবস্থার এমনই উন্নতি হয় যে, তিনি একদিন কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরের কাছে সরাসরি ভক্তি প্রার্থনা করেন। ঠাকুর তাঁকে কয়েকটি উপদেশ দিয়ে কৃপা করেন এবং ঠাকুরের অপর ভক্ত জিতেন্দ্রিয় ছোট নরেনের শুদ্ধ অবস্থার কথা উল্লেখ করে, তার উদাহরণ দেন।

*

গিরিধারী দাস

কলকাতার গরাণহাটার মহাপ্রভু-মন্দিরের বৈষ্ণব মোহন্ত। একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গরাণহাটায় (বর্তমানে নিমতলা ষ্ট্রীট) বৈষ্ণব-সাধুদের আখ্ড়ায় শুভাগমন করায়, গিরিধারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেখানে ঠাকুর "ষড়্ভুজ-মহাপ্রভুমূর্তি" দর্শন করেন এবং এই উপলক্ষে গিরিধারী, ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন।

*

নারায়ণচন্দ্র জ্যোতিষী

কামারপুকুর গ্রামের পাশে ভুরসুবো গ্রামের অধিবাসী। তিনি জ্যোতিষ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং গ্রামবাসীদের জন্মকুণ্ডলী বা কোষ্ঠী তৈরী করে দিতেন।

কামারপুকুরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলে, তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম, জ্যোতিষী নারায়ণচন্দ্রের কাছে জাতক শিশুর জন্মপত্রিকা দিয়ে ঠিকুজী তৈরী করতে অনুরোধ করেন। ভাগ্যবান নারায়ণচন্দ্রই প্রথম ঠিকুজী মারফৎ

ঠাকুরের আসল পরিচয় জানতে পারেন এবং তিনি-যে উত্তরকালে জগৎজুড়ে "প্রভু"রূপে গণ্য হবেন, সেই ভবিষ্যৎবাণী নারায়ণচন্দ্রই প্রথম ঘোষণা করেন। অবতার-পুরুষের ঠিকুজী তৈরী করার প্রথম সুযোগ পেয়ে নারায়ণচন্দ্র ধন্য হন এবং তাঁর ভবিষ্যৎবাণী সফল হওয়ায়, জগৎ-সংসার ধন্য হয়।

*

ভক্ত মোদক

কামারপুকুর গ্রামের চারক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত বালি-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের ভক্ত অধিবাসী। ভক্তিমান মোদক সেখানে তাঁর নবনির্মিত গৃহে কোন সাধুকে তিনরাত্রি বাস করাবার ইচ্ছা পোষণ করতেন।

একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বর থেকে ভাগ্নে হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে কামারপুকুর যাওয়ার পথে বালি-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামে উপনীত হলে, সে সময় এমন প্রবল বৃষ্টিপাত হয় যে, তাঁরা সেখানে আটকে পড়েন। এই সময় ঠাকুর বাধ্য হয়ে শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে নিকটবর্তী ভক্ত মোদকের নবনির্মিত গৃহে আশ্রয় নেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন মোদক-ভবনে তিনরাত্রি অতিবাহিত করেন; পরে অবশ্য কামারপুকুরে না গিয়ে, ভাগ্নে হৃদয়ের শিহড়গ্রামে তাঁরা চলে গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, ঘটনাচক্রে ভক্ত মোদকের বাড়ীতে ঠাকুর তিন রাত্রি বাস করায়, ভক্তের অন্তরের বাসনা অযাচিতভাবে পূর্ণ হয়।

*

দীননাথ খাজাঞ্চী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ীর খাজাঞ্চী। এষ্টেট কর্তৃক ঠাকুরের নামে বরাদ্দ মাসিক কয়েকটি টাকা তিনিই খাজাঞ্চীরূপে নিজে ঠাকুরকে দিতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, পরবর্তীকালে ঠাকুর যখন পূজা করতে পারতেন না, তখন ঐ টাকা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে দেওয়ার জন্য এষ্টেটের তৎকালীন মালিক ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস যথাযথ ব্যবস্থা করেন এবং দীননাথও সেইমত ঐ টাকা শ্রীশ্রীমাকে দিতে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের প্ররোচনায় দীননাথ ঐ সামান্য সাহায্যটুকুও বন্ধ করে দেন এবং তার ফলে শ্রীশ্রীমাকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়। স্বামী বিবেকানন্দও (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ) ঐ টাকা বন্ধ না করার জন্য অনুরোধ করলেও, তা পালিত হয়নি এবং দীননাথের এই আচরণে সেই সময় শ্রীশ্রীমা মনে খুব ব্যথা পান।

পঞ্চম স্তবক

শক্তিসাধক কেনারাম ভট্টাচার্য

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের প্রাক্কালে প্রথম গুরু। কলকাতার বৈঠকখানা বাজারের অধিবাসী কেনারাম ছিলেন সুপণ্ডিত এবং প্রবীণ শক্তিসাধক। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে আসতেন বলে, রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং ঠাকুরের অগ্রজ ও মা ভবতারিণীর পূজক রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মায়।

ভবিষ্যতে মা-ভবতারিণীর পূজার জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে (তৎকালে গদাধর) শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়ে রামকুমার প্রবীণ কেনারামকে এই কাজে ব্রতী করেন এবং শক্তিসাধক কেনারামের কাছেই যথাসময়ে ঠাকুর প্রথম শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণ করামাত্রই ঠাকুর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হওয়ায়, কেনারাম তাঁর জীবনে এই সর্বপ্রথম ভাবসমাহিত যোগীকে দর্শন করে মুগ্ধ হন এবং শিষ্যের ইষ্টলাভের জন্য প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করেন। মহান্ গুরুর মহান্ শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ এরপর থেকেই অন্তরের ব্যাকুলতার সহায়ে, বৈধী ভক্তির নিয়মাদি উল্লঙ্ঘন করে ক্রমে ক্রমে নিজেই রাগানুগা ভক্তির পথে অগ্রসর হন এবং গুরু কেনারামের আশীর্বাণী সফল করে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। বলা আবশ্যক, দীক্ষাদানের পর কেনারাম সম্পর্কে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।

*

রামাইত সাধু শ্রীমৎ জটাধারী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের তৃতীয় গুরু। প্রথম গুরু শক্তিসাধক শ্রীকেনারাম ভট্টাচার্যের কাছ থেকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের পর, ঠাকুর তাঁর দ্বিতীয় মহিলা-গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছ থেকে তন্ত্রমতে দীক্ষালাভ করেন। [ভৈরবীর পরিচয় এই পুস্তকে অন্যত্র মহিলা গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে] এর পরেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের তৃতীয় গুরু শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত ও পরম বৈষ্ণব জটাধারীর আগমন হয়। জটাধারীর কাছে "রামলালা" নামে বালক-শ্রীরামচন্দ্রের একটি বিগ্রহ ছিল ; সেই বিগ্রহকে জটাধারী জীবন্ত-জ্ঞানে পূজা করতেন এবং তাঁকে নিয়ে মানুষের মতন অপূর্ব লীলাবিলাস করতেন। জটাধারী রামাইত সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে জটাধারীর আগমনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অপূর্ব ভক্তি-বিশ্বাস ও "রামলালার" অলৌকিক ক্রিয়ার কথা জানতে পারেন এবং পরম বৈষ্ণব

জটাধারীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। জটাধারীও ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর মনের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, তাঁকে বৈষ্ণব মতে দীক্ষাদান করতে রাজী হন। অতঃপর এক শুভদিনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে জটাধারী "গোপাল-মন্ত্রে" দীক্ষাদান করেন এবং ঠাকুরও বৈষ্ণবমতে সাধনার পথে অগ্রসর হন। ঠাকুরের পূতসঙ্গ লাভ করে এবং তাঁর মহাভাবের পরিচয় পেয়ে, তাঁর সম্পর্কে জটাধারীর এমন উচ্চধারণা হয় যে, অবশেষে তাঁর ইহজীবনের পরম ইষ্ট ও চিরসাথী সেই "রামলালা" বিগ্রহটি, শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণকে দান করে তিনি দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে চিরদিনের মত চলে যান এবং পরবর্তীকালে আর তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বলা আবশ্যক, ঠাকুর সেই "রামলালা" বিগ্রহের সঙ্গে নিজেও পরে অনেক লীলা-বিলাস করেন এবং বৈষ্ণব মতের সব কয়টি সাধন নিজেই একে একে সম্পন্ন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও "রামলালার" মূর্তিটি দক্ষিণেশ্বরে ৺ভবতারিণীর মন্দিরে বহুকাল রক্ষিত ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ পরে সেটি চুরি হয়ে যায়।

*

বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের চতুর্থ গুরু। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের লুধিয়ানার অধিবাসী নাগা পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। তিনি শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের পুরীনামার অন্তর্গত ছিলেন। বালকের মতন প্রায়ই তিনি উলঙ্গ অবস্থায় থাকতেন বলে, ঠাকুর তাঁকে "ন্যাংটা" নামে নির্দেশ করতেন। "কিমিয়া" সাধনের দ্বারা যে কোন ধাতুকে সোনায় পরিণত করার ক্ষমতা তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের ছিল এবং প্রয়োজনে তাঁরা সেই সোনার বিনিময়ে নিজেদের খাদ্যের সংস্থান করতেন। দীর্ঘ ৪০ বছর সাধনার পর তোতাপুরী নির্বিকল্প সমাধিলাভ করার শক্তি অর্জন করেন এবং ব্রহ্মজ্ঞ হন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করার পর, পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং মাত্র কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করার ইচ্ছা করেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর সেই অবস্থান পরে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তোতাপুরীর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয় এবং ঠাকুরকে দর্শন করেই তিনি তাঁকে বেদান্ত বা অদ্বৈত সাধনার উপযুক্ত আধার বলে বুঝতে পারেন। তোতাপুরী স্বেচ্ছায় ঠাকুরকে দীক্ষাদানের প্রস্তাব করলেও, মাতৃভক্ত ঠাকুরের আচরণে প্রথমে তাঁর মনে

দ্বিধা, বা অসন্তোষ জন্মায়। ইতিমধ্যে ঠাকুর মা-ভবতারিণীর আদেশ পাওয়ার পর, তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং নিজ গর্ভধারিণী মাতার অজ্ঞাতসারে তা সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করেন; কারণ, ঠাকুরের সন্ন্যাস-গ্রহণে তাঁর মাতা চন্দ্রমণি দেবীর বিশেষ মনোকষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং সেই সময় চন্দ্রমণিদেবী দক্ষিণেশ্বরেই ঠাকুরের কাছে বাস করছিলেন।

পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী তোতাপুরী এক শুভদিনে ঠাকুরের দ্বারা তাঁর পিতৃ-পুরুষদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, স্বীয় আত্মার জন্য পিণ্ডদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করান এবং বিরজা হোমের দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অতঃপর তোতাপুরীর নির্দেশে ঠাকুর তাঁর শিখা, উপবীত (পৈতা) প্রভৃতি যথারীতি আহুতি দেন এবং গুরুপ্রদত্ত কৌপীন পরিধান করে "সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন। তোতাপুরী শিষ্যের সন্ন্যাস-নাম দেন "রামকৃষ্ণ পরমহংস"। ঠাকুরের অগ্রজ দুই ভাই রামকুমার ও রামেশ্বরের নামের সঙ্গে ঠাকুরের এই সন্ন্যাস-নামের অপূর্ব মিল হয়।

[অবশ্য এই নাম-করণ সম্পর্কে কিছু কিছু মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, ঠাকুরের বংশের সকলের নামের সঙ্গেই "রাম" শব্দটি যুক্ত থাকায়, ঠাকুরের ডাক-নাম "গদাই" বা "গদাধর" হলেও, বংশের প্রথানুযায়ী তাঁর প্রকৃত নাম রাখা হয়েছিল "রামকৃষ্ণ"।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের পূজক হিসাবে ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারকে "বড় ভটচাজ" এবং ঠাকুরকে "ছোট ভটচাজ" বলে ডাকা হত এবং রাণীর জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসই ছোট ভটচাজকে শ্রদ্ধাবশতঃ প্রথম "রামকৃষ্ণ" নামে অভিহিত করেন।

উক্ত দুই অভিমতের পক্ষে যুক্তি স্বরূপ বলা হয় যে, রাণী রাসমণির ১২৬৫ বঙ্গাব্দ, তথা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত মন্দিরের একটি বরাদ্দের তালিকায় লেখা আছে যে, সেই সময় ৺রাধাকান্তের পূজার জন্য "শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—পাঁচ টাকা পারিশ্রমিক এবং ৩-জোড়া ধুতি ইত্যাদি পেতেন"। পরবর্তীকালে ১২৭১ বঙ্গাব্দ, তথা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তোতাপুরী কর্তৃক ঠাকুরকে দীক্ষাদানের ছয় বৎসর আগেই ঠাকুর "শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য" নামে রাণী রাসমণির দলিলে উল্লিখিত হয়েছিলেন। তাঁকে "ছোট ভটচাজ্" নামে ডাকা হত বলেই তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-নামের শেষে "চট্টোপাধ্যায়ের" স্থলে "ভট্টাচার্য" লেখা হত।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, ঠাকুরের "রামকৃষ্ণ" নামটি বংশানুক্রমিক ধারা অনুযায়ী, বা মথুরানাথ প্রদত্ত নাম নয়, কারণ গয়াতে শ্রীগদাধরের

স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর ঠাকুরের জন্ম হওয়ায় তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম কর্তৃক ব্যতিক্রম হিসাবে তাঁর বিশেষ নাম রাখা হয় "গদাধর" এবং ঠাকুরও সব সময় পিতৃপ্রদত্ত নাম হিসাবে "গদাধর চট্টোপাধ্যায়" নামে স্বাক্ষর করতেন।

"পরমহংস" কথাটি ঠাকুরের নাম নয়—উপাধি। কেউ কেউ বলেন যে, গুরু তোতাপুরীই তাঁর সন্ন্যাস-নাম শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে, বেদান্ত-সাধনার চরম পরাকাষ্ঠা প্রকাশের জন্য "পরমহংস" উপাধিটি যোগ করে দিয়েছিলেন; আবার কেউ কেউ বলেন যে, ব্রাহ্মনেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনই ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তাঁর মধ্যে চরম আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ দর্শন করে প্রথম তাঁকে "পরমহংস" নামে অভিহিত করেন এবং সেই সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি ঠাকুরকে "শ্রীরামকৃষ্ণ" নামের বিনিময়ে বহু সময় শ্রদ্ধাবশতঃ "পরমহংসদেব" বলে উল্লেখ করতেন।

এই বিষয়ে কোন প্রকার মন্তব্য না করে বলা যায় যে, ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী সারদানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণ" নামটি গুরু-প্রদত্ত নাম হিসাবেই বিবেচনা করেছেন, পক্ষান্তরে ঠাকুরের গৃহীসন্তান কথামৃত প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত উক্ত নামটি পিতৃ-প্রদত্ত নাম হিসাবেই সমীচীন বলে গণ্য করেছেন।]

দীক্ষাদানের পরেই দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর সাধন কুটীরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্ণনীয় সমাধিস্থ অবস্থা দর্শন করে, তোতাপুরী যুগপৎ ভীত ও বিস্মিত হন এবং অশেষ চেষ্টার পর নির্বিকল্প সমাধি থেকে ঠাকুরকে জাগতিক রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন। অদ্বৈত সাধনার একনিষ্ঠ সাধক তোতাপুরী প্রথম প্রথম আদ্যাশক্তিকে অস্বীকার করলেও, নানা বিপর্যয়ের মধ্যে মহামায়ার অসীম শক্তিকে স্বীকার করেন এবং মাতৃসাধক শিষ্যের কাছে পরাভূত হন। গুরু তোতাপুরীর কাছ থেকে যেমন শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ "জ্ঞান-মার্গের" দীক্ষালাভ করেন, তেমন শিষ্যের কাছ থেকেও গুরু তোতাপুরী "ভক্তি মার্গের" শিক্ষালাভের মাধ্যমে উভয়ে উভয়ের গুরু হন। একাদিক্রমে এগারো মাস দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গ লাভ করার পর, তোতাপুরী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ফিরে যান এবং আর তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেননি।

*

মুসলমান ফকীর সুফী গোবিন্দ রায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের পঞ্চম এবং শেষ গুরু। দমদম নিবাসী এই মুসলমান দরবেশ পূর্বে হিন্দু-ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধর্মান্তরিত হন ও সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত হন; গোবিন্দ রায়ের ইসলামী

নাম জানা যায়নি। পারসী ও আরবী ভাষায় তাঁর খুব দখল ছিল এবং খুব নিষ্ঠা সহকারে তিনি "নমাজ" পাঠ করতেন। দক্ষিণেশ্বরে তৎকালে সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের আগন্তুকদের মত একদা এই ফকীরও দক্ষিণেশ্বরে এসে মনোরম পঞ্চবটীর তলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন অবস্থান করেন।

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন ফকীরের উত্তম নমাজ-পাঠ, কোরাণ-পাঠ এবং ইসলামীয় সাধন প্রণালী লক্ষ্য করে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন; প্রেমিক সুফীও ঠাকুরের আচরণে মুগ্ধ হন। ঠাকুর তাঁর কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তিনি ঠাকুরকে দীক্ষাদান করতে রাজী হন। অতঃপর একদা উপযুক্ত সময়ে ফকীর গোবিন্দ রায় ইসলাম ধর্মানুযায়ী যথারীতি ঠাকুরকে দীক্ষাদান করেন এবং "আল্লা" মন্ত্র জপের উপদেশ দেন। ঠাকুরও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর, মুসলমান গুরুর আদেশে মুসলমানের মতন "কাছা" খুলে কাপড় পরতেন এবং ত্রিসন্ধ্যা "নমাজ" পড়তেন। মুসলমানের সব রকম প্রিয়খাদ্য এই সময় ঠাকুর ভক্ষণ করতেন; কেবলমাত্র ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের বাধায় "গো-মাংস" ভক্ষণ থেকে ঠাকুর নিবৃত্ত হয়েছিলেন। মনে-প্রাণে গোঁড়া মুসলমানরূপে পরিণত হওয়ায়, ঠাকুর এই সময় কোন হিন্দুর দেবদেবীকে দর্শন করতেন না, এমন কি কালী-মন্দিরেও আসতেন না। তিনি মন্দির প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে এই সময় বাইরের এক কুটীরে বাস করতেন এবং নিকটবর্তী একটি মসজিদে "নমাজ" পড়তেও যেতেন। মাত্র তিনদিন ইসলাম ধর্ম সাধনের পরেই, ঐ মতের সাধন-ফল ঠাকুরের আয়ত্বে আসে এবং তিনি এক জ্যোতির্ময় পুরুষপ্রবরের দিব্যদর্শন লাভ করেন; পরে তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্মে ঠাকুরের মন লীন হয়ে যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগের পর, ফকীর গোবিন্দ রায়ের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।

*

সাধক বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণব পণ্ডিত এবং প্রখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র। বৈষ্ণবচরণও স্বয়ং তৎকালে বৈষ্ণব সমাজের নেতা ও বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে পরিচিত ছিলেন। সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের তিনি ছিলেন একজন প্রধান ব্যাখ্যাকার এবং সাধন জগতের একজন সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন দার্শনিক। ধর্মীয় জগতে যে-কোন জটিল বিষয়ের মীমাংসার

জন্য সবাই তখন তাঁর কাছেই যেত এবং তাঁর মতামত গ্রহণ করত। এইরকম এক জটিল বিষয়ের মীমাংসা উপলক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বৈষ্ণবচরণের পরিচয় ঘটে।

দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালে ঠাকুরেব শরীরে অস্বাভাবিক বিকার ঘটেছিল, সেজন্য তার সঠিক কারণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ঠাকুরের মহিলা-গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণীব প্রেরণায়, রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস দক্ষিণেশ্বরে একটি ক্ষুদ্র পণ্ডিত-সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় বৈষ্ণবচরণসহ কয়েকজন বিচক্ষণ পণ্ডিত যোগদান করেন এবং সেখানে ভৈরবী ব্রাহ্মণী শাস্ত্রীয় উদাহরণ দ্বারা ঠাকুরের দৈহিক বিকারকে "মহাভাব" বলে প্রমাণ করেন। এই উপলক্ষে বৈষ্ণবচরণ ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের সকল প্রকার লক্ষণ দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং তাঁকে মহাপুরুষ বলে চিনতে পারেন, সেজন্য ভৈরবী ব্রাহ্মণীর যুক্তিসহ অভিমতও তিনি অনুমোদন করেন। এরপর থেকেই বৈষ্ণবচরণ, ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে এসে তাঁর পবিত্র সঙ্গ উপভোগ করেন।

একদা বৈষ্ণবচরণ কলকাতার নিকটবর্তী কাছিবাগান নামক স্থানে বৈষ্ণবদেব "নব রসিক" সম্প্রদায়ের আখড়ায় ঠাকুরকে নিয়ে যান; কিন্তু সেখানে "নব রসিক"দের যুবতীরা ঠাকুরের প্রতি কুৎসিৎ ভাব প্রদর্শন করায়, ঠাকুর সবাইকে "মাতৃ" সম্বোধনে পরিহার করেন এবং বৈষ্ণবচরণকে তিরস্কার করে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করেন।

ঠাকুরের চারিত্রিক দৃঢ়তা, সমাধিস্থ অবস্থা প্রভৃতি দর্শনেব পর বৈষ্ণবচরণ পরবর্তীকালে ঠাকুরকে "অবতার"রূপে ঘোষণা করেন; অবশেষে একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে বৈষ্ণবচরণ প্রণতি জানাবার সময় ঠাকুর সমাধিস্থ হন এবং বৈষ্ণবচরণের স্কন্ধে বসে পড়ে তাঁকে কৃপাদান করেন। বৈষ্ণবচরণও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সেই মুহূর্তেই সংস্কৃত ভাষায় ঠাকুরের উদ্দেশে একটি স্তব রচনার দ্বারা ঠাকুরকে বন্দনা করে কৃতার্থ হন।

*

সাধক ভগবানদাস বাবাজী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী, বর্ধমান জেলার কালনার প্রবীণ ও সিদ্ধ-বৈষ্ণব নেতা। ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তির জন্য তদানীন্তন বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষস্থানে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। একাসনে দিনরাত জপ-ধ্যানের ফলে, শেষ বয়সে তাঁর

চরণ দুটি অসাড় ও অবশ হয়ে পড়েছিল। হরিনামে ও ভগবৎ প্রেমে তাঁর অশ্রু বিসর্জন হত এবং বৈষ্ণবগণ তাঁর উপদেশ অনুযায়ী নিজেদের ও বৈষ্ণবধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করতেন।

একদা কলকাতার কলুটোলার হরিসভায় কালী দত্তের বাড়ীতে ভাবাবেগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানকার পবিত্র "শ্রীচৈতন্যের আসনে" দণ্ডায়মান ও সমাধিস্থ হওয়ায়, সে সংবাদে বাবাজী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং অপরিচিত ঠাকুরের উদ্দেশে তাঁর অসাক্ষাতে কটূক্তিও করে-ছিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই একদা রাণী রাসমণির জামাতা, ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস ও ভাগ্নে হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর কালনায় বেড়াতে যান এবং সেখানে বাবাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হৃদয়কে নিয়ে বাবাজীর আশ্রমে বিনা পরিচয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই বাবাজী নিজ সিদ্ধবলে তা জানতে পারেন এবং আশ্রমে নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে বলে মন্তব্য করেন। ঠাকুর এই সময় সর্বাঙ্গে বস্ত্রাবৃত অবস্থায় উপস্থিত ভক্তগণের একপাশে দীনভাবে উপবিষ্ট থাকায়, বাবাজী তখনো তাঁর পরিচয় পাননি। ঠাকুর সেখানে লক্ষ্য করেন যে, জনৈক বৈষ্ণব ভক্তের কোন অপরাধের জন্য বাবাজী তাঁর "কণ্ঠী" কেড়ে নিয়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে সেই ভক্তকে বহিষ্কারের জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন এবং এই উপলক্ষে খুব তর্জন গর্জন করছেন। বাবাজীকে সে সময় "মালা" জপতে দেখে, ঠাকুরের সঙ্গী হৃদয় তাঁকে প্রশ্ন করেন যে, সিদ্ধপুরুষের মালা জপার আর প্রয়োজন আছে কিনা? বাবাজী তাতে উত্তর দেন যে, লোক শিক্ষার জন্যই মালা জপার প্রয়োজন। এরপরেই ঠাকুর সহসা নিজের শ্রীমুখের বস্ত্রাবরণ ত্যাগ করে সেখানে দণ্ডায়মান হন এবং বাবাজীর উদ্দেশে কঠোর ভর্ৎসনা করেন। সম্প্রদায় থেকে ভক্তকে বিতাড়ন করা ও লোকশিক্ষা দেওয়ার অধিকার সম্পর্কে ঠাকুর বাবাজীকে প্রশ্ন করেন এবং ভাবের আতিশয্যে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভিনব আকস্মিক প্রকাশে ও তাঁর দেহে অপূর্ব ভাববিকাশ দর্শন করে বাবাজী প্রথমে স্তম্ভিত হন; পরে ঠাকুরের কথাগুলি হৃদয়ে উপলব্ধি করে তিনি প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত আচরণে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করেন। এরপর সেখানে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে এক দিব্যানন্দের সৃষ্টি হয় এবং তৎসহ ঠাকুরের মুহুর্মুহু ভাবাবেশ দর্শনে, ঠাকুরের ওপর বাবাজীর শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি পায়। এই সময় বাবাজী যখন ঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় পান এবং কলুটোলায় হরিসভার "শ্রীচৈতন্যের আসন" তিনিই অধিকার করেছিলেন বলে জানতে পারেন, তখন অনুতাপে বাবাজীর মন ভরে ওঠে। পূর্বে না জেনে তাঁকে কটুবাক্য বলায় বাবাজী বিনীতভাবে

ঠাকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চেয়ে প্রণাম করেন, যদিও তিনি ঠাকুরের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

বলা আবশ্যক, এই সিদ্ধ বৈষ্ণবের পরবর্তী আচরণ ও দীনতা লক্ষ্য করে ঠাকুর বিশেষ সন্তুষ্ট হন; এমনকি, ঠাকুরের কাছে বাবাজীর উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার বিশেষ প্রশংসা শুনে, ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস বাবাজীর কালনার আশ্রমের দেববিগ্রহের সেবা ও একদিনের মহোৎসবের জন্য বিশেষ আয়োজন করেছিলেন।

*

সাধক রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জটাজুটধারী জনৈক সাধক। তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে আসেন এবং ঠাকুরের কাছে বসে কেবল "শিবোঽহম্" "শিবোঽহম্" করতে থাকেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অবশেষে তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেন যে, মুখে কেবল "শিবোঽহম্" বললে কিছুই ফল হয় না; যখন সেই সচ্চিদানন্দ শিবকে হৃদয়ে ধ্যান করে তন্ময় হয়ে গিয়ে বোধে বোধ হয়, তখন সেই অবস্থাতেই "শিবোঽহম্" বলা চলে; যতক্ষণ না সেই অবস্থা আসে, ততক্ষণ সেব্য-সেবক ভাবে থাকাই উচিত।

ঠাকুরের এই উপদেশে রামচন্দ্র ব্রহ্মচারীর চৈতন্য হয় এবং তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন। এইভাবে ঠাকুরের কৃপালাভ করে তিনি যাওয়ার সময় দেওয়ালের গায়ে লিখে রেখে যান—"স্বামি বাক্যে আজ হতে রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী সেব্য-সেবকভাব প্রাপ্ত হল।"

*

সাধক দুর্গানন্দ ব্রহ্মচারী

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জনৈক সাধক। তিনি একদা পঞ্চবটীতে একটি কুটিরে কিছুদিন অবস্থান করলেও, ঠাকুরের আধ্যাত্মিক প্রভাব থেকে তিনি দূরে ছিলেন এবং সংসারী লোকদের রোগ-ব্যাধিতে ঔষধ দিতেন। সেজন্য ভুলক্রমে ঠাকুরের কাছে কেউ রোগের জন্য ঔষধ নিতে এলে, তিনি তাকে দুর্গানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

অচলানন্দ তীর্থ স্বামী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত কালীঘাটের জনৈক তান্ত্রিক সাধক। পূর্বাশ্রমের নাম রাজকুমার। প্রথম জীবনে তিনি হুগলী জেলার কোতরং গ্রামে বাস করতেন এবং গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করতেন। পরে বাড়ীর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা – সবাইকে ত্যাগ করে তিনি কালীঘাটে তন্ত্র সাধনায় ব্রতী হন। তাঁর তান্ত্রিক-সন্ন্যাসের নাম "অচলানন্দ তীর্থ স্বামী"।

অচলানন্দ তাঁর উত্তর সাধকদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে মাঝে মাঝে সাধন করতে যেতেন। এই সময় তিনি দলবলসহ খুব "কারণ" পান করতেন এবং ঠাকুর তাঁদের সবাইকে চালভাজা, কাঁচা লঙ্কা প্রভৃতি দিয়ে আসতেন। অচলানন্দ খুব "কারণ" পান করলেও, মাতাল না হয়ে স্থিরাসনে গম্ভীরভাবে বসে ধ্যান-জপ করতেন; বাকী সবাই বমি করে আর পেরে উঠতেন না। শিবের নির্দেশরূপে অচলানন্দ "বীরভাবের" সাধনায় মত্ত হতেন এবং সেজন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের "সন্তানভাব" তাঁর ঠিক বোধগম্য হত না। তিনি ঠাকুরকে "সন্তানভাব" ত্যাগ করে "বীরভাবের" সাধনের পথে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করতেন; কিন্তু তাঁর সেই চেষ্টা কার্যকরী হয়নি। নিজের অভাবের দরুন গৃহস্থদের জন্য নানাপ্রকার তান্ত্রিক ক্রিয়ার দ্বারা তিনি অর্থ উপার্জন করতেন; তাই দক্ষিণেশ্বরে কোন গৃহস্থ, ঠাকুরের কাছে ঐরূপ ক্রিয়ার জন্য অনুরোধ করলে, ঠাকুর তাদের অচলানন্দের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

*

খৃষ্টান সাধু প্রভুদয়াল মিশ্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত খৃষ্টান ধর্মযাজক। তিনি "কোয়েকার" সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁর জন্মস্থান ছিল পশ্চিমাঞ্চলে। খৃষ্টান হওয়া সত্ত্বেও তিনি যোগাভ্যাস করতেন এবং তাঁর বাইরের পোষাকের তলায় গেরুয়া বস্ত্র পরতেন। তাঁর একটি ভাইয়ের বিবাহের দিনে সেই ভাইটি ও অপর আর একটি ভাই বরের আসরের সামিয়ানা চাপা পড়ে একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করে এবং সেই ঘটনার পরেই মিশ্র সংসার ত্যাগ করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উদার মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে, মিশ্র বহুবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হন। ঠাকুরের সঙ্গে মিলনের পূর্বে তাঁর জ্যোতিঃ দর্শন হত এবং সেই সঙ্গে তখন যীশুকে ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি দর্শন করতেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে চাক্ষুস দর্শন করে তিনি তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশা বলে মত প্রকাশ করেন

এবং খৃষ্টান ধর্মযাজক হওয়া সত্ত্বেও ঠাকুরের প্রসাদী মিষ্টান্নাদি আহার করেন।

একদা মিশ্র করজোড়ে ঠাকুরকে জানান যে, তিনি তাঁর মন-প্রাণ, শরীর— সবই ঠাকুরকে অর্পণ করেছেন। এই কথায় ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন এবং মিশ্রের হস্ত ধারণ করে কৃপা করেন ও বলেন—"তুমি যা চাইছ, তা হয়ে যাবে"। বলা-বাহুল্য, মিশ্র ঠাকুরের কৃপালাভ করে কৃতার্থ হন। স্বামী বিবেকানন্দও মিশ্রকে বিশেষ সম্মান করতেন।

*

খৃষ্টান উইলিয়াম্‌স্‌

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক বিদেশী খৃষ্টান শিষ্য। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে কয়েকবার আসেন এবং তাঁর পূত সঙ্গলাভ করে ধন্য হন। ঠাকুরের কাছে যাতায়াতের ফলে এবং তাঁর দেব চরিত্রের পরিচয় পেয়ে, উইলিয়াম্‌স্‌ ঠাকুরকে ঈশ্বরপুত্র যীশুখৃষ্ট বলে স্থির করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এমনকি, ঠাকুর তাঁকে সংসার ত্যাগ করার জন্য উপদেশ দিলে, উইলিয়াম্‌স্‌ সংসারও ত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে, আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উইলিয়াম্‌স্‌ হিমালয় পর্বতের কোন এক স্থানে কঠিন তপস্যায় ব্রতী হন এবং অবশেষে সেখানেই দেহত্যাগ করেন।

*

রেভারেণ্ড হেষ্টি

কলকাতায় তদানীন্তন "জেনারেল এসেম্বলী কলেজে"র (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) বিদেশী খৃষ্টান প্রিন্সিপাল। তিনি উদারচেতা ও সুপণ্ডিত ছিলেন! তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, পবিত্র জীবন এবং সরল সপ্রেম আচরণের দ্বারা হেষ্টি সাহেব ঐ কলেজে পাঠরত নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রভৃতি ছাত্রদের কাছে বিশেষ সম্মান পেতেন।

সমাধি-অবস্থা দর্শন করার ঔৎসুক্যে এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনে, কোনও এক সময়ে হেষ্টি সাহেব দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে সমাধিস্থ ঠাকুরকে দর্শন করে এসেছিলেন এবং পরে কলেজে পড়াবার সময় সেই কথার উল্লেখ করে ছাত্রদের কাছে ঠাকুরের সমাধি-অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন।

তিনি একদিন ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-অনুভবে ভাব-সমাধির কথা ছাত্রদের কাছে বর্ণনা করলে, ছাত্রেরা সঠিকভাবে ঐ সমাধি

অবস্থা বুঝতে অক্ষম হয়। তখন হেষ্টি সাহেব তাদের বলেন—"চিত্তের পবিত্রতা ও বিষয়-বিশেষে একাগ্রতা থেকে উক্ত অবস্থার উদয় হয়; ঐ প্রকার অবস্থার অধিকারী ব্যক্তি বিরল দেখা যায়। একমাত্র দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের আজকাল ঐ রকম অবস্থা হতে দেখেছি; তোমরা উক্ত অবস্থা একদিন দর্শন করে এলে, তোমরাও এ-বিষয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।" বলা আবশ্যক, হেষ্টি সাহেবের এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম—সেই প্রথম নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) শ্রবণ করেন এবং পরবর্তীকালে ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন।

*

রেভারেণ্ড যোশেফ্ কুক্

ব্রাহ্মনেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের বিদেশী খৃষ্টান বন্ধু। ধর্ম বিষয়ে তিনি একজন বড় বক্তা ছিলেন এবং কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।

জনৈকা আমেরিকান পাদ্রী মিস্ পিগটসহ একদা কুক্ সাহেব আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে যাঁন। সেদিন ঠাকুরকে ষ্টীমারে চড়িয়ে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করার সময়, কুক্ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। নানা প্রসঙ্গ আলোচনার পর ঠাকুর যখন ষ্টীমারের মধ্যেই তাঁর সম্মুখে সমাধিস্থ হন, তখন কুক্ সাহেব ও অন্যান্য সঙ্গীরা বিস্মিত হন এবং ঠাকুরকে যেন ভূতে পেয়েছে বলে মনে করেন। খৃষ্টানধর্মীয় পথের পথিক কুক্ সাহেবের পক্ষে হিন্দু ধর্মের সমাধি দর্শন পরম সৌভাগ্যের বিষয় ছিল।

*

পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম সন্ন্যাসী-শিষ্য এবং প্রখ্যাত নৈয়ায়িক। ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী সন্তানগণের আগমনের বহুপূর্বে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আগমন করেন এবং তাঁর কাছ থেকে সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শাস্ত্রীজী ছিলেন রাজপুতানার শেখাওয়াটি প্রদেশের অধিবাসী, সুপণ্ডিত, নিষ্ঠাবান্ ও পরমভক্ত। একাদিক্রমে তিনি পঁচিশ বৎসর গুরুগৃহে বাস করে নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং অবশেষে ন্যায় দর্শন পাঠের জন্য বঙ্গদেশের নবদ্বীপে এসে সাত বৎসর এখানে অবস্থান করেন। নবদ্বীপে পাঠ সাঙ্গ হবার পর, দেশে ফিরে যাওয়ার পূর্বে একদা দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে এসে তিনি ঠাকুর

শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান এবং তাঁর দেবতুল্য আচরণে মুগ্ধ হন। ঠাকুরও শাস্ত্রীজীকে পেয়ে দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে নানাবিধ শাস্ত্র-আলোচনায় রত হন এবং তাঁকে একজন সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ব্যারিষ্টার রূপে রাণী-রাসমণির একটি মোকদ্দমার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য উপস্থিত হলে, সেদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঠাকুর প্রথমে শাস্ত্রীজীকেই মাইকেলের সঙ্গে আলাপ করতে পাঠান এবং পরে নিজে সেখানে উপস্থিত হন। এই সময় বিধর্মী মাইকেলের সঙ্গে ধর্মত্যাগের কারণ সম্পর্কে আলাপ করে শাস্ত্রীজী খুব বিক্ষুব্ধ হন এবং স্বধর্ম ত্যাগকে হীনবুদ্ধির কাজ বলে মাইকেলের প্রতি সরাসরি উক্তি করেন।

ঠাকুরের মধ্যে শাস্ত্রের নিগূঢ় তথ্য সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে, শাস্ত্রীজী ঠাকুরেব প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভ করার পর শাস্ত্রীজীব মধ্যে সংসার বৈরাগ্য তীব্র ভাব ধারণ করে। তিনি ঠাকুরের কাছে দীনভাবে শিষ্যের ন্যায় বাস করতে থাকেন এবং তাঁর কাছ থেকে সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য খুব ব্যাকুল হন। শাস্ত্রীজীর পরম আগ্রহ, আন্তরিক ব্যাকুলতা, শুদ্ধাভক্তি ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা লক্ষ্য করে অবশেষে ঠাকুর শাস্ত্রীজীকে দীক্ষাদান করতে রাজী হন এবং শুভদিনে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর তাঁকে নিজে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষাদান করেন। শাস্ত্রীজীই ঠাকুরের প্রথম দীক্ষাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী-শিষ্য, কিন্তু তাঁর "সন্ন্যাস নাম" জানা যায়নি।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভাগ্যবান্ শাস্ত্রীজী, গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ ও চরণ ধূলি নিয়ে চিরদিনের মত দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করেন; পরে স্ত্রী ও সংসার পরিত্যাগ করে তিনি বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়ে কঠোর তপশ্চরণ শুরু করেন এবং সেখানেই তাঁর দেহরক্ষা হয়।

*

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর নিবাসী প্রখ্যাত দার্শনিক ও বক্তা। হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জন্য তিনি নানাস্থানে সভা-সমিতি মারফৎ বক্তৃতা করতেন এবং সে সব স্থানে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য প্রচুর ভীড় হত। কলকাতায় "এ্যালবার্ট হলে" তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা হওয়ায়, তৎকালীন যুব ও ছাত্রসমাজ সেই বক্তৃতা শুনতে সেখানে যোগদান করতেন এবং তাঁদের মধ্যে ঠাকুরের ত্যাগীসন্তানগণের কয়েকজনও উপস্থিত থাকতেন। এই বক্তৃতা

উপলক্ষে শশধর যখন কলেজ ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন তখন নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁর সঙ্গে কয়েকবারে মিলিত হন এবং তাঁর ধর্মব্যাখ্যার কয়েকটি ত্রুটী, যুক্তির দ্বারা তাঁকে বোঝাতে প্রয়াস পান।

আধ্যাত্মিক জগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারী শশধরের নাম ও পরিচয় শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ন্যায় পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য ভক্তদের কাছে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায়, স্বামীজীই প্রথম ঠাকুরকে শশধরের কাছে নিয়ে যান। ঠাকুরকে দর্শন করা মাত্রই শশধর অতি বিনীতভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা ও প্রণাম করেন। এরপর উভয়ের আলোচনার সুরুতেই ঠাকুর, শশধরকে প্রচারকের অভিমান ত্যাগের উপদেশ দেন এবং ঠাকুরের মুখে জ্বলন্ত শক্তিপূর্ণ নানা মহাবাক্য শ্রবণ করে শশধরও ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। এর পরেও শশধর পুনরায় নিজেই দক্ষিণেশ্বরে ও বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর কথামৃত পান করে মুগ্ধ হন। বলরাম বসুর বাড়ীতে শশধর সজল নয়নে ঠাকুরের কাছে ভক্তি প্রার্থনা করায়, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শশধরের বক্ষ স্পর্শ দ্বারা তাঁকে কৃপা করেন এবং শশধরও ঠাকুরের শ্রীচরণ নিজবক্ষে ধারণ করে অশ্রুবিসর্জন করেন।

একদা কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে গিয়ে শশধর বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং ঠাকুরকে বলেন যে, তাঁর মত পরম শক্তিমান্ পুরুষ ইচ্ছা করলেই নিজের মন একাগ্র করে একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ ধারণ করলেই, সব রোগ সেরে যেতে পারে। ঠাকুর তার উত্তরে ব'লেছিলেন—"তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বল্লে গো? যে-মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এই ভাঙ্গা হাড়-মাসের খাঁচাটার ওপর দিতে আর প্রবৃত্তি হয়?" বলা বাহুল্য, শশধর এই উক্তিতে নিরুত্তর ছিলেন।

পরবর্তীকালে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী ভক্ত শশধর প্রচার কার্য পরিত্যাগ করেছিলেন এবং ৺কামাখ্যায় তপস্যার জন্য চ'লে গিয়েছিলেন।

*

পণ্ডিত গৌরীকান্ত তর্কভূষণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, বাঁকুড়া জেলার ইঁদেশের অসাধারণ ক্ষমতা-সম্পন্ন সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক। তিনি পণ্ডিত মহলে "গৌরী পণ্ডিত" নামে খ্যাত ছিলেন। সিদ্ধাই বলে তিনি অনেক অসাধ্য সাধন করতেন। প্রতি বৎসর ৺দুর্গাপূজার সময় তিনি নিজের স্ত্রীকে পূজার আসনে বসিয়ে, তিনদিন ভক্তি সহকারে তাঁকে শ্রীশ্রীজগদম্বাজ্ঞানে পূজা করতেন। এমন কি, হোমের সময় তিনি

নিজের বাম হস্তের ওপর এক মণ কাঠ সাজিয়ে শূন্যে তুলে ধরতেন এবং তার ওপর আগুন জ্বেলে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা আহুতি দিতেন; ঐ এক মণ কাঠের আগুন শেষ না হওয়া অবধি তিনি দীর্ঘ সময় শূন্যে হস্ত প্রসারিত রেখে এবং ঐ আগুনের উত্তাপ দেহে সহ্য করে, তাঁর তপস্যালব্ধ অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিতেন। এহেন মহাশক্তিমান তান্ত্রিক সাধক গৌরী পণ্ডিত একদা দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রথমেই উচ্চরবে তাঁর সিদ্ধাই প্রকাশের সময়, পরম শক্তিধর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ততোধিক পাল্টা উচ্চরবের কাছে পরাভূত হন এবং তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন।

একদা রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব-বিষয়ক এক ধর্মসভার আয়োজন করেন এবং সেই ধর্মসভায় অন্যান্য পণ্ডিতগণের সঙ্গে গৌরী পণ্ডিতও যোগদান করেন। সেখানে ঠাকুরের সম্পর্কে সাধক বৈষ্ণবচরণ গোস্বামীর শাস্ত্রসম্মত ধারণাকেই গৌরী পণ্ডিত স্বীকার করেন, তবে বৈষ্ণবচরণ, ঠাকুরকে "অবতার" বলায় সে কথা তাঁর মনঃপূত হয়নি; তিনি বলেন যে, যাঁর অংশ থেকে অবতারগণের উৎপত্তি, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও স্বয়ং সেই।

পরে গৌরী পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে মাসের পর মাস ঠাকুরের দিব্যসঙ্গ লাভ করেন এবং অবশেষে ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। এই সময় তাঁর দেশ থেকে বার বার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গের পত্রাদি পাওয়া সত্ত্বেও তিনি আর দেশে ফিরে যাননি। সহসা এক শুভদিনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে এবং ঈশ্বরলাভের জন্য ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভ করে, গৌরী পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করেন ও পরম অজানার পথে যাত্রা করেন। তারপর থেকে অনেক অনুসন্ধান করেও আর কেউই গৌরী পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পায়নি।

*

পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, তৎকালীন স্বনামধন্য পণ্ডিত। স্বামী সারদানন্দ, তথা শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর পিতা শ্রীগিরীশচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। পুত্র শরৎচন্দ্র সংসার ত্যাগ করে কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত থাকায়, পিতা গিরীশচন্দ্র খুব ভীত হয়ে পড়েন এবং পুত্রকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করেন। গিরীশচন্দ্রের ধারণা হয় যে, যদি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে পাণ্ডিত্যে পরাস্ত করা যায়, তবে তার প্রতিক্রিয়ায় পুত্রকে বুঝিয়ে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি একদিন কাশীপুরে প্রখ্যাত পণ্ডিত জগন্মোহন

তর্কালঙ্কারকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসেন এবং তাঁর দ্বারা পাণ্ডিত্যে ঠাকুরকে পরাভূত করার অভিপ্রায় পোষণ করেন। কিন্তু ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে এবং তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাবে তর্কালঙ্কার মশাই এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি গিরীশচন্দ্রকে জানিয়ে দেন যে, এমন গুরুর শিষ্য হওয়া তাঁর পুত্রের পক্ষে ভাগ্যের কথা।

*

পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

কলকাতার সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক। বিরাট পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি খুব নিরহঙ্কার ছিলেন এবং পরম ভক্ত ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ থাকায় উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল এবং সেজন্য ঠাকুর তাঁর নিজ ভক্তগণের কাছে জয়নারায়ণের বিষয়ে প্রায়ই প্রশংসা করতেন। নিজের মৃত্যুর কথা জানতে পেরে জয়নারায়ণ কাশীতে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই তাঁর দেহত্যাগ হয়েছিল।

*

পণ্ডিত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী নৈয়ায়িক পণ্ডিত। নিজের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অহঙ্কার ছিল। একদা কোন্নগরে এক ভক্ত গৃহে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, দীনবন্ধু সেখানে ঠাকুরকে দর্শন করতে যান।

দীনবন্ধুকে দেখামাত্রই ঠাকুর তাঁকে নমস্কার করলেও, তিনি ঠাকুরকে প্রতি-নমস্কার না জানিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করেন যে, যেহেতু তাঁর গলাতে পৈতা (উপবীত) নাই, সেইহেতু ব্রাহ্মণ দীনবন্ধুর পক্ষে তাঁকে নমস্কার করা উচিত কিনা! তাতে ঠাকুর নিজেকে সকলের দাসানুদাস বলে পরিচয় দিলে, দীনবন্ধু পুনরায় ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন যে, যেহেতু তাঁর অঙ্গে গেরুয়া বস্ত্র নাই, সেইহেতু তিনি সন্ন্যাসী কিনা! কারণ, গলায় পৈতা না থাকলেও কেবলমাত্র সন্ন্যাসীকেই প্রণাম করা যায়। (এখানে উল্লেখ্য যে, ঠাকুর শুভ্র বসন পরিধান করতেন।) এই প্রশ্নের মধ্যেই দীনবন্ধুর পাণ্ডিত্যের ফাঁকী ঠাকুরের কাছে ধরা পড়ে। কারণ, ঠাকুর যে "পরমহংস", একথা পূর্বে জেনেই দীনবন্ধু "পরমহংস"কে দেখার জন্যই সেখানে এসেছিলেন; সুতরাং "পরমহংস" সন্ন্যাসী কিনা জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর তাঁর নিষ্ফল দাম্ভিকতা লক্ষ্য করে মৃদুস্বরে তাঁকে জানান যে, তিনি সন্ন্যাসী।

বলা বাহুল্য, ঠাকুরের একটি নমস্কারের বিনিময়ে একটি প্রতি-নমস্কার জানাবার উদ্দেশ্যে সেদিন যে ঘটনা ঘটে, তাতে জ্ঞানমার্গের নৈয়ায়িক দীনবন্ধু, ভক্তিমার্গের পৈতাবিহীন, গেরুয়া বস্ত্র বিহীন "পরমহংসকে" ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে অন্যায়ভাবে বাঁধতে গিয়ে বিফল হন।

পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত বিশিষ্ট ব্রাহ্মভক্ত। বিরাট পাণ্ডিত্যের অধিকারী প্রিয়নাথ, আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন। অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতার ন্যায় তিনিও ঠাকুরের গুণগ্রাহী ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

*

পণ্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য, খড়দহ-নিবাসী প্রসিদ্ধ নিত্যানন্দ বংশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তিনি নিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামী ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও বরাবরই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। ঠাকুরও এই উদার ভক্তটিকে বিশেষ স্নেহ করতেন।

একদা খড়দহের ৺শ্যামসুন্দর-বিগ্রহ দর্শন করার উদ্দেশ্যে ঠাকুর যাদবকিশোরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর থেকে খড়্দহে আসেন। ঠাকুরকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে যাদবকিশোর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করালে, ঠাকুর তাঁকে বলেন—"তুই আমাকে শ্যাম দেখাতে এনে, শ্যামাকে দেখালি!" পরে যাদবকিশোর তাঁকে শ্রীবিগ্রহের প্রসাদান্ন ভোজন করালে ঠাকুর খুব তৃপ্ত হন এবং বলেন—"তুই আজ একশো টাকা দামের ভোগ খাওয়ালি!"

*

পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সমাধ্যায়ী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে ভাষণ দিতেন। আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ী "কমলকুটীরে", নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ স্থানে এবং দক্ষিণেশ্বরেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়।

একদা হুগলী জেলার ভদ্রকালীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জনৈক ভক্ত শিবু আচার্যের শ্বশুরবাড়ীতে সঙ্গীগণসহ শুভাগমন করলে, সেখানে সমাধ্যায়ী শাস্ত্র আলোচনা করেন এবং অপর ভক্তদের সঙ্গে তুমুল তর্ক করেন। এই সময় ঠাকুর ভাবাবেশে সহসা সমাধ্যায়ীর ডান হাঁটু স্পর্শ করেন এবং পুনরায় তর্ক করার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু ঠাকুরের এই স্পর্শে সমাধ্যায়ী নির্বাক হয়ে যান এবং বিস্ময়ে ঠাকুরকে দর্শন করতে থাকেন।

সমাধ্যায়ী সম্পর্কে ঠাকুর বলতেন—"সমাধ্যায়ীর চক্ষু দিয়ে এঁর ভিতরটি দেখা যাচ্ছে, যেমন শার্শির ভেতর দিয়ে ঘরের ভেতরের সব জিনিস দেখা যায়।" সমাধ্যায়ী সম্পর্কে ঠাকুরের এরূপ উক্তি থাকলেও, তিনি সমাধ্যায়ীর ভাষণ সবসময় পছন্দ করতেন না; কারণ, সমাধ্যায়ী ঈশ্বরকে "রসহীন" বলে

উল্লেখ করতেন। ঈশ্বর সম্পর্কে সমাধ্যায়ীর সঠিক ধারণা ছিল না বলে ঠাকুর নিজ ভক্তদের কাছে মন্তব্য করেছিলেন।

*

পণ্ডিত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, হুগলী জেলার আঁটপুর নিবাসী ভক্ত। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং এই নিরহঙ্কার পণ্ডিতকে ঠাকুর বিশেষ স্নেহ করতেন। শ্যামাপদ দক্ষিণেশ্বরে বসে যখন ধ্যান জপ করতেন, তখন তাঁর আশ্চর্য দর্শন হত। শ্যামাপদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে ঠাকুর আনন্দ পেতেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে শ্যামাপদের মুখে শ্রীমদভাগবতের আবৃত্তি শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হন এবং দণ্ডায়মান্ অবস্থায় শ্যামাপদের কোলে ও বুকে চরণ স্থাপন করে হাসতে থাকেন। এই সময় শ্যামাপদ, ঠাকুরের চরণ ধারণ করে "গুরো! চৈতন্যং দেহি" বলে প্রার্থনা করেন এবং ঠাকুর তাঁকে গুরুরূপে কৃপা করেন।

*

পণ্ডিত শঙ্করনাথ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, আর্য সমাজের নেতা। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজের তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তৎকালীন দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের যাতায়াতের সময়, পণ্ডিত শঙ্করনাথও একদা ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

*

পণ্ডিত পদ্মলোচন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত প্রখ্যাত বৈদান্তিক এবং বর্ধমান-রাজার সভা পণ্ডিত। তিনি কাশীতে গুরুগৃহে দীর্ঘকাল বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরূপে খ্যাত হন। তাঁর সদাচার, তপস্যা, ইষ্টনিষ্ঠা প্রভৃতি সদগুণের পরিচয় পেয়ে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা পোষণ করতেন, কিন্তু প্রথমদিকে ঠিকমত সে সুযোগ ঘটেনি।

একদা শারিরীক অসুস্থতার দরুণ পদ্মলোচন দক্ষিণেশ্বরের পাশে আড়িয়াদহের কাছে (মতান্তরে পানিহাটিতে) গঙ্গাতীরস্থ একটি বাগানে অবস্থান করছেন—এই সংবাদ শুনে ঠাকুর নিজেই তাঁর সঙ্গে সেখানে দেখা করতে যান। প্রথম মিলনেই ঠাকুর তাঁকে সুপণ্ডিত ও সাধক বলে জানতে পারেন এবং তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে আনন্দ পান।

ঠাকুরের মধুরকণ্ঠে মাতৃসঙ্গীত, মুহুর্মুহু সমাধি, বিভিন্ন প্রকারের উপলব্ধি প্রভৃতি পদ্মলোচনের মনে বিশেষ রেখাপাত করে; তিনি ঠাকুরকে একজন মহাপুরুষরূপে বরণ করেন এবং তাঁর প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হন।

পরবর্তীকালেও ঠাকুরের সঙ্গে পদ্মলোচনের আরো কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই সময় ঠাকুর নিজ শক্তিতে পদ্মলোচনের গোপন ইষ্টশক্তির পরিচয় জানতে পারায়, পদ্মলোচন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সাক্ষাৎ ইষ্টজ্ঞানে ঠাকুরের স্তব স্তুতি করেন। পরে তিনি ঠাকুরের কৃপালাভ করেন এবং তাঁকে "অবতার" রূপেও স্বীকার করেন। কিন্তু পদ্মলোচনের শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, তিনি কাশীতে চলে যাওয়ার সঙ্কল্প করেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে এক শুভদিনে সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ পূর্বক কাশীতে যাওয়ার অল্পকাল পরেই সেখানে পদ্মলোচনের দেহত্যাগ হয়।

*

আচার্য প্রমথনাথ সেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ব্রাহ্মভক্ত। তিনি ছিলেন আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং খুব মহৎলোক ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে অথবা অন্যান্য ভক্তদের বাড়ীতে তিনি বহুবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। অল্পবয়সে প্রমথনাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলেই, ঠাকুর তাঁকে নিজ-হাতে সন্দেশ খেতে দিতেন এবং তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। প্রমথনাথের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ঠাকুর তাঁকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রমথনাথ নববিধান ব্রাহ্মসমাজে আচার্যের পদ গ্রহণ করে, সেখানে মাঝে মাঝে ঠাকুরের স্মৃতিকথা আলোচনার ব্যবস্থা করতেন এবং ঠাকুরের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

*

আচার্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মভক্ত। ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। তিনি একজন সুগায়ক ছিলেন। ঠাকুরের অনুরোধে তিনি একদা "হরি রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে" - "গানটি গাইলে, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন।

*

আচার্য শ্রীবেচারাম

আদি ব্রাহ্মসমাজের জনৈক আচার্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কয়েকবার যোগাযোগ হয়েছিল।

একদা সিঁথির ব্রাহ্মভক্ত বেণী পালের বাগানে, ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে বেচারাম আচার্যরূপে যোগ দিয়েছিলেন এবং ঠাকুরও সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে বেচারামের অনেক তত্ত্বকথা আলোচিত হয় এবং ঠাকুরের মুখে ব্রহ্মতত্ত্ব শুনে ও ঐ কথার সঙ্গে বেদান্তের মিল দেখে তিনি মুগ্ধ হন।

ষষ্ঠ স্তবক

শিক্ষক হরলাল

হিন্দুস্কুলের জনৈক শিক্ষক এবং ভক্ত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণে হরলাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরও এই ভক্ত শিক্ষকের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে আনন্দ পেতেন। ঠাকুর যেদিন দক্ষিণেশ্বরে আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ষ্টীমারে গঙ্গায় ভ্রমণ করতে যান, ভাগ্যবান হরলালও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

*

অধ্যাপক নীলমণি

প্রখ্যাত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিশেষ বন্ধু। শ্যামপুকুরে ৺কালীপূজার দিন সকালে ডাক্তার সরকারের সঙ্গে তিনি ঠাকুরকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক নীলমণির পরিচয় পেয়ে ঠাকুর সেদিন তাঁকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন এবং আনন্দে বলে ওঠেন—"আজ আমার খুব দিন!" সেদিন ঠাকুরের সরল আচরণে ও কথাবার্তায় নীলমণি মুগ্ধ হন।

*

অধ্যাপক নৃত্যগোপাল গোস্বামী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, পূর্ববঙ্গের ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক। কলকাতায় এলেই তিনি ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং ঠাকুরও সুপুরুষ ও ভক্তিমান এই অধ্যাপককে বিশেষ স্নেহ করতেন।

ঠাকুরের অসুস্থতার খবর পেয়ে একদা নৃত্যগোপাল ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসেন এবং বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে অসুস্থ ঠাকুরকে দেখতে যান। সেদিন সেখানে ঠাকুরের ভক্ত নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও অপর ভক্ত কালীপদ ঘোষ ঠাকুরকে কীর্তন গেয়ে শোনাতে থাকায়, ঠাকুর সমাধিস্থ হন। সমাধি অবস্থায় ঠাকুরের দক্ষিণ চরণ প্রসারিত থাকায়, নৃত্যগোপাল সেই সুযোগে ঠাকুরের শ্রীচরণ অতি সন্তর্পণে নিজের বক্ষে ধারণ করেন এবং ব্যাকুলভাবে দরদর ধারায় অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। কীর্তনের শেষে ঠাকুর যখন অর্ধবাহ্যদশায় ফিরে আসেন, তখন তিনি নৃত্যগোপালকে তিনবার "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম উচ্চারণ করার জন্য আদেশ করেন। ঠাকুরের আদেশে নৃত্যগোপাল তৎক্ষণাৎ তিনবার ঐ নাম উচ্চারণের দ্বারা, ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত হন।

*

অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক এবং কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিশেষ বন্ধু।

একদা মাষ্টার মশাই রহস্যভরে কালীকৃষ্ণকে বলেছিলেন—"শুঁড়ীর দোকানে যাবে তো, আমার সঙ্গে এস, সেখানে এক জালা মদ আছে।" কালীকৃষ্ণ সে প্রস্তাবে রাজী হলে, মাষ্টার মশাই তাঁকে শুঁড়ীর দোকান দেখাবার অছিলায় সহসা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করেন এবং ঠাকুরকে বন্ধুটির বিষয়ে উপরোক্ত ঘটনা জানান। ঠাকুর সহাস্যে কালীকৃষ্ণকে ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের সুরার বিষয়ে কিছু উপদেশ দেন। ভাগ্যবান কালীকৃষ্ণ সেদিন ঠাকুরের মুখে একটি গানও শুনেছিলেন।

*

অধ্যাপক কামাখ্যাপ্রসাদ মিত্র

বিহারের বাঁকীপুর কলেজের অধ্যাপক এবং ব্রাহ্মভক্ত। প্রথম জীবনে তিনি কলকাতার মির্জাপুর পার্কের কাছে বাস করতেন এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন। এই সময় একদিন ঠাকুর তাঁকে নিজ হাতে সন্দেশ খাইয়েছিলেন। শেষ বয়সে তিনি আচার্য কেশব চন্দ্র সেনের নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। বাঁকীপুরে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকলেও সব সময় তিনি ঠাকুরের কথাই বলতেন এবং ঠাকুরের অপার স্নেহের কথা স্মরণ করে বিহ্বল হয়ে পড়তেন। এমনকি, ব্রাহ্ম সমাজের বেদী থেকে উপদেশ দেওয়ার সময়েও তিনি ঠাকুরের উপদেশগুলিই উচ্চারণ করতেন।

*

সাংবাদিক যোগেন্দ্রনাথ বসু

বিখ্যাত "বঙ্গবাসী" পত্রিকার সম্পাদক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বশতঃ তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরও তাঁকে স্নেহ করতেন। ব্রাহ্ম সমাজের নিরাকার-বাদীদের তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না এবং সে কথা ঠাকুরের কাছে একবার ক্ষোভের সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে যোগদান করতেন এবং ঠাকুর তাঁর কথাবার্তার তারিফ করতেন।

সাংবাদিক কৃষ্ণকুমার মিত্র

"সঞ্জীবনী"-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, সমাজসেবক এবং ব্রাহ্মভক্ত। জীবদ্দশা ১৮৫২ থেকে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। আদি নিবাস পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইল মহকুমার বাঘিল গ্রাম।

কলকাতার সিঁদুরিয়া পটীতে মণিলাল মল্লিকের বাড়ী, সিঁথিতে বেনীমাধব পালের বাগান-বাড়ী এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তিনি বহুবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর কথামৃত পান করেন। পরবর্তীকালে তিনি ঠাকুরের সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করেন এবং নিজ "আত্মচরিত"-গ্রন্থে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থা এবং ঠাকুরের সুমিষ্ট কণ্ঠে ব্রহ্ম-সঙ্গীত শ্রবণের কথা বিশদভাবে উল্লেখ করেন।

প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মনীষী রাজনারায়ণ বসুর কন্যা শ্রীমতী লীলাদেবীর সঙ্গে কৃষ্ণকুমারের বিবাহ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দ (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ) অন্যান্য গায়কগণ সহ তিনখানি গান পরিবেশন করেন; ঐ গানগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা ও সুর সংযোজনা করে নিজে স্বামীজীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

*

সাংবাদিক কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মভক্ত আচার্য কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে, বেলঘোরিয়ার বাগানে ও দক্ষিণেশ্বরে তিনি কয়েকবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর রচনায় ঠাকুরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। "প্রবাসী"তে প্রকাশিত তাঁর রচনার একটি অংশ :– "শ্রীকেশবচন্দ্রের লেখা পড়িয়া ও ব্রাহ্ম সাধকদিগের মুখে তাঁহার বিশেষ ধর্মভাবের কথা শুনিয়া আমার মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল এবং অনেকগুলি শিক্ষিত লোকের মনও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইল। আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমি বোধ হয় পাঁচবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎভাবে মিলিত হইয়াছি এবং প্রত্যেকবার চার-পাঁচ ঘণ্টা করিয়া তাঁহার কথা শুনিয়াছি ও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়াছি।" কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের আন্তরিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তিনি লিখেছেন–"একদিন কেশবচন্দ্র নাচিতে নাচিতে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন যে, 'তুমি শ্যাম, আমি রাধা', অমনি পরমহংসদেবও বলিলেন যে, 'তুমি শ্যাম, আমি রাধা'।

*

সাংবাদিক হীরানন্দ

সিন্ধুপ্রদেশের "সিন্ধু-টাইমস্" এবং "সিন্ধু-সুধা" পত্রিকা দুটির সম্পাদক তিনি ছিলেন সিন্ধুদেশবাসী হায়দ্রাবাদের ব্রাহ্মভক্ত। লেখাপড়া করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের কাছে হীরানন্দ এসেছিলেন এবং বি. এ. পাশ করার পর, দেশে ফিরে গিয়ে উক্ত দুটি পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন; বহুদিন কলকাতায় থাকার ফলে তিনি বাংলাভাষাও জানতেন। আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্তদের সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা ছিল।

কলকাতায় থাকাকালীন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণবশতঃ হীরানন্দ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে থাকতেন। ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে তিনি আনন্দ পেতেন এবং ঠাকুরকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করতেন। মধুর স্বভাবের জন্য ঠাকুরও হীরানন্দকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং নিজের আত্মীয়বোধ করতেন।

একদা কাশীপুর উদ্যান বাটীতে অসুস্থ অবস্থায় থাকার সময়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হীরানন্দকে দেখার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং সেই সংবাদ পেয়ে হীরানন্দ সুদূর সিন্ধুপ্রদেশ থেকে পুনরায় কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন। হীরানন্দকে কাছে পেয়ে ঠাকুর স্বস্তিবোধ করেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রাণভ'রে আলাপ করেন। হীরানন্দও ঠাকুরের পদসেবা, অন্নপ্রসাদ গ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেকে কৃতার্থ করেন। ঠাকুরের প্রতি অকুণ্ঠ মমতায় হীরানন্দ তাঁকে সুস্থ করার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যকর স্থান নিজের দেশে নিয়ে যাওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু ঠাকুরের শারিরীক অক্ষমতার দরুন সে কাজ সম্ভব হয়নি।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও হীরানন্দ সিন্ধুপ্রদেশ থেকে কলকাতায় এলে, বরানগরের মঠে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের সঙ্গে পরবর্তীকালে যোগাযোগ করেছিলেন।

*

"বেদব্যাস"—সম্পাদক

হিন্দু-পুনরুত্থানবাদীদের তৎকালীন বিখ্যাত মুখপত্র "বেদব্যাস" পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায়নি। কলকাতায় প্রখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির গৃহে যেবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে

যান, সেবারে "বেদব্যাস"—সম্পাদকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরকে সাক্ষাতের পর থেকেই তিনি তাঁর অনুরাগী ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং তাঁর পূত সঙ্গ লাভ করে আনন্দ পেতেন।

পরবর্তীকালে তাঁর লিখিত একটি প্রবন্ধে ঠাকুরের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বিবরণের মারফৎ তিনি প্রকাশ করেন—"আমরা প্রায়ই তাঁহার নিকট গমন করিয়া, তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিতাম। আমরা এই সময় তাঁহার নিকট নানা ধর্মাবলম্বী দর্শকে পরিপূর্ণ দেখিতাম। খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু তো আছেই, আরও কত সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিখ্যাত নববিধানী ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেও ভক্তি গদগদভরে তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।"

*

প্রেততত্ত্ববিদ্ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতায় "থিওসফিক্যাল সোসাইটীর" প্রতিষ্ঠাতা আমেরিকাবাসী কর্ণেল অলকট্ সাহেবের বিশেষ বন্ধু। দেবেন্দ্রনাথ "সতী কি কলঙ্কিনী," "আদর্শ সতী" প্রভৃতি নাটক প্রণয়ন করেছিলেন এবং সেগুলি তখন "গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে" অভিনীত হত। বন্ধু অলকটসাহেবের সহায়তায় প্রথম জীবনে তিনি "থিওসফিষ্ট" (প্রেততত্ত্ববিদ) রূপে নানাপ্রকার সাধন সুরু করেন এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী এই পথে অগ্রসর হন। থিওসফিষ্টদের বহুবিধ আচার ও নিয়ম পালন করা সত্ত্বেও যখন তিনি সূক্ষ্মশরীরে মহাত্মাদের দর্শন পেলেন না, তখন তিনি থিওসফিষ্টদের ওপর খুব বিরক্ত হন এবং বন্ধু অলকটসাহেবের ওপর আস্থা হারিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে ও উক্ত সোসাইটীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।

কিন্তু এই বিষয়ে সঠিক তথ্য জানার জন্য দেবেন্দ্রনাথের মন খুব ব্যাকুল হয় এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হন। দিনের পর দিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করে, ঠাকুরের সঙ্গে "সূক্ষ্ম শরীর তত্ত্ব" নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই সংক্রান্ত নানাবিধ প্রশ্নের সঠিক উত্তর তিনি ঠাকুরের কাছ থেকে পান। ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভ করে এবং নিজের মনের ক্ষুধা মিটে যাওয়ার ফলে, অবশেষে তিনি ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী ভক্তে পরিণত হন।

*

ফটোগ্রাফার অবিনাশচন্দ্র দাঁ

বরানগরের কুঠীঘাট-নিবাসী ফটোগ্রাফার। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো তোলা উপলক্ষে ভাগ্যবান অবিনাশ, ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার ও তাঁর ভাব সমাধিস্থ দেহকে স্পর্শ করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার "বোন্ শেফার্ড কোম্পানী"তে অবিনাশ শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ করতেন এবং অবসর সময়ে নিজে একটি ক্যামেরা নিয়ে এই বিষয়ে হাত পাকাতেন।

ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত বরানগরনিবাসী ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় একদা (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) ঠাকুরের একখানি ফটো তোলার জন্য বিশেষ আগ্রহী হন এবং তাঁর বন্ধু অবিনাশচন্দ্র দাঁকে এই উদ্দেশ্যে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিয়ে আসেন। সে সময় কালীবাড়ীতে ৺রাধাকান্ত মন্দিরের রোয়াকে ঠাকুর গভীর সমাধিমগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন; ভবনাথ সেই সমাধিস্থ অবস্থার ফটো তোলাতে ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ভাগ্যবান অবিনাশ ঠিক সময়মত ঠাকুরের সেই দুর্লভ আধ্যাত্মিক ভাবের ফটো তোলেন। ফটো তোলার আগে ঠাকুরের সমাধিমগ্ন দেহ কিছু বাঁকা থাকায়, অবিনাশ তাঁকে ঠিকমত বসাবার জন্য নিকটে এসে তাঁর দেহ স্পর্শ করেন; কিন্তু ঠাকুরের দেব-দেহ ও চরণ দুটী ঠিকভাবে বসাতে গিয়ে তিনি দেহখানির অতীব কোমলতা অনুভব করেন। অবিনাশ ইতিপূর্বে সমাধি অবস্থার বিষয় কিছু না জানায়, ঠাকুরের দেহ স্পর্শ করে দেখেন যে, তা তুলোর মত হাল্কা এবং বেশী নাড়াচাড়া করলে হয়তো তা শূণ্যে উঠে যেতে পারে। এই ঘটনায় অবিনাশ ভীত ও বিচলিত হয়ে ঠাকুরকে নাড়াচাড়া বন্ধ করেন এবং যথাস্থানে ক্যামেরার কাছে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি তাঁর ফটো গ্রহণ করেন। কিন্তু বেশী তাড়াতাড়িতে ফটোর নেগেটিভ্ কাঁচটি তাঁর হাত থেকে অসাবধানতাবশতঃ পড়ে যাওয়ার ফলে, সেটির ওপরের অংশের সামান্য একটু ভাগ ভেঙে যায়; অবশ্য মূল ছবিখানি অবিকৃত থাকে।

বলা আবশ্যক, দেশ-বিদেশে সর্বত্র, আশ্রমে-মঠে-মন্দিরে, ভক্তদের ঠাকুর ঘরে—গৃহে গৃহে, ঠাকুরের যে ছবিখানি নিত্য পূজিত ও অর্চিত হয়, তা অবিনাশ কর্তৃক তোলা সেই মূল ফটোর প্রতিচ্ছবি। পরে ঠাকুরকে এই সমাধিস্থ অবস্থার ফটো দেখানো হলে, ঠাকুর ভক্তদের বলেন যে, এ অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির গভীরতম সমাধি-অবস্থার ছবি। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—"কালে এ ছবি ঘরে ঘরে পূজা হবে।" শুধু তাই নয়, অনেক সময় ঠাকুর তাঁর নিজের যোগাবস্থার এই পবিত্র ছবিখানি স্থির নয়নে দেখতেন,

করজোড়ে প্রণাম করতেন, এমনকি কখনো নিজহাতে তাতে পুষ্পাঞ্জলিও দিতেন।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ভক্তগণ কর্তৃক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মোট ৪ খানি ফটো তোলা হয়েছিল।

প্রথম ফটো :—১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের কলকাতার "কমল-কুটীর" বাসভবনে ঠাকুরের প্রথম ফটো তোলা হয়েছিল। সেখানে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগদান করে ও ব্রাহ্মভক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের সুমধুর সঙ্গীত শুনে ঠাকুর যখন দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিস্থ হন, তখন ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়রাম তাঁর দেহখানি আগলে ধরেন; কথিত আছে, সেই অবসরে আচার্য কেশবচন্দ্র, ঠাকুরের সেই দুর্লভ সমাধিমগ্ন অবস্থার ফটো তুলে নেন।

দ্বিতীয় ফটো :—১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর কলকাতার রাধাবাজারের "বেঙ্গল ফটোগ্রাফারে"র ষ্টুডিওতে ঠাকুরের দ্বিতীয় ফটো তোলা হয়েছিল। ঠাকুরের পরমভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র সেদিন ঐ দোকানে ঠাকুরকে ক্যামেরা দেখাতে নিয়ে গিয়ে তাঁর ফটো তুলিয়েছিলেন। ষ্টুডিওর একটি নকল থামের ওপর হাত রেখে দণ্ডায়মান অবস্থায় ঠাকুরের সমাধি হলে, সেই সময় তাঁর ফটো তোলা হয়; এই ফটোতে ঠাকুরের পরিধানে ধুতি, কালো কোট, চটিজুতা প্রভৃতি ছিল।

তৃতীয় ফটো :—১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দক্ষিণেশ্বরে অবিনাশচন্দ্র দাঁ কর্তৃক ঠাকুরের জগদ্বিখ্যাত তৃতীয় ফটোটি তোলা হয়। (পূর্বেই পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে)। এইটিই ঠাকুরের জীবদ্দশার শেষ ফটো। বলা বাহুল্য, সব কটি ফটোই ঠাকুরের সমাধিমগ্ন অবস্থায় তোলা হয়েছিল

চতুর্থ ফটো :—১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুরের চতুর্থ এবং শেষ ফটো তোলা হয়েছিল। সর্বশেষ এই ফটোটি ঠাকুরের মহা সমাধিমগ্নের ফটো। পরমভক্ত এবং সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিশেষ ইচ্ছায় ও উদ্যোগে শোকাহত ভক্তগণ পরিবেষ্টিত ঠাকুরের নশ্বর দেহের এই ফটো সমধিক প্রচলিত নয়।

*

চিত্রকর অন্নদা বাগচী

কলকাতার শিকদার পাড়ার অধিবাসী বিখ্যাত চিত্রকর। অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে, অন্নদা মাঝে মাঝে সেখানে এসে ঠাকুরের

সঙ্গে মিলিত হতেন। ঠাকুরের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং নিজের অঙ্কিত কয়েকখানি ভাল ভাল চিত্র তিনি শ্রদ্ধাবশতঃ ঠাকুরকে উপহার দিয়ে ধন্য হয়েছিলেন। ঠাকুর সেগুলির মধ্যে "ষড়ভুজমূর্তি" এবং "অহল্যা-পাষাণী"র পটগুলি দেখে খুব প্রশংসা করেছিলেন ও অন্যান্য ভক্তদের সেগুলি দেখিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।

*

চিত্রকর প্রিয়নাথ সিংহ

স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী বন্ধু এবং প্রখ্যাত চিত্রকর। তিনি প্রথম বয়সেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর স্নেহলাভ করেন। স্বামীজীর সঙ্গে বরাবরই তাঁর বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল এবং তিনি ঠাকুরের মহাভাবের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ঠাকুর কর্তৃক স্বামীজীকে স্পর্শদ্বারা অদ্বৈতানুভূতি দানের একটি বিখ্যাত রঙীণ চিত্র তিনি পরবর্তী জীবনে এঁকে-ছিলেন, যা স্বামীজী নিজে দেখে অনুমোদন করেছিলেন। এ ছাড়া "গুরুদাস বর্মন"—এই ছদ্মনামে তিনি "শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত" নামে একটি পুস্তকও রচনা করেছিলেন।

*

যন্ত্রসঙ্গীত বিশারদ অমৃতলাল দত্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত এবং স্বামী বিবেকানন্দের খুল্লতাত ভ্রাতা। তিনি "হাবু হাবু" নামে পরিচিত ছিলেন। যন্ত্রসঙ্গীত বিশারদরূপে অমৃতলাল বিলাতী বাদ্যযন্ত্রকে দেশীয়ভাবে পরিবর্তিত করেছিলেন। বংশীবাদনে বিশেষ পারদর্শী অমৃতলাল কলকাতার তৎকালীন নাট্যজগতে সুরকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং কিছুদিন রামপুরের নবাবের দরবার ভুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময় বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব তাঁর যন্ত্রবিদ্যায় বিশেষ গুণমুগ্ধ হয়ে, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আমেরিকা থেকে ফেরার পর, স্বামী বিবেকানন্দের সম্বর্ধনা উপলক্ষে নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্রের রচিত গানে অমৃতলালই সুর-সংযোজনা করেছিলেন।

কাশীপুরে যখন ঠাকুর খুব অসুস্থ, সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ) তাঁর এই খুল্লতাত ভ্রাতা অমৃতলালকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁর ভ্রাতার মুক্তির জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন। সে সময় অমৃতলাল গাঁজা, গুলি ও চণ্ডুতে সিদ্ধ ছিলেন এবং জপ-ধ্যানের নাম-গন্ধও জানতেন না। প্রথমে ঠাকুরের খুব অনিচ্ছা থাকলেও, নরেন্দ্রনাথের

একান্ত পীড়াপীড়িতে ঠাকুর তাঁর বক্ষস্থলে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করেন এবং সেই স্পর্শে অমৃতলাল কয়েক ঘণ্টার মত সমাধিস্থ হয়ে যান। এরপর থেকেই তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসে এবং তিনি সকল প্রকার নেশা ত্যাগ করে ঠাকুরের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। পরবর্তীকালে ঠাকুরের কাছে সঙ্গীত প্রেমিক অমৃতলাল যাতায়াত সুরু করেন এবং ঠাকুরের পরম স্নেহ ও কৃপা লাভ করে তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেন।

ঠাকুরের পরম অনুরাগীরূপে তিনি প্রথমযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-ধর্মপ্রচারে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করেছিলেন এবং বহু ভক্তকে ঠাকুরের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, অমৃতলাল তাঁর অস্থি নিয়ে জপের মালা তৈরী করে নিয়মিত জপ করতেন। সে সময় কলকাতার গান-বাজনার আখ্ড়ায় তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি রেখে পূজা করাতেন এবং কাঁকুড়-গাছির যোগোদ্যানে ঠাকুরের সমাধি দিবস উপলক্ষে ঐ দলগুলির দ্বারা গান গাওয়াতেন।

*

বীণাবাদক মহেশচন্দ্র সরকার

কাশীর প্রসিদ্ধ বীণাবাদক ও ঈশ্বর প্রেমিক। একদা ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকদিনের জন্য কাশীতে অবস্থান করেন এবং সেই সময় তাঁর বীণার বাজনা শোনার খুব ইচ্ছা হয়। কাশীর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বীণাবাদক শ্রীমহেশচন্দ্র সরকারের মদনপুরা-পল্লীর বাড়ীতে ঠাকুর নিজেই বীণার বাজনা শোনার জন্য শুভাগমন করেছিলেন এবং মহেশচন্দ্র তাঁকে অপূর্ব বীণা-বাজনা শুনিয়েছিলেন। বীণাটির তৎকালীন মূল্য ছিল দু'হাজার টাকা এবং সেদিন মহেশচন্দ্র সেই মূল্যবান বীণার কানাড়া রাগ (মতান্তরে আশোয়ারী রাগ) বাজিয়েছিলেন। বীণার মধুর ঝঙ্কার শোনামাত্রই ঠাকুর সেখানে ভাবাবিষ্ট হন এবং মাঝে মাঝে বীণার সুরের সঙ্গে নিজের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি গান করেন। বিকাল পাঁচটা থেকে রাত আটটা অবধি তিনঘণ্টা ঠাকুর সেখানে আনন্দের সঙ্গে বীণার বাজনা শুনে ফিরে আসেন এবং ঠাকুরের এই উপস্থিতি মহেশচন্দ্রের মনে বিশেষ রেখাপাত করে। এরপর ঠাকুর যে-কদিন কাশীতে ছিলেন, মহেশচন্দ্র প্রতিদিন তাঁকে দর্শন করতে যেতেন এবং তাঁর পূত সঙ্গ উপভোগ করতেন। মহেশচন্দ্রের বাজনা সম্পর্কে ঠাকুর পরে ভক্তদের কাছে ব'লেছিলেন যে, বীণা বাজাবার সময় মহেশচন্দ্র মত্ত হয়ে উঠতেন।

পরবর্তীকালে কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ ঠাকুরের কয়েকজন ভক্ত কাশীতে ভ্রমণকালে বীণাবাদক মহেশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ঠাকুরকে যে-বাজনা শুনিয়ে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন, তাঁর কাছে সেই রাগের বাজনা শুনে তাঁরাও তৃপ্ত হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে পরবর্তীকালে কাশীতে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মহেশচন্দ্রের ভাগ্নে শ্রীপ্রমোদদাস মিত্রের খুব হৃদ্যতা জন্মেছিল এবং প্রমোদদাসও ভাল বীণা বাজাতে পারতেন। বলা আবশ্যক যে শেষজীবনে ঈশ্বর প্রেমিক মহেশচন্দ্র ঈশ্বরের জন্য অনশন করে জীবন ত্যাগ করেন।

※

মৃদঙ্গবাদক রাইচরণ দাস

কামারপুকুরের কিছুদূরে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামের অধিবাসী বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদা ভাগ্নে হৃদয়ের বাড়ী শিহড়গ্রামে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেলে, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি চারপাশের নানা গ্রাম থেকে দলে দলে লোক তাঁর কাছে আসত এবং সেখানকার বৈষ্ণবেরা তাঁকে কীর্তন শুনিয়ে আনন্দ দান করতেন। এই কীর্তন উপলক্ষেই প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক রাইচরণ, ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁকে নিজের অপূর্ব মৃদঙ্গবাদন শোনাবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। পরমগুণী রাইচরণের অনবদ্য মৃদঙ্গবাদন শুনলেই ঠাকুরের ভাবাবেশ হত।

※

খোলবাদক শিশু সুরেশ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট গৃহীভক্ত নবগোপাল ঘোষের ৫।৬ বছরের প্রথম শিশুপুত্র। জন্মাবধি তার এমনই তাল-জ্ঞান ছিল যে, সে অতি অল্প বয়সেই কীর্তন গানের সঙ্গে সুন্দরভাবে খোলের বাজনা বাজাতো এবং সেই শিশুটির খোলের বাজনা শুনে সবাই মুগ্ধ হত। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ঠাকুর প্রথমদিকে নবগোপালকে নিত্য কীর্তন করার উপদেশ দিলে, নবগোপাল প্রায় তিন বৎসর প্রত্যহ নিজ পরিবারের বালক-বালিকাদের নিয়ে খোল-করতাল সহ নিজ বাড়ীতে কীর্তন করতেন এবং এই শিশু পুত্রটি তখন থেকেই খোল-বাজনায় নিযুক্ত থাকতো। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও এই শিশু সুরেশের খোলের বাজনা অনেকবার শুনেছেন এবং পরম আনন্দ লাভ করেছেন। সুরেশ, ঠাকুরের খুব প্রিয় ছিল এবং তাঁর স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিল।

খোলবাদক গোপীদাস

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত জনৈক খোলবাদক। দক্ষিণেশ্বরে সংকীর্তনাদিতে তিনি মাঝে মাঝে খোল বাজাতেন—কখনো কখনো ঠাকুরের কীর্তন গানের সময়েও তিনি খোল বাজাবার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

*

পাখোয়াজবাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং স্বামী-বিবেকানন্দের বাল্য বন্ধু। উত্তম পাখোয়াজবাদক হিসাবে তিনি খ্যাত ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে স্বামীজী (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ) যখন ধ্রুপদ গান গাইতেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁর সঙ্গে সতীশচন্দ্রই পাখোয়াজ সঙ্গত করতেন। এই সঙ্গত-করা উপলক্ষেই সতীশচন্দ্র, ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং ভক্ত ঈশানচন্দ্রের পুত্ররূপে ঠাকুরের বিশেষ স্নেহলাভ করে ধন্য হন।

পরবর্তীকালে, সতীশচন্দ্র গাজীপুরে সরকারী আফিম ডিপার্টমেণ্টে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকলেও, ঠাকুরের সন্তান এবং বাল্যবন্ধু স্বামীজীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং "সন্ন্যাস" গ্রহণের পরেও স্বামীজী তাঁর গাজীপুরের বাসস্থানে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলেন ও সেখানে বিখ্যাত "পওহারী বাবা"র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

*

যাত্রাশিল্পী "বিদ্যা-অভিনেতা"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত গৌরবর্ণ যুবক এবং যাত্রাশিল্পী। "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রাভিনয়ে তিনি "বিদ্যা" ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করায়, সাধারণতঃ তিনি "বিদ্যা-অভিনেতা" রূপেই পরিচিত ছিলেন; তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায়নি। অল্প বয়সে তাঁর একটি কন্যার মৃত্যু হওয়ায়, তিনি একটু উদাসভাবে থাকতেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে তাঁর যাত্রায় সুন্দর অভিনয় দেখে, ঠাকুর খুব খুসী হন। যাত্রার শেষে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে, ঠাকুর তাঁর সঙ্গে আনন্দে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন এবং বহু উচ্চস্তরের আলোচনা করেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁর অন্তরের আগ্রহ দেখে, ঠাকুর তাঁকে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন।

*

যাত্রাগায়ক নীলকণ্ঠ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত এবং উচ্চদরের যাত্রাওয়ালা। জীবদ্দশা ১৮৬১ থেকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর পূরানাম নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর জন্মস্থান বর্ধমান জেলার ধরণীগ্রাম। তৎকালীন বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারীর দলে তিনি পূর্বে যাত্রা করতেন এবং পরে তিনি নিজেই যাত্রাদলের মালিক হয়েছিলেন। যাত্রাগান উপলক্ষেই নীলকণ্ঠ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন।

দক্ষিণেশ্বরে বা অন্য ভক্তগৃহে নীলকণ্ঠের যাত্রাগান হবে শুনলেই ঠাকুর সেখানে যেতেন এবং তাঁর গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। নীলকণ্ঠের গান শুনে মাঝে মাঝে ঠাকুর সমাধিস্থও হতেন, আবার ভাবে নৃত্যও করতেন। একদা কলকাতার হাটখোলার বারোয়ারী তলায় ঠাকুর, নীলকণ্ঠের "কৃষ্ণযাত্রা" শুনতে গেলে, ঠাকুরের আগমনবার্তা পেয়েই নীলকণ্ঠ সসম্ভ্রমে ঠাকুরকে নিয়ে নিজের কাছে বসিয়ে যাত্রাগান শোনান ; কিন্তু গান শুনেই ঠাকুর দাঁড়িয়ে উঠে সেখানে সমাধিস্থ হন এবং তাঁর সেই মনোহর মূর্তি দর্শন করার জন্য শ্রোতাগণ দলে দলে এগিয়ে এলে, সেদিনের যাত্রাগান বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর রাধাকৃষ্ণ নাম কীর্তন করে নীলকণ্ঠ, ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ করেন।

ভক্ত নীলকণ্ঠ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে "সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ" জ্ঞানে আন্তরিক ভক্তি করতেন এবং তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করতেন। যাত্রাগান ছেড়ে মুক্তি লাভের জন্য একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নীলকণ্ঠ প্রার্থনা জানালে, ঠাকুর তাঁকে যাত্রাগান ত্যাগ করতে নিষেধ করেন এবং লোকশিক্ষা ও লোকের মঙ্গলের জন্য যাত্রাগানে নিযুক্ত থাকতে নীলকণ্ঠকে উপদেশ দেন। নীলকণ্ঠ তাঁর আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হন।

*

পাঁচালীগায়ক শিবু আচার্য

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য বিখ্যাত পাচালী গায়ক। পাচালী গান উপলক্ষেই তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। একদা ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল আলমবাজারে শিবুর পাচালী গান শুনে এসে ঠাকুরের কাছে প্রশংসা করায়, ঠাকুর শিবুর গান শোনার জন্য খুব ব্যগ্র হন। এর কিছুদিন পরে শিবু দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মা-কালী দর্শনে এলে, রামলাল শিবুকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে হাজির হন। ঠাকুরের অতিশয় আগ্রহে শিবু সেদিন ঠাকুরকে কয়েকটি গান শোনালে, ঠাকুর তাঁর গান শুনে নয়নজলে ভাসতে থাকেন।

পরবর্তীকালে শিবু পুনরায় সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে পাঁচালী গান শোনান্ ও তাঁর শ্বশুরবাড়ী ভদ্রকালী গ্রামে একবার কৃপা করে যাওয়ার জন্য ঠাকুরের কাছে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। ভক্তবৎসল ঠাকুর শিবুর অনুরোধে রাজী হলে, নির্ধারিত দিনে শিবু সপার্ষদ ঠাকুরকে পতাকা সজ্জিত পানসী নৌকায় চড়িয়ে দক্ষিণেশ্বরের অপর পারে ভদ্রকালী গ্রামে নিজের শ্বশুববাড়ীতে নিয়ে যান এবং ঠাকুরকে বিশেষ অভ্যর্থনা করেন। ভাগ্যবান শিবু, ঠাকুরকে ভদ্রকালীতে আনতে পারায় কৃতার্থবোধ করেন।

*

চণ্ডীগায়ক রাজনারায়ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত বিখ্যাত চণ্ডীগায়ক। তিনি দক্ষিণেশ্বরে উৎসবাদিতে চণ্ডীর গান গাইতেন এবং ঠাকুর তাঁর গান শুনে বিভোর হতেন। রাজনারায়ণের দুই পুত্র তাঁর সহ গায়ক হিসাবে যোগদান করতেন এবং তাঁদের গানের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঠাকুর নিজেও আনন্দ সহকারে কণ্ঠ মেলাতেন।

*

চণ্ডীগায়ক শম্ভু

প্রখ্যাত চণ্ডীগায়ক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একবার মনে সাধ জাগে যে, তিনি শম্ভুর "চণ্ডীর গান" শুনবেন। দক্ষিণেশ্বরে সত্যই একদা শম্ভুর চণ্ডীর গানের ব্যবস্থা হওয়ায়, ঠাকুরের সেই ইচ্ছাপূর্ণ হয় এবং তিনি খুব আনন্দিত হন।

*

কীর্তনীয়া মনোহর সাঁই গোস্বামী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, তৎকালীন প্রখ্যাত-নামা কীর্তনীয়া। কীর্তন-গান উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে কয়েকবার তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে, কলকাতার হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় এবং ভক্ত অধরলাল সেনের বাড়ীতে ঠাকুর বহুবার মনোহরের কীর্তন শুনে ভাবাবিষ্ট হয়েছেন এবং নিজে তাঁর কীর্তনে যোগদান করে নৃত্যও করেছেন। ঠাকুরের মহাভাব দর্শন করে একদা মনোহর, বিষয়-বুদ্ধি ঘুচিয়ে দেবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন।

তাতে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন—"তুমি এতবড় রসিক তোমার ভেতর থেকে মিষ্টরস বেরুচ্ছে"। বলা বাহুল্য, মনোহর ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।

*

কীর্তনীয়া নরোত্তম

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত বিখ্যাত কীর্তনীয়া। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে কীর্তনগান শুনিয়ে তিনি ধন্য হন। তাঁর মধুর কীর্তনগান শুনে একদা ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং কীর্তনান্তে নরোত্তমকে কীর্তন-গানে উৎসাহ দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন।

*

কীর্তনীয়া বৈষ্ণবচরণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, তদানীন্তনকালের প্রখ্যাত কীর্তনীয়া। কীর্তনগান উপলক্ষেই কয়েকবার ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। ভক্ত বলরাম বসু, ভক্ত অধরলাল সেন প্রভৃতি ঠাকুরের অনুরাগীদের বাড়ীতে তিনি কয়েকবার কীর্তনগান করায়, ঠাকুর তাঁর কীর্তন শুনে মুগ্ধ হন। বৈষ্ণবচরণের গানে ঠাকুরের সমাধি হত; আবার ভাবাবেগে তিনি নৃত্যও করতেন। ঠাকুর তাঁর মুখে এই বিশেষ গানটি শুনতে ভালবাসতেন—

"দুর্গানাম জপো সদা রসনা আমার;
দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার।"

একদা ভক্ত অধরলালের বাড়ীতে বৈষ্ণবচরণের কীর্তন শুনে ঠাকুর এমন মেতে ওঠেন যে, দুই বাহু প্রসারিত করে নিজেই কীর্তনে আখর দিতে থাকেন এবং উদ্দাম নৃত্য করতে থাকেন। সেদিন ঠাকুরের এই অপূর্ব নৃত্য দেখে উপস্থিত ভক্তেরা—এমনকি নরেন্দ্রনাথও (স্বামী বিবেকানন্দ) আর স্থির থাকতে না পেরে ঠাকুরের সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন। বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করতেন।

*

কীর্তনীয়া কেশব

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া। কীর্তনগান উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। একদা ভক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কেশব, ঠাকুরকে কীর্তন শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। সেদিন

ঠাকুর কেশবের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন এবং কর্তা, কর্মফল, সিদ্ধিলাভ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে কেশবকে শুনিয়ে তিনি তাঁকে কৃতার্থ করেন।

*

কীর্তনীয়া গোপাল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া। শিহড়গ্রামে কীর্তন উপলক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। একদা ভাগ্নে হৃদয়ের বাড়ী শিহড়-গ্রামে ঠাকুরের কয়েকদিন অবস্থানের সময়, শিহড়ের পাশে মেমানপুর গ্রামে গোপালের কীর্তন গান হয় এবং ঠাকুরকে সেখানে নিয়ে গিয়ে গোপালের অপূর্ব কীর্তন শোনাবার জন্য গ্রামবাসী ভক্তেরা সচেষ্ট হন। ঠাকুর তখন গোপালের খবর নেওয়ার জন্য ভাগ্নে হৃদয়কে মেমানপুর পাঠালে, ঠাকুরের নাম শুনেই গোপাল নিজেই দলবলসহ সেই রাত্রেই শিহড়গ্রামে চলে আসেন এবং ঠাকুরকে প্রণাম করে কীর্তনগান সুরু করেন। ঠাকুর গোপালের ভক্তির পরিচয় পেয়ে এবং তাঁর মধুর কীর্তনগান শুনে আনন্দিত হন এবং নিজেও সেই গানের সঙ্গে আখর দিতে থাকেন। ভক্ত গোপালের কীর্তন শুনে ঠাকুর সেদিন সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

*

কীর্তনীয়া বেনোয়ারী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত জনৈক সাধারণ কীর্তনীয়া। একদা ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে ৺রথযাত্রার দিনে ঠাকুর সেখানে অবস্থান করার সময়, বলরাম সেইবারে বেনোয়ারীর কীর্তনের ব্যবস্থা করেন এবং সেই আসরে ঠাকুরও উপস্থিত থাকেন। কিন্তু কীর্তন গাওয়ার সময় বেনোয়ারী নানাপ্রকার ঢং করায় শ্রোতারা বিরক্ত হন, কেউ বা আবার হাসতে থাকেন। সেদিন বেনোয়ারীর কীর্তনে ঠাকুরের মনে কোন প্রকার রেখাপাত না করায়, ঠাকুর কীর্তন ফেলে বাড়ীর বারান্দায় রথ টানতে চলে গিয়েছিলেন।

*

কীর্তনীয়া শ্যামদাস

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত তৎকালীন প্রখ্যাত কীর্তনীয়া। তাঁর নিজস্ব একটি কীর্তন-সম্প্রদায় ছিল। একদা দক্ষিণেশ্বরে শ্যামদাসের "মাথুর" কীর্তন শুনে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন।

কীর্তনীয়া ধনঞ্জয় দে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত শিহড় গ্রামের নিকটবর্তী রামজীবনপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া। একদা ঠাকুর তাঁর ভাগ্নে হৃদয়ের বাড়ী শিহড়গ্রামে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেলে, কামারপুকুরের কিছুদূরে বেল্‌টেগ্রামে বৈষ্ণব ভক্ত নটবর গোস্বামী তাঁর বাড়ীতে ঠাকুরকে নিয়ে যান এবং উত্তম কীর্তন শোনাবার ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষে নটবর, রামজীবনপুর গ্রাম থেকে ঐ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া ধনঞ্জয়কে আনিয়ে ঠাকুরকে কীর্তন শোনান এবং তাঁর মধুর কীর্তন শুনে ঠাকুর বিশেষ আনন্দ পান।

*

গায়ক ভূপতিচরণ চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত সুগায়ক ভক্ত। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং ঠাকুরকে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের গান শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন। বহুবার ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভ করে ভূপতিচরণ তাঁর ভক্তরূপে পরিণত হন। ভূপতিচরণের গান শুনে ঠাকুরের সমাধি হত, আবার তাঁর গানেই ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হত।

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যখন গায়ে তেল মাখছিলেন, তখন সহসা কলকাতা থেকে ভূপতিচরণ এসে সেখানে হাজির হন এবং একটি উচ্চ ভক্তিমূলক গান গাইতে সুরু করেন। সেই গান শুনেই ঠাকুরের ভাবাবেশ হয় এবং তিনি ভূপতিচরণের কাঁধের ওপর শ্রীচরণ তুলে তাঁকে কৃপা করেন।

ঠাকুরের সঙ্গে বরাবর যোগাযোগ থাকায়, কাশীপুরে ঠাকুরের "কল্পতরু" হওয়ার দিনেও ভাগ্যবান ভূপতিচরণ উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর কৃপালাভ করেছিলেন। সেদিন ভূপতিচরণ ঠাকুরের কাছে সমাধি প্রার্থনা করায়, "তোর সমাধি হবে" বলে ঠাকুর ভূপতিচরণকে আশীর্বাদও করেছিলেন।

*

গায়ক কালীকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গায়ক-বন্ধু এবং ঠাকুরের অনুরাগী। তিনি বন্ধু ভবনাথের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করায়, ঠাকুরের স্নেহলাভে ধন্য হন। একদা দক্ষিণেশ্বরে ভক্তগণ কর্তৃক ঠাকুরের জন্মোৎসব পালনের দিনে কালীকৃষ্ণ যোগদান করেন এবং ভবনাথের সঙ্গে ঠাকুরকে গান গেয়ে শোনান। কালীকৃষ্ণের গান শুনে সেদিন ঠাকুর ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন।

গায়ক রামতারণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, ভাগ্যবান গায়ক-ভক্ত। তিনি নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের থিয়েটারে গান গাইতেন। শ্যামপুকুরে অবস্থান-কালে অসুস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনাবার জন্য, গিরীশচন্দ্র গায়ক রাম-তারণকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান এবং এই উপলক্ষে রামতারণ তাঁর পূতসঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সেদিন রামতারণ গিরীশচন্দ্র-রচিত কয়েকখানি ভক্তিমূলক গান গেয়ে ঠাকুরকে শোনান এবং ভক্ত-গায়কের গান শুনে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন।

*

গায়ক তারাপদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে ঠাকুরের অবস্থানকালে তিনি একদা নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র প্রমুখ অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে সেখানে ঠাকুরের কাছে যান এবং তাঁর সঙ্গলাভের আনন্দ উপভোগ করেন। সেই সময় গায়ক হিসাবে তাঁর পরিচয় জানতে পেরে ঠাকুর তাঁর গান শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে, তারাপদ ঠাকুরকে গিরীশচন্দ্রের প্রখ্যাত "কেশব কুরু করুণা দীনে" গানটি শুনিয়ে মুগ্ধ করেন। ঠাকুরের অনুরোধে তারাপদ সেদিন তাঁকে আরো অনেকগুলি ভজন-কীর্তন গেয়ে শোনান এবং ঠাকুর তাঁর গানের প্রশংসা করেন।

*

গায়কদ্বয় নেড়ে-উড়ে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত দুইবন্ধু। কলকাতার মাণিকতলায় রেলের পুলের কাছে তাঁদের বাড়ী ছিল। বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে ঠাকুরের অবস্থানকালে এই দুই বন্ধু মাঝে মাঝে একসঙ্গে ঠাকুরের কাছে আসতেন এবং দুজনে মিলে একতারা বাজিয়ে ঠাকুরকে ভজন গান শুনিয়ে চলে যেতেন। তাঁরা খুব বিনয়ী ও ঠাকুরের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন। এই দুই ভক্ত-গায়কদের নিয়ে ঠাকুরের অপর ভক্তগণ খুব আনন্দ উপভোগ করতেন। তাঁদের একজনের মাথায় ঝাঁকড়া চুল ও মুখে দাড়ী ছিল; অপর জনের মাথায় টাক ও মুখের দাড়ী কামানো থাকত। তাই ভক্ত বলরাম বসু ব্যঙ্গ করে তাঁদের নাম দিয়েছিলেন—"নেড়ে-উড়ে" এবং এই নামেই তাঁরা ভক্তগণের কাছে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের প্রকৃত নাম জানা যায়নি।

কোন্নগরের গায়ক

হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী জনৈক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়ক (নাম অজ্ঞাত)। একদা তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনাতে আসেন; সেদিন সেখানে নরেন্দ্রনাথও (স্বামী বিবেকানন্দ) উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরের কাছে তিনি কালোয়াতী গান গাওয়ার পর নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গান বাজনা সম্পর্কে ঘোরতর তর্ক হয় এবং ঠাকুর তা উপভোগ করেন। এরপর নরেন্দ্রনাথ নিজে ঠাকুরকে কয়েকখানি গান শোনালে, ঠাকুর পুনরায় সেই গায়ককে বিনীতভাবে আনন্দময়ী মায়ের নামগান করতে বলেন এবং গায়কটি রাগিণী আলাপ করে "মম বারণ" গানটি করেন। ঠাকুর তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে বলেন—"এতেও আনন্দ হয়।"

*

বেলঘোরিয়ার গায়ক

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জনৈক অজ্ঞাতনামা ভক্ত গায়ক। ঠাকুর যেদিন বেলঘোরিয়ায় ভক্ত গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে শুভাগমন করেন, সেদিন উক্ত গায়ক সেখানে "জাগো জাগো জননী" গানটি গাইলে, ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং গায়কের খুব প্রশংসা করেছিলেন। পরে সেই গায়কটিকে গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরেও ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে গান শোনান। গায়কের গান শুনে আনন্দিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, সেদিন হঠযোগ, রাজযোগ, ষড়চক্রভেদ, সমাধি প্রভৃতি বিষয়ে অবিশ্রান্ত আলোচনা দ্বারা গায়ক এবং অন্যান্য ভক্তদের ধন্য করেছিলেন।

*

সপ্তম স্তবক

কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন

কলকাতা কুমারটুলী নিবাসী পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ভারত বিখ্যাত কবিরাজ। চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের প্রথম অবস্থায় ঠাকুরের শরীরে ও মনে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায়, রাণী রাসমণির জামাতা ও ঠাকুরের পরম ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের আহ্বানে ঠাকুরের চিকিৎসার ভার গঙ্গাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। এই সময় দীর্ঘদিন চিকিৎসা করার ফলে গঙ্গাপ্রসাদ, আধ্যাত্মিকতায় পুষ্ট ঠাকুরের শারিরীক ও মানসিক লক্ষণগুলির প্রত্যক্ষ সাক্ষী হন এবং তাঁর দৈহিক দৈবক্রিয়াগুলির সম্যক পরিচয় লাভ করেন। কিন্তু শত চেষ্টাতেও তিনি কবিরাজীমতে, চিকিৎসাশাস্ত্রের আয়ত্বের বাইরে, ঐ অস্বাভাবিক ক্রিয়াগুলি নিরাময় করতে ব্যর্থ হন এবং ঠাকুরের তথাকথিত রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে. গঙ্গাপ্রসাদ তাঁর চিকিৎসা বন্ধ করেন এবং ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদের অভিমত অনুযায়ী এটী যোগজ-ব্যাধি বলে ঘোষণা করেন। অন্য সময়েও ঠাকুরের রক্ত আমাশয় রোগে, গঙ্গাপ্রসাদ তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন এবং গঙ্গাপ্রসাদের বাড়ীতেও ঠাকুরের কয়েকবার শুভাগমন হয়েছিল। চিকিৎসাজগতে গঙ্গাপ্রসাদকে ঠাকুর "ধন্বন্তরী"রূপে জ্ঞান করতেন এবং গঙ্গাপ্রসাদের নির্দেশগুলিকে ঠাকুর ঈশ্বরীয় নির্দেশরূপে গ্রহণ করতেন।

পরবর্তীকালে, ঠাকুর যখন কঠিন কণ্ঠরোগে পীড়িত হয়ে কলকাতায় ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য অবস্থান করছিলেন, তখন ভক্তদের প্রচেষ্টায় পুনরায় গঙ্গাপ্রসাদকে ঠাকুরের চিকিৎসা করার জন্য আনা হয়। গঙ্গাপ্রসাদ সেই সময় অনেকগুলি অভিজ্ঞ কবিরাজসহ ঠাকুরের কণ্ঠরোগ বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন এবং রোগটি দুরারোগ্য বলে ভক্তদের কাছে অভিমত প্রকাশ করেন। এই সময় ঠাকুর স্বয়ং গঙ্গাপ্রসাদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন—ক্যান্সার অসুখ সারবে কিনা! দুঃখিত গঙ্গাপ্রসাদ, ঠাকুরের এই প্রশ্নে নীরব থাকায়, ঠাকুর রোগের ভবিষ্যৎ ফলাফল অনুমান করে নিয়েছিলেন।

*

কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পাল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য পরমভক্ত, সিঁথি নিবাসী কবিরাজ। ঠাকুরের প্রতি মহা আকর্ষণে তিনি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং তাঁর পূতসঙ্গ লাভ করে শান্তি পেতেন। ঠাকুরও ভক্ত মহেন্দ্রনাথকে পেলে সহসা কাছ ছাড়া করতে চাইতেন না এবং তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে আনন্দ পেতেন।

ঠাকুর মহেন্দ্রনাথকে "মহিন্দর" বলে ডাকতেন এবং মহেন্দ্রনাথও ঠাকুরকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করতেন। ঠাকুরকে সেবা করার জন্য তিনি সব সময় সচেষ্ট থাকতেন এবং একবার ঠাকুরের পা ফুলতে থাকায় তিনি কবিরাজীমতে ঠাকুরের চিকিৎসাও করেছিলেন।

একদা মহেন্দ্রনাথ ভক্তিস্বরূপ ঠাকুরের সেবার জন্য পাঁচটি টাকা গোপনে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রামলালের কাছে পরে সে কথা জানতে পেরে ঠাকুর প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতায় রাত কাটান এবং পরেরদিন ভোরেই সে টাকা মহেন্দ্রনাথকে ফেরৎ পাঠিয়ে তবে শান্তি পান।

এখানে বলা আবশ্যক, মহেন্দ্রনাথই প্রথম সিঁথি থেকে শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ, তথা বুড়ো-গোপালকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায় ঠাকুরের সঙ্গে বুড়ো-গোপালের আধ্যাত্মিক যোগাযোগের ফলে, পরবর্তীকালে তিনি ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান "স্বামী অদ্বৈতানন্দ"রূপে অভিহিত হন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঠাকুরের ব্যবহৃত একজোড়া পাদুকা, ভক্ত মহেন্দ্রনাথের কাছে রক্ষিত থাকায়, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি ঐ পাদুকা পূজা করা স্থরু করেন এবং বর্তমানে বরানগরে "শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদুকা-ভবনে" উহার নিয়মিত পূজা হয়।

*

কবিরাজ ঈশানচন্দ্র মজুমদার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী বরানগর নিবাসী কবিরাজ। তিনি ছিলেন কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভগ্নীপতি। বরানগরে ঈশানচন্দ্রের বাড়ীতে কয়েকদিন অবস্থানকালে মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ তাঁর ভাগ্নে-সম্পর্কীয় সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন। ঈশানচন্দ্র পূর্ব থেকেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং মাঝে মাঝে কবিরাজীমতে ঠাকুরের চিকিৎসাও করতেন। ঠাকুরের সঙ্গে ঈশানচন্দ্রের খুব হৃদ্যতা থাকায়, ঠাকুর বরানগরে তাঁর বাড়ীতেও শুভাগমন করেছিলেন।

*

কবিরাজ শশীভূষণ সান্যাল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত ও পরম সাধক। হাওড়া জেলার বালীগ্রাম নিবাসী শশীভূষণ ছিলেন সদ্‌বংশীয় ব্রাহ্মণ, পরম পণ্ডিত এবং প্রখ্যাত কবিরাজ। বাল্যকালে তিনি স্বামী শিবরামানন্দ নামক গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু পরে সাধক-জীবনে আশানুরূপ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি না হওয়ায়, তিনি হতাশ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে শশীভূষণ পরম ব্যাকুলতায় ঠাকুরের শ্রীচরণ নিজবক্ষে কিছুক্ষণ ধারণ করার পরেই তাঁর অন্তর দিব্য আনন্দে পূর্ণ হয় এবং এই কৃপালাভের পর থেকেই তিনি ঠাকুরের পরমভক্তে পরিণত হন। ঠাকুরের উপদেশে তিনি দরিদ্র রোগীদের কাছ থেকে কবিরাজী পেশায় আর অর্থ গ্রহণ করতেন না, অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থও উপার্জন করতেন না। বালীতে ৺কল্যাণেশ্বর শিব দর্শনের পর একদা ঠাকুর ভক্ত শশীভূষণের বালীগ্রামের বাড়ীতেও স্বেচ্ছায় শুভাগমন করেছিলেন এবং তাঁর নিষ্ঠাচারে প্রীত হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে, শশীভূষণের আধ্যাত্মিক জীবন আরও উন্নত হয় এবং তার নিজস্ব একটি শিষ্যমণ্ডলী গড়ে ওঠে। কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—এই তিন যোগের ওপর শশীভূষণের অসামান্য অধিকার থাকায়, শিষ্যগণ কর্তৃক তিনি "স্বামী যোগত্রয়ানন্দ" নামে অভিহিত হন।

*

কবিরাজ নবীন পাল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, বাগবাজার নিবাসী অভিজ্ঞ ও প্রবীণ কবিরাজ। চিকিৎসা উপলক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর কয়েকবার যোগাযোগ হয়। শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য ভক্তেরা নবীনকে নিযুক্ত করেন এবং তিনিও কিছুদিন অসুস্থ ঠাকুরের চিকিৎসা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যথাসাধ্য চেষ্টা করেও তিনি ঠাকুরের কণ্ঠরোগ নিবারণে বিফল হন।

*

নবগোপাল কবিরাজ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত কলকাতার জনৈক অভিজ্ঞ কবিরাজ। ঠাকুরের চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি তাঁর কাছে আসার সুযোগ লাভ করেছিলেন। ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে একদা প্রখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের সঙ্গে তিনি ঠাকুরের কণ্ঠ রোগ পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া, কাশীপুরে ঠাকুরের অসুখ বাড়াবাড়ি শুনে, একদিন গভীর রাত্রে ঠাকুরের পরমভক্ত নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষ তাঁকে নিয়ে সত্বর কাশীপুরে হাজির হয়েছিলেন এবং তিনি ঠাকুরের সাময়িক চিকিৎসা করেছিলেন

*

দ্বারিকানাথ কবিরাজ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত কলকাতার জনৈক অভিজ্ঞ কবিরাজ। ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে একদা প্রখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের সঙ্গে তিনি ঠাকুরের কণ্ঠ রোগ পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন।

*

গোপীমোহন কবিরাজ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত কলকাতার জনৈক অভিজ্ঞ কবিরাজ। ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে একদা প্রখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের সঙ্গে তিনি ঠাকুরের কণ্ঠ রোগ পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন।

*

রাম কবিরাজ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, নাটাগড়ের স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ কবিরাজ। চিকিৎসা উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। একদা দক্ষিণেশ্বরে কঠিন পেটের ব্যারামে ঠাকুর খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায়, রাম কবিরাজকে তাঁর চিকিৎসার জন্য আনা হয়। ঠাকুরের মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা এবং তৎসহ সরা সরা মলত্যাগের ফলে, ঠাকুর সে সময় খুব দুর্বল হয়ে পড়লেও ঈশ্বরীয় কথায় তাঁর কোন বিরাম ছিল না। ঠিক এই অবস্থায় রাম কবিরাজ এসে, ঠাকুরকে ভক্তগণের মাঝে বসে বিচার করতে ও ধর্মোপদেশ দিতে দেখে বিস্মিত হন এবং বলেন—"এ কি পাগল! দুখানা হাড় নিয়ে বিচার করছে!" বলা আবশ্যক, রাম কবিরাজ সে-যাত্রায় ঠাকুরকে সুস্থ করেছিলেন।

বিশ্বনাথ কবিরাজ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, আগড়পাড়া নিবাসী কবিরাজ। চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ পান। একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের বায়ু বৃদ্ধি রোগ হওয়ায়, বিশ্বনাথকে ঠাকুরের চিকিৎসার ভার দেওয়া হয় এবং তিনি সযত্নে কবিরাজীমতে ঠাকুরের চিকিৎসা করে তাঁকে নিরাময় করেন। ঠাকুর সে-সময় খুব তামাক খেতেন বলে, বিশ্বনাথ তাঁকে ছিলিমের ওপর ধনের চাল ও মৌরী দিয়ে তামাক খেতে বলায়, ঠাকুর তাঁর নির্দেশ পালন করেছিলেন।

*

গোপাল কবিরাজ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী। তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত এবং চিকিৎসা বিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিলেন। দাবাবোড়ে খেলাতেও তিনি নিপুণ ছিলেন। ভক্ত বলরাম বসুর বাগবাজারের বাড়ীর নিকট-প্রতিবেশী হিসাবে তিনি বলরামের বাড়ীতে বহুবার ঠাকুরকে দর্শন করেন এবং তাঁর পূতসঙ্গলাভ করে তাঁর ভক্তে পরিণত হন। বলরাম ছাড়াও নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রমুখ ঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদগণের সঙ্গেও তাঁর খুব হৃদ্যতা ছিল।

*

দাড়ীওয়ালা ডাক্তার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, কলকাতার জনৈক ডাক্তার। সাময়িক চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। ঠাকুরের শেষ অসুখের সময়, প্রথম অবস্থায় কিছুদিন তিনি শ্যামপুকুরে ঠাকুরের চিকিৎসা করেন। কিন্তু তাঁর চিকিৎসায় ঠাকুরের রোগ আরো বৃদ্ধি পাওয়ায়, তাঁর দ্বারা চিকিৎসা বন্ধ রাখা হয়। অতঃপর সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।

*

কালী ডাক্তার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত কলকাতার সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার এবং ভক্ত পুরুষ। উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ের কাছে তাঁর বাড়ী ছিল। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একজন অনুরাগী

ছিলেন এবং তাঁর শ্যামবাজারের বাড়ীতে শুভাগমন করে ঠাকুর তাঁকে কৃতার্থ করেছিলেন।

*

উপেন ডাক্তার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, কলকাতার জনৈক চিকিৎসক ঠাকুরের চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি তাঁর কাছে আসার সুযোগ লাভ করেছিলেন। একদা কাশীপুরে ঠাকুরের অসুখ বাড়াবাড়ি হওয়ার সংবাদ শোনামাত্রই ঠাকুরের পরমভক্ত নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষ সেদিন গভীর রাত্রে উপেন ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে সহসা ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন এবং উপেন ডাক্তার সেদিন ঠাকুরের সাময়িক চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন।

*

রামনারায়ণ ডাক্তার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী জনৈক চিকিৎসক ও পণ্ডিত। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যেতেন এবং তাঁর সঙ্গ উপভোগ করে আনন্দ পেতেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁর কিছু পাণ্ডিত্য থাকায় তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরের সঙ্গে তত্ত্বকথা নিয়ে আলোচনা করতেন এবং সেজন্য ঠাকুর তাঁকে স্নেহ করতেন। একদা তিনি ঠাকুরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়ে কিছু ভুল তর্ক করায়, ঠাকুর তাঁকে তিরস্কার করেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের দোষ দেখিয়ে দেন। এই ঘটনায় রামনারায়ণ ডাক্তার ক্রন্দন করতে করতে ঠাকুরের চরণ জড়িয়ে ধরে দীনতা প্রকাশ করেন।

*

রাখাল ডাক্তার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, কলকাতার বহুবাজার নিবাসী নামকরা চিকিৎসক। চিকিৎসা উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। দক্ষিণেশ্বরে কণ্ঠরোগে অসুস্থ ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য, ঠাকুরের পরম ভক্ত কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রাখাল ডাক্তারকে নিযুক্ত করেন। দোহারা চেহারা রাখাল ডাক্তারের হাতের আঙুলগুলি খুব মোটা মোটা ছিল; তাই ঠাকুরের গলার ভেতর সেই মোটা আঙুল ঢুকিয়ে রাখাল ডাক্তার যখন পরীক্ষা করতেন, তখন ঠাকুর খুব ভীত হয়ে পড়তেন। সেজন্য

রাখাল ডাক্তার ঠাকুরকে আশ্বাস দিয়ে খুব যত্ন সহকারে তাঁর গলার ভেতরে পরীক্ষা করতেন। তিনি প্রায়ই ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দেখতে যেতেন এবং অসুস্থ অবস্থাতেও কীর্তন শুনে ভাবাবস্থায় ঠাকুরকে নৃত্য করতে দেখে তিনি বিস্মিত হতেন। রাখাল ডাক্তারকে ঠাকুর খুব স্নেহ করতেন এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলেই ঠাকুর তাঁকে খুব আপ্যায়ন করতেন।

একদা রোগের কষ্টে ঠাকুর রাখাল ডাক্তারের জামায় বার বার হাত দিয়ে বালকের মত বলেন—"বাবু, বাবু! তুমি এইটে ভাল করে দাও।" বলা বাহুল্য, আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও রাখাল ডাক্তার ঠাকুরকে নিরাময় করতে পারেননি।

*

মধুসূদন ডাক্তার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, কলকাতার জনৈক প্রবীণ চিকিৎসক এবং খুব রসিক পুরুষ। তিনি ভক্তিজগতের লোক ছিলেন এবং ঠাকুরের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ঠাকুরেব হাত-ভাঙার চিকিৎসা উপলক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়।

একদা ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলার দিকে যাওয়ার সময় ঠাকুর রাস্তার পূবদিকে রেলিং-এ পা আটকে পড়ে যান এবং তাব ফলে প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর বাম হাতের হাড় সবে যায়। এই ভাঙ্গাহাতেব চিকিৎসার জন্য ভক্তগণ কর্তৃক মধুসূদন ডাক্তাবকে নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি ঠাকুরের হাতে বাড্-বাঁধা, ব্যাণ্ডেজ-কবা প্রভৃতি কাজের ভার গ্রহণ কবেন। কলকাতা থেকে নৌকায় করে দক্ষিণেশ্বরে এসে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং ঠাকুরও এই রসিক ডাক্তারেব সঙ্গে রসিকতা করে আনন্দ পেতেন। অসুস্থ ঠাকুরকে প্রত্যহ দেখতে আসার জন্য ভক্তদের অনুরোধ মধুসূদন ডাক্তার উপেক্ষা করতে পারতেন না এবং সেজন্য সব রকম অসুবিধা অগ্রাহ্য করে তিনি সাধ্যমত সেবা করতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে প্রখ্যাত যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠের যাত্রা-গানের আসরে মধুসূদন ডাক্তারের চোখে জলের ধারা দেখে, ঠাকুর একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং তাঁর ভক্তির প্রকাশ উপভোগ করেন।

*

দুকড়ি ডাক্তার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত কলকাতার জনৈক চিকিৎসক এবং ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী। একদা ভক্ত রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে ঠাকুর সমাধিস্থ

হলে, অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে দুকড়ি ডাক্তারও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঠাকুরের চোখে আঙুল প্রবেশ করিয়ে সমাধিস্থ অবস্থা পরীক্ষা করে ছিলেন; কারণ সমাধি কাকে বলে তিনি জানতেন না। অবশ্য এই ঘটনায় সেখানে উপস্থিত ভক্তেরা তাঁর ওপর বিরক্ত হয়ে ছিলেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বশতঃ দুকড়ি ডাক্তার শ্যামপুকুরে অসুস্থ ঠাকুরকে পরেও দেখতে যেতেন।

*

শ্রীনাথ ডাক্তার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, কলকাতার জনৈক বেদান্তবাদী চিকিৎসক। তিনি কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরকে দেখতে গিয়ে, তাঁর সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতেন। বেদান্তমতে "সব স্বপ্নবৎ" – একথা সংসারী লোকের পক্ষে ভাল নয় বলে ঠাকুর তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

*

ডাক্তার স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত এবং কলকাতার স্বনামধন্য চিকিৎসক। কলকাতার সিমলাপাড়া নিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের মাধ্যমে তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে ধন্য হন।

ঠাকুরের সম্পর্কে পূর্বে তাচ্ছিল্য মনোভাব সম্পন্ন কৈলাসচন্দ্রকে কাশীপুরে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য একদা রামচন্দ্র অনুরোধ করেন, তাতে কৈলাসচন্দ্র তাঁকে বলেন – "তোমার পরমহংস যদি ভাললোক হয়তো ভাল, নইলে তার কাণ ম'লে দেব।" রামচন্দ্রও কৈলাসচন্দ্রের এই সর্ত স্বীকার করে তাঁকে একদিন কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে পৌছে দিলে, কৈলাসচন্দ্র প্রথমে ঠাকুরের দোতলার ঘরে না গিয়ে উদ্যানের পুকুরের ধারে চাতালে বসে থাকেন। ঐ সময় বাড়িটির নীচের হলঘরে পাড়ার শিক্ষিত যুবক নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে, রামচন্দ্র দত্তের গৃহভৃত্য অশিক্ষিত লাটুকে (স্বামী অদ্ভূতানন্দ) একসঙ্গে বসে থাকতে দেখে, সুরুচিসম্পন্ন কৈলাসচন্দ্র মনে মনে ঘৃণা পোষণ করেন। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি ঠাকুরের ওপরের ঘর থেকে নেমে এসে পুকুরের ধারে কাকে খুঁজতে থাকেন এবং বলতে থাকেন যে, যিনি ঠাকুরের কাণ মলে দেবেন বলেছেন, তাঁকে ঠাকুর ডাকছেন। এই কথা শুনে কৈলাসচন্দ্র বিস্মিত হয়ে ভাবেন, কলকাতার সিমলা পাড়ায় ঘরের ভেতরে বসে তিনি যে-

কথা বলেছিলেন, সে-কথা কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুর কিভাবে জানতে পারলেন! যাইহোক, অপ্রতিভ কৈলাসচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ওপরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রণাম করেন এবং মনে মনে তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেন। এই ঘটনার পর থেকেই কৈলাসচন্দ্র ঠাকুরের প্রতি এত ভক্তিপরায়ণ হয়েছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে প্রণাম না করে ভক্ত কৈলাসচন্দ্র বাড়ী থেকে বার হতেন না। ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার পর থেকেই দাম্ভিক কৈলাসচন্দ্র সম্পূর্ণ নিরহঙ্কারে পরিণত হয়েছিলেন।

*

ডাক্তার শশীভূষণ ঘোষ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত এবং কলকাতার বাগবাজার নিবাসী চিকিৎসক। তিনি ভক্ত বলরাম বসুর প্রতিবেশী ছিলেন এবং বলরামের বাড়ীতে ঠাকুর এলেই তিনি বিশেষ অনুরাগবশতঃ প্রতিবারই সেখানে গিয়ে ঠাকুরের পূত সঙ্গ লাভ করে আনন্দ পেতেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা ছিল এবং তিনি বলরাম-মন্দিরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-মিশন সভার "আণ্ডার সেক্রেটারী" ছিলেন। পরবর্তীকালে শশীভূষণ ঠাকুরের একখানি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

*

ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগী এবং প্রবীণ ও প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথী-চিকিৎসক। তাঁর বিধবা কন্যার সঙ্গে স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বিবাহ হয়। ঠাকুরের চিকিৎসা উপলক্ষে বিহারীলাল ও তাঁর জামাতা প্রতাপচন্দ্র—উভয়েই ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

অসুস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে, স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে চিকিৎসা উপলক্ষে বিহারীলালও ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং তাঁর চিকিৎসা করতেন। এই চিকিৎসা উপলক্ষে ঠাকুরের কথামৃত পান করে এবং অদ্ভুত ভাবাবস্থা দর্শন করে বিহারীলাল মুগ্ধ হতেন। তিনি যেমন ঠাকুরের অনুরাগী ছিলেন, ঠাকুরও তেমনি তাঁর ঈশ্বর চিন্তা, শুদ্ধাচার প্রভৃতির জন্য খুব প্রশংসা করতেন। বলা বাহুল্য, বিহারীলাল, ঠাকুরের কণ্ঠ-রোগ সারাতে বিফল হন।

পূর্বে সুস্থ অবস্থায় একদিন বিহারীলালের কলকাতার বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে

গাড়ী করে ঠাকুর যখন তাঁর জনৈক ভক্তের বাড়ীতে যাচ্ছিলেন, তখন বিহারীলাল তাঁকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে সসম্ভ্রমে তাঁর বাড়ীতে ঠাকুরকে কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে যাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

*

ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অনুরাগী এবং স্বনামধন্য প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক। জীবদ্দশা ১৮৬১ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ; জন্মস্থান নদীয়া জেলার চাপড়া গ্রাম। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা সত্ত্বেও তিনি এ্যালোপাথীর বদলে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে হোমিওপ্যাথী-কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আমেরিকার চিকিৎসক মহাসভায় যোগদান করেন এবং নিজ গবেষণা ও বিদ্যার প্রভাবে সেখানে বিশেষ সম্মান লাভের দরুন, ঐ মহাসভার সহকারী-সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বিখ্যাত হোমিওপ্যাথী-চিকিৎসক ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ীর বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন এবং বিখ্যাত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি ও তাঁর শ্বশুর বিহারীলাল—উভয়েই ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র মজুমদার তাঁর পৌত্র।

অসুস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে, স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সহযোগী হিসাবে প্রতাপচন্দ্র, ঠাকুরের চিকিৎসা করেন এই সময় ঠাকুরের পূত সঙ্গ লাভ করে এবং তাঁর অদ্ভুত ভাবাবস্থা দর্শন করে বিজ্ঞান জগতের প্রতাপচন্দ্র মোহিত হন। প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে অন্যান্য আলোচনার মাধ্যমে ঠাকুর তাঁর শ্বশুর মশাই ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ীর বিষয়ে তাঁর কাছে প্রশংসা করতেন। বলা বাহুল্য, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঠাকুরের রোগ সারাতে অক্ষম হয়েছিলেন।

*

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী, কলকাতার বহুবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী অক্রুরদত্তের বংশধর এবং প্রবীণ সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক। স্বনামধন্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর অধীনেই হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করেছিলেন। উদার রাজেন্দ্রলাল বিনা পয়সায় সকলের চিকিৎসা করতেন এবং

তাঁর দান-ধ্যানও খুব ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে তাঁর ভক্তে পরিণত হন।

ঠাকুরের ভক্তদের অভিপ্রায় অনুসারে রাজেন্দ্রলাল কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরকে হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা করেন প্রথমদিকে ঠাকুরের রোগের সামান্য উন্নতি হলেও, শেষকালে তাঁর চিকিৎসায় বিশেষ কোন সুফল হয়নি। এই চিকিৎসা উপলক্ষে ঠাকুরের বিশেষ সেবা করার অধিকার পেয়ে তিনি কৃতার্থ হন এবং ঠাকুর যাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, সে বিষয়েও তিনি বিশেষ যত্নবান হন। ঠাকুরকে দেখতে আসার সময় তিনি সুগন্ধি ফুল, সুমিষ্ট ফল, এমনকি রুচিকর পথ্যও ঠাকুরের জন্য নিয়ে আসতেন এবং সব সময় তাঁর প্রতি অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। ঠাকুরও রাজেন্দ্রলালের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন।

একদা কাশীপুরে ঠাকুরের চটি জুতায় পায়ে ব্যথা লাগতে থাকায়, ভাগ্যবান রাজেন্দ্রলাল তাঁর পায়ের মাপ নিয়ে নতুন কোমল পাদুকা ফরমাস দিয়ে তৈরী করিয়ে, নিজে ঠাকুরকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। এই পাদুকা এখন বেলুড়মঠে পূজা হয়।

*

ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ বসু

স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী বিরজানন্দ, তথা কালীকৃষ্ণ মহারাজের পিতা এবং কলকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক। প্রথম জীবনে তিনি মহিষাদল-রাজবাড়ীর চিকিৎসকরূপে প্রচুর অর্থ ও যশ অর্জন করেন এবং পরে কলকাতায় নিজেই স্বাধীনভাবে চিকিৎসার কাজ শুরু করেন। আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের কলকাতার বাড়ীতেও তিনি কিছুকাল গৃহ চিকিৎসকরূপে যাতায়াত করেছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ সর্বপ্রথম আচার্য কেশবচন্দ্রের বাড়ীতেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। এরপর থেকেই তিনি ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবন বৃত্তান্ত"; ভক্ত সুরেশচন্দ্র দত্তের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উপদেশ" প্রভৃতি ঠাকুর সম্পর্কীয় বইগুলি কিনে পড়তে থাকেন এবং ঠাকুরের মহাভাবের অনুরাগী হয়ে ক্রমে তাঁর ভক্তে পরিণত হন।

পরবর্তীকালে ত্রৈলোক্যনাথের সতের বছর বয়স্ক পুত্র কালীকৃষ্ণ যখন ভগবানলাভের আশায় সংসার ত্যাগ করে বরানগর মঠে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী সন্তানগণের কাছে বাস করার অভিপ্রায় জানান, তখন তিনি পুত্রকে

ধর্মজীবনে উৎসাহিত করেন। ঠাকুরের সন্তানগণের কাছে গিয়ে থাকার জন্য আশীর্বাদসহ পুত্রকে সম্মতি দান করে, ভক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা, স্বীয় কাজের মাধ্যমেই প্রকাশ করেছিলেন।

*

ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দ, তথা বাবুরাম মহারাজের জনৈক ভ্রাতা। কোনও এক বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে এই ভাগ্যবান তরুণ ডাক্তার, ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন।

একদা ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে থাকাকালীন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের সঙ্গে আলোচনাকালে "অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের" কথা শোনেন এবং সেই যন্ত্রটি দেখার জন্য বালকের মত আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঠাকুরের কৌতূহল নিবারণের জন্য ভক্তেরা তখন ঐ যন্ত্রটি যোগাড়ের উদ্দেশ্যে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, সদ্য ডাক্তারী পাশ করে বিপিনবিহারী, পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের জন্য মেডিক্যাল কলেজ থেকে একটি "অনুবীক্ষণ-যন্ত্র" পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছেন। তাই ভক্তদের আগ্রহে বিপিনবিহারী তাঁর সেই যন্ত্রটি নিয়ে বলরাম বসুর বাড়ীতে ঠাকুরের কাছে আসেন এবং যন্ত্রটিকে ঠিকমত খাটিয়ে তার মধ্য দিয়ে দেখার জন্য ঠাকুরকে আহ্বান জানান। কিন্তু ঠাকুরের মন তখন উচ্চমার্গে থাকায়, তিনি সে সময় মনকে নীচে নামিয়ে আনতে পারেননি। তাই বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন ঠাকুরের মন স্বাভাবিক অবস্থায় নীচে নামল না, তখন অণুবীক্ষণের সাহায্যে দর্শন করার আশা ত্যাগ করা হয়।

*

ডাক্তার ভগবান রুদ্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, কলকাতার এম. ডি-পাশ করা বড় চিকিৎসক। তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। চিকিৎসা উপলক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়।

দক্ষিণেশ্বরে অসুস্থ ঠাকুরকে চিকিৎসা করার জন্য ভক্তেরা ডাঃ রুদ্রকে নিযুক্ত করেন এবং তিনি কিছুদিন ঠাকুরের চিকিৎসা করেন। চিকিৎসাকালীন ঠাকুরের অবস্থা বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে, একদা ঠাকুরের হাতের ওপর একটি টাকা (রৌপ্য মুদ্রা) রেখে ডাঃ রুদ্রের সামনে পরীক্ষা করা হয়। হাতে টাকা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরের হাতটি বেঁকে যায় এবং তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে

যায়; পরে টাকাটি স্থানান্তরিত করার পর ঠাকুরের তিনবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে এবং হাতটিও স্বাভাবিক হয়। এই ঘটনা দেখে বিজ্ঞানজগতের মানুষ ডাঃ রুদ্র বিস্মিত হন এবং ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। যদিও আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও ডাঃ রুদ্র ঠাকুরকে নিরাময় করতে পারেননি, তবু তাঁর নিরভিমান ও শান্ত স্বভাবের জন্য, ঠাকুর তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।

*

ডাক্তার নিতাই চরণ হালদার

কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের বড় হোমিওপ্যাথী ডাক্তার। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং তাঁর পূত সঙ্গলাভ করে কৃতার্থ হতেন। তিনি কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে অসুস্থ ঠাকুরের চিকিৎসাও করেছিলেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দসহ ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন এবং আলমবাজার মঠে নিয়মিত যাতায়াত করেন। তিনি সে সময় প্রত্যহ বিকালে মঠের সাধুদের সঙ্গে মিলিত হতেন, তাঁদের জন্য ভাল ভাল খাবার নিয়ে যেতেন এবং সন্ধ্যারতির পর বাড়ীতে ফিরে আসতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নিতাই চরণই সর্বপ্রথম সাধুদের মঠে প্রার্থনা-সঙ্গীতের জন্য একটি "হারমোনিয়াম" উপহার দিয়েছিলেন।

*

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। তিনি প্রায় সব সময়েই প্রচুর মদ্যপান করতেন বটে, কিন্তু চিকিৎসার সময় তাঁর ঠিক হুঁশ থাকতো। কলকাতার নতুন বাজারের কাছে তাঁর বাড়ী ছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অহেতুকী ভক্তির জন্য দুর্গাচরণ মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন। কোনও সময় হয়তো রাত দশটায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে সহসা হাজির হতেন এবং ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়কে ঘরের বাইরে থেকে নাম ধরে ডাকতেন। দুর্গাচরণের গলার স্বর শুনলেই ঠাকুর হৃদয়কে দরজা খুলে দিতে বলতেন এবং দুর্গাচরণ ঠাকুরকে আপাদমস্তক দর্শন করে, একটি কথাও না বলে পুনরায় চলে যেতেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন প্রথম গলরোগে আক্রান্ত হন, তখন গোলাপ-মা প্রভৃতি ঠাকুরের ভক্তদের আগ্রহে এবং সেবক লাটু ও যোগীন-মার সহায়তায়

ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় দুর্গাচরণ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। দুর্গাচরণ যদিও ঠাকুরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে তাঁর গলায় প্রলেপের ব্যবস্থা করেন, তবুও তাঁর চিকিৎসায় ঠাকুরের গলার বেদনার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি।

*

ডাক্তার নিতাই মল্লিক

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জনৈক ভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করে তাঁর পরমভক্তে পরিণত হন। একদা দক্ষিণেশ্বরে শিবমন্দিরের সিঁড়িতে বসে ঠাকুর যেদিন ভক্তদের কাছে তাঁর নিজ স্বভাবের পরিবর্তনের কথা বলছিলেন, সেদিন ভক্ত নিতাই সেখানে উপস্থিত থাকায়, ঠাকুরের সেই গুহ্যকথা শুনে ধন্য হন।

*

ডাক্তার ভগবান দাস

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত ব্রাহ্মভক্ত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল। একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর তাঁকে সনাতন ধর্ম ও আধুনিক ধর্মের পার্থক্যের বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন।

*

ডাক্তার কাঞ্জিলাল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, কলকাতার সুকিয়া ষ্ট্রীট নিবাসী হোমিওপ্যাথী-ডাক্তার এবং ঠাকুরের একান্ত শরণাগত ভক্ত। প্রথমাবধি তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের জন্য প্রবল ব্যাকুলতা থাকায়, তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন এবং সারাজীবন তাঁর সঙ্গলাভ করেন। ঠাকুরও এই ভক্ত ডাক্তারকে বিশেষ স্নেহ করতেন।

পরবর্তীকালে কাঞ্জিলাল ডাক্তার, শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং শেষজীবনে তাঁর মধ্যে বৈরাগ্যের ভাব আসায় তিনি সাধন-ভজন ও সাধুসঙ্গে দিন যাপন করেন।

*

ডাক্তার মহলানবীশ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য। সমাজ-মন্দিরের পাশেই তাঁর ডিসপেন্সারী ছিল। একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজ-মন্দিরে উপস্থিত হয়ে ব্রাহ্মভক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ব্রাহ্মভক্তেরা ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মপাড়ার মধ্যে শিবনাথের বাড়ীতে যান; কিন্তু শিবনাথ তখন বাড়ীতে না থাকায়, ডাঃ মহলানবীশ ঠাকুরকে অভ্যর্থনা সহকারে সমাজ মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যান এবং সেখানে ব্রাহ্মভক্তের কাছে ঠাকুর তাঁর কথামৃত দান করেন।

*

ডাক্তার কোট্‌স

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত খুব বড ইংরাজ চিকিৎসক। তিনি ছিলেন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। চিকিৎসা উপলক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাময়িক যোগাযোগ হয়।

কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য ভক্তেরা ঠাকুরের সম্মতিক্রমে ইংরাজ চিকিৎসকের দ্বারা ঠাকুরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে, কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের সর্বপ্রধান ইংরাজ চিকিৎসকরূপে ডাঃ কোট্‌সকে ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করা হয়। তিনি এই উপলক্ষে একদিন কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে আসেন এবং ঠাকুরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন। কিন্তু ঠাকুরের রোগের অবস্থা দেখে, তিনি সেটি চিকিৎসাতীত বলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং চিকিৎসার ভার নিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, চিকিৎসক কর্তৃক ঠাকুরের গলদেশ পরীক্ষার পূর্বেই, ঠাকুর সেদিন স্বভাবত সমাধিতে নিমগ্ন হওয়ায়, ইংরাজ চিকিৎসক ডাঃ কোট্‌স, ঠাকুরের সমাধি অবস্থা প্রত্যক্ষ দর্শন করে বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। পরে তিনি ভক্তদের কাছে বাইবেলে বর্ণিত যীশুর এরূপ অবস্থার সঙ্গে ঠাকুরের অবস্থা তুলনা করেছিলেন।

*

ডাক্তার আব্দুল ওয়াজিদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, ধার্মিক মুসলমান চিকিৎসক। তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের ডাক্তার-বন্ধু; রামচন্দ্র নিজেও ডাক্তার ছিলেন।

একদা রামচন্দ্রের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষে এক বিশেষ উৎসবে

রামচন্দ্রের আমন্ত্রণে, বন্ধু ওয়াজিদ এসে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, ওয়াজিদের সঙ্গে তাঁর একজন মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেট-বন্ধুও সেদিন ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন এবং উভয়েই ঠাকুরের সংকীর্তনাদি উপভোগ করেছিলেন।

সেদিন রামচন্দ্র আয়োজিত ভোজন-ব্যবস্থায় ঠাকুরের উপস্থিতিতে হিন্দু ভক্তদের সঙ্গে এক পংক্তিতেই এই মুসলমান ভক্ত ওয়াজিদ ও তাঁর ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধু সেদিন আহার করেন। রামচন্দ্রের এই ব্যবস্থাতে তাঁর জনৈক আত্মীয় আপত্তি জানালে, রামচন্দ্র তাঁকে বলেন যে, এটা কোন সামাজিক কাজ নয়, ঠাকুরের উৎসবে হিন্দু-মুসলমান সবাই একত্রে বসে প্রসাদ পাবার অধিকারী। বলা বাহুল্য, ঠাকুরের উপস্থিতিতেই এই ব্যবস্থা হওয়ায়, আর কেহই এ বিষয়ে আপত্তি জানাতে ভরসা পায়নি উল্লেখ্য, ঠাকুর বলতেন যে, ভক্তের কোন জাত নেই।

(এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলা আবশ্যক যে, ঠাকুরের সংস্পর্শে আগত জনৈক ভক্ত শ্রীশশীভূষণ সামন্ত "রামকৃষ্ণ-লীলাতত্ত্ব" নামে একটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন এবং সেই অমূল্য গ্রন্থে ঠাকুরের তৎকালীন অনেক হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যের নাম ও বর্ণনা দেন। ঠাকুরের কিছু মুসলমান শিষ্যের কথা একমাত্র সেই গ্রন্থেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে সেই অমূল্য গ্রন্থখানি আর পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান— এই তিন প্রকার ধর্মেরই সাধনা ঠাকুর করেছিলেন এবং সেজন্য তাঁর কাছে এই তিন ধর্মেরই ভক্তগণের আগমন স্বাভাবিক। হিন্দু ছাড়াও কয়েকজন খ্রীষ্টান ভক্তের আগমনের কথা এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের ঠাকুরের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করার কথা কয়েকটি প্রামাণিক গ্রন্থে স্বীকৃত হলেও মুসলমান-ভক্ত বা শিষ্যের কথা একমাত্র শশীভূষণের গ্রন্থেই উল্লিখিত হয়েছিল। এই সম্পর্কে ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত এবং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তও একদা প্রকাশ করেছিলেন যে, বেলুড়মঠে একবার ঠাকুরের একজন মুসলমান-শিষ্যের পুত্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং সেই ভদ্রলোকটি সে সময় সুন্দরবন অঞ্চলে "সাব-রেজিষ্ট্রারের" পদে নিযুক্ত ছিলেন।)

*

অষ্টম স্তবক

উকীল নগেন্দ্রনাথ মিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি ওকালতি করতেন। ভক্ত সুরেন্দ্রনাথের মাধ্যমেই ঠাকুরের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের যোগাযোগ হয় এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত শুরু করেন। কিছুদিন যাতায়াতের ফলে, ঠাকুরের বিশেষ আকর্ষণে তিনি তাঁর অনুরাগী ভক্তে পরিণত হন। ঠাকুরও নগেন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং বহু সদুপদেশ দিতেন।

*

উকীল অতুলচন্দ্র ঘোষ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের পরমভক্ত নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা। তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করতেন, বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথরূপেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

ভক্ত অতুলচন্দ্র, ঠাকুরকে বহুবার দর্শন করেন এবং বহুবার তাঁর সান্নিধ্যে আসেন। দক্ষিণেশ্বরে অথবা নিজেদের গৃহে, অথবা কলকাতার অন্যান্য বহু ভক্তের গৃহে অতুলচন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং তাঁর পূতসঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ঠাকুরও অতুলচন্দ্রকে খুব স্নেহ করতেন, সংসারে বাস করেও ঈশ্বরের দিকে মনটি ফেলে রাখার জন্য ঠাকুর তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন। কাশীপুরে ঠাকুরের "কল্পতরু" হওয়ার দিনেও ভাগ্যবান অতুলচন্দ্র সেখানে উপস্থিত থাকায়, ঠাকুরের বিশেষ কৃপালাভ করেছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঠাকুরের দেহরক্ষার পূর্বে নাড়ীজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ অতুলচন্দ্র, ঠাকুরের নাড়ীর অবস্থা পরীক্ষা করে প্রথম সঙ্কটজনক অবস্থা বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এবং ঠাকুরের ভক্ত-সন্তানদের প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

*

উকীল হরিবল্লভ বসু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত বলরাম বসুর খুল্লতাত ভ্রাতা। তিনি উড়িষ্যার কটকের সরকারী উকীল ছিলেন এবং "রায় বাহাদুর" উপাধি পেয়েছিলেন।

নিজেদের বৈষ্ণবকুলের মর্যাদা নষ্ট করে ভ্রাতা বলরাম বসু দক্ষিণেশ্বরে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করেন—এই অভিযোগ পেয়ে পরমবৈষ্ণব হরিবল্লভ কটক থেকে কলকাতায় চলে আসেন এবং ভ্রাতাকে ঠাকুরের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই কাজে বিফল হয়ে হরিবল্লভ যখন মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন, ঠিক তখনই ঠাকুর তাঁর পরমভক্ত নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষকে আহ্বান করেন, যাতে গিরীশচন্দ্র তাঁর বাল্যবন্ধু হরিবল্লভকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে যান। নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী গিরীশচন্দ্র হরিবল্লভকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে গেলে, ঠাকুর হরিবল্লভের সঙ্গে আত্মীয়ের মতন সুমিষ্ট আচরণ দ্বারা তাঁকে মুগ্ধ করেন এবং তাঁর ভক্তিপূর্ণ হৃদয় ও উজ্জ্বল চক্ষুদুটীর প্রশংসা করেন। সেদিন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ও ভগবৎ সঙ্গীতের পর ঠাকুর সমাধিস্থ হলে, হরিবল্লভ ঠাকুরের দিব্যভাবমূর্তি দর্শন ও মর্মস্পর্শী বাণী শ্রবণ করে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন ; এমনকি, ঠাকুরের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি নিজ বৈষ্ণব-কুলের মর্যাদা ও নিজপদের উচ্চ মর্যাদা ভুলে, বলপূর্বক ঠাকুরের চরণধূলি গ্রহণ করে কৃতার্থ হন। এইদিন ঠাকুর হরিবল্লভকে সহসা স্পর্শ দ্বারা কৃপা করেছিলেন। পরবর্তীকালে হরিবল্লভ ঠাকুরের পরম অনুরাগী ভক্তে পরিণত হন এবং সকল প্রকার বৈষ্ণবী গোঁড়ামী ত্যাগ করে তাঁর আশ্রিতরূপে গণ্য হন। ঠাকুরের ভাবধারাকে অবলম্বন করে হরিবল্লভ আজীবন তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেছিলেন।

*

উকীল বৈদ্যনাথ মিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের আত্মীয়। বৈদ্যনাথ কৃতবিদ্য এবং হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। ভক্ত সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষে বৈদ্যনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে যোগদান করেন। বৈদ্যনাথের সঙ্গে আলোচনা করে ঠাকুর খুব খুশী হয়েছিলেন এবং তাঁর স্বভাবের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। বৈদ্যনাথও বরাবরই ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

*

উকীল গণেশবাবু

রাণী রাসমণির বাড়ীর সঙ্গে যুক্ত খুব শান্ত প্রকৃতির লোক। তিনি মাঝে মাঝে রাণীর বাড়ীর বাবুদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে আসতেন এবং সেই উপলক্ষেই ঠাকুরের সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন।

মোক্তার অধরচন্দ্র রায়

কলকাতার অধিবাসী জনৈক ভক্ত। তিনি শাঁখারীটোলার "আত্মোৎকর্ষ 'বিধায়িণী" সভার সভ্য ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি বহুবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে ধন্য হন।

*

ইঞ্জিনীয়ার প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য পরম ভক্ত। তিনি ছিলেন চব্বিশ পরগণা জেলার কাদিহাটী গ্রামের অধিবাসী এবং ইঞ্জিনীয়ার। প্রথম জীবনে তিনি চাকরী করতেন; কিছু সংস্থানের পর তিনি চাকরী ত্যাগ করেন। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে রাজবল্লভ পাড়ায় ৺মদনমোহনজীর মন্দিরের কাছে তাঁদের আর একটি বাড়ী ছিল।

প্রিয়নাথ ৩৪/৩৫ বছর বয়সে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে, তাঁর দাদা মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করতেন। ঠাকুরও প্রিয়নাথকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গও করতেন। আধ্যাত্মিক জগতে এগিয়ে যাবার জন্য প্রিয়নাথকে ঠাকুর বিশেষ উৎসাহ দিতেন। পূর্বে যদিও প্রিয়নাথ কিছুটা কৃপণ ছিলেন, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পূতসঙ্গ লাভের পর, তাঁর সেই ভাব অনেকটা নষ্ট হয়েছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রথমবার বিলাত থেকে ভারতে ফেরার দু'-চারদিন বাদেই স্বামী বিবেকানন্দকে প্রিয়নাথের বাগবাজারের রাজবল্লভপাড়ার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং সেখানে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়।

*

জমিদার মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামের কিছু উত্তরে ভুরসুবো গ্রামের জমিদার। তিনি ছিলেন ঠাকুরের পিতৃবন্ধু। তিনি নিজে পরমভক্ত এবং বিশিষ্ট দাতা ছিলেন বলে শ্রদ্ধাবশতঃ গ্রামের লোকেরা তাঁকে "মাণিক রাজা" বলত। মাণিক রাজার "আম্রকানন" একদা বিখ্যাত ছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরামের ধর্মপরায়ণতায় আকৃষ্ট হয়ে মাণিক রাজা তাঁর সঙ্গে বিশেষ সখ্যতায় আবদ্ধ ছিলেন এবং সেই কারণে তাঁর সঙ্গে

বালক গদাধর প্রায়ই মাণিক রাজার বাড়ীতে যেতেন এবং মাণিক রাজাও গদাধরকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। গদাধরের ওপর মাণিক রাজার এমনই আকর্ষণ ছিল যে, গদাধরকে কয়েকদিন দেখতে না পেলে, তিনি কামারপুকুরে লোক পাঠিয়ে গদাধরকে নিজের বাড়ীতে আনাতেন এবং পরম তৃপ্তি পেতেন। মাণিক রাজার বাড়ীর লোকেদের কাছেও গদাধর খুব প্রিয় ছিলেন এবং তাঁব পুণ্যময় গৃহে ঠাকুরের পদার্পণ ও বাল্যলীলা মাণিকরাজাকে ধন্য করেছিল।

*

জমিদার ধর্মদাস লাহা

ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামের জমিদার। তিনি ছিলেন ঠাকুরেব পিতৃবন্ধু। তাঁর বাড়ীতে ঠাকুর, তথা বালক গদাধরেব খুব যাতায়াত ছিল এবং ধর্মদাস ও তাঁর বাড়ীর লোকেরা সবাই গদাধরকে খুব স্নেহ করতেন।

গদাধরের অন্নপ্রাশনের সময় ধর্মদাস তাঁব পরমবন্ধু ক্ষুদিরামকে বিশেষ সাহায্য করেন এবং প্রধানতঃ ধর্মদাসের অনেকাংশ ব্যয় বহনের ফলেই, গদাধরের অন্নপ্রাশনের কাজ সুসম্পন্ন হয়। ক্ষুদিরামের অবর্তমানে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার গদাধরের উপনয়নের ব্যবস্থা করলে, সে সময় গদাধর কুলপ্রথা ভঙ্গ করে কামারকন্যা ধনীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা নেবার অভিলাষ ব্যক্ত কবায়, সে কাজে বিঘ্ন উপস্থিত হয়; কিন্তু পিতৃসুহৃদ ধর্মদাসের প্রচেষ্টায় রামকুমার গদাধরের ইচ্ছা পূর্ণ করলে, নির্বিঘ্নে সে কাজও সমাপ্ত হয়।

গ্রামে ধর্মদাসের বাড়ীতেই পাঠশালা বসত এবং ঠাকুর প্রথম জীবনে লাহাদের সেই পাঠশালাতেই লেখাপড়া করতেন। এমনকি, ধর্মদাসের পুত্র গয়াবিষ্ণুর সঙ্গে ঠাকুরের বাল্যকালে এমন সখ্যতা ছিল যে, তাঁরা পরস্পরকে "স্যাঙাৎ" বলে সম্বোধন করতেন। ধর্মদাসের বিধবা কন্যা প্রসন্নময়ীও ঠাকুরের একজন অনুরাগিনী ভক্ত ছিলেন এবং তাঁকে কোন দেবতা বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। ঠাকুরের কামারপুকুরের সংসারের অভাব ও দুরবস্থা লাঘবের জন্য গয়াবিষ্ণু যেমন তাঁদের জমি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, প্রসন্নময়ীও তেমনি তাঁদের বাড়ীতে দৈনিক অতিথি সেবার জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে পরম উপকার করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ধর্মদাসের মহান হৃদয়ের জন্য ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বাড়ীর লোকেদের একটি মধুর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

*

জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, নদীয়া জেলার উলোগ্রামের প্রখ্যাত জমিদার এবং দাতা। উলোর বর্তমান নাম বীরনগর। উত্তর কলকাতার কাশীপুরে তিনি মা-কালীর বৃহৎ এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পরম ধার্মিক এবং ভক্ত ছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনে, ভক্ত বামনদাস আগে থেকেই বরাবর ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু পূর্বে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের কোন সুযোগ হয়নি। একদা দক্ষিণেশ্বরে বিশ্বাসদের বাড়ীতে বামনদাসের অবস্থানকালে, তাঁর ভক্তির পরিচয় জানতে পেরে ঠাকুর স্বয়ং সেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে যান এবং সেই সময়ে উভয়ের মধ্যে বহুক্ষণ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হয়। বামনদাস তাঁকে মহাসমাদরে আপ্যায়িত করেন এবং তাঁর দর্শন লাভ করে নিজেকে ধন্য বলে মনে করেন। সেদিন ঠাকুরের কণ্ঠে মধুর শ্যামাসঙ্গীত শুনে এবং ঠাকুরের মহাভাবের পরিচয় পেয়ে, ভক্ত বামনদাস মুগ্ধ হন। ঠাকুর যখন সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন বিস্মিত বামনদাস তাঁর সম্পর্কে অন্যদের কাছে বলেন—"বাবা, বাঘ যেমন মানুষকে ধরে, তেমনই ঈশ্বরী এঁকে ধরে রেখেছেন।"

*

জমিদার জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, বরানগর নিবাসী প্রতাপশালী জমিদার। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ৺রাধাগোবিন্দের পূজকরূপে প্রথম নিযুক্ত হন, তখন ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে বরানগর কুঠীঘাটের কাছে ৺দশমহাবিদ্যা-মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করতে যেতেন। একদা সেখানে জমিদার জয়নারায়ণ, সর্বসমক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে কৌতুক সহকারে প্রশ্ন করেন যে, ৺রাধাগোবিন্দের ভাঙ্গাবিগ্রহ জোড়া দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে পূজা করা হয় কিনা। জয়নারায়ণের এই প্রশ্নে ৺রাধাগোবিন্দের তৎকালীন পূজক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ খুব বিরক্তিবোধ করেন; তিনি ব্যথিত হৃদয়ে উত্তর দেন যে, যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত, তাঁর কখনো পা ভাঙ্গতে পারে না। বলা আবশ্যক, ঠাকুরের মুখে এই জোরালো উত্তর শুনে, জয়নারায়ণ সেদিন চুপ হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জনৈক পুরোহিতের হাত থেকে অসাবধানতাবশতঃ দক্ষিণেশ্বরের উক্ত গোবিন্দজীর মূর্তিটি পড়ে যাওয়ার ফলে,

মূর্তিটির একটি চরণ ভেঙে গিয়েছিল এবং নতুন মূর্তির পরিবর্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ভাঙাচরণ নিজে জুড়ে দিয়ে পুনরায় সেই বিগ্রহ পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। আরো উল্লেখ করা যায় যে, পুরাতন সেই বিগ্রহ এখনও সেইভাবে সেখানে পূজিত হচ্ছে এবং নতুন বিগ্রহটি পাশের ঘরে রক্ষিত আছে।

*

জমিদার দাতারাম মণ্ডল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, দক্ষিণেশ্বর নিবাসী প্রতাপশালী জমিদার ও ভক্ত। তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী, দয়ালু ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে নানা সাধু, সন্ন্যাসী, ফকীর প্রভৃতি আসতেন এবং দাতারাম প্রত্যেকের সেবা করতেন। বিত্তশালী দাতারামের বাড়ীতে একদা একটি ডাকাতের দল পূর্বাহ্নে চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে এসেছিল; কিন্তু তাদের পুলিশে ধরিয়ে না দিয়ে, বা কোনপ্রকার বিরোধিতা না করে স্বয়ং দাতারাম ডাকাতের সর্দারের কাছে সমুদয় ধনরত্ন সমর্পণ করায়, সর্দার স্তম্ভিত হয়ে সবকিছু দাতারামকে ফেরৎ দিয়ে চলে গিয়েছিল।

এই ভক্তশ্রেষ্ঠ এবং মহানুভব দাতারাম, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন এবং তাঁর পূতসঙ্গ লাভ করে আনন্দ পেতেন। দাতারাম ঠাকুরকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং ঠাকুরও তাঁকে স্নেহ করতেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমানে দক্ষিণেশ্বরে আদ্যাপীঠের সম্মুখ দিয়ে যে রাস্তা গঙ্গার দিকে গিয়েছে, সেই রাস্তার ওপরেই দাতারামের বাড়ী; জনসাধারণের সুবিধার জন্য নিজের খরচে তিনি গঙ্গার ধারে যে পাকা স্নানের ঘাট তৈরী করে দেন, "মণ্ডল মশায়ের ঘাট" নামে সেটি এখনো বিদ্যমান আছে।

*

জমিদার উপেন্দ্রনাথ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী গৃহীভক্ত। তিনি ছিলেন মধ্য কলকাতার এণ্টালী অঞ্চলের অধিবাসী জমিদার মহেন্দ্রনাথের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। উপেন্দ্রনাথ শৈশবে কয়েকবার ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর দৈবপ্রভাবে চিরদিনই ঠাকুরের মহাভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঠাকুরের কাজে উদ্বুদ্ধ হন। পরবর্তী কালে উপেন্দ্রনাথ, ঠাকুরের ভক্ত এবং কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহায়তায় ঠাকুরের ভাবধারা প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন।

জমিদার দুর্গাশঙ্কর

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী ভক্ত। গয়ায় তাঁদের জমিদারী ছিল। ভক্ত দুর্গাশঙ্কর প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে তাঁর পূত সঙ্গ লাভ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন। ভাগ্যবান দুর্গাশঙ্কর ঠাকুরের মুখে অপূর্ব শ্যামাসঙ্গীত শুনতেন এবং ভাব-ভক্তিতে অশ্রু বিসর্জন করতেন। পরে তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাশঙ্করও ঠাকুরের অনুগত ছিলেন। দুর্গাশঙ্করের অকৃত্রিম ভক্তির কথা উল্লেখ করে ঠাকুর অন্যান্যদের কাছে তাঁর প্রশংসা করতেন।

*

জমিদার গদাশঙ্কর

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ভক্ত। গয়ায় তাঁদের জমিদারী ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাশঙ্করও ঠাকুরের পরম অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সঙ্গে গদাশঙ্করের বিবাহ হয়েছিল। প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী হন এবং ক্রমশঃ ব্রাহ্মভাবাপন্ন হন। পরবর্তীকালে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াতের ফলে, গদাশঙ্কর ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। একদা ঠাকুর তাঁকে নিরালায় নিয়ে গিয়ে তাঁর মনের ভাব সম্পর্কে প্রশ্ন করেন; তাঁর নিরাকারভাব ভাল লাগলেও ঠাকুর তাঁকে সন্ধ্যা-আহ্নিক করার উপদেশ দিয়েছিলেন। এইভাবে ঠাকুরের স্নেহলাভ করে গদাশঙ্কর কৃতার্থ হন।

*

উত্তরপাড়ার জমিদার পরিবার

হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার প্রখ্যাত জমিদার, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পরিবারবর্গ বা বাড়ীর অপরাপর ভক্তেরা দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির দর্শনার্থে এলে বা উৎসবাদিতে যোগদান করলে, তাঁরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতেন এবং এইভাবেই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় গড়ে ওঠে। রাজা প্যারীমোহন স্বয়ং ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন কিনা, তা সঠিক জানা যায় না। তবে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান, বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো-ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের বিজয় গৌরবের বার্তা এদেশে

পৌঁছালে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার টাউন হলে বিদেশে অবস্থানকারী স্বামীজীকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাবার জন্য যে বিরাট জনসভা হয়, তাতে রাজা প্যারীমোহন সভাপতিত্ব করেন। সেই অভিনন্দনের উত্তরে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর নিউইয়র্ক থেকে স্বামীজী রাজা প্যারীমোহনকে যে প্রত্যুত্তর দেন, সেটিকে "জাতীয় দলিল" হিসাবে গণ্য করা যায়। সেই ঐতিহাসিক পত্রের দু-একটি অংশ :—

"সম্প্রতি কলকাতার টাউনহলে অনুষ্ঠিত সভায় যে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছে এবং আমার সহ-নাগরিকবৃন্দ যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্ভাষণ আমাকে পাঠিয়েছেন তা আমি পেয়েছি। মহাশয়, আপনারা যে আমার এই সামান্যতম কাজকে অভিনন্দিত করেছেন, সেজন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।"

"আমি দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছি যে, কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি, অপর জাতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে বাঁচতে পারে না।·· আমার মনে হয়, ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ, জাতির চারিদিকে আচারের দেওয়াল তৈরী করা—যার ভিত্তি হল অন্যকে ঘৃণা করা···

"প্রাচীন ও আধুনিক যুক্তিবাদীরা যতই মিথ্যা যুক্তি দ্বারা এই সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, এটা সুনিশ্চিত যে অপরকে ঘৃণা করলে নিজেরও নৈতিক অধঃপতন হয়। যে জাতি একদিন পৃথিবীর মধ্যে ছিল শ্রেষ্ঠ, সে কিনা আজ অবজ্ঞা ও উপহাসের পাত্র হয়েছে। এটাই তার জলন্ত প্রমাণ।"

"হৃদয়কে উন্মোচিত করাই জীবন, আর সংকোচন মানে মৃত্যু। জীবন মানে ভালোবাসা, ঘৃণা করার অর্থ মৃত্যু। যখন থেকে আমরা অপর জাতিকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম, তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছিল আমাদের নৈতিক অধঃপতন। যতদিন না আমরা হৃদয়কে উন্মোচিত করতে পারছি, ততদিন কোন কিছুই আমাদের নৈতিক অধঃপতন রোধ করতে পারবে না। সুতরাং পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গেই হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।·· "

"অন্যকে স্বাধীনতা দিতে যার অনীহা, সে কি কখনও নিজে স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য? বৃথা চীৎকারে শক্তির অপচয় না করে, আসুন আমরা শান্তভাবে ও মানবিকভাবে কাজ করতে শুরু করি। আর আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি—কেউ যদি কোন কিছু পাওয়ার যোগ্য হয়, তা হলে বিশ্বের কোন শক্তিই তাকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। প্রাচীনকালে আমাদের জাতীয় চরিত্র ছিল মহান, আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় চরিত্র আরও গৌরবান্বিত হবে।"

*

দেওয়ান গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য পরমভক্ত। তিনি ছিলেন চব্বিশ পরগণা জেলার বেলঘরিয়ার অধিবাসী এবং দেওয়ানের পদে নিযুক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

ভক্তিমান গোবিন্দ ঠাকুরের প্রতি মহা আকর্ষণে কখনো একাকী, কখনো বা বন্ধুগণসহ দক্ষিণেশ্বরে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন। গোবিন্দের মনে কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হলেই তিনি ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হতেন এবং ঠাকুরও তা তৎক্ষণাৎ নিরসন করতেন; এইভাবে গোবিন্দ ক্রমশঃ ঠাকুরের পরমভক্তে পরিণত হন। ঠাকুরও গোবিন্দকে অত্যন্ত স্নেহ করায় তাঁর বেলঘরিয়ার বাড়ীতেও শুভাগমন করেছিলেন। একদা নরেন্দ্রনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর গোবিন্দের বাড়ীতে সংকীর্তনে নৃত্য করেন ও প্রসাদ গ্রহণ করেন। ভাগ্যবান গোবিন্দের বাড়ীতে ঠাকুরের সমাধিও হয়েছিল।

*

কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ ভুপ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত কুচবিহারের রাজবাড়ীর ছেলে এবং আচায কেশবচন্দ্র সেনের কুটুম্ব-স্থানীয়। একদা কেশবচন্দ্র তাঁর জামাতা, কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের একটি স্টীমারে করে দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে গঙ্গার ওপর ভ্রমণ করেন। সেদিন স্টীমারে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে কুমার গজেন্দ্রনারায়ণও উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের পূতসঙ্গ উপভোগ করেছিলেন। সেদিন স্টীমারের মধ্যেই অতি সারগর্ভ উপদেশ দ্বারা ঠাকুর উপস্থিত ভক্তগণকে কৃতার্থ করেন এবং ভাগ্যবান ভূপেন্দ্রনারায়ণও তার অংশীদার হন।

*

নেপালরাজের ছেলে-ভাইপো

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত এবং তৎকালীন নেপালরাজা জং বাহাদুরের প্রতিনিধি কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের কলকাতায় বসবাস কালে একদা জং বাহাদুরের ছেলেরা এবং ভাইপো কর্নেল কলকাতায় আসেন এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে যান। তাঁদের ভক্তিভাব দেখে ঠাকুর বিশেষ প্রশংসা করেন।

*

নবম স্তবক

চিনু শাঁখারী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম এবং পরম অনুরাগী, কামারপুকুর গ্রামের বৃদ্ধ শাঁখারী। তাঁর প্রকৃত নাম শ্রীনিবাস ; কিন্তু শ্রীনিবাসের বদলে সবাই তাঁকে "চিনিবাস" বলে ডাকতো এবং ঐ চিনিবাসেরই অপভ্রংশ "চিনু" রূপে তিনি পরিচিত ছিলেন। চিনু শাঁখারী খুব উচ্চদরের বৈষ্ণব সাধক ছিলেন ; সৌম্যমূর্তি, পরমবৈষ্ণব চিনুব মধ্যে বহু বিভূতি ও সিদ্ধাই প্রকাশ পেত। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন এবং গৌর-জ্ঞানে আদর করতেন ; ঠাকুরও তাঁকে "দাদা" বলে বিশেষ সম্মান করতেন।

একদা দেবতার উদ্দেশে আপনমনে শ্রীনিবাস তথা চিনু যখন মালা গাঁথছিলেন. তখন সেখানে হঠাৎ বালক গদাধর (শ্রীরামকৃষ্ণ) উপস্থিত হলে শ্রীনিবাসের প্রাণের মধ্যে এক দৈব প্রেরণা আসে . তিনি তখন মালা গাঁথা বন্ধ রেখে কাছের দোকান থেকে কিছু ফল আর মিষ্টি এনে গদাধরকে নিজে খাইয়ে দেন। এরপর তিনি গদাধরকে মনের সাধ মিটিয়ে মালা ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে কাতরকণ্ঠে বলেন – "বাবা গদাই ! আমি ভজনহীন, অতি দীনহীন কাঙাল ; এই পৃথিবী থেকে হয়তো শীঘ্র চলে যাব , কিন্তু তুমি জগতের হিতের জন্য ভবিষ্যতে কত-কি কাজ করবে তা দেখার সৌভাগ্য আমার হবে না। বাবা ! তোমার কাছে এই দীনের মিনতি রইল – তুমি যেন এই কাঙালকে ভুলো না।" বলাবাহুল্য, শ্রীনিবাসই গদাধরের মধ্যে ভাবী-শ্রীরামকৃষ্ণের তথা লীলাময় অবতারের চিত্র, নিজ উপলব্ধি দ্বারা প্রথম দর্শন করেছিলেন এবং কৃপাসিন্ধু ঠাকুরও ভক্ত শ্রীনিবাসের প্রার্থনা অনুযায়ী তাঁকে কোনদিন ভোলেননি বা অবহেলা করেননি।

পরবর্তীকালে "শ্রীরামকৃষ্ণ" রূপে যখন ঠাকুর কামারপুকুরে আসেন, তখনও তিনি পরমভক্ত "চিনু-দাদা"র সঙ্গে পূর্ব সম্পর্ক বজায় রাখতেন এবং বৃদ্ধ শ্রীনিবাসও তাঁর আদরের "গদাই"কে পূর্বের মতই আপন জ্ঞান করতেন। কামারপুকুরে থাকাকালীন ঠাকুর শ্রীনিবাসের বাড়ীতে গিয়ে ভগবৎ চর্চা করতে খুব ভালবাসতেন এবং কোন কোন দিন ভগবৎ প্রসঙ্গে তাঁদের সারারাত কেটে যেত ঠাকুরের সঙ্গে সে সময় ভৈরবী ব্রাহ্মণীও কামারপুকুরে থাকায়, ভক্ত শ্রীনিবাসকে ব্রাহ্মণী ৺রঘুবীরের প্রসাদ খাইয়ে ভক্তি সহকারে তাঁর উচ্ছিষ্টস্থান নিজ হাতে পরিষ্কার করেছিলেন।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, শ্রীনিবাস পরম সিদ্ধাই-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। একদা তাঁকে কোন কারণে জমিদারের বরকন্দাজ গ্রেপ্তার করতে এসে ঘরের কপাটে অচল

হয়ে সারারাত্রি দাঁড়িয়েছিল এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। আর একবার কয়েকজন সাধু কামারপুকুরে শ্রীনিবাসের বাড়ীতে অতিথি হয়ে তাঁর কাছে আমের টক্ খেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখন আমের সময় নয় বলে শ্রীনিবাস খুব অস্থির হয়ে পড়েন এবং আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে ভগবানের কাছে অতিথিদের তুষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। শ্রীনিবাসের সিদ্ধাইয়ের এমন জোর ছিল যে, তাঁর প্রার্থনামত সেদিন অসময়ে সত্যসত্যই গাছ থেকে কয়েকটি কাঁচা আম অকস্মাৎ খসে পড়েছিল এবং শ্রীনিবাস সেই কাঁচা আমের টক্ খাইয়ে অতিথিদের তৃপ্ত করেছিলেন। বলা আবশ্যক, ভক্তিপথের সাধক শ্রীনিবাসের এই সিদ্ধাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পছন্দ করতেন না, তাই তিনি শ্রীনিবাসকে সিদ্ধাই থেকে বিরত হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য, ঠাকুরের বাল্যকালের প্রথম ও পরম অনুরাগী ভক্ত হিসাবে এবং ভাবী-শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হিসাবে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে ভাগ্যবান শ্রীনিবাস তথা চিনু শাঁখারী চির স্মরণীয় হয়ে আছেন।

*

রসিক মেথর

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত পরমভক্ত এবং দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীব মেথর। তার মনে প্রবল বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান নরদেহ ধারণ করে শ্রীবামকৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং এই বিশ্বাস নিয়েই সে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অতিশয় ভক্তি করত এবং "বাবা" বলে সম্বোধন কবত, ঠাকুরও তাঁকে স্নেহ-ভরে "রস্কে" বলে ডাকতেন। সে জাতিতে মেথর ছিল বলে নিজেকে অশুচি জ্ঞান করত এবং সেজন্য দূর থেকে ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম কবত। রসিকের এই ভক্তিতে ঠাকুর তাঁর প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন।

একদা গঙ্গাস্নানান্তে রসিক যখন ঠাকুরের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, সে সময় ঠাকুরেব মন ভাল না থাকায় রসিককে দেখে তাঁর মন সাময়িক বিক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু পরক্ষণেই নির্দোষ রসিকের প্রতি তাঁর এই অনুপযুক্ত মনোভাবের জন্য তিনি অনুতপ্ত হন এবং যে স্থান দিয়ে ভক্ত রসিক হেঁটে গিয়েছিল, সেখানকার মাটি নিয়ে নিজের মাথায় মেখে ঠাকুর রসিকের প্রতি অসামান্য স্নেহ প্রদর্শন করেন।

রসিক "মেথরের কাজ" করত বলে পাছে ঠাকুরের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়, সেজন্য একদিন ঠাকুর পরমভক্ত রসিকের বাড়ীতে গিয়ে গোপনে নিজের মস্তকের

কেশের দ্বারা রসিকের বাড়ীর নর্দমা পরিষ্কার করে আসেন এবং কেঁদে কেঁদে বলেন—"মা, আমি ব্রাহ্মণ এই অভিমান বিনাশ করো।"

আরো একদিন ঠাকুর ভক্তদের কাছে রসিক-প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"ধ্যান করতে করতে মন চলে গেল রসকের বাড়ী ; রসকে মেথর। মনকে বললুম, থাক্ শালা ঐখানে থাক্। মা দেখিয়ে দিলেন ওর বাড়ীর লোকজন সব বেড়াচ্ছে খোলমাত্র ; ভেতরে সেই এক কুলকুণ্ডলিনী, এক ষটচক্র!"

একদা ভক্ত রসিক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কাতরভাবে প্রশ্ন করে—"প্রভু আমার কি উপায় হবে!" এই ঘটনায় কৃপাসিন্ধু ঠাকুর যে দৃষ্টিতে তাঁর উচ্চস্তরের ভক্তদের দিকে তাকিয়ে কৃপা করতেন, সেদিন সেইভাবে তিনি রসিকের প্রতিও তাঁর স্নেহময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং পরমভক্ত ও পরম ভাগ্যবান রসিক অমৃতত্ব লাভ করে ধন্য হয়। এমনকি, অন্তিমকালে ঠাকুরের দর্শন পাবার জন্য ভক্ত রসিক প্রার্থনা জানালে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তা-ও মঞ্জুর করেন।

পরবর্তীকালে ভক্তবর রসিক নিজের বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি তুলসীকুঞ্জ নির্মাণ করেছিল এবং সেখানে বসেই ভজন করত। মৃত্যুর দিন দুপুরবেলায় রসিক তার স্ত্রী-পুত্রদের তুলসীকুঞ্জে তাকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতে বলে এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করে "এই যে বাবা এসেছ, বাবা এসেছ" বলে, সজ্ঞানে "রামকৃষ্ণ" নাম করতে করতে দেহত্যাগ করে। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, রসিকের মৃত্যুর দু-বছব আগে ঠাকুরের দেহরক্ষা হয়।

বলা বাহুল্য, ঠাকুরের পরমভক্ত রসিক মেথর রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে বিশিষ্ট স্থানাধিকাবীরূপে গণ্য হয়ে আছে।

*

ভর্তাভারী মালী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত এবং দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর বাগানের মালী। সে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পূতসঙ্গ লাভ করার প্রচুর সুযোগ পাওয়ায় ক্রমশঃ ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁর পরম অনুগত হয়। ঠাকুরও ভক্তিমান ভর্তাভারীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতেন এমনকি তার কাছে মনের দু-একটা কথাও প্রকাশ করতেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পঞ্চবটীর বেড়া ভেঙ্গে যাওয়ায়, তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সেকথা একমাত্র ভর্তাভারীকেই জানান ; কিন্তু সে-ও এই বিষয়ে তৎক্ষণাৎ কোন উপায় করতে না পারায় মনে মনে খুব দুঃখ পায়।

ঠিক এই সময় গঙ্গায় তাঁদের সামনেই বান আসে এবং সেই বানের জলে অকস্মাৎ একবোঝা বাঁশের খুঁটী, বাকারী প্রভৃতি বেড়া তৈরীর সমস্ত উপকরণ ভেসে এসে পুনরায় জলের মধ্যে ডুবে যায়। ঠাকুর এই দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাৎ ভর্ত্তাভারীকে সে-কথা জানালে, ঠাকুরের মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য পরমভক্ত ভর্ত্তাভারী আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে। সে সেই মুহূর্ত্তে নিজের জীবন বিপন্ন করেও লাফ দিয়ে গঙ্গায় বানের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ডুব দিয়ে সেই উপকরণগুলি জল থেকে তুলে আনে। এরপর ভর্ত্তাভারী সেই উপকরণগুলির দ্বারা পঞ্চবটীর বেড়া পুনরায় তৈরী করে ঠাকুরকে নিশ্চিন্ত করে। বলাবাহুল্য, ঠাকুরের তৃপ্তির জন্য পরম দুঃসাধ্য ও বিপজ্জনক এই কাজের দ্বারা ভর্ত্তাভারী সেদিন ঠাকুরের প্রতি অসীম ভক্তির পরিচয় দিয়েছিল।

*

শম্ভু কুমোর

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী, কামারপুকুর গ্রামের বৃদ্ধ কুম্ভকার। তিনি ঠাকুরকে, তথা বালক গদাধরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন; গদাধরও তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে অনেক প্রাণের কথা কইতেন। গদাধরের গান শুনতে শম্ভু খুব ভালবাসতেন এবং গদাধর তাঁর বাড়ীতে এলেই, তিনি তাঁকে গান গেয়ে শোনাতে অনুরোধ করতেন। শম্ভু মাটি দিয়ে যখন নানা দেব-দেবীর মূর্তি গড়তেন, গদাধর তা দেখে শিখে নিতেন; পরে শম্ভুর কাছ থেকেই মাটি চেয়ে নিয়ে সুন্দর সুন্দর মূর্তি গড়লে শম্ভু গদাধরের হাতের কাজ দেখে বিস্মিত হতেন।

একদা শম্ভুর বাড়ীতে গদাধর এমন মধুর গান করেন যে, শম্ভু সব কাজ ফেলে ছুটে এসে গদাধরের চরণ দুটি ধরে আরো একখানি গান গাইবার জন্য বিশেষ মিনতি করেন। কিন্তু দ্বিতীয় গানটি গাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গদাধর অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে, ভীত শম্ভু পাড়ার সবাইকে তাড়াতাড়ি ডেকে এনে "ব্রহ্ম হত্যার" আশঙ্কায় ডুকরে কাঁদতে থাকেন। অবশেষে সকলের পরিচর্যার ফলে গদাধর সুস্থ হলে শম্ভু নিশ্চিন্ত হন। প্রতিবেশী মধু যুগী, ঠাকুরের ভাব-সমাধির কথা বিবৃত করলে শম্ভু তার অর্থ কিছুই বোঝেননি; কারণ তাঁর আশী বছর বয়সের মধ্যে এমন অবস্থা তিনি আগে কখনো কারোর দেখেননি। বলাবাহুল্য, ঠাকুরের বাল্য-লীলায় ভাগ্যবান শম্ভুর বাড়ী ধন্য হয়।

*

মধু যুগী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী, কামারপুকুর গ্রামের যুগীপাড়ার অধিবাসী। তিনি ঠাকুরকে তথা বালক গদাধরকে খুব স্নেহ করতেন এবং গদাধরও তাঁর বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। পাঠশালায় ছুটির পর প্রায়ই গদাধর বিভিন্ন পুঁথি নিয়ে মধুর বাড়ীতে চলে যেতেন এবং সুমিষ্ট কণ্ঠে আবৃত্তি করে প্রহ্লাদ-চরিত্র, দাতাকর্ণ-কাহিনী প্রভৃতি বিষয়গুলি উপস্থিত সকলকে শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন। মধুর বাড়ী ঠাকুরের বাল্যলীলায় ভরপুর ছিল।

একদা পাড়ার শম্ভু কুমোরের বাড়ীতে গদাধর গান গাইবার সময় অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে, মধু সে-সময় পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে উক্ত ঘটনার কথা শুনেই মধু গদাধরকে সস্নেহে নিজের কাঁধে তুলে গদাধরকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসেন। গদাধরের "ভাব-সমাধি"র কথা মধু'র আগে জানা ছিল; তাই এই বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়াকে মধু "ভাব-সমাধি" রূপে ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন এবং সবাইকে আশ্বস্ত করেছিলেন। ঠাকুরকে স্নেহদান করে মধু কৃতার্থ হন।

*

চণ্ড-ওঝা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, কামারপুকুর গ্রামের মস্ত গুণিন ওঝা; তন্ত্র-মন্ত্রে তিনি নিপুণ ছিলেন এবং ভূত-প্রেত-উপদেবতা তাড়িয়ে তিনি গ্রামের লোকের উপকার করতেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সাধনকালের প্রথমাবস্থায় তাঁর অস্বাভাবিক আচরণের কথা শুনে দেশে তাঁর মা চন্দ্রমণি দেবী খুব চিন্তায় পড়েন এবং অপর পুত্র রামেশ্বরকে দিয়ে ঠাকুরকে কামারপুকুরে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ঠাকুরের তথাকথিত "পাগলামি" ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় পাড়ার পাঁচজনের পরামর্শে তিনি অবশেষে অব্যর্থ ব্যাধি-শান্তির জন্য চণ্ড ওঝাকে ডাকিয়ে পাঠান। ওঝা এসে যথাবিধি পূজা ও বলি দেওয়ার পর চণ্ড এসে শূন্যে অধিষ্ঠান করেন এবং ওঝার উদ্দেশে বলেন—"ওকে ভূতে পায়নি, ওর কোন আধি-ব্যাধি নেই।" এই ঘটনায় ওঝা নিশ্চিন্ত হন, কিন্তু ঠাকুরকে অত্যাধিক সুপুরি খেতে নিষেধ করেন, কারণ বেশী সুপুরি খেলে কাম বৃদ্ধি হতে পারে। বলা আবশ্যক, ঠাকুর তখন অত্যন্ত সুপুরি খেতেন; কিন্তু ওঝার নিষেধের পর তিনি অত সুপুরি খাওয়া বন্ধ করেন।

*

চতুরা পাণ্ডা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব পাণ্ডা। একদা তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের উদ্যোগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গেলে, তখন তাঁর মধ্যে বৈষ্ণবভাবের পরম উদ্দীপন হয়। এই সময় ঠাকুর সকলপ্রকার বৈষ্ণবীয় প্রথা অবলম্বন করেন এবং রাধাকুণ্ডের কাছে বৈষ্ণব পাণ্ডা চতুরার সহায়তায় বৈষ্ণবীয় ভেক্-ধারণ করে তিনদিন তা রক্ষা করেন। এই ভেক্-ধারণ উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে ভক্ত চতুরা পাণ্ডার মিলন হয়।

*

পাচক ঈশ্বর চাটুজ্যে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাঁকুড়া নিবাসী ভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে মা-কালীর ভোগ রান্নার পাচকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সেই উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গলাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। পাচক ঈশ্বরের প্রস্তুত অন্নভোগ যেমন মা-কালীকে নিবেদন করা হত, তেমন ঐ ভোগের প্রসাদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকেও দেওয়া হত। সেজন্য একই সঙ্গে মা-কালী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করার সুযোগ পেয়ে, পাচক ঈশ্বর চাটুজ্যে ধন্য হয়েছিলেন। অনুগত ঈশ্বরকে ঠাকুর খুব স্নেহ করতেন এবং ভালো রান্না করার জন্য তাঁকে নানা নির্দেশও দিতেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকেও ঈশ্বর নিজ কন্যার মতন জ্ঞান করতেন।

*

পাচক গাঙ্গুলী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত পাচক ব্রাহ্মণ। প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। ভক্তগণ কর্তৃক তিনি কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুরের অসুস্থতার সময় রন্ধন-কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যদিও রন্ধন-কাজে তিনি খুব পারদর্শী ছিলেন না, তবু তাঁর সরলতার জন্য ঠাকুর তাঁকে খুব স্নেহ করতেন।

একদা কাশীপুরে পথ্য তৈরী করে গাঙ্গুলী ঠাকুরের ঘরে নিয়ে গেলে, ঠাকুর তাঁকে সেখানে বসতে বলেন এবং সহসা ভাবের বশে তাঁকে স্পর্শ করেন। এই ঘটনায় গাঙ্গুলী প্রায় দু-ঘণ্টা গভীর ভাবের ঘোরে থাকেন এবং পরে শশীমহারাজ, তথা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন—"আমি কোথায় ?" অতঃপর ঠাকুরের নির্দেশে শশীমহারাজ গাঙ্গুলীকে তাঁর নিজ ঘরে পৌছে দেন এবং এই অযাচিত কৃপালাভ করে গাঙ্গুলী সেদিন ধন্য হন।

কাশীপুরে ঠাকুর যেদিন "কল্পতরু" হন, সেই সময় ঠাকুরের পরমভক্ত

নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষ উন্মত্তের মত সেখানকার সমুদয় ভক্তকে খুঁজে এনে কৃপাপ্রাপ্তির জন্য ঠাকুরের কাছে হাজির করান। রন্ধনশালায় সে সময় গাঙ্গুলী রুটি প্রস্তুতের কাজে নিযুক্ত থাকায়, গিরীশচন্দ্র তাঁকেও খুঁজে এনে ঠাকুরের কাছে হাজির করালে, কৃপাসিন্ধু ঠাকুর সেদিন ভাগ্যবান গাঙ্গুলীকেও কৃপাদৃষ্টি দান করে কৃতার্থ করেছিলেন।

*

ত্রৈলোক্য-ভৃত্য

দক্ষিণেশ্বর এষ্টেটের মালিক শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস কর্তৃক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত নিযুক্ত হিন্দুস্থানী ভৃত্য। একটি গর্হিত কর্মের জন্য ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী ও সেবক ভাগ্নে হৃদয়রাম, দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে ত্রৈলোক্যনাথ কর্তৃক বিতাড়িত হওয়ার পর, ঠাকুরের সেবার জন্য হৃদয়রামের স্থলে এই হিন্দুস্থানী ভৃত্যকে ত্রৈলোক্যনাথ নিযুক্ত করেন। ভাগ্যবান ভৃত্যটি মাত্র দু-একদিন ঠাকুরের সেবা করার সুযোগ পেয়েছিল, কারণ এরপরেই ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের সঙ্গে তাঁর গৃহ ভৃত্য লালটু বা লাটু দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে এলে ঠাকুর রামচন্দ্রের কাছ থেকে লালটুকে তাঁর কাজের জন্য চেয়ে নেন এবং এই লালটুই পরে লাটু মহারাজ, তথা স্বামী অদ্ভুতানন্দ রূপে অভিহিত হন।

*

গিরীশ-ভৃত্য

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের ভাগ্যবান্ ভৃত্য। সম্ভবতঃ তাকে "ঈশ্‌নে" ব'লে ডাকা হত। গিরীশচন্দ্রের বাড়ীতে এই ভৃত্যটি বহুবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করার এবং তাঁর সেবা করার সুযোগ পায়।

একদিন গিরীশচন্দ্রের আদেশে তাঁর বাড়ীতে ঠাকুরকে আহার করাবার জন্য সে লুচি, চচ্চড়ি প্রভৃতি পরিবেশন করে, ভৃত্যের দ্বারা পরিবেশন কার্য গর্হিত বা অশোভনীয় হলেও, ঠাকুর সেদিন গিরীশচন্দ্রের সকল দোষ ক্ষমা করে, ভৃত্যের দেওয়া আহার্য জিনিষ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন এবং ভৃত্যটিও ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করে।

একদা ভৃত্যটির অসুখ করলে, গিরীশচন্দ্র গোপনে ঠাকুরের চরণামৃত এনে তাকে খাইয়ে দেন এবং তাতেই এই ভাগ্যবান্ ভৃত্যটি নিরাময় হয়ে ওঠে। এইভাবে সে ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে তাঁর কৃপা লাভ করে ধন্য হয়। পরে

ঠাকুরকে সে-কথা জানিয়ে গিরীশচন্দ্র যখন বলেন যে, তাঁর প্রসাদ খেয়েই ভৃত্যটি সুস্থ হয়েছে, তখন ঠাকুর অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন—"ও কি হীন বুদ্ধির কথা তোমার! ঈশ্বরের কাছে কি লাউ-কুমড়া ফল চাইতে হয়? তাঁর কাছে অমৃতত্ব লাভ হয়। রোগ আরাম করার জন্য তিনি ডাক্তার-কবিরাজ করে দিয়েছেন, ওষুধ করে রেখেছেন" ঠাকুরের এই কথা শুনে গিরীশচন্দ্র নীরব ছিলেন। বলা বাহুল্য, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে-কোন সিদ্ধাইয়ের বিরোধী ছিলেন।

❊

যদু মল্লিকের দ্বারবান্

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ভক্ত এবং শ্রীযদুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বরের বাগান-বাড়ীর রক্ষক। ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত যদুলাল মল্লিকের ব্যবস্থাপনায় ঠাকুর মাঝে মাঝে ঐ বাগানে বেড়াতে যেতেন এবং সেই সময় এই ভক্ত দ্বারবান্ ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হবার বিশেষ সুযোগ পেত। ঠাকুরের প্রতি তার প্রবল ভক্তি থাকায়, ঠাকুরের সেবার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত ঠাকুর সেখানে গেলে, তাঁকে বৈঠকখানায় বসিয়ে বড় হাতপাখা নিয়ে সে নিজে ঠাকুরকে হাওয়া করত। এমনকি, ভাগ্যবান্ এই দ্বারবান্‌টি মাঝে মাঝে ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করলে ঠাকুর এই পরম ভক্তের কাছে আহার গ্রহণ করে তাকে তৃপ্তিদান করতেন। বলা বাহুল্য, মালিক যদুলালের মত, কর্মচারী দ্বারবান্‌ও ঠাকুরের স্নেহলাভে ধন্য হয়।

❊

দ্বারবান্ হনুমান সিং

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অগাধ বিশ্বাসী এবং দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-রক্ষা কার্যে নিযুক্ত মহাবীর মন্ত্রের উপাসক ও ভক্ত দ্বারবান্।

একদা জনৈক বিরাটদেহী পাঞ্জাবী পালোয়ান, মন্দিরের দ্বারবানের পদ গ্রহণের জন্য, মন্দিরের মালিক মথুরানাথ বিশ্বাসের কাছে হাজির হয়। মথুরানাথ তাকে প্রথমে দ্বারবান্ হনুমান সিংকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করার শর্ত দেন এবং এই উপলক্ষে দু-জনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য করেন। নবাগত পালোয়ান এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কালে নিয়মিত ব্যায়াম ও পুষ্টিকর খাদ্য ভোজনে নিজেকে নিযুক্ত রাখে; অপরদিকে ভক্ত হনুমান সিং আগের মত কেবলমাত্র ইষ্টমন্ত্র জপ এবং দিনান্তে

একবার মাত্র আহার করেই দিন কাটাতে থাকে। হনুমান সিং, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অত্যন্ত ভক্তি করত এবং ঠাকুরও তার প্রতি বিশেষ স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঠিক আগের দিন ঠাকুর নিজেই হনুমান সিংকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল সম্পর্কে প্রশ্ন করায়, হনুমান সিং ভক্তিভরে ঠাকুরকে প্রণাম করে ও উত্তর দেয়—"আপনার কৃপা থাকে তো, আমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করব।" বলা বাহুল্য, ঠাকুরের প্রতি অগাধ বিশ্বাসী হনুমান সিং সেদিন মথুরানাথ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মুখে নবাগত শক্তিশালী পালোয়ানকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করে নিজের দ্বারবানের পদে পূর্বের ন্যায় বহাল থাকে।

*

সিপাহী কোয়ার সিং

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ অনুরাগী শিখ-ভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বাগানের পাশে পল্টনদের নিবাসে বাস করতেন। কালীবাড়ীর উত্তর দিকে তৎকালীন এক সরকারী বারুদখানা পাহারা দেবার জন্য একদল শিখসৈন্য নিযুক্ত ছিল এবং তারা মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে এসে আলাপ করত। সেই সৈন্যদলের হাবিলদার ছিলেন এই কোয়ার সিং। সৈন্যদলের হাবিলদারের পদে নিযুক্ত থাকলেও, কোয়ার সিং একজন ভক্তিমান পুরুষ ছিলেন এবং প্রায়ই ঠাকুরের কাছে এসে তাঁর পূতসঙ্গ লাভ করে আনন্দ পেতেন, ঠাকুরও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। ঠাকুরের সমাধি-অবস্থা থেকে জাগতিক-অবস্থায় ফিরে আসা দর্শন করে তিনি বিস্মিত হতেন এবং ঠাকুরকে "গুরু নানক" জ্ঞানে সম্মান করতেন।

একদা কোয়ার সিং তাঁর আস্তানায় সাধুভোজনের আয়োজন করেন এবং ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁকেও সেখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। সেখানে সেদিন অন্যান্য অনেক সাধুর সমাবেশ হয় এবং তাঁরা অপরিচিত ঠাকুরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর তাঁদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে বসেন। এরপর ভোজনের জন্য আহার্যবস্তু পাতায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই, বিনা আহ্বানেই ঠাকুর দ্রুত আহার সুরু করায়, তাতে অপর সাধুরা "আরে এ কেয়া রে" বলে নিজেদের মধ্যে উক্তি করেন। কিন্তু ঠাকুর কোন কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে, ভক্ত কোয়ার সিং-নিবেদিত আহার্য ভোজন করে তাঁকে তৃপ্তিদান করেন।

৷

কুস্তিগীর শরৎ

দক্ষিণেশ্বরের পার্শ্ববর্তী আড়িয়াদহ-নিবাসী কুস্তিগীর শরৎচন্দ্র মিত্র। ব্যায়ামচর্চা উপলক্ষে তিনি দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর দ্বারবানদের কুস্তির আখড়ায় এসে কুস্তি লড়তেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে এই কুস্তি দেখতে যাওয়ায়, ঠাকুরের সঙ্গে শরতের আলাপ-পরিচয় হয়।

একদা জনৈক বড় হিন্দুস্থানী পালোয়ানের সঙ্গে শরতের কুস্তি লড়ার প্রস্তুতির সময় ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হন এবং নিজে তাকে উৎসাহিত করেন। এমনকি, হিন্দুস্থানী পালোয়ানকে চাবাতে পারলে, শরৎকে নিজে হাতে মিঠাই খাওয়াবার কথাও ঠাকুর তাকে জানিয়ে দেন। যদিও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে শরতের জেতার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তবুও ঠাকুরের উৎসাহে তিনি অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর সেই হিন্দুস্থানী পালোয়ানকে কাবু করে ফেলেছিলেন। এই ঘটনায় ঠাকুর খুব হাততালি দিয়ে মনের আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বাঙালীর ছেলে হয়ে অতবড় হিন্দুস্থানী পালোয়ানকে হারিয়েছে বলে শরতের বীরত্বের প্রশংসা করেন। বলা বাহুল্য, ঠাকুর তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেদিন কুস্তিগীর শরৎকে তাঁর নিজের ঘরে জোর করে নিয়ে গিয়ে, নিজে হাতে তার মুখে মিঠাই তুলে দিয়েছিলেন এবং তার প্রতি স্নেহের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন।

*

মন্মথ গুণ্ডা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, উত্তর কলকাতার বাগবাজারের গোঁসাই-পাড়ার অধিবাসী মন্মথ ভট্টাচার্য। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও তিনি পৈতা ফেলে দিয়েছিলেন এবং আচার-বিচার কিছুই মানতেন না, বা খাদ্যাখাদ্য বিচার করতেন না। বাগবাজারে ৺সিদ্ধেশ্বরীতলার কাছেই তাঁর মামার বাড়ীতে তিনি বাস করতেন এবং জনৈক বিখ্যাত ধনীর নায়েবের চাকরী করতেন। ব্যায়ামে পারদর্শী, সবলদেহী মন্মথকে পাড়ার সবাই ভয় করত এবং কোথাও মারামারি হলে, তিনি একা গিয়ে একশো লোকের মহড়া রাখতে পারতেন। এজন্য পাড়ায় তিনি "মন্মথ গুণ্ডা" নামে পরিচিত ছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত যোগীন-মা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত শুরু করলে, যোগীন-মার তরুণ বয়স্ক ভাই হীরালালের তাতে আপত্তি ছিল। তাই একদিন যোগীন-মা তাঁর বাড়ীতে ঠাকুরকে আনার ব্যবস্থা করায়, হীরালাল সেদিন ঠাকুরকে ভয় দেখাবার জন্য মন্মথ গুণ্ডাকে

নিযুক্ত করেন। মন্মথও সেই অনুযায়ী ঠাকুরকে ভয় দেখাবার জন্য উদ্যত হন; কিন্তু তাঁকে দর্শন করে ও তাঁর কযেকটি কথা শুনেই মন্মথ একেবারে অন্য মানুষে পরিণত হন এবং তাঁর অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে ঠাকুরের কাছে কাঁদতে সুরু করেন। দয়াল ঠাকুর তাঁর সব অপরাধ ক্ষমা করেন এবং তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে যান।

ঠাকুরের উপদেশমত একদিন মন্মথ, ঠাকুরের ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্ত গঙ্গাধরের (স্বামী অখণ্ডানন্দ) সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন এবং গঙ্গাধরের মুখে ঠাকুর মন্মথের গুণ্ডামী ও অন্যান্য অনাচারের কাহিনী শোনেন। এরপর ঠাকুর তর্জনীর দ্বারা মন্মথের দেহ পরীক্ষা করে, তাঁকে মা কালীর মন্দিরের প্রদক্ষিণের পথে নিরালায় নিয়ে যান এবং সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গোপনে মন্মথকে কৃপা করেন। এই ঘটনার পর থেকেই মন্মথের জীবনে পরিবর্তন আসে এবং তিনি আরো কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করে তাঁর পরমভক্ত রূপে পরিণত হন।

পরবর্তীকালে, মন্মথ গলায় পৈতা, গেরুয়াবস্ত্র প্রভৃতি ধারণ করে স্বেচ্ছায় বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং তাঁর মুখে সর্বদা মাতৃনাম ধ্বনিত হতে থাকে। ঠাকুরের উদ্দেশে তিনি মাঝে মাঝে "প্রিয়নাথ" "প্রিয়নাথ" বলে চীৎকার করতেন এবং বরানগর মঠে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের কাছে যাতায়াত করতেন। অবশেষে বিসূচিকা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

*

ডাকাত বাগ্দী পাইক

তারকেশ্বরের নিকটবর্তী কুখ্যাত তেলো ভেলোর মাঠের ডাকাত তৎকালে এই তেলো-ভেলোর প্রান্তরে ডাকাতেরা পথিকের সর্বস্বহরণ করে তাদের প্রাণেও মেরে ফেলত এবং সেজন্য ডাকাতের ভয়ে দলবদ্ধ ভাবে পথিকেরা এখান দিয়ে যাতায়াত করত। তেলো এবং ভেলো—এই গ্রাম দুটীর কাছে এক ভীষণ করাল বদনা ৺কালীমূর্তিকে পূজা করে ডাকাতেরা ডাকাতি করতে বেরিয়ে পড়ত এবং সেই মূর্তির সামনেই নরহত্যা করত। এই মূর্তি আজিও "ডাকাত-কালী" নামে প্রসিদ্ধ।

একদা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী দলবদ্ধভাবে পদব্রজে কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার সময় সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং ক্লান্ত শরীরে সন্ধ্যার সময় এই ভয়ঙ্কর তেলো-ভেলোর মাঠে এসে উপস্থিত হন। এই সময় দীর্ঘদেহী, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ডাকাত বাগ্দী পাইক কাঁধে লাঠি নিয়ে কর্কশ স্বরে

চীৎকার করতে করতে তাঁর পশ্চাৎধাবন করলে, শ্রীশ্রীমা প্রথমেই ডাকাত বাগ্দীকে "পিতৃসম্বোধনে" তুষ্ট করেন; এমনকি, শ্রীরামকৃষ্ণকে সেই ডাকাতের জামাতা পরিচয়ে সম্পর্ক পাতিয়ে, শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে পৌছে দেবার জন্য সেই ডাকাতের শরণাপন্ন হন। এই সময় ডাকাতের স্ত্রীও সেখানে উপস্থিত হলে, তাকেও শ্রীশ্রীমা "মাতৃসম্বোধনে" নিজের বিপদের কথা জানান। ডাকাত-দম্পতি শ্রীশ্রীমায়ের আচরণে ও বিশ্বাসে মুগ্ধ হয় এবং নিজেরা তাঁকে এক দোকানে নিয়ে গিয়ে মুড়ি-মুড়কী খাইয়ে, সেই রাত্রে সেখানে শোওয়ার ব্যবস্থা করে। পরদিন সকালে তারা শ্রীশ্রীমাকে নিরাপদ স্থানে নিজেরাই পৌছে দিলে আশ্রয়দাতা ডাকাত পিতা-মাতাকে শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে যান।

শ্রীশ্রীমায়ের আমন্ত্রণে পরবর্তীকালে ডাকাত-দম্পতি সত্যই মাঝে মাঝে নির্ভয়ে দক্ষিণেশ্বরে "জামাতা" শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসত এবং "জামাতা" রূপেই ঠাকুরকে জ্ঞান করত। ঠাকুরও সামাজিক আচার ও জাতিবিচার ভুলে, এই পরম ভাগ্যবান ডাকাত ও তার স্ত্রীর সঙ্গে জামাতার মতই ব্যবহারে ও আদর-আপ্যায়নে তৃপ্ত করতেন। পূর্বে ডাকাতি ও নরহত্যা করলেও, এই ডাকাত বাগ্দী পাইক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে সরল ও সচ্চরিত্রে পরিণত হয়। এই ডাকাত-দম্পতি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাকেও অত্যন্ত স্নেহ করত এবং এই স্নেহের কারণ স্বরূপ তারা বলত যে, পুর্বোক্ত ঘটনার দিন সেই মাঠে তারা শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে "কালীরূপ" দর্শন করেছিল। ধন্য এই দম্পতি, যারা ডাকাত হয়েও শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রয় লাভ করেছিল।

*

মাতাল বিহারী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী, কলকাতার সিমুলিয়া পল্লী নিবাসী বিহারী ঘোষ। তিনি অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিলেন, "ওভার-সীয়ার"—পদে চাকরী করলেও তিনি সমুদয় অর্থ মদ খেয়েই খরচ করতেন এবং এই মদ-খাওয়া থেকে প্রথম জীবনে তাঁকে নিবৃত্ত করা যায়নি।

একদা সিমুলিয়া পল্লীতে ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, রামচন্দ্র সেদিন সন্ধ্যায় মাতাল বিহারীকে লুচি-আলুর দমের "চাট্" খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে তাঁর বাড়ীতে এনে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত করেন। ভাগ্যবান বিহারী সেদিন ঠাকুরকে একটি প্রণাম করে সকলের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করেন! কিন্তু ঠাকুরকে এই দর্শন ও প্রণাম করার পর থেকেই, অতবড়

মাতাল বিহারীর মদ খাওয়ার অভ্যাস ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং তিনি পুনরায় ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন।

পরবর্তীকালে, বিহারীর জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে এবং তিনি কলকাতা ত্যাগ করে নাগপুরে চাকরী নিয়ে চলে যান। সম্পূর্ণরূপে মদ খাওয়া ত্যাগ করে তিনি নাগপুরে নিজের ঠাকুর ঘরে সাধন ভজন করতেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথাতেই আনন্দে দিন কাটাতেন।

*

মাতাল কৃষ্ণধন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের তৎকালীন মদ্যপায়ী ইয়ার-বন্ধু কৃষ্ণধন দত্ত। তিনি গিরীশচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম জীবনে প্রচুর মদ্যপান করতেন এবং উভয়ের মধ্যে খুব হৃদ্যতা ছিল। একদা ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় দেখার পর, মদ্যপান করে তিনি গিরীশচন্দ্র প্রমুখ মাতাল বন্ধুদের নিয়ে গভীর রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে হাজির হন। সেখানে ঠাকুরের ঘরের কাছে গিয়ে তাঁরা চেঁচামেচি সুরু করায়, ঠাকুর তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলে দেন। অতঃপর ঠাকুরকে মধ্যস্থলে বসিয়ে কৃষ্ণধন মত্ত অবস্থায় "রাধে গোবিন্দ বলো" গান ধরেন এবং বন্ধুদের নিয়ে ঠাকুরকে ঘিরে নাচতে থাকেন। এরপর ভোরবেলায় যখন কৃষ্ণধন কলকাতায় ফিরে আসেন, তখন ঠাকুর-সম্পর্কে বন্ধুদের কাছে বলেন—"ছাখ দক্ষিণেশ্বরের ঐ লোকটা—ওর মত প্রাণের ইয়ার আর দেখিনি; ও খুব উঁচুদরের ইয়ার।"

*

মাতাল পদ্মবিনোদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহধন্য ভক্ত—বিনোদবিহারী সোম। তিনি উত্তর কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন। মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে প্রথম জীবনে তিনি মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং ঈশ্বর-চিন্তা করে তাঁর মাঝে মাঝে ভাবাবস্থা হত। ঠাকুরও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন পরে তিনি বিবাহ করলেও, সংসার যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু সঙ্গদোষে তিনি মদ্যপায়ী হয়ে ওঠেন এবং অচিরেই তাঁর পতন হয়। এই সময় থিয়েটারে যোগদান করে তিনি "পদ্ম বিনোদ" আখ্যা পান।

একদা গভীর রাত্রে পানাসক্ত অবস্থায় তিনি বাগবাজারে উদ্বোধন মঠের

(মায়ের বাড়ী) কাছে গিয়ে নেশার ঝোঁকে শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশে মিনতিভরা গান সুরু করায়, শ্রীশ্রীমা তাঁকে কৃপা করে দর্শন দিয়েছিলেন। ঐ মঠের স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা থাকায়, তিনি সারদানন্দকে "দোস্ত" বলে ডাকতেন। মদ্যপায়ী হলেও ঠাকুরের ওপর তাঁর খুব ভক্তি বিশ্বাস ছিল।

শেষ জীবনে তিনি কঠিন উদরী-রোগে আক্রান্ত হন এবং হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে শেষ মুহূর্তে তিনি পুনরায় ঠাকুরকে স্মরণ করে, ঠাকুরের "কথামৃত" শুনতে চান। অন্তিমকালে ঠাকুরের কথা শুনতে শুনতে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে এবং "রামকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করতে করতে পরমভক্ত ও ভাগ্যবান পদ্মবিনোদ দেহত্যাগ করেন।

*

বোবা উপেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের "মূক" ভক্ত উপেন্দ্র মজুমদার। তিনি বোবা ছিলেন বটে, কিন্তু বধির ছিলেন না; কাণে কথা শুনতে পেতেন। ধীর, স্থির, নম্র, বিনয়ী ভক্তটি ছিলেন ঠাকুরের পরমভক্ত রামচন্দ্র দত্তের মামাশ্বশুর-সম্পর্কীয়। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং তাঁর পূত সঙ্গলাভ করে আনন্দ পেতেন। ঠাকুরও এই "বোবা" ভক্তটিকে বিশেষ স্নেহ করতেন। কাশীপুরে "কল্পতরু" হওয়ার দিন ঠাকুর ভাগ্যবান উপেন্দ্রকে স্পর্শদ্বারা কৃপা করেছিলেন।

*

কুষ্ঠ রোগী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক অজ্ঞাত পরিচয়, পরম ভাগ্যবান ভক্ত। সে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিল।

একদা দক্ষিণেশ্বরে উক্ত কুষ্ঠরোগী এসে ঠাকুরের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা জানায় যে, ঠাকুর যদি একবার তার দেহে হাত বুলিয়ে দেন তবে সে ঐ কঠিন কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্তি পায়। ঠাকুর সব রকম সিদ্ধাইয়ের বিরোধী ছিলেন বলে প্রথমে সেই কুষ্ঠ রোগীর প্রার্থনায় রাজী হননি, কিন্তু তার প্রবল কাতরতা এবং অগাধ বিশ্বাস লক্ষ্য করে অবশেষে করুণাময় ঠাকুর কৃপা পরবশ হয়ে তার শরীরে হাত বুলিয়ে দেন এবং সে সত্য সত্যই কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু সেদিন সর্বক্ষণ ঠাকুরের হাতে এমন যন্ত্রণা হয় যে, তিনি অস্থির হয়ে মা-কালীর কাছে গিয়ে জানান যে, তিনি আর কখনো এমন কাজ করবেন না; পরে অবশ্য

ঠাকুরের সে যন্ত্রণা লাঘব হয়। পরবর্তীকালে ঠাকুর ভক্তদের কাছে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"তার রোগ সেরে গেল, কিন্তু তার ভোগটা (নিজের দেহ দেখিয়ে) এইটের ওপর দিয়ে হয়ে গেল।"

*

কণ্ঠিধারী ব্যক্তি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জনৈক তিলক কণ্ঠি প্রভৃতি ধর্মলিঙ্গ-ধারী ব্যক্তি। ঠাকুর যেবার রথযাত্রার দিনে কলকাতায় পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, সেদিন সেখানে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে এই কণ্ঠিধারী ব্যক্তিটিও উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শশধরকে নানা উপদেশ দানের পর তৃষ্ণার্ত ঠাকুর জল খেতে চাইলে, এই কণ্ঠিধারী ব্যক্তিটি সসম্ভ্রমে এক গেলাস জল এনে ঠাকুরকে খেতে দেন; কিন্তু ঠাকুর ঐ জল খেতে গিয়েও, খেতে পারলেন না। তখন অপর এক ব্যক্তি ঠাকুরের জন্য জল এনে দিলে, তিনি তা পান করেন। এই ঘটনার সময় নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি এই জল না খাওয়ার রহস্য অনুসন্ধান করে কণ্ঠিধারীর কনিষ্ঠভ্রাতার কাছ থেকে জানতে পারেন যে, উক্ত কণ্ঠিধারীর স্বভাবে দোষ ছিল। কণ্ঠিধারীর স্পর্শদোষদুষ্ট জল সেদিন তাই ঠাকুর পান করতে পারেন নি। ঠাকুরের এই সঠিক সিদ্ধান্তে স্বামীজী বিস্মিত হন।

*

গাড়ীওয়ালা বেণী সাহা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী, বরানগর নিবাসী গাড়ী ব্যবসায়ী। তাঁর কতকগুলি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী ছিল এবং সেগুলি ভাড়া দিয়ে তিনি অর্থ রোজগার করতেন। এই গাড়ীভাড়া উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়।

ঠাকুরকে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতার ভক্তদের বাড়ীতে আসতে হত এবং ফিরতে রাত হলে গাড়ীর চালকেরা গোলমাল করত ও অধিক ভাড়া দাবী করত। তাই ঠাকুর বেণী সাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন যে, তাঁর গাড়ীতেই ঠাকুর যাতায়াত করবেন এবং ফিরতে রাত হলেও, মোট তিন টাকা চার আনা গাড়ী ভাড়া দেবেন; এমনকি, ফিরতে বেশী রাত হলেও, বিলম্বের জন্য চালক যেন গোলমাল না করে। বলা আবশ্যক, ঠাকুরের গাড়ী ভাড়ার খরচ ভক্তেরাই বহন করতেন। বেণী সাহার সঙ্গে ঠাকুরের আরো বন্দোবস্ত

ছিল যে, তাঁকে যে-গাড়ী পাঠানো হবে, তার ঘোড়াগুলি যেন খুব ভাল হয়, যাতে চাবুক না মেরে কেবলমাত্র পা দিয়ে ধাক্কা দিলেই ঘোড়া ছুটতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলে, ঠাকুর অস্থির হয়ে পড়তেন এবং পাছে ঘোড়ার কষ্ট হয়, তাই ঠাকুর গাড়ীতে বেশী আরোহী ওঠাতে দিতেন না।

বলা বাহুল্য, ঠাকুরের অনুগত বেণী সাহা তাঁর সবকটি নির্দেশ মেনে নিয়েছিলেন এবং ঠাকুর খবর পাঠালেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ঠিক সময়ে গাড়ী পাঠিয়ে দিতেন। বেণী সাহার এই নিষ্ঠাব দরুণ ঠাকুর তাঁর ওপব সন্তুষ্ট ছিলেন।

*

মিঠাইওয়ালা ফাগু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশংসাপ্রাপ্ত বরানগবেব মিষ্টান্ন বিক্রেতা। বরানগর বাজারের কাছে তার খাবারের দোকান ছিল এবং ঐ দোকানের কচুরী বিখ্যাত ছিল। ঠাকুর তার কচুরী নিজে খেতে খুব ভালবাসতেন এবং অপরকে খাইয়েও আনন্দ পেতেন।

একদা হাতীবাগানের ষ্টার থিয়েটারে নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের "দক্ষ যজ্ঞ" নাটক দেখে ঠাকুর যখন ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে দক্ষিণেশ্বরে ফিরছিলেন, তখন বরানগর বাজারের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময়, ঠাকুর গাড়ী থামিয়ে ফাগুর দোকানের হিংয়ের কচুরী, রামলালকে দিয়ে কিনিয়ে খেয়েছিলেন। কাশীপুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের কাছে আগত ভক্তগণকে ঠাকুর মাঝে মাঝে ফাগুর কচুরী খাওয়াতেন। একদা গিরীশচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ভক্তদের জন্য ঠাকুর ফাগুর দোকানের গরম কচুরী, লুচি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন আনিয়ে, নিজে তা প্রসাদ করে ভক্তদের খেতে দিয়েছিলেন। ভাগ্যবান ফাগু তার দোকানের উপাদেয় কচুরী খাইয়ে ঠাকুর ও তাঁর ভক্তদের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

*

জ্ঞানী চাষী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় জ্ঞানবান চাষী। একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের তামাক খাওয়ার সময় উক্ত চাষীটি ঠাকুরের কাছে এসে তামাক খেতে চাইলে, ঠাকুর তাঁর কল্কেটি

তামাক খাওয়ার জন্য চাষীটিকে দেন। ভাগ্যবান চাষীটি ঠাকুরের কল্কেতে তামাক খেয়ে চলে যাওয়ার পর, ঠাকুর লক্ষ্য করেন যে, সেখানে একটি পয়সা সে ফেলে গিয়েছে। তাই ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সেই চাষীটিকে ডেকে পয়সাটি নিয়ে যাবার কথা বলায়, চাষীটি তা নিতে অস্বীকার করে এবং ঠাকুরকে জানায়—"ইচ্ছা করেই পয়সাটি রেখে এসেছি; মন্দিরের কাঙাল-গরীবদের সেবায় লাগিয়ে দেবেন। যে মন্দিরে কাঙাল-গরীবের সেবা হয়, সেখানকার এক ছিলিম তামাকও অমনি খেতে নেই।" ঠাকুর চাষীটির এই জ্ঞান-ভক্তির কথা এবং সেই অনুযায়ী কাজের পবিচয় পেয়ে তার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হন।

*

হঠযোগী নারায়ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণেব সান্নিধ্যে আগত জনৈক হঠযোগী। তিনি কিছুদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং পঞ্চবটীতলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। হঠযোগী নারায়ণ ভাত বা রুটী আহার না করে, কেবলমাত্র দুধ আর আফিং খেয়ে থাকতেন এবং এজন্য তাঁর মাসে পচিশ টাকা খরচ পড়ত; কিন্তু তাঁর টাকার বড় অভাব ছিল। ঠাকুর নিজে গিয়ে পঞ্চবটীতে এই হঠযোগীর সঙ্গে আলাপ করতেন।

একদা ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান যোগীন (স্বামী যোগানন্দ) কৌতুহলের বশে হঠযোগীর ক্রিয়া দেখাব জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, ঠাকুর সেখান থেকে যোগীনের হাত ধরে টেনে নিজের ঘরে আনেন এবং ঐ সব ক্রিয়া দেখতে বা শিখতে নিষেধ করেন।

ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত, আড়িয়াদহের কৃষ্ণকিশোব ভট্টাচার্যের পুত্র রামপ্রসন্ন এবং আরও কয়েকজন ঐ হঠযোগীকে খুব ভক্তি করতেন ও তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। হঠযোগীর আর্থিক অভাব নিবারণের জন্য রামপ্রসন্ন ঠাকুরকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন তাঁর ভক্তদের বলে হঠযোগীর জন্য কিছু টাকার ব্যবস্থা করেন। একবার ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান রাখালকেও (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) হঠযোগী অনুরূপ প্রস্তাব করায়, রাখাল সে-কথা ঠাকুরকে জানান। অতঃপর হঠযোগী নিজেই একদিন ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর কিছু ব্যবস্থার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। সেজন্য করুণাময় ঠাকুর তাঁর কয়েকজন ভক্তকে হঠযোগীর কাছে তাঁকে সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

হিন্দুস্থানী সাধু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়, জনৈক অজ্ঞাতনামা বেদান্তবাদী সাধু। ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই হিন্দুস্থানী সাধুটির সঙ্গে আলাপ করেন এবং তাঁকে স্বীয় সান্নিধ্যে আনেন।

একদা ঠাকুর তাঁর বিশিষ্ট ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছির নতুন বাগান দর্শন করে, অপর ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাগানে যাওয়ার পথে একটি গাছ-তলায় খাটিয়াতে এই সাধুটিকে বসে থাকতে দেখেন। তাঁকে দেখামাত্রই ঠাকুর নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে হিন্দীতে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কথাবার্তা কন এবং পরিচয়ে জানতে পারেন যে, সাধুটি একজন "পরমহংস"। সাধুটির সঙ্গে সদালাপে ঠাকুর এত প্রীত হন যে, তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবার জন্য রামচন্দ্র দত্তকে অনুরোধ করেন। সেখান থেকে চলে আসার সময় সাধুটি ঠাকুরকে গাড়ী অবধি পৌঁছে দেন; অনেকদিনের পরিচিত বন্ধুর মত ঠাকুরও তাঁর বাহুর ভেতর নিজের বাহু জড়িয়ে হেঁটে এসে ওঠেন।

পরে একদিন রামচন্দ্র সেই সাধুটিকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলে, ঠাকুর তাঁর সঙ্গে প্রিয়জনের মত ব্যবহার করেন এবং নিজের কাছে ছোট তক্তপোষের ওপর সাধুটিকে বসিয়ে বহুক্ষণ হিন্দীতে তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। সাধুটির মুখে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শুনে ঠাকুর সেদিন সমাধিস্থ হন এবং সাধুটিও জীবনে এই প্রথম সমাধি-অবস্থা প্রত্যক্ষ দর্শন করে বিস্মিত হন। পরে সাধুটি ঠাকুরের সঙ্গে মা-কালীর মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করেন এবং ভক্তিভরে বলেন—"কালী প্রধানা হ্যায়"। ঠাকুর তাঁর এই প্রিয় সাধুটিকে "প্রবর্তকের ঘর" বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং সর্ব বিষয়ে তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।

*

কাশ্মীরী সাধু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, কাশ্মীরের নাগা-সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক অজ্ঞাতনামা জটাধারী সাধু। দীর্ঘ জটা শ্মশ্রু বিশিষ্ট এই সাধুটি অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। তিনি কিছুদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে কুঠি বাড়ীতে বাস করায়, ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ঠাকুর তাঁকে "মহাপুরুষ" বলে নির্দেশ করতেন এবং তাঁর ভক্তদের ঐ সাধুকে দর্শন করার জন্য কুঠি-বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন।

*

অনন্দময় সাধু

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জনৈক আনন্দময় সাধু। তাঁর মুখখানি সর্বদাই প্রসন্ন থাকত এবং মুখে একটি সুন্দর জ্যোতির প্রকাশ হত। তিনি বেশীর ভাগই ঘরে বসে থাকতেন এবং আপনমনে ফিক ফিক করে হাসতেন। সকালে ও সন্ধ্যায় একবার করে ঘরের বাইরে এসে গাছপালা, আকাশ, গঙ্গা সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন ও আনন্দে বিভোর হয়ে দুহাত তুলে নাচতেন; কখনো-বা হেসে গড়াগড়ি দিতেন, আর বলতেন—"বাঃ বাঃ ক্যায়া মায়া – ক্যায়সা প্রপঞ্চ বনায়া!" ঠাকুর সাধুটিকে বড় ভালবাসতেন।

*

জ্ঞানোন্মাদ সাধু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় পাগল-সাধু। একদা ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে মা-ভবতারিণীর ঘরে বসেছিলেন, সেই সময় এই সাধুটি ছেঁড়া কাপড় গায়ে দিয়ে এবং হাতে একটি হাঁড়ী নিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় মন্দিরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন। সেখানে এসে তিনি এমন উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ করেন যে, তার শব্দে যেন মন্দির কেঁপে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি মন্দিরের বাইরে চলে যান এবং যেখানে লোকজন খেয়ে পাতা ও উচ্ছিষ্ট ফেলেছে, সেখানে কুকুরদের সঙ্গে আহার করেন। একটি কুকুর খুব অশান্ত হওয়ায়, তার কানটি ধরে তিনি বলেন—"তুই-ও খা, আমিও খাই"। ঠাকুর লক্ষ্য করেন যে, সেই কান ধরায় কুকুরটি শান্তভাবে রইল, যেন কতদিনের ভাব! পরে সেই সাধুটিকে ভাল খাবার দেওয়া হলেও, তিনি তা না খেয়ে হন্ হন্ করে ফটক দিয়ে চলে যান। ঠাকুরের আদেশে তাঁর ভাগ্নে হৃদয় সাধুটির পেছনে পেছনে খানিকটা গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—"সত্য কি?" তার উত্তরে সাধুটি নিকটবর্তী ডোবার জল দেখিয়ে বলেন—"এই জল, আর গঙ্গাজল যেদিন এক দেখবি, সেদিন সত্য ধারণা হবে" এরপর হৃদয় তাঁর চেলা হওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলে, সাধুটি মাটি থেকে একটা ইট তুলে হৃদয়কে মারবার জন্য তাড়া করলে, হৃদয় ছুটে পালান এবং সাধুটিও দ্রুতপদে চলে যান। এই জ্ঞানোন্মাদ সাধুটির অবস্থা দেখে ঠাকুর মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁর যেন এমন অবস্থা না হয়।

*

হৃষীকেশের সাধু

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাবস্থার সময় ঠাকুরের সান্নিধ্যে আগত হৃষীকেশের জনৈক উচ্চমার্গের সাধু। ঠাকুরের মধ্যে তিনি সমাধির পাঁচ প্রকার - যথা, পিপীলিকাবৎ, মীনবৎ, কপিবৎ, পক্ষিবৎ এবং তির্যগবৎ অবস্থা-গুলি প্রত্যক্ষ করেন এবং ঠাকুরকে সে-কথা জানিয়ে যান।

*

গেঁড়াতলার ফকীর

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত জনৈক অজ্ঞাতনামা মুসলমান ফকীর। একদা সন্ধ্যায় কলকাতার গেঁড়াতলা মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি অঝোরে কাঁদছিলেন এবং প্রেমের স্বরে আর্তভাবে ডাকছিলেন—"প্যারে আ-যাও, আ যাও!" এমন সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে করে ভ্রাতুস্পুত্র রামলাল প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাট থেকে সেই পথেই ফিরছিলেন। ফকীরের আর্তকণ্ঠ শুনেই ঠাকুর সহসা গাড়ী থেকে নেমে তাঁর কাছে দৌড়ে যান এবং তাঁকে প্রেমে জড়িয়ে ধরেন। ভক্ত ফকীরও প্রেমিক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আলিঙ্গন অবস্থায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। পরে ফকীর একটু শান্ত হলে, ঠাকুর সেখান থেকে চলে যান। ভাগ্যবান ফকীরের সঙ্গে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপূর্ব মিলন দৃশ্য, সেদিন সেখানে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ উপভোগ করেছিলেন।

*

ভবানীপুরের পাদ্রী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের জনৈক অজ্ঞাতনামা খ্রীষ্টান সাধু। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম-নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বিশেষ বন্ধু। একদা শিবনাথের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে তিনি দক্ষিণেশ্বরে বন্ধু শিবনাথের সঙ্গেই ঠাকুরকে সাক্ষৎ করতে যান এবং শিবনাথ ঠাকুরের কাছে তাঁর সেই খ্রীষ্টান বন্ধুটির পরিচয় দেন। পরিচয় পাওয়া মাত্রই, ঠাকুর সেই খ্রীষ্টান পাদ্রীর সামনে মাটিতে মাথা রেখে প্রণত হয়ে বলেন—"যীশুখ্রীষ্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম।" এই ঘটনায় সেই খ্রীষ্টান পাদ্রী বিস্মিত হয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন—"মশাই যে যীশুর চরণে প্রণাম করছেন, তাঁকে আপনি কি মনে করেন?" ঠাকুর উত্তরে বলেন—"কেন, ঈশ্বরের অবতার!" অতঃপর ঠাকুর তাঁকে অবতারত্ব ব্যাখ্যা করে শোনালে, সেই খ্রীষ্টান পাদ্রী ঠাকুরের উদার ধর্মমতের সার্বভৌমিকতার ভাবে বিশেষ মুগ্ধ হন।

কাটোয়ার ট্যারা বৈষ্ণব

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, কাটোয়া নিবাসী জনৈক অজ্ঞাতনামা বৈষ্ণব ভক্ত। তাঁর চক্ষু ট্যারা ছিল। তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন এবং নানাবিধ প্রশ্ন করতেন। একদা তিনি ঠাকুরকে জন্মান্তরের বিষয়ে প্রশ্ন করলে, ঠাকুর তাতে অসন্তুষ্ট হন এবং জন্মান্তরবাদের খবর ছেড়ে ঈশ্বরে ভক্তিলাভের জন্য তাঁকে উপদেশ দেন।

*

কাশীর ভৈরব-ভৈরবী

ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে কাশীতে অবস্থানকালে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন গঙ্গার ধারে একটি ভৈরবী-চক্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একজন করে ভৈরব এবং একজন করে ভৈরবী। তাঁরা ঠাকুরকে "কারণ" পান করতে বলায় ঠাকুর তাঁদের জানান যে তিনি "কারণ" স্পর্শ করতে পারেন না। তাঁরা কিন্তু ঠাকুরের সম্মুখেই "কারণ" পান করে নৃত্য সুরু করেন এবং পাছে নৃত্যের ঝোঁকে তাঁরা গঙ্গায় পড়ে যায়, সেজন্য ঠাকুরের ভয় হয়। তাঁদের জপ-ধ্যান করতে না দেখে ঠাকুর দুঃখিত হয়েছিলেন।

*

জব্বলপুরের ভক্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, জব্বলপুর নিবাসী জনৈক অজ্ঞাতনামা এম. এ. পাশ যুবক। তিনি প্রথম জীবনে ঘোরতর নাস্তিক ছিলেন। একদা দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কাছে এসে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বহু নেতিবাচক উক্তির পর ঠাকুর তাঁকে অজানা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতে উপদেশ দেন এবং পরে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। কয়েকদিন পরেই সেই নাস্তিক ভদ্রলোকটি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ফিরে এসে তাঁর চরণ ধরে কাঁদতে থাকেন এবং বলেন যে, ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর সব সন্দেহের অবসান হয়েছে। পরে সেই ভদ্রলোকই পরমভক্তে পরিণত হন।

*

মণিরামপুরের ভক্ত

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জনৈক পেন্সনভোগী সরকারী কর্মচারী এবং ভক্ত। তিনি পূর্বে পি ডব্লিউ. ডি-তে কাজ করতেন। তিনি মণিরামপুরে বাস করেন শুনে, ঠাকুরের বাল্যসখা শ্রীরামকে স্মরণ হয়; কারণ, কামারপুকুর নিবাসী উক্ত শ্রীরাম মল্লিক তখন মণিরামপুরের চাণকে বাস করতেন। ঠাকুর তাই মণিরামপুরের ভক্তকে বলেন—"শ্রীরামের দোকান

তোমাদের ওখানে। ওদেশে শ্রীরাম আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। সেদিন এখানে এসেছিল।" ঠাকুর উক্ত মণিরামপুরের ভক্তকে গুরুবাক্য, সৎসঙ্গ, পরব্রহ্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন।

*

সিঁথির বেদান্তবাগীশ

উত্তর কলকাতার অন্তর্গত সিঁথির জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। নাম অজ্ঞাত। স্থূলকায় ও সদাহাস্যমুখ এই ভক্তটি কাশীতে বেদান্ত পড়েছিলেন। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতেন এবং ঠাকুরকে খুব মান্য করতেন। ঠাকুরও তাঁর সঙ্গে বেদান্তের আলোচনা করে আনন্দ পেতেন।

*

শ্রীরামপুরের গোঁসাই

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, হুগলী জেলার শ্রীরামপুর নিবাসী জনৈক অজ্ঞাতনামা বৈষ্ণব ভক্ত। তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে আসেন এবং তার কাছে দু-একদিন থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভক্ত গোঁসাইটির আন্তরিক আগ্রহ লক্ষ্য করে, করুণাময় ঠাকুর তাকে নিজের কাছে কয়েকদিন যত্ন করে রেখেছিলেন। কিন্তু তাকে আশ্রয় দেবার ফলে, অপর সঙ্গী প্রতাপচন্দ্র হাজরা আপত্তি করায়, ঠাকুর হাজরাকে ভৎর্সনা করেছিলেন।

*

মালপাড়ার গোঁসাই

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত মালপাড়া নিবাসী জনৈক অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধ ভক্ত। ঠাকুরের নাম শুনে একদা গোঁসাই বাবাজী দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে খুঁজতে থাকেন ও চীৎকার করতে থাকেন—"মহাপুরুষ কোথায়? মহাপুরুষ কোথায়?" ঠাকুর দূর থেকে বাবাজীকে দেখতে পেয়ে, জনৈক দুর্গানন্দকে দেখিয়ে দেবার জন্য ভাগ্নে হৃদয়কে আদেশ করেন এবং নিজে নাটমন্দিরের এক কোণে, কাপড়ে আপাদমস্তক ঢেকে ব'সে থাকেন। এদিকে গোঁসাই বাবাজী হৃদয়ের কথামত দুর্গানন্দের কাছে এসে বলেন—"ইনি তো মহাপুরুষ নন, মহাপুরুষ কোথায়?" চারদিকে তল্লাশী করে ঘুরে ঘুরে গোঁসাই বাবাজী মা-কালীর মন্দিরে এসে মা-কে প্রণাম করেন ও নাটমন্দিরের চারদিকে নিরীক্ষণ করতে থাকেন। অবশেষে নাটমন্দিরের একপাশে বস্ত্রাবৃত ঠাকুরকে লক্ষ্য করে, তিনি দৌড়ে এসে তাঁর আবরণ খুলে দেন। এই সময় ঠাকুর ভাবাবস্থায় দাঁড়িয়ে উঠতেই, গোঁসাই বাবাজী ঠাকুরের শ্রীচরণে পড়ে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকায়, ঠাকুর এই বৃদ্ধ ভক্তকে কৃপা করেন।

দশম স্তবক

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত, বিত্তশালী ও বেদান্তবাদী পুরুষ। তিনি কলকাতার সুতাপটীতে বাস করতেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বশতঃ তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে যেতেন এবং তাঁর পূত সঙ্গ লাভ করে আনন্দে দিন যাপন করতেন। ঠাকুরও সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন লক্ষ্মীনারায়ণকে বিশেষ স্নেহ করতেন; এমনকি তাঁর সুতাপটীর বাড়ীতেও তিনি একবার শুভাগমন করেছিলেন। শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে লক্ষ্মীনারায়ণের অধিক ব্যুৎপত্তি থাকায়, তিনি প্রথম প্রথম ঠাকুরের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ে নানাপ্রকার তর্ক করতেন; কিন্তু সকল বিষয়ে পরাজিত হয়ে অগত্যা তিনি ঠাকুরের বশ্যতা স্বীকার করেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের বিছানায় ছেঁড়া চাদর লক্ষ্য করে লক্ষ্মীনারায়ণের মনে বিশেষ দুঃখের উদ্রেক হয় এবং তিনি ঠাকুরের অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে পরম শ্রদ্ধা সহকারে ঠাকুরের নামে দশহাজার টাকা লিখে দেবার প্রস্তাব করেন, যাতে ঐ মূলধনের সুদের টাকায় ঠাকুরের আর্থিক সমুদয় দুর্গতির লাঘব হয়। কিন্তু ভক্তের এই প্রস্তাব শোনা মাত্রই ঠাকুর "মা" "মা" বলে কাঁদতে কাঁদতে অচৈতন্য হয়ে পড়েন এবং সম্বিৎ ফিরে এলে লক্ষ্মীনারায়ণকে অত্যন্ত তিরস্কার করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ তখন ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়ের মাধ্যমে সেই টাকা পুনরায় দেওয়ার চেষ্টা করলে, বিক্ষুব্ধ ঠাকুর লক্ষ্মীনারায়ণকে দক্ষিণেশ্বরে আসতে নিষেধ করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের নির্লোভ আচরণে বিস্মিত ও মুগ্ধ হন এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে ঠাকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

পরবর্তীকালে, কাশীপুরে অসুস্থ অবস্থায় থাকাকালীন ঠাকুরের জন্য খরচের বিষয়ে কয়েকজন গৃহীভক্তের সঙ্গে ত্যাগী ভক্তদের কিছু ভুল বোঝাবুঝির ফলে সাময়িক মনোমালিন্য হয়, সেজন্য ত্যাগী ভক্তেরা গৃহীভক্তদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরুন, সে সময় খুবই আর্থিক অনটন ঘটে। সেই অসময়েও পরমভক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ অর্থ এনে ত্যাগী ভক্তদের কাছে জমা রেখে যান, কিন্তু ঠাকুরের নির্দেশে তা ফেরৎ পাঠানো হয়। বলা আবশ্যক, উক্ত সাময়িক মনোমালিন্যের শীঘ্রই অবসান ঘটেছিল এবং লক্ষ্মীনারায়ণের কাছ থেকে টাকা নেবার প্রয়োজন হয়নি। যাই হোক, লক্ষ্মীনারায়ণ সব সময় ঠাকুরের সেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখে কৃতার্থ বোধ করতেন।

*

মাড়োয়ারী ভক্ত

কলকাতার বড়বাজারের ১২নং মল্লিক ষ্ট্রীট নিবাসী জনৈক ভাগ্যবান মাড়োয়ারী ভক্ত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল এবং ঠাকুরও তাঁর মল্লিক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে "অন্নকূট" উপলক্ষে একদা শুভাগমন করেন। ঠাকুরের আগমনে দলে দলে অপর মাড়োয়ারী ভক্তেরা উপস্থিত হয়ে ঠাকুরকে বিশেষ শ্রদ্ধা জানান, কেহ-বা ঠাকুরের পদসেবা করেন, কেহ-বা শাস্ত্রীয় আলোচনা করেন। ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে পরিস্কার হিন্দী ভাষায় কথোপকথন করায়, সেদিন মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ছোট গোপাল, বাবুরাম, রাম চাটুজ্যে প্রভৃতি ঠাকুরের সঙ্গী অপর ভক্তেরা বিস্মিত হন। এমনকি, হিন্দীতে কথা বলার পর, ঠাকুর সে কথার অর্থ বাংলাতে এঁদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে শ্রীশ্রীময়ূর মুকুটধারী বিগ্রহের পূজা দর্শন করার পর, ঠাকুর নির্মাল্য ধারণ করেন এবং সমাধিস্থ হন। পরে বিগ্রহের আরতির সময় ঠাকুর স্বয়ং, বিগ্রহকে চামর ব্যজন করেন এবং এই ভাগ্যবান ভক্তের বাড়ীতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

*

হালদার-পুরোহিত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে পদাঘাতকারী মহাপাষণ্ড ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন ঠাকুরের পরমভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের বাড়ীর কুল-পুরোহিত এবং কালীঘাটের হালদার বংশীয় ব্রাহ্মণ—নাম চন্দ্র হালদার। কিন্তু তিনি "হালদার-পুরোহিত" নামেই পরিচিত ছিলেন।

পরমভক্ত মথুরানাথ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞান করেন এবং তাঁর প্রতি অবিচলিত ভক্তি প্রদর্শন করেন দেখে, হালদার-পুরোহিতের মন ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তিনি মনে মনে ধারণা করেন যে, ঠাকুর বুঝি কোন প্রকার বশীকরণ ক্রিয়ার দ্বারা বড়লোক মথুরানাথকে নিজের অনুগত করে রেখেছেন এবং সকল প্রকার সুবিধা আদায় করে নিচ্ছেন। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে লোভী হালদার-পুরোহিত ক্রমশঃ পশুতে পরিণত হন।

ঠাকুর মাঝে মাঝে কলকাতার জানবাজারে ভক্ত মথুরানাথের বাড়ীতে গিয়ে থাকতেন। একদা জানবাজারে মথুরানাথের বাড়ীতে থাকাকালীন এক সন্ধ্যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একাকী অর্ধবাহ্য অবস্থায় নিরালায় বসে থাকতে দেখে, হালদার-পুরোহিত তাঁর কাছে উপস্থিত হন। তিনি ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে

ধাক্কা দিতে দিতে বার বার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, কী উপায়ে ঠাকুর মথুরানাথকে বশ করেছেন। ভাবস্থ ঠাকুরের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে অবশেষে হালদার-পুরোহিত এত ক্রুদ্ধ হন যে, ঠাকুরকে সজোরে পদাঘাত করে তিনি অন্যত্র চলে যান। কিন্তু পরম করুণাময় ও ক্ষমাপরায়ণ ঠাকুর তাঁকে মনে মনে মার্জনা করেন এবং পাছে এই ঘটনা জানলে ভক্ত মথুরানাথ হালদার-পুরোহিতকে কঠিন দণ্ড দেন, সেজন্য ঠাকুর সেকথা তখন কাকেও জানাননি। কিন্তু পাপের পরিণতি স্বরূপ কিছুদিন বাদেই ঘটনাচক্রে অপর এক অপরাধের জন্য মথুরানাথ কর্তৃক হালদার-পুরোহিত বিতাড়িত হন। পরবর্তীকালে, হালদার-পুরোহিত কর্তৃক পদাঘাতের ঘটনা মথুরানাথের কাছে ঠাকুর বিবৃত করায়, মথুরানাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন যে, এই কথা সেই সময় ঠাকুর তাঁকে জানালে, তিনি হালদার-পুরোহিতের মুণ্ডচ্ছেদন করতেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক, উক্ত হালদার-পুরোহিতের সঙ্গে কালীঘাটের ৺কালীমন্দিরের সেবাইৎ হালদার-বংশের কোন যোগ ছিল না; বরং "বিলাত-ফেরৎ" হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দকে যখন দক্ষিণেশ্বর ৺কালীমন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, তখন এই সেবাইৎ হালদার-বংশীয়েরাই ঠাকুরের সন্তান স্বামীজীকে কালীঘাটের ৺কালীমন্দিরে মহাসমাদরে প্রবেশ করিয়ে উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

*

খেলাৎ ঘোষের সম্বন্ধী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী পরম বৈষ্ণব। তিনি তাঁর ভগ্নীপতি ৺খেলা ঘোষের বাড়ীতে বাস করতেন এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন। নাম অজ্ঞাত।

বয়সে প্রবীণ এই ভক্তটি ঠাকুরের প্রতি এত অনুরক্ত হন যে, তাঁদের বাড়ীতে ঠাকুরের পদার্পণের জন্য ঠাকুরকে বিশেষ আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেজন্য ঠাকুর ৺খেলাৎ ঘোষের বাড়ীতে একদা রাত্রে শুভাগমন করলে, ভক্তটি ঠাকুরকে যথেষ্ট আপ্যায়ন করেন ও তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে কৃতার্থ হন। সেই বাড়ীতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হয়েছিল।

*

শিবু আচার্যের শ্বশুর

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য বিখ্যাত পাঁচালী গায়ক শিবু আচার্যের দরিদ্র, নিষ্ঠাবান এবং ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ শ্বশুর। তাঁর বাড়ী ছিল হুগলী জেলার ভদ্রকালী গ্রামে। নাম অজ্ঞাত।

একদা জামাতা শিবুর সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে এবং তাঁর শ্রীমুখের বাণী শুনে মোহিত হন এবং তাঁর কাছে যাতায়াত শুরু করেন। ক্রমশঃ তিনি ঠাকুরের প্রতি এত অনুরক্ত হন যে, সপার্ষদ ঠাকুরকে নিজের গোলপাতার ছাউনীর জীর্ণ মাটির বাড়ীতে এনে "ভিক্ষা" দেবার প্রবল ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে। অতিশয় সঙ্কোচের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর মনের বাসনা প্রকাশ করায়, ভক্তের ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রেমময় ঠাকুর রাজী হন।

নির্ধারিত দিনে শিবু আচার্যের সহায়তায় ভদ্রকালীতে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরে সদলবলে ঠাকুর শুভাগমন করেন এবং তাঁর বাড়ীর উঠানে বসেই ভক্তগণসহ তত্ত্বালাপ করেন। এইদিন পতাকা সজ্জিত পান্‌সী নৌকায় চড়িয়ে দক্ষিণেশ্বরের অপর পারে ভদ্রকালীতে ঠাকুরকে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তাঁকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। সেদিন ভদ্রকালীর ঘাটের ওপর সুন্দর ফটক তৈরী করা হয়েছিল এবং বহু ভক্ত নরনারী ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানে ঠাকুরের গলায় সুগন্ধি ফুলের মালা পরিয়ে দিতেই তিনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ এইদিন নিজবাড়ীতে ঠাকুরকে এনে "ভিক্ষা" দিতে পারায় নিজে কৃতার্থ হন।

*

রাখালের বাপের শ্বশুর

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, তথা শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষের দাদু-সম্পর্কীয়। রাখালচন্দ্রের পিতা আনন্দমোহন ঘোষ, রাখালের মাতার মৃত্যুর পর এই ভদ্রমহোদয়ের কন্যাকেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তিনি সাধকলোক ছিলেন। নাম অজ্ঞাত।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনে তিনি জামাতা আনন্দমোহনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যান এবং ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন। গৃহস্থাশ্রমে থেকেও ভগবানলাভের উপায় সম্পর্কে ঠাকুর তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

*

ভূধর চাটুজ্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। নাম অজ্ঞাত। তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা ভূধর চাটুজ্যেও ঠাকুরের অনুরাগী ছিলেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি কলকাতায় থাকাকালীন তাঁদের ঠনঠনিয়ার বাড়ীতে অবস্থান করতেন; সেই সময় ঠাকুর তাঁদের বাড়ীতে শুভাগমন করায়, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করেন। পরে শশধর পণ্ডিতকে নিয়ে তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসেন এবং তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ঠাকুরের সঙ্গে তিনি সেদিন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করেন এবং ঠাকুর তাঁকে ঈশ্বরে মন রেখে সংসার করার জন্য উপদেশ দেন। ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভ করার পর তিনি শেষ জীবনে একাকী অতি পবিত্রভাবে কাশীতে বাস করতেন এবং সর্বদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে চিন্তা করতেন।

*

সুরেন্দ্রর মেজদাদা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের মধ্যম অগ্রজ ভ্রাতা। নাম অজ্ঞাত। তিনি জজ ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে ঠাকুরের আগমন উপলক্ষে, ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ঠাকুর সেদিন তাঁর সঙ্গে সেখানে বহুক্ষণ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন এবং তাঁকে নানা সদুপদেশ দেন।

*

প্রাণকৃষ্ণের জ্ঞাতি

হুগলী জেলার জনাইয়ের ভক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জনৈক আত্মীয়। নাম অজ্ঞাত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর যাতায়াত থাকায়, ঠাকুর তাঁকে একদা দেবদুর্লভ তত্ত্বকথা শুনিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন।

*

ভাদুড়ীর পুত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক ও পরমভক্ত ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ীর জনৈক পুত্র। নাম অজ্ঞাত। তিনি মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে ঠাকুরের গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে একদা ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর কথামৃত পান করেন।

*

হৃদয়ের ছেলে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদা তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রামের শিহড় গ্রামের বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থানকালে, হৃদয়ের ৪।৫ বছরের শিশুপুত্র ঠাকুরের স্নেহস্পর্শে ধন্য হয়। এই সম্পর্কে ভক্তদের কাছে ঠাকুর বলেছিলেন—"ওদেশে হৃদয়ের ছেলে সমস্তদিন আমার কাছে থাকত—চার-পাঁচ বছরের ছেলে। আমার সামনে এটা ওটা খেলা করত, এক রকম ভুলে থাকত। যেই সন্ধ্যা হয়, অমনি বলে—মা যাব। আমি কত বলতুম—পায়রা দোব, এইসব কথা—সে ভুলত না; কেঁদে কেঁদে বলত—মা যাব। খেলাটেলা কিছুই ভাল লাগছে না। আমি তার অবস্থা দেখে কাঁদতুম।"

*

কেশবের পুত্রদ্বয়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণাচন্দ্র অল্প বয়সেই ঠাকুরের স্নেহলাভে ধন্য হন। একদা অসুস্থ কেশবচন্দ্রকে তাঁর কলকাতার বাড়ী "কমলকুটীরে" ঠাকুর দেখতে গেলে, তাঁর এই কিশোর পুত্রটিকে ঠাকুরের পাশে বসিয়ে, পুত্রটিকে আশীর্বাদ করতে বলা হয়। "আমার আশীর্বাদ করতে নেই" বলে ঠাকুর অক্ষমতা জানালে, ব্রাহ্মভক্ত অমৃতলাল বসু ঠাকুরকে তবুও বিশেষ অনুরোধ করায়, ঠাকুর পুত্রটির সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে পরম স্নেহদান করেন।

কেশবচন্দ্রের দেহত্যাগের পর তাঁর মা সারদাসুন্দরীদেবী একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র করুণাচন্দ্র এবং কনিষ্ঠপুত্র নির্মলচন্দ্রকে নিয়ে উপস্থিত হয়ে হরিনাম করায়, কেশবচন্দ্রের শোক তাঁরা অনেকটা সামলেছেন দেখে ঠাকুর সন্তুষ্ট হন। পরবর্তীকালে ঠাকুরের অসুস্থতার খবর পেয়ে কেশবের মা যেদিন কেশবের স্ত্রীসহ ঠাকুরকে দেখতে যান, সেদিনও করুণাচন্দ্র ও নির্মলচন্দ্র সঙ্গে ছিলেন। ঠাকুর সেদিন তাঁদের দেখে কেঁদে ফেলেন এবং কেশবচন্দ্রের পুত্রদ্বয়কে নিজের পাশে বসিয়ে তাঁদের গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক স্নেহমাখা কথা বলেন।

*

কেশবের অনুরাগীবৃন্দ

প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা আচার্য কেশবচন্দ্রের বহু সহসাধক যেমন তাঁর অনুসরণে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন, তেমন কেশবচন্দ্রের বহু অনুরাগীও

ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে নববিধান-মণ্ডলীভুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক, মহেন্দ্রনাথ বসু, উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি মজুমদার, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

*

মণি মল্লিকের বড় ছেলে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত মণিলাল মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রথম জীবনেই তিনি ঠাকুরের পবিত্র সঙ্গ ও স্নেহলাভ করেছিলেন। নাম অজ্ঞাত।

আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে তিনি প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করে তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। সেখান থেকে ফিবে বাড়ীতে এসেই তিনি তাঁর পিতা মণিলালকে ঠাকুরেব প্রসঙ্গ শোনান এবং ঠাকুরের কাছে যেতে অনুরোধ করেন। এর পূর্বে মণিলালের সঙ্গে ঠাকুরের কোন যোগাযোগ ছিল না। পুত্রের কথামত পিতা মণিলাল যেদিন প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করতে যান, সেদিন মণিলালকে দেখেই ঠাকুর ছেলেটির নাম করে বলেছিলেন—"তুমিই না অমুকের বাপ? তোমায় দেখে এই মনে হচ্ছে।" ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য মণিলালের এই ছেলেটিব অকালে মৃত্যু ঘটেছিল।

*

মণি মল্লিকের নাতজামাই

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত মণিলাল মল্লিকের ইংরাজী শিক্ষিত নাতজামাই। নাম অজ্ঞাত। তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং ইংরাজী পুস্তকের দোহাই দিয়ে ঈশ্বর-সম্পর্কীয় বিরূপ কথা বলতেন। সেজন্য ঠাকুর তাঁর অজ্ঞানতা দূর করার জন্য নানা উদাহরণ দিয়ে তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতেন।

*

অনুকুল মুখুজ্যের জামায়ের ভাই

হাইকোর্টের জজ শ্রীঅনুকুল মুখোপাধ্যায়ের জামাতার ভ্রাতা এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। নাম অজ্ঞাত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। একদা ঠাকুর তাঁকে নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সম্পর্কে

জিজ্ঞাসাবাদ করায়, তিনি নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা ঠাকুরকে জানান এবং বলেন যে নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধিমান ছোকরা। তাঁর কাছে নরেন্দ্রনাথের সুখ্যাতি শুনে ঠাকুর খুব উৎফুল্ল হন এবং উপস্থিত ভক্তদের বলেন যে, যেহেতু ইনি নরেন্দ্রনাথের প্রশংসা করেছেন, সেইহেতু ইনি নিজে ভাললোক।

*

নিরঞ্জনের ভাই

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তরুণ ভক্ত। নাম অজ্ঞাত। ছোকরা বয়সে তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং তাঁর পূত সঙ্গলাভ করে তৃপ্তি পেতেন। ঠাকুর তাঁর লক্ষণগুলি দেখে, তাঁকে ধ্যান করার জন্য উপদেশ দেওয়ায়, তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলে ঠাকুরেব সামনে বসেই ধ্যান করতেন। গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায়, ভাবের প্রাবল্যে তাঁর শরীব কাঠের মত হয়ে যেত এবং ঠাকুর তাঁর সেই ধ্যানের অবস্থার কথা অপর ভক্তদের শুনিয়ে প্রশংসা করতেন।

*

প্রতাপের ভাই

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জনৈক ভক্ত। নাম অজ্ঞাত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল এবং ঠাকুরকে তিনি খুব ভক্তি করতেন। তিনি সংসারী হয়েও বেকার অবস্থায় তাঁর স্ত্রী-পুত্রদেব শ্বশুরবাড়ীতে রেখে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে কয়েকদিন বাস করেন এবং তাঁর আশ্রয়েই বরাবর থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের ভরণপোষণের দায়িত্ব অস্বীকার করে ঠাকুরের কাছে থাকতে চাওয়ায়, ঠাকুরের বিশেষ আপত্তি ছিল। তাই ঠাকুর তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁকে কাজ-কর্ম খুঁজে নিয়ে সংসার করার জন্য উপদেশ দেন। স্ত্রী-পুত্রদের শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরিয়ে নিজের কাছে রেখে যথাযথ গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের জন্য ঠাকুর তাঁকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা তিনি পালন না করায়, ঠাকুর অবশেষে তাঁকে ভর্ৎসনার দ্বারা সেখানকার আশ্রয় ত্যাগ করিয়ে গৃহে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

*

হাবী'র মা'র ভাই

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহিলা-ভক্ত হাবী'র মা'র জনৈক ভ্রাতা। কুড়ি বছর বয়স্ক এই তরুণ ভক্ত, কলেজে পড়ার সময়েই ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। তিনি তাঁর ছোট ভাইটিকেও সঙ্গে নিয়ে মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে যেতেন।

*

গোলাপ-মা'র ভাই-ভাজ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত গোলাপ-মা, ওরফে অন্নপূর্ণাদেবীর বাগবাজারের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন কালে, গোলাপ-মা'র ভাইয়েরা ও একটি ভ্রাতৃবধূ ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। তাঁরা আন্তরিকভাবে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করায় এবং তাঁর পদধূলি গ্রহণ করায়, ঠাকুর তাঁদের ভক্তির প্রশংসা করেন। ঠাকুর সেই দিনই অপর বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত যোগীন মা'র বাড়ীতেও শুভাগমন করায়, গোলাপ-মা'র জনৈক ভ্রাতা সেখানে ঠাকুরের সম্মুখে এক কনসার্ট-পার্টির সঙ্গে বাঁয়া-তবলা বাজান এবং ঠাকুর তাঁর বাজনার প্রশংসা করেন।

*

ভাই ভূপতি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ সন্তান। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে বাগুবল্লভ পাড়ায় তাঁর বাড়ী ছিল। ডাক-নাম "ঝুলন"। তিনি ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত বলরাম বসুর পুত্র—রামকৃষ্ণ বসুর কিছুদিন গৃহশিক্ষক ছিলেন। ভক্ত বলরামের বাড়ীতেই তিনি প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর আশীর্বাদলাভ করে ধন্য হন। পরে শ্যামপুকুরের বাড়ীতে তিনি ঠাকুরের কৃপালাভ করেন এবং ঠাকুর তাঁকে অঙ্গুলি বিন্যাসের দ্বারা জপের মুদ্রা দেখিয়ে দেন। ছোট শিশুর মত সরল স্বভাবের দরুন ঠাকুর তাঁকে স্নেহ করতেন এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁরও অচলা ভক্তি ছিল। তিনি জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না এবং ত্যাগ বৈরাগ্যের মধ্যে জীবন যাপন করতেন। পরবর্তীকালে, তিনি নিরবচ্ছিন্ন জপে আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু কাশীধামে গমন করার পর কিছু পরিমাণে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়।

*

দ্বিজর পিতা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, ঠাকুরের তরুণ ভক্ত দ্বিজর পিতা। নাম অজ্ঞাত। তিনি হিন্দু কলেজে ডি-এল রিচার্ডসনের ছাত্র ছিলেন এবং ওকালতী পাশ করার পর তিনি কলকাতার এক সওদাগরী অফিসে ম্যানেজারের চাকরীতে নিযুক্ত ছিলেন। দ্বিজর মায়ের মৃত্যুর পর, তিনি পুনরায় বিবাহ করেছিলেন। তাঁর পুত্র দ্বিজ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করত বলে তাঁর আপত্তি ছিল এবং দ্বিজর সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন।

একদা তিনি দক্ষিণেশ্বরে সহসা ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলে, ঠাকুরের দেবদুর্লভ আচরণে এবং কথামৃত পানে তিনি মুগ্ধ হন। ঠাকুর তাঁর কাছে দ্বিজর প্রশংসা করেন এবং তাকে দক্ষিণেশ্বরে আসার জন্য বাধা দিতে নিষেধ করেন। বলা বাহুল্য, দ্বিজর পিতা, ঠাকুরের সে কথায় রাজী হন। ভাল ছেলের পিতা হিসাবে ঠাকুর দ্বিজর পিতাকে পুণ্যাত্মা বলে প্রশংসা করেন এবং তিনি যে ঘোর বিষয়ী নন, সে-কথাও উল্লেখ করেন। পুত্রের প্রশংসা শুনে এবং ঠাকুরের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে দ্বিজর পিতা সেদিন নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরে গিয়েছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য, কথা বলার সময় সেদিন ঠাকুর দ্বিজর পিতার কাছে এসে মাদুরে বসেছিলেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর শরীর স্পর্শ করেছিলেন। অবশেষে দ্বিজর ভাগ্যবান পিতাকে ঠাকুর কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াবার পর, নিজে হাতে তাঁকে পাখা দিয়ে বাতাস করেছিলেন।

*

শ্রীম—পুত্র কন্যাগণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ গৃহীভক্ত, কথামৃত-প্রণেতা "শ্রীম", তথা মাষ্টার-মশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পুত্র কন্যাগণ অতি শৈশবে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। মহেন্দ্রনাথের একটি অষ্টম বর্ষীয় পুত্রের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী নিকুঞ্জদেবীর সাময়িক মানসিক রোগ দেখা দেওয়ায়, মহেন্দ্রনাথ যখন স্ত্রীকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন, তখন তাঁর অপর নাবালক পুত্র কন্যাগণও তাঁদের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং ঠাকুরের স্নেহলাভ করেছিলেন।

মহেশ ন্যায়রত্নের ছাত্র

প্রখ্যাত পণ্ডিত ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের জনৈক ছাত্র। নাম অজ্ঞাত। তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়কে তিনি নাস্তিক্য-আস্তিক্য নিয়ে বিচারের জন্য আহ্বান জানালে, ঠাকুর সেই ছাত্রটিকে বিশেষ আমল দেননি। পরে তিনি সেই ছাত্রটির লক্ষণ ভাল নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন—কারণ তাঁর "বিড়াল চক্ষু" ছিল।

✻

মুখুজ্যেদের হরি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ১৮/২০ বছরের যুবক ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের ভক্ত মুখুজ্যে-ভ্রাতৃদ্বয়, তথা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের আত্মীয়। অল্পবয়সেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল এবং তিনি উক্ত মুখুজ্যেদের বাড়ীতেই বাস করতেন।

হরি কখনো একাকী, অথবা কখনো মুখুজ্যেদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ পেতেন। তিনি ঠাকুরকে গুরুরূপে অন্তরে বরণ করেছিলেন এবং গুরুর মতই তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। তিনি ঠাকুরের এত প্রিয় ছিলেন যে, তাঁর দক্ষিণেশ্বরে যেতে কিছুদিন বিলম্ব হলে, ঠাকুর তাঁকে ভর্ৎসনা করতেন।

একদা হরি প্রকাশ্যে ঠাকুরের কাছে দীক্ষালাভের জন্য প্রস্তাব করায়, ঠাকুর তাতে রাজী হননি, তবে প্রার্থনা করেছিলেন যে, যারা আন্তরিক টানে তাঁর কাছে আসবে, তারা যেন সবাই সিদ্ধ হয়। ভাগ্যবান হরির হাত নিজের হাতের ওপর রেখে, পরীক্ষা করে ঠাকুর তাঁর ভাল লক্ষণের কথা জানিয়েছিলেন এবং তাঁর ভক্তির প্রশংসা করেছিলেন।

✻

বাগবাজারের হরিবাবু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, উত্তর কলকাতার বাগবাজার নিবাসী যুবক ভক্ত এবং কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিশেষ বন্ধু। বহুকাল আগে তাঁর পত্নী বিয়োগ হয়, কিন্তু তিনি আর বিবাহ করেননি। বাড়ীতে বাবা, মা, ভাই, বোন প্রভৃতির ওপর তাঁর খুব টান ছিল এবং তাঁদের সবাইকে তিনি দেখাশোনা করতেন।

বন্ধু মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসায়, ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন—"তুমি না-সংসারী, না-হরিভক্ত, এ ভাল নয়।" ঠাকুর তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে সংসারের কাজ করবে, আর যখন একলা থাকবে, তখন পড়বে ভক্তিশাস্ত্র—শ্রীমদ্ভাগবত বা চৈতন্য চরিতামৃত—এইসব পড়বে।" বলা বাহুল্য, হরিবাবু পরে ঠাকুরের ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন।

*

যুগলবাবু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আলমবাজার নিবাসী ভক্ত। তিনি ঠাকুরের অপর ভক্ত নটবর পাঁজার প্রতিবেশী ছিলেন। যুগলবাবু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। যুগলবাবুর আন্তরিক ভক্তির দরুন, ঠাকুর তাঁর আলমবাজারের বাড়ীতেও শুভাগমন করেছিলেন।

*

কুঞ্জবাবু

জনৈক সৌখীন অভিনেতা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে "নব বৃন্দাবন" নাটক দেখতে গিয়েছিলেন, সেদিন কুঞ্জবাবুর অভিনয়ে ঠাকুর ছিলেন দর্শক। আচার্য কেশবচন্দ্র এবং নরেন্দ্রনাথও (স্বামী বিবেকানন্দ) সেই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং কুঞ্জবাবু "পাপ-পুরুষ" সেজেছিলেন। কুঞ্জবাবুর অভিনয় ঠাকুরের ভাল লাগলেও, ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন যে, পাপের অভিনয় করাও ভাল নয়।

*

কান্তিবাবু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত কলকাতা নিবাসী ব্রাহ্ম ভক্ত। ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবাদিতে ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল।

*

নেপালবাবু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত বরানগর নিবাসী ভক্ত। বরানগরে ভগ্নীর বাড়ীতে থাকাকালীন মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত যেবার তৃতীয় দিনে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করেন, সেদিন তাঁর সঙ্গে নেপালবাবুও ছিলেন।

*

আগড়পাড়ার আশু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চব্বিশ পরগণা জেলার আগড়পাড়া নিবাসী যুবক ভক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। ঠাকুরের সমাধি-দর্শন করে তিনি মুগ্ধ হন এবং ঠাকুরের প্রতি প্রবল আকর্ষণে তিনি তাঁর শ্রীচরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন।

দক্ষিণেশ্বরে এলেই আশু ইসারায় ভক্ত-পরিবৃত ঠাকুরকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে যেতেন এবং সকলের অসাক্ষাতে নির্জনে গিয়ে চুপি চুপি ঠাকুরের সঙ্গে মনের কথা বলতেন। একদিন অন্যান্য ভক্তদের সমক্ষেই ঠাকুর তাঁকে প্রকৃতির ভাব নিজের মধ্যে আরোপ করে কামাদি রিপু জয় করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। ঠাকুর আশুকে শনি-মঙ্গলবার তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য নির্দেশ করতেন। শেষ জীবনে ঠাকুরের পরম অনুরাগী ভক্ত আশু কলকাতায় বাস করতেন এবং সবসময় ঠাকুরের কৃপার কথা স্মরণ করে আনন্দ পেতেন।

*

বেলঘোরের তারক

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, চব্বিশ পরগণা জেলার বেলঘোরিয়া নিবাসী বিবাহিত যুবক ভক্ত তারক মুখোপাধ্যায়। বাড়ীর বাধা অগ্রাহ্য করে তারক নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং তাঁর কথামৃত পান করে তৃপ্তি পেতেন। উচ্চ লক্ষণযুক্ত, ভক্তিমান ও নিরভিমানী তারককে ঠাকুর অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য উপদেশ দিতেন। তারক ঠাকুরকে আন্তরিক ভক্তি করতেন এবং তাঁর আশ্রয়লাভ করে কৃতার্থ হতেন।

একদা সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুর তারকের বুকে চরণ রেখে তাঁকে কৃপা করেন এবং তারকও ঠাকুরকে চির বাঞ্ছিতরূপে হৃদয়ে গ্রহণ করেন। তারকের সম্পর্কে ঠাকুরের এমন উচ্চ ধারণা ছিল যে, তিনি বলেছিলেন—"মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই, আর বেলঘোরের তারক মৃগেল।"

বীরভুমের বিহারী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য, বীরভূম-নিবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভক্ত বিহারী মুখোপাধ্যায়। ঠাকুরের অপর ভক্ত ও কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকায়, তিনি কাজের সন্ধানে কলকাতায় তাঁর বাড়ীতে এসে উঠেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই বিহারী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত শুরু করেন এবং তাঁর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঠাকুর এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে খুব স্নেহ করতেন।

শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ৺কালীপূজার রাত্রে অসুস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে যেদিন ভক্তেরা ৺কালীজ্ঞানে পূজা করেন, সেদিন বিহারীও সেখানে উপস্থিত থাকায়, ঠাকুরের সমাধি-অবস্থায় অপূর্ব রূপান্তর দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করেন। সেদিন গিরীশচন্দ্র, শরৎ, শশী, রাম, চুনীলাল, রাখাল, মাষ্টারমশাই, নিরঞ্জন, ছোট নরেন প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে বিহারীও একযোগে সমস্বরে ঠাকুরের উদ্দেশে স্তব করেছিলেন। সেদিন ভক্তবৃন্দের আনন্দের জন্য ঠাকুর একটু পায়েস মুখে দিয়ে, সেই প্রসাদ ভক্তদের বিতরণ করায়, ভাগ্যবান বিহারীও ঠাকুরের সেই প্রসাদ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে ধন্য হন।

*

বরানগরের ঠাকুরদাদা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য, বরানগর নিবাসী ২৭।২৮ বছরের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কথক-ঠাকুর হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করায়, সাধারণতঃ "ঠাকুরদাদা" নামে পরিচিত ছিলেন। কিছুদিন বৈরাগ্য অবলম্বন করে প্রথম জীবনে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর, পুনরায় তিনি সংসারে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু নিয়মিত সাধন-ভজনে নিযুক্ত ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশতঃ তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করতেন। ঠাকুরও পরম স্নেহে তাঁকে নানা উপদেশ দিতেন; এমনকি তাঁর বরানগরের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমনও হয়েছিল। ঠাকুরদাদার কথকথা করার বিশেষ গুণ থাকায়, তিনি তা ঠাকুরকে শোনাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। বিশিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী, সুগায়ক ও সুপণ্ডিত অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্য-সাংখ্য ষড়দর্শনতীর্থ, তাঁরই পৌত্র ও উত্তর সাধক।

*

দম্‌দম্‌ মাষ্টার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য শিক্ষক যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র। দম্‌দমার একটি বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করতেন বলে সাধারণতঃ "দম্‌দম্‌ মাষ্টার" নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাড়ী ছিল বাঁকুড়া জেলার কাটিকাগ্রামে। যজ্ঞেশ্বর দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন।

একদা ঠাকুরের মুখে তিনি শোনেন যে, দেবস্থানে গেলে, অন্ততঃ এক পয়সার বাতাসাও সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। এরপর একদিন অল্পবেতনের শিক্ষক যজ্ঞেশ্বর সত্যই এক পয়সার বাতাসা নিয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলে, ঠাকুর নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাবার ত্যাগ করে, দরিদ্র যজ্ঞেশ্বরের সেই বাতাসা পরম তৃপ্তি সহকারে আহার করে তাঁকে কৃতার্থ করেন; পরে সব সময়ই যজ্ঞেশ্বর ঠাকুরের জন্য একপয়সার বাতাসা নিয়ে যেতেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর যজ্ঞেশ্বর বরানগর মঠে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের কাছেও অনেক সময় থাকতেন। মাষ্টারীর চাকরী চলে যাওয়ার পর, তিনি স্ত্রী এবং তিনটি পুত্র নিয়ে প্রথমাবস্থায় বিশেষ অসুবিধায় পড়েন; কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় পরে বরানগরের একটি "বিধবা-আশ্রমের" অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হয়ে বিশেষ সুনাম ও অর্থউপাজন করেন। অবশেষে স্বেচ্ছায় সে-কাজ ত্যাগ করে তিনি আলমবাজার মঠের কাছে একটি ভাড়াটিয়া বাসায় বাস করতেন এবং মঠে এসে নিঃস্বার্থভাবে সকলের সেবা ও আবশ্যকীয় কার্যাদি করাতে, মঠের সকলের কাছে প্রিয়জন হিসাবে গৃহীত হতেন।

*

কাশীর রাজাবাবু

রাণী রাসমণির জামাতা, জমিদার মথুরানাথ বিশ্বাসের কাশীর জমিদার-বন্ধু। মথুরানাথের সঙ্গে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীতে যান এবং সেখানে কেদার-মন্দিরের কাছে মথুরানাথের বন্ধু রাজাবাবুর বাড়ীতে গিয়ে প্রথম ওঠেন। কিন্তু সেখানে বৈঠকখানা ঘরে ঠাকুরের সম্মুখেই রাজাবাবু সাঙ্গপাঙ্গসহ মথুরানাথের সঙ্গে নানা বৈষয়িক কথা শুরু করায়, ঠাকুর খুব অস্বস্তি বোধ করেন এবং আক্ষেপে কেঁদে বলতে থাকেন—"মা, কোথায় আমায় আনলে। আমি যে রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম; তীর্থ করতে এসেও সেই কামিনী-কাঞ্চনের কথা! কিন্তু সেখানে—দক্ষিণেশ্বরে তো বিষয়ের কথা শুনতে হয়নি!" বলা আবশ্যক, ঠাকুর এই বিরুদ্ধ পরিবেশ ত্যাগ করে সেই বাড়ী থেকে অন্যত্র গিয়ে উঠেছিলেন।

দশম স্তবক (ক)

কুকুর-কাপ্তেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরক্ত, অতিবৃদ্ধ একটি কুকুর ; ঠাকুর আদর করে তার নাম রেখেছিলেন "কাপ্তেন"। কুকুরটি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের আশ্রয়ে বাস করত এবং মা-কালীর মন্দিরের সামনের চাতালে বসে থাকতো। কুকুরটি ঠাকুরের খুব প্রিয় ছিল এবং "কাপ্তেন" বলে ডাকলেই সে ঠাকুরের কাছে চলে আসতো ও তাঁর চরণে গড়াগড়ি দিত। এই কুকুরটি এত ভাগ্যবান ছিল যে, ঠাকুরের আহারের পর প্রতিদিন সে ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খেতো এবং এমনই অদ্ভুত ছিল যে, গঙ্গার ঘাটে নেমে সে গঙ্গার জল পান করে আসত।

ঠাকুরের স্নেহে লালিত এই কুকুরটির সম্পর্কে ঠাকুর একদা বলেছিলেন— "এত-যে কুকুর রয়েছে, কাপ্তেনের মত কেউ-ই মায়ের সামনে বসে না, গঙ্গার ধাপে বসতে, গঙ্গাজল খেতে, ওর মত কাকেও দেখিনি। কাপ্তেনটা শাপভ্রষ্ট, ওর পূর্ব জন্মের সংস্কার যা ছিল, তাই করছে এখানে এসে,—ধন্য হয়ে গেল!' সত্যই কুকুরটি ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে ধন্য হয়।

*

আশ্রিত বিড়াল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রিত কাশীপুরের একটি বিড়াল। একদা কাশীপুরের বাড়ীতে অসুস্থ ঠাকুরের কাছে একটি বিড়াল কয়েকটি বাচ্চাসহ আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাঁরই ঘরে বাস করতে থাকে। বিড়ালটির উপস্থিতিতে ঠাকুর বিশেষ বিব্রত বোধ করলেও, তাকে নিরাশ্রয় করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাই একদিন তাঁর অন্যতম মহিলা-ভক্ত নিস্তারিণী দেবী (ভক্ত নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী) কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে এলে, করুণাময় ঠাকুর বাচ্চাসহ ঐ বিড়ালটিকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পালন করার জন্য নিস্তারিণীকে অনুরোধ করেন। ঠাকুরের কাছ থেকে পাওয়া এই বিড়াল ও তার বাচ্চাগুলিকে নিস্তারিণী, ঠাকুরের বিশেষ অনুগ্রহরূপে গ্রহণ করেন এবং সযত্নে তাদের বাড়ীতে এনে পালন করেন। এমনকি, যেহেতু বিড়ালটি ঠাকুরের আশ্রয়ে ছিল, সেজন্য তিনি কারুকে প্রহারাদি করতেও দিতেন না। বলা বাহুল্য, বিড়ালটি ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করে ধন্য হয়।

*

ভক্ত হনুমান

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে পতিত কামারপুকুরের একটি ভক্ত হনুমান। বাল্যকালে ঠাকুর (তৎকালীন গদাধর) মাঝে মাঝে কামারপুকুরে প্রতিবেশী মধু যুগীর বাড়ীতে গিয়ে প্রহ্লাদ-চরিত্র প্রমুখ পুঁথি-পাঠ করতেন এবং সে সময় তাঁর মিষ্টকণ্ঠে পুঁথি শোনার জন্য গ্রামের অনেক ভক্ত তাঁর কাছে জড়ো হতেন। একদা সেখানে ঠাকুরের পুঁথি পাঠকালে নিকটস্থ আমগাছের ডাল থেকে একটি হনুমান নেমে এসে, সকলের সামনেই ঠাকুরের তথা গদাধরের চরণ ছুঁয়ে নির্ভয়ে বসে থাকে এবং শেষ অবধি একমনে তাঁর পাঠ শুনতে থাকে। পাঠশেষে ঠাকুর সেই হনুমানের মস্তকে পুঁথিখানি স্পর্শ করালে, হনুমানটি ঠাকুরের চরণে ঠিক মানুষের মত দু'হাতে প্রণাম করে এবং পরে পুনরায় আমগাছে ফিরে যায়। পশুদেহধারী এই ভক্তটি সেদিন ঠাকুরের প্রতি অদ্ভুত আসক্ত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালে ঠাকুর যেদিন জ্যোতির্ময়ী সীতা দেবীর মূর্তি দর্শন করেন, সেদিনও একটি হনুমান অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে ঠাকুরের চরণতলে পতিত হয়েছিল এবং এই হনুমানের আগমনে ঠাকুর সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তিকে সীতাদেবীর মূর্তি বলে বুঝতে পেরেছিলেন।

*

শরণাগত মৎস্য

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রিত একটি অদ্ভুত মৎস্য। একদা কামারপুকুরে জলমগ্ন রাস্তায় চলার সময় ঠাকুর লক্ষ্য করেন যে, একটি মৎস্য ঠাকুরের পায়ে পায়ে কেবলই ঘুরছে; তাঁর সঙ্গ ছাড়তে চায় না। ঠাকুর এই ঘটনায় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত সঙ্গীদের বলেন—"এটিকে মারিস্‌নেরে, এটি আমার পায়ে পায়ে শরণাগত হয়ে কেমন ঘুরছে! কেউ যদি পারিস্‌তো, এটিকে পুকুরে ছেড়ে দিয়ে আয়।" এরপর কারুর জন্য অপেক্ষা না করেই ঠাকুর স্বয়ং সেই মৎস্যটিকে ধরে নিয়ে, পুকুরের জলে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। অবশেষে ঘরে ফিরে এসে সেই মৎস্য প্রসঙ্গে ঠাকুর সবাইকে বলেন—"আহা, কেউ যদি এই রকম শরণাগত হয়, তবেই সে রক্ষা পায়।" বলা বাহুল্য, করুণাময় ঠাকুরের করুণার স্পর্শ থেকে সেই শরণাগত, সামান্য মৎস্যটিও বঞ্চিত হয়নি এবং সত্যই সে সে-যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিল।

*

একাদশ স্তবক

নিত্যগোপাল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত বিশেষ শ্রেণীর ত্যাগীভক্ত। পূর্বনাম শ্রীনৃত্যগোপাল বসু। তিনি ছিলেন ঠাকুরের অপর ভক্তদ্বয় রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্রের মাসতুতো ভাই এবং ঠাকুরের আর একভক্ত তুলসী মহারাজের মাতুল। তিনি রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতেই বাস করতেন। ঠাকুরের প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণে তিনি ২৩।২৪ বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করেন।

বিশেষ শ্রেণীর ভক্ত হিসাবে নিত্যগোপাল সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং যা উক্তি করেছিলেন, তা থেকে জানা যায় যে, নিত্যগোপালের ইদানীং দক্ষিণেশ্বরে আসার বহু বছর আগে বরানগর থেকে "গোপাল সেন" নামে একটি অল্প বয়সের ছেলে ঠাকুরের কাছে আসত এবং ভাবে সমাধিস্থ হত। একদা পঞ্চবটীতলায় ভাবস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, গোপাল সেনের বুকে পা দিলে, সে-ও ভাব-অবস্থায় ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে বলে—"আমি আর এ সংসারে থাকতে পারছি না; আপনার এখন অনেক দেরী—আমি তবে যাই।" ঠাকুরও ভাবাবস্থায় তাকে বলেন "আবার এস।" সে-ও "আবার আসব"—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ী চলে যায়। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ঠাকুর শোনেন যে, সেই ছেলেটি, অর্থাৎ গোপাল সেন আত্মহত্যার দ্বারা দেহত্যাগ করেছে। এর সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর পরে দক্ষিণেশ্বরে বর্তমানের নিত্যগোপালকে দেখে ঠাকুর ভাবাবস্থায় জানতে পারেন যে, সেই গোপাল সেন নামক ছেলেটিই ইদানীং জন্মান্তরে "নিত্যগোপাল" রূপে অন্য দেহ ধারণ করে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পুনরায় ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হয়েছেন।

নিত্যগোপালের পূর্বজন্মের দেহ ধারণের ইঙ্গিতে ঠাকুর একদা তাঁকে "গোপাল" নামে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"গোপাল! তুই কেবল চুপ করে থাকিস।" তাতে নিত্যগোপাল বালকের মত উত্তর দিয়েছিলেন—"আমি-জানি-না।" তখন ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন—"বুঝেছি কিছু বলিস না কেন! অপরাধ?—বটে বটে! জয় বিজয় নারায়ণের দ্বারী; সনক সনাতনাদি ঋষিদের ভেতরে যেতে বারণ করেছিল; সেই অপরাধে তিনবার এই সংসারে জন্মাতে হয়েছিল।" এইভাবে উভয়ের মধ্যে অতি নিগূঢ় কথার আদান প্রদান হত।

নিত্যগোপাল সর্বদা ভাবস্থ ও চুপচাপ থাকতেন। ভাবাবস্থায় তাঁর বক্ষ রক্তবর্ণ হত এবং ঠাকুর তাঁর এই অবস্থাকে "পরমহংস" অবস্থা বলতেন। নিত্যগোপালের অসাধারণ দৈবশক্তি ছিল; একদিন ভাবাবেশে তিনি

দক্ষিণেশ্বরের শিবমন্দিরগুলিতে প্রবেশ করে একে একে সমুদয় শিবকে আলিঙ্গন করতে থাকেন। এমন সময়ে একটি শিবমন্দিরের ভেতরে নিত্যগোপাল থাকাকালীন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মন্দিরের দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে নিত্যগোপালের দৈবশক্তির পরীক্ষা করেন। কিন্তু একটু পরেই ঠাকুর দেখেন যে, মন্দিরের এক দেওয়াল ভেদ করে নিত্যগোপাল বাইরে চলে এসেছেন, অথচ দেওয়ালে ভাঙনের কোন চিহ্নই নেই। নিত্যগোপালের এই অসামান্য শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে ঠাকুর সন্তুষ্ট হন এবং ভাবাবেশে তাঁকে বলে ফেলেন—"তুই এসেছিস? আমিও এসেছি!"

নিত্যগোপাল ঠাকুরকে এত ভক্তি করতেন যে, ঠাকুরকে দেখামাত্রই তিনি সর্ব-প্রথম তাঁর চরণে মস্তক রেখে বন্দনা করতেন। ঠাকুরও নিত্যগোপালকে এত স্নেহ করতেন যে, কখনো কখনো ভাবাবিষ্ট নিত্যগোপালকে তিনি স্বহস্তে খাইয়েও দিতেন; আবার কখনো কখনো নিজে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ঠাকুর নিত্যগোপালের কোলে চরণ তুলে দিয়ে কৃপাদান করতেন এবং নিত্যগোপালও ভাবাবস্থায় কাঁদতেন। এইভাবে উভয়ের মধ্যে অপূর্বলীলা সংঘটিত হলেও, নিত্যগোপালের "পৃথক ভাবের" জন্য ঠাকুর তাঁর অন্যান্য ভক্তদের নিত্যগোপালের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করতেন ও বলতেন—"ওর ভাব আলাদা; ও এখানকার লোক নয়।" ঠাকুর সর্বদা নিত্যগোপালকে সদুপদেশ দ্বারা বহু বিষয়ে সাবধান করতেন ও প্রকৃত সাধুর জীবন অবলম্বনের জন্য তাঁকে উৎসাহ দিতেন। ঠাকুরের এক পরম ভক্তিমতী স্ত্রীলোক, নিত্যগোপালকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করতেন এবং তাঁর নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতেন শুনে ঠাকুর নিত্যগোপালকে সেখানে যেতে বিশেষভাবে নিষেধ করতেন, এমনকি, এই মেলামেশার ফলে পতন হবার আশঙ্কায়, "সাধু সাবধান"—এই মহাবাক্য প্রয়োগে তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করতেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তাঁর পূত চিতাভস্মপূর্ণ কলসটি গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছির উদ্যানবাটীতে (যোগোদ্যানে) সমাহিত করা হলে, প্রথম অবস্থায় প্রায় পাঁচ-ছয় মাসকাল নিত্যগোপাল সেখানে ঠাকুরের নিত্যপূজায় নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু অসুস্থতার দরুন অবশেষে তিনি পূজার কাজ ত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে, নিত্যগোপাল "সন্ন্যাস" গ্রহণ করে "স্বামী জ্ঞানানন্দ অবধূত" নামে অভিহিত হন এবং নিজস্ব পৃথক ভাবধারায় "মহানির্বাণ মঠ" প্রতিষ্ঠা করেন।

*

তুলসী মহারাজ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ভক্ত। পূর্বনাম শ্রীতুলসী চরণ দত্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের অপর ভক্ত নিত্যগোপালের ভাগ্নে এবং ঠাকুরের অন্য দু'জন ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত এবং মনোমোহন মিত্রের আত্মীয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তিনি উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ২০ নং বোসপাড়া লেনে, পিতা দেবনাথ দত্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি কাশীতে পিতা-মাতার সঙ্গে বাস করেন এবং সেখানকার "বাঙালীটোলা উচ্চ বিদ্যালয়ে" লেখাপড়া শুরু করেন। ঠাকুরের অন্যতম ত্যাগী সন্তান হরিপ্রসন্ন মহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) তাঁর সহপাঠী ছিলেন। কাশীতে তাঁর মাতৃবিয়োগের কয়েক বছর পর, কলকাতায় তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটলে, তিনি কাশী ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং কলকাতার বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ছাত্রাবস্থাতেই তুলসীচরণ নিজের পাড়াতেই ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন, কিন্তু সেদিন ঠাকুরকে প্রণাম করতে গিয়ে বিজলীতারের "শকের" ন্যায় তিনি কেমন একটা ধাক্কা পেয়ে, ভয়ে পালিয়ে যান। পরে বন্ধু হরিপ্রসন্নের সঙ্গে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তিনি ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হন। এর পরেও তিনি আরো কয়েকবার ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করেন; কাশীপুরেও তিনি অসুস্থ ঠাকুরকে দেখতে যেতেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তুলসীচরণ, ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী সন্তানদের সঙ্গে বরানগর মঠে যোগদান করেন এবং "সন্ন্যাস" গ্রহণের পর তিনি "স্বামী নির্মলানন্দ" নামে অভিহিত হন। ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি "তুলসী মহারাজ" নামে পরিচিত ছিলেন। বলিষ্ঠ যুবক এবং কঠোর পরিশ্রমী হিসাবে তিনি পরবর্তীকালে আলমবাজার মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, তথা শশীমহারাজের সহকারীরূপে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। এই সময় মঠের যাবতীয় আবশ্যকীয় কাজ ছাড়াও, তিনি একাধারে অধ্যয়ন ও সাধন-ভজন করতেন। বিদ্যাচর্চায় এবং পাণ্ডিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করায়, তিনি বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত ও ইংরাজীতে অনর্গল গভীর ভাবপূর্ণ বক্তৃতা দিতে পারতেন। রন্ধন কাজেও তিনি বিশেষ পটু ছিলেন এবং তিনি যেখানে বসতেন বা শয়ন করতেন, সেই স্থানটি বিশেষ পরিচ্ছন্ন রাখতেন। তিনি বহুতীর্থ ভ্রমণ করেন এবং স্বামী অভেদানন্দের কাজে সাহায্যের উদ্দেশ্যে তিনি দু'-বছরের জন্য আমেরিকাতেও যান। পরবর্তীকালে তুলসী মহারাজ উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ১০ নং রামকৃষ্ণ লেনে পৃথকভাবে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মঠ" প্রতিষ্ঠা করেন।

দক্ষ মহারাজ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত পল্টুর (প্রমথ কর) আত্মীয়। পূর্বে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ছিলেন এবং খুব সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তিনি ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভ করে ধন্য হন এবং ঠাকুরের ভাবধারার মাধ্যমেই নিজেকে নিযুক্ত রাখেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং "সন্ন্যাস" অবলম্বন করে "স্বামী জ্ঞানানন্দ" নামে অভিহিত হন। ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি "দক্ষমহারাজ" নামে পরিচিত ছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ পরবর্তী জীবনে তিনি ঠাকুর-স্বামীজীর আশ্রয় ত্যাগ করে পাঞ্জাবী অবধূতদের কাছে নানাপ্রকার ঔষধ-প্রস্তুতির প্রক্রিয়া ও সোনারূপা করার প্রণালী শিক্ষা করেন এবং অবশেষে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। তাঁর এই উন্মাদনা রোগ সারাবার জন্য রামকৃষ্ণ-মঠের সাধুগণ অক্লান্ত চেষ্টা করেও বিফল হন এবং তাঁর ঐরূপ শোচনীয় অবস্থার জন্য স্বামী বিবেকানন্দও খুব ব্যথিত হন। কিছুকাল পরে প্রচণ্ড উন্মত্ত অবস্থায় কলকাতার ফুটপাথে তাঁর দেহাবসান হয়।

*

গিরিজা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভ্রাতা। ঠাকুর তাঁর সাধনকালে দক্ষিণেশ্বরে মহিলা-গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবীর কাছে তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে, যে দু'জন ভক্ত পূর্ববঙ্গে ভৈরবীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বরিশাল-নিবাসী গিরিজা একজন। ভৈরবী পরবর্তীকালে গিরিজাকে এনে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে মিলন করিয়ে দিয়েছিলেন।

গিরিজা যদিও উচ্চদরের সাধক ছিলেন, কিন্তু বিশেষ বিশেষ সিদ্ধাইলাভের পর তিনি সাধনপথ থেকে ভ্রষ্ট হন। এই সিদ্ধাই-এর জোরে একদা গিরিজা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে নিয়ে রাত্রে অন্ধকার পথে হাঁটার সময় নিজের পিঠ থেকে জ্যোতির ছটা প্রকাশের দ্বারা পথ আলোকিত করেন এবং ঠাকুরকে নির্বিঘ্নে হেঁটে যেতে সাহায্য করেন। কিন্তু ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর পূত সঙ্গ লাভ করে ক্রমশঃ গিরিজার সিদ্ধাই শক্তি নষ্ট হয়ে যায়; পরে তিনি ঠাকুরের দিব্যশক্তি প্রভাবে পুনরায় চৈতন্যলাভের পর, দ্বিগুণ উৎসাহে ঈশ্বরীয় পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।

চন্দ্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু ভ্রাতা। ঠাকুর তাঁর সাধনকাল দক্ষিণেশ্বরে মহিলা-গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবীর কাছে তন্ত্রমতে দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে, যে দু'জন ভক্ত পূর্ববঙ্গে ভৈরবীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বরিশাল নিবাসী চন্দ্র একজন। ভৈরবী পরবর্তীকালে চন্দ্রকে এনে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে মিলন করিয়ে দিয়েছিলেন।

চন্দ্র যদিও উচ্চদরের সাধক ছিলেন, কিন্তু বিশেষ বিশেষ সিদ্ধাইলাভের পর তিনি সাধনপথ থেকে ভ্রষ্ট হন। পরে ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে ও তাঁর পূত সঙ্গলাভ করে ক্রমশঃ চন্দ্রের সিদ্ধাই-শক্তি নষ্ট হয় এবং ঠাকুরের দিব্যশক্তি প্রভাবে তিনি পুনরায় চৈতন্যলাভের পর দ্বিগুণ উৎসাহে ঈশ্বরীয় পথে অগ্রসর হন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার কয়েক বৎসর পর, চন্দ্র সহসা বেলুড়মঠে এসে উপস্থিত হন এবং প্রায় মাসাধিককাল সেখানে বাস করেন। এই সময় ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের সঙ্গে 'তিনি নিত্য জপ-ধ্যানে রত থাকতেন এবং ঠাকুর-ঘরে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমূর্তিকে "দাদা" বলে সম্বোধন করতেন। ঠাকুরের কথা প্রসঙ্গে তিনি প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতেন এবং বলতেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সব কথাই তাঁর জীবনে সত্যে পরিণত হয়েছে ; কেবল মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে দর্শন দেবার যে প্রতিশ্রুতি ঠাকুর দিয়েছিলেন, সেইটিই বাকী ছিল। মঠের সাধুদের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি মঠে বাস না করে, সেখান থেকে পরে চলে যান ; পরবর্তীকালে চন্দ্রের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

*

ছোট নরেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত তরুণ ভক্ত। পুরা নাম নরেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি ছিলেন উত্তর কলকাতার তেলিপাড়ার বাসিন্দা এবং কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যালয়ের ছাত্র। মহেন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই ছাত্রজীবনে ঠাকুরের সঙ্গে ছোট নরেনের মিলন হয়। ঠাকুরের প্রধান ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দের নাম "নরেন" হওয়ায়, ঠাকুর একই নামের এই ভক্তটিকে "ছোট নরেন" নামে নির্দেশ করতেন।

ঠাকুরের প্রতি মহা আকর্ষণে ছোট নরেন ছেলেবেলা থেকে স্কুল পালিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়মিত যেতেন এবং ঠাকুরকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। বাড়ীর ভয়কে উপেক্ষা করে তিনি একবার তিন রাত্রি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে বাস করেন এবং ঈশ্বর দর্শনের জন্য কান্নাকাটি করেন। ঠাকুর

ছোট নরেনের জামা খুলে শরীর পরীক্ষা করে আধ্যাত্মিকভাবের উন্নতি লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাঁকে "শুদ্ধাত্মা" বলে নির্দেশ করেছিলেন। ছোট নরেনকে দেখার জন্য ঠাকুর মাঝে মাঝে খুব অস্থির হতেন এবং তাঁকে দেখলে প্রায়ই সমাধিস্থ হতেন। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর, ছোট নরেনেরও মাঝে মাঝে ভাব-সমাধি হত। একদা ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ দ্বারা কৃপা করেন এবং তিনিও তৎক্ষণাৎ নিরাকারের ধ্যানে সমাধিস্থ হন। তাঁর প্রতি ঠাকুরের এমন উচ্চ ধারণা ছিল যে, অন্যান্য ভক্তদের তিনি ছোট নরেনের সঙ্গে আলাপ করতে বলতেন এবং ছোট নরেনকে খাওয়ালে নারায়ণ-সেবা হবে বলে ঠাকুর মন্তব্য করতেন। ছোট নরেনের তেলিপাড়ার বাড়ীতেও ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল।

পরবর্তীকালে বিবাহ করার পর ছোট নরেন একদা কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, ঠাকুর অত্যন্ত শোকার্তের ন্যায় তাঁর চিবুক ধরে কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে শেষ উপদেশ দেন – "ঈশ্বরকে ভুলে যেন একেবারে সংসারে ডুবে যাসনি।" বলা আবশ্যক, ছোট নরেনের দাম্পত্যজীবন তেমন সুখকর হয়নি এবং তিনি ওকালতি করলেও তেমন অর্থাগম হয়নি।

*

ছোট গোপাল

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত তরুণ ভক্ত এবং বিশিষ্ট সেবক। পুরা নাম গোপালচন্দ্র ঘোষ। তিনি ছিলেন কলকাতার গড়পারের বাসিন্দা। ঠাকুরের কয়েকজন "গোপাল" নামক ভক্ত থাকায়, তাঁকে "ছোট গোপাল" নামে অভিহিত করা হয়। মাঝে মাঝে তিনি হঠাৎ অর্থাৎ হুট করে কোথাও চলে যেতেন, আবার হুট করে এসে হাজির হতেন, তাই ঠাকুর তাঁকে "হুটকো গোপাল" বলে ডাকতেন।

ছোট গোপাল বা হুটকো গোপাল ঠাকুরের মহা আকর্ষণে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে রাত্রিবাসও করতেন। সুযোগ পেলেই তিনি ঠাকুরের যথাসাধ্য সেবা করতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে মাঝে মাঝে ভক্তদের গৃহেও যেতেন। ইতিমধ্যে তিনি ঠাকুরের কাছ থেকে বিশেষ কৃপালাভ করেন এবং ঠাকুরকে গুরুরূপে বরণ করেন। শেষদিন অবধি তিনি কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরকে প্রাণঢালা সেবা করেছিলেন। ছোট গোপালের সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা থাকলেও তাঁর দুটি অল্পবয়স্ক ভাই ও বিধবা মায়ের ভরণপোষণের ভার তাঁর ওপর থাকায়, সে সময় তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরে কাশীপুর ছেড়ে বরানগরে যে বাড়িটি ভক্তেরা বাস করবার জন্য ভাড়া করেন, সেখানে ঠাকুরের গদী ও জিনিসপত্র নিয়ে ছোট গোপালও চলে আসেন এবং নরেন্দ্রাদি ত্যাগী সন্তানদের সঙ্গে সেখানে বাস করতে থাকেন।

এই সময় ঠাকুরের বিশিষ্ট গৃহীভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ছোট গোপালের সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করতেন এবং মঠের সাধুদের সান্নিধ্যে থেকে তাঁদের সেবা করার জন্য তাঁকে উৎসাহিত করতেন। মঠে থাকাকালীন তিনি নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) উপদেশ মত চলতেন এবং ঠাকুরের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাধক জীবনযাপন করতেন। পরবর্তীকালে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পর তিনি বিবাহ করে সংসারী হন এবং একটি কন্যা সন্তান রেখে পরলোক গমন করেন।

*

নারায়ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম স্নেহভাজন ও কৃপাপ্রাপ্ত তরুণ ভক্ত। তিনি ছিলেন কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৭ ১৮ বছর বয়সের এই ব্রাহ্মণ সন্তানটিকে ঠাকুর সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞান করতেন এবং তাঁকে "নারাণ" বলে ডাকতেন। তিনি কলকাতার বাগবাজারের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষক মহেন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই ছাত্রজীবনে নারায়ণ বা নারাণ দক্ষিণেশ্বরে বা কলকাতার অন্যান্য ভক্তদের বাড়ীতে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং ঠাকুরকে "অবতার" রূপে ভক্তি করতেন। ঠাকুরও তাঁকে এত স্নেহ করতেন যে, কিছুদিন তাঁকে দেখতে না পেলে দক্ষিণেশ্বরে বসে তাঁকে দেখার জন্য কাঁদতেন। নারায়ণকে কাছে পেলেই ঠাকুর সস্নেহে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন এবং কিছু-না-কিছু খেতে দিতেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে কীর্তন শোনার সময় ঠাকুরের কাছে নারাণ উপস্থিত হলে, ঠাকুর কীর্তন শোনা বন্ধ রেখে স্থান ত্যাগ করেন এবং নারাণকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে নিজে হাতে খাইয়ে দেন। আর একবার দক্ষিণেশ্বরে অসুস্থতার জন্য ঠাকুর মৌনাবলম্বন করায় ভক্তেরা চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং শ্রীশ্রীমা, রাখাল, লাটু প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গেরা সবাই কান্নাকাটি করতে থাকেন। সেই সময় সেখানে নারাণ উপস্থিত হলে, ঠাকুর তাঁকে পেয়ে মৌনভঙ্গ করেন এবং "মা তোর ভাল করবে" বলে নারাণকে আশীর্বাদ করেন। ঠাকুরকে সেদিন কথা কইতে দেখে সকলের প্রাণে খুব আনন্দ হয়।

ঠাকুরের কাছে নারাণের যাওয়া-আসা তাঁর বাড়ীর লোকেরা মোটেই পছন্দ করতেন না এবং সেজন্য নারাণকে অত্যন্ত প্রহার করতেন। নারাণের এই প্রহারের কথা শুনে ঠাকুর মনে খুব কষ্ট পেতেন এবং তাঁকে আসতে নিষেধও করতেন; অথচ তাঁরা পরস্পরকে না দেখে থাকতে পারতেন না বলে, নারাণ সকল নির্যাতন উপেক্ষা করে প্রেমময় ঠাকুরের কাছে এসে পুনরায় মিলিত হতেন এবং বহুভাবে তাঁর পরম কৃপালাভ করে শান্তি ও আনন্দ পেতেন। একদা নারাণের মা ঠাকুরের কাছে গিয়ে নিবেদন করেন, যাতে নারাণকে বিবাহ করতে রাজী করানো যায়; কিন্তু ঠাকুর সে প্রস্তাবে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন।

*

বিষ্ণু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আড়িয়াদহ নিবাসী তরুণ ভক্ত এবং স্কুলের ছাত্র। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে চলে আসতেন এবং তাঁর সঙ্গলাভ করে শান্তি পেতেন। সংসারে থাকতে তার ভাল লাগে না বলে, তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরকে জানাতেন। বাংলার বাইরে পশ্চিমে এক আত্মীয়ের কাছে বেড়াতে গিয়ে, বিষ্ণু সেখানে মাঠে বনে পাহাড়ের নির্জন স্থানে বসে ধ্যান করতেন এবং নানা ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করতেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বিষ্ণু এইসব কথা ঠাকুরকে জানিয়েছিলেন। অবশেষে ঠাকুরের এই উদাসী ছাত্র ভক্তটি গলায় ক্ষুর দিয়ে আত্মহত্যা করায়, ঠাকুর মনে অত্যন্ত ব্যথা পান। বিষ্ণু সম্পর্কে ঠাকুর তাঁর অন্যান্য ভক্তদের কাছে একদা বলেছিলেন—"বোধ হয় শেষ জন্ম, পূর্ব জন্মে অনেক কাজ করা ছিল, একটু বাকী ছিল—সেইটুকু বুঝি এবার হয়ে গেল!"

*

হরিপদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য তরুণ ভক্ত। তিনি ছিলেন উত্তর কলকাতার বাগবাজারের বাসিন্দা এবং কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যালয়ের ছাত্র। মহেন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই তিনি ছাত্রজীবনে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন।

ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশতঃ তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং তাঁর পূত সঙ্গলাভ করে আনন্দ পেতেন। তিনি মাঝে

মাঝে ঠাকুরকে প্রহ্লাদ চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি বেশ সুর করে কথকথার দ্বারা শোনাতেন এবং ঠাকুরও এই ব্রাহ্মণ সন্তানটিকে বিশেষ স্নেহ করতেন। কিন্তু শীঘ্রই হরিপদ "ঘোষপাড়ার" মতে "রাগকৃষ্ণ" সাধনের এক মহিলার পাল্লায় পড়েন, মহিলাটি বাৎসল্যভাবে তাঁকে নিজের কোলে শোয়াতেন এবং নিজের হাতে খাবার খাইয়ে দিতেন। ঠাকুর এ সকল বৃত্তান্ত শুনে হরিপদকে সাবধান করে দেন এবং সেই মহিলাটির কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য তাঁকে উপদেশ দেন। এমনকি, সেই মহিলাটি একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এলে ঠাকুর তাঁর হাবভাব দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারেননি এবং তাঁকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন হরিপদব প্রতি কোন কু-ভাব না আনেন।

*

তেজচন্দ্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত তরুণ ভক্ত। পুরা নাম তেজচন্দ্র মিত্র। তিনি ছিলেন উত্তর কলকাতার বাগবাজারের বাসিন্দা এবং কথামৃত প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যালয়ের ছাত্র। মহেন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই তিনি ছাত্রজীবনে ঠাকুরেব সঙ্গে মিলিত হন।

ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বশতঃ তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত শুরু করেন এবং তাঁব একান্ত ভক্তে পরিণত হন। তেজচন্দ্রকে পেলেই ঠাকুর তাঁকে "শুদ্ধ আধাব" জ্ঞানে কাছে বসাতেন এবং "আপনার লোক" বলে খুব স্নেহ করতেন। তেজচন্দ্র নিয়মিত ধ্যান করতেন এবং কথা কম বলতেন। একদা তেজচন্দ্র ঠাকুরেব কাছে সংসার ত্যাগের বাসনা প্রকাশ করায়, ঠাকুর তাঁকে মন্ত্র নির্দেশ পূর্বক দীক্ষাদান করেন এবং তাঁব বাড়ীতেও শুভাগমন করেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও ভাগ্যবান্ তেজচন্দ্র পুনরায় ঠাকুরের দর্শন এবং কৃপা পেয়েছিলেন। একদা অপরের গচ্ছিত দু'শো টাকা তাঁব পকেটমার হওয়ায়, তিনি ব্যাকুল হয়ে গঙ্গার ধারে বসে অশ্রুনয়নে ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণকে ডাকতে থাকেন, কারণ ঐ টাকা শোধ দেওয়ার মত অবস্থা সে সময় তেজ-চন্দ্রের ছিল না। এই সময় ঠাকুব তাঁর সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হয়ে দর্শন দেন এবং বলেন – "কাঁদছিস কেন? এই গঙ্গার ধারে ইট চাপা আছে, দ্যাখ।" এই ঘটনায় তেজচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উঠে নির্দিষ্ট ইটখানা সরিয়ে একতাড়া নোট পান এবং আনন্দের সঙ্গে শরৎ মহারাজ, তথা স্বামী সারদানন্দের কাছে উপস্থিত হয়ে এই অলৌকিক ঘটনার কথা জানান।

পণ্টু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য তরুণ ভক্ত। প্রকৃত নাম প্রমথ কর। তিনি ছিলেন উত্তর কলকাতার কম্বুলিয়াটোলার অধিবাসী এবং কথামৃত প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যালয়ের ছাত্র। মহেন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই খুব অল্প বয়সে ছাত্র জীবনে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়।

পণ্টু প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন, অথবা কলকাতায় কোন ভক্তগৃহে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, সেখানেও তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ঠাকুরও এই রূপবান ও হাস্যমুখী ছেলেটিকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য উপদেশ দিতেন। কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে মেলামেশা পণ্টুর পিতা মোটেই পছন্দ করতেন না এবং এজন্য পণ্টুকে তিনি খুব কড়া শাসন করতেন। তা সত্ত্বেও পিতার শাসন অগ্রাহ্য করে পণ্টু ঠাকুরের কাছে এসে পরম তৃপ্তি পেতেন এবং এজন্য তাঁর পিতার সঙ্গে বাড়ীতে খুব গোলমাল হত। ঠাকুর এইসব ঘটনা জেনে, পাছে তাঁর পিতা তাঁর এই যাতায়াত একেবারেই বন্ধ করে দেন, সেজন্য সব কথা বাড়ীতে বলতে তাঁকে নিষেধ করতেন এবং পিতার সঙ্গে ঝগড়া করতেও নিষেধ করতেন। একদা পণ্টুর পিতাও ঠাকুরের কাছে এসে পণ্টুর বিষয়ে নানা অভিযোগ করে যান এবং পণ্টু যাতে সংসারবিরাগী না হন, সে বিষয়ে ঠাকুরকে লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করে যান।

ঠাকুরের পূত সঙ্গ ও স্নেহলাভ করে পণ্টু নিজেকে ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত রাখার চেষ্টা করতেন, কিন্তু তিনি গভীরভাবে ধ্যান করতে অক্ষম হওয়ায়, ঠাকুর আক্ষেপ করতেন। পণ্টুর লক্ষণগুলি দেখে ঠাকুর আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, আধ্যাত্মিক জগতে পণ্টুর উন্নতি হবে। পরবর্তীকালে, পণ্টু এ্যাটর্ণী হন এবং বিবাহ করে সংসারী হন।

*

পতু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য অল্পবয়স্ক ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত হরিশ্চন্দ্র মুস্তাফীর দশ বছরের পুত্র। প্রকৃত নাম "হরিপদ।" পিতার সঙ্গে পতু ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর বিশেষ স্নেহ লাভ করেন। ঠাকুরকে দেখেই ভক্তিমান বালক পতু অশ্রুবিসর্জন করতেন এবং ঠাকুর তাঁর মুখে মিষ্টান্ন তুলে দিয়ে তাঁর প্রতি পরম স্নেহ প্রকাশ করতেন। পরে কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরের সেবাকার্যেও পতু আন্তরিকভাবে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন।

দ্বিজ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য তরুণ ভক্ত। কথামৃত প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে তিনি মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত শুরু করেন এবং তাঁর স্নেহলাভে ধন্য হন।

দ্বিজ'র মায়ের মৃত্যুর পর, দ্বিজ'র পিতা পুনরায় বিবাহ করেন; কিন্তু ঠাকুরের কাছে দ্বিজ'র যাতায়াতে তাঁর প্রবল আপত্তি থাকায়, তিনি স্বয়ং ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে এই বিষয়ে কথা কইতে গেলে, ঠাকুর তাঁর কাছে দ্বিজ'ব বিষয়ে প্রশংসা করেন এবং দ্বিজকে দক্ষিণেশ্বরে আসার জন্য বাধা দিতে নিষেধ করেন।

দ্বিজ পূর্ব সংস্কার অনুযায়ী দক্ষিণেশ্বরে আসেন বলে ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে'ছলেন এবং ঠাকুরের প্রতি একান্ত অনুরাগের দরুন দ্বিজ'র আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতির কথাও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। গোপনে ঈশ্বর সাধনার জন্য দ্বিজ'র প্রতি ঠাকুরের নির্দেশ ছিল।

*

ক্ষীরোদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম স্নেহভাজন তরুণ ভক্ত। পুরানাম ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র। তিনি ছিলেন কথামৃত প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যা-লয়ের ছাত্র। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষের (পরবর্তীকালে স্বামী সুবোধানন্দ) সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করতে যান এবং তদবধি সেখানে যাতায়াত শুরু করেন।

ক্ষীরোদের সম্পর্কে ঠাকুর খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এই ভক্ত ছাত্রটিকে তিনি মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে উপদেশ নেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিতেন এবং তাঁর প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার জন্য মাষ্টারমশাইকেও নির্দেশ করতেন। ক্ষীরোদ বরাবরই ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

*

কিশোরী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, কৃষ্ণনগর নিবাসী গৃহীভক্ত। পুরানাম কিশোরীমোহন রায়। কলকাতায় সরকারী ষ্টেশনারী অফিসে উচ্চপদে কাজ করার জন্য, কৃষ্ণনগর ছেড়ে তিনি আলমবাজারের পাশে বনহুগলীতে বাস

করতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে প্রায়ই যেতেন এবং তাঁর সান্নিধ্যলাভে ও কথামৃত পানে খুব আনন্দ পেতেন। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর পরম স্নেহলাভ করে কিশোরী ঠাকুরের বিশেষ ভক্তে পরিণত হন।

একদা শ্বশুর বাড়ীতে নিজের স্ত্রীকে রেখে, কিশোরী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে কয়েকদিন বাস করতে থাকায়, তাঁর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা তাঁর সন্ধানে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসেন এবং এজন্য ঠাকুরকে কটু কথাও বলেন। অতঃপর ঠাকুর কিশোরীকে দক্ষিণেশ্বরে আসতে নিষেধ করে তাঁকে বাড়ীতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলে, অভিমানে কিশোরী সাময়িকভাবে ঠাকুরের সঙ্গ ত্যাগ করেন; কিন্তু দু-একদিন বাদেই আবার তিনি ঠাকুরের কাছে ফিরে আসেন।

সরল অন্তঃকরণের জন্য ঠাকুর কিশোরীকে খুব স্নেহ করতেন; "কল্পতরু" হওয়ার দিন কাশীপুরে তিনি কিশোরীকে কৃপাও করেছিলেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও কিশোরী বরানগর ও আলমবাজার মঠে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং ঠাকুরের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত থাকতেন। তাঁর দীর্ঘশ্মশ্রু থাকার দরুন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ভালবেসে "আব্দুল" সম্বোধন করতেন।

*

রবীন্দ্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগী যুবক-ভক্ত। কলকাতার অতি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ঠাকুরের প্রতি অনুরাগ বশতঃ তিনি দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। একবার সেখানে তিন রাত্রি বাস করার পর, তিনি ঠাকুরের স্নেহের পাত্রে পরিণত হন। তাঁর মধুর ও কোমল স্বভাবের দরুন, ঠাকুর তাঁকে কৃপা করলেও, তাঁকে জানিয়েছিলেন—"তোর কিন্তু দেরী হবে, এখন তোর একটু ভোগ আছে; এখন কিছু হবে না।"

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, রবীন্দ্র মোহের বশে যদিও সাময়িকভাবে কুসঙ্গে পড়েন, কিন্তু ঠাকুরের কৃপা থাকায় সেখান থেকে নিজেকে মুক্ত করে তিনি বরানগর মঠে এসে নরেন্দ্রাদি ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের কাছে অবশেষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মঠে তিনি কয়েকদিন বাসও করেন এবং নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁকে বৈরাগ্যের উপদেশও দেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মঠ ত্যাগ করে বাড়ীতে ফিরে গিয়েছিলেন।

*

ধীরেন্দ্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগত ভক্ত। তিনি ছিলেন কলকাতার জোড়াসাঁকোর প্রখ্যাত ঠাকুর-বংশের দৌহিত্র। ঠাকুরের অন্যতম গৃহী ভক্ত কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহায়তায় তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর ভক্তে পরিণত হন। গৌরবর্ণ, স্থূলকায় ও সত্যনিষ্ঠ ধীরেন্দ্রকে ঠাকুর খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁকে "ধীরু" বলে সম্বোধন করতেন।

একদা কাশীপুরে অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর ভাবাবেশে ধীরুর উপস্থিতিতে বলেন যে, সমুদ্রপারের ভক্তদের কৃপা করতে হলে, তাদের মত পোষাক পরা দরকার। ধীরু ঠাকুরের সেই কথা শুনে, ঠাকুরের জন্য একটি পায়জামা এনে দিয়ে কৃতার্থবোধ করেন এবং ঠাকুরও তা পরিধান করে আনন্দ প্রকাশ করেন।

*

যতীন্দ্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ভক্ত। তিনি ছিলেন কলকাতার শোভাবাজারের প্রখ্যাত রাজা রাধাকান্তদেবের নাতি ও রাজবাড়ীর ছেলে। তিনি ঠাকুরের একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাওয়া-আসা করতেন। কখনো কখনো তিনি দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাসও করেছেন এবং ঠাকুরের পরম স্নেহ লাভ করেছেন। একদা ঠাকুর স্নেহের বশে থুঁতনি ধরে তাঁকে স্পর্শ করেছিলেন। কলকাতায় ঠাকুরের আগমন হলে, সেখানেও যতীন্দ্র, বা যতীন সুযোগমত ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং তাঁর প্রতি অহেতুকী ভক্তি প্রকাশ করতেন।

একদা যতীন্দ্র, ঠাকুরকে জানান যে, ঠাকুরের চরণে প্রণাম করতে তাঁর খুব ইচ্ছা হয়, কিন্তু পাছে বন্ধুরা তাঁকে "ভক্ত" বলে ঠাট্টা করে, সেই লজ্জায় তিনি প্রণাম করতে পারেন না। এই কথা শুনে ঠাকুর তাঁকে বলেন—"কি দরকার লোক-দেখানোর! মনে ভক্তি থাকলেই হল। তুমি যেমন করছ, তাই করবে; এতেই তোমার হবে।" বলা বাহুল্য, এইভাবে ঠাকুর তাঁর ভাবটি রক্ষা করেছিলেন।

*

মহেন্দ্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, নিরাকারবাদী ভক্ত। তিনি পূর্বে আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজে সর্বদা যেতেন; কিন্তু ঠাকুরকে দর্শন করার পর

থেকে, আর সেখানে না গিয়ে, প্রায় কয়েকবছর তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করেন। এই সময় ভাগ্যবান মহেন্দ্র স্বপ্নে বহুবার ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর কৃপা লাভ করেছিলেন। ঠাকুরের কাছে মহেন্দ্র স্বপ্নের সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করায়, ঠাকুর তাঁকে শাক্তরূপে নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং বহু বিষয়ে উপদেশ দান করেছিলেন।

*

বড় কালী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত পরম ভক্ত। মূল নাম অজ্ঞাত। তিনি একটি অফিসে সামান্য বেতনে চাকরী করতেন এবং কোনমতে সংসার প্রতিপালন করতেন। ঘরে স্ত্রী এবং ছেলেপুলে ছিল। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণে তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন; এমনকি মাঝে মাঝে অফিস কামাই করেও তিনি ঠাকুরের প্রতি আন্তরিক টানে তাঁকে দেখতে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং তাঁকে কেবলমাত্র দর্শন করেই তৃপ্তি পেতেন। মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অপর ভক্ত হাজরা মশাইয়ের সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে তাঁর আলোচনা ও তর্ক হত এবং তর্কের সময় হাজরা মশাইকে তিনি কখনো কখনো ভর্ৎসনাও করতেন।

*

বুটো কালী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। প্রকৃত নাম কালী মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন হুগলী জেলার গোপীনাথপুর গ্রামের অধিবাসী। ভক্তরূপে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং শেষ দিন অবধি নানাভাবে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। এমনকি, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর কাশীপুর শ্মশানে তিনিও উপস্থিত ছিলেন এবং দাহকার্যের পর ঠাকুরের কিছু পূত অস্থি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তীকালে, প্রথমে কলকাতার বাড়ীতে এবং পরে গ্রামের বাড়ীতে তিনি ঠাকুরের সেই পূত অস্থি পূজা করতেন।

*

প্রিয়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত ব্রাহ্ম ভক্ত এবং নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) বন্ধু। ব্রাহ্ম সমাজে নরেন্দ্রনাথ যুক্ত থাকাকালীন, তিনি

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যেতেন। একবার নরেন্দ্রনাথ ও কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাসও করেছিলেন এবং সে সময় শ্রীশ্রীমায়ের প্রস্তুত রুটী, ছোলার ডাল ইত্যাদি আহার করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। পুরাতন ব্রাহ্ম ভক্ত রাজমোহনের কলকাতার সিমুলিয়া পল্লীর বাড়ীতে তাঁর যাতায়াত ছিল; একদা রাজমোহনের বাড়ীতে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনার সময় ঠাকুর স্বেচ্ছায় শুভাগমন করলে, নরেন্দ্রাদি বন্ধুগণসহ তিনি সেদিন উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের সামনে উপাসনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

*

প্রসন্ন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত ব্রাহ্ম ভক্ত। তিনি আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের শিষ্য ছিলেন। কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ঠাকুরের ভাবধারাকে ঠিকমত বুঝতে অক্ষম হওয়ায়, প্রসন্ন তাঁর গুরু কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনা করতেন।

একদা ঠাকুরকে পরীক্ষা করার জন্য প্রসন্ন রাত্রি বেলায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে গিয়ে বাস করেন এবং কেশবচন্দ্রের চেলা হওয়ার জন্য তাঁকে বার বার উপদেশ দিতে থাকেন। এই ঘটনায় ঠাকুর প্রসন্নের উপর খুব বিরক্ত হন এবং সে রাত্রে তাঁকে ঘর থেকে বহিষ্কার করেন। হতভাগ্য প্রসন্ন, ঠাকুরের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে, সেদিন ঘরের বাইরের বারান্দায় রাত কাটিয়েছিলেন এবং পরের দিন বাড়ী ফিরে গিয়েছিলেন।

*

রতন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত পরম ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের অপর ভক্ত যদুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বরের বাগানের তত্ত্বাবধায়ক এবং এই সূত্রেই তিনি ঠাকুরের সঙ্গলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে রতন প্রায়ই যদুলালের বাগান থেকে পার্শ্ববর্তী রাণী রাসমণির বাগানে এসে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং ঠাকুরকে খুব ভক্তি করতেন। ভক্ত যদুলালের কলকাতার বাড়ীতে যাত্রা-গান প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর থেকে নিয়ে আসার জন্য রতনই প্রায় যেতেন এবং এজন্য ঠাকুর রতনকে খুব স্নেহ করতেন।

কৃষ্ণধন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জনৈক রসিক ব্রাহ্মণ এবং ভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন এবং তাঁর কথামৃত পান করে আনন্দ পেতেন। কৃষ্ণধন রসিক-প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং ভাঁড়ের ন্যায় এমন এক একটি কথা বলতেন যে, সকলে তা হাস্যসহকারে উপভোগ করত। ঠাকুর কিন্তু কৃষ্ণধনের এই সামান্য রসিকতা পছন্দ করতেন না। একদা ঠাকুর কৃষ্ণধনকে ঐহিক বিষয় নিয়ে ফস্টি নস্টিতে সময় নষ্ট না করে, ঈশ্বরের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উপদেশ দেন। কৃষ্ণধন তখন ভক্তিভরে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন—"আপনি টেনে নিন।" তাতে ঠাকুর কৃষ্ণধনকে স্বীয় চেষ্টার উপর নির্ভর করতে উপদেশ দেন এবং নীতিপূর্ণ কাঠুরিয়ার গল্প শুনিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেন।

*

রামধন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ব্যক্তি। তিনি ছিলেন রাণী-রাসমণির দক্ষিণেশ্বর এষ্টেটের জনৈক কর্মচারী এবং রাণীর খুব প্রিয়পাত্র। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তিনি খুব বিরূপ থাকায়, ঠাকুরের সঙ্গে কখনো কথাও কইতেন না এবং রামধনের এরূপ আচরণের জন্য ঠাকুর মনে খুব ব্যথা পেতেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের গঙ্গাস্নানের সময়, রামধন সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে ঠাকুরকে দেখেও কথা না বলায় ঠাকুর খুব দুঃখিত হন এবং রামধনের মনের পরিবর্তনের জন্য মা-ভবতারিণীর উদ্দেশে প্রার্থনা জানান। বলা বাহুল্য, প্রার্থনা করার সাথে সাথেই রামধন পুনরায় সেই পথে ফিরে এসে, ঘাটের কাছে নেমে ঠাকুরের সঙ্গে অযাচিতভাবে আলাপ করেন। করুণাময় ঠাকুরের প্রার্থনায় রামধনের মন থেকে বৈরীভাব দূর হয়ে যায় এবং ক্রমে তিনি ঠাকুরের অনুরক্তে পরিণত হন।

*

সারদাচরণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত গৌরাঙ্গ-ভক্ত। তিনি ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত অধরলাল সেনের বন্ধু ছিলেন এবং স্কুলের ডেপুটী ইনস্পেক্টরের পদে চাকরী করতেন। সারদাচরণের বড় ছেলেটির অকালে মৃত্যু হওয়ায় তিনি শোকে

অধীর হয়ে পড়েন এবং এই সময় বন্ধু অধরলাল তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে সান্ত্বনা লাভের আশায় নিয়ে যান; ঠাকুরও সারদাচরণকে গান শুনিয়ে এবং ভগবৎ প্রসঙ্গ দ্বারা সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে শান্ত করেন। এরপর থেকেই সারদাচরণ সুযোগ পেলেই ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং তাঁর কথামৃত পান করে শান্তি পেতেন।

একদা ভক্ত অধরলালের বাড়ীতে ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, সারদাচরণও শান্তির আশায় সেখানে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন এবং গৌরাঙ্গ-ভক্ত সারদাচরণকে ঠাকুর গৌর কীর্তন শুনিয়ে তাঁর মনের ভার লাঘব করেন। পরবর্তীকালে, চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর সারদাচরণ সাধন-ভজনে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

*

রাজমোহন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, কলকাতার সিমুলিয়া পল্লী নিবাসী পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত। তাঁর বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রভৃতি তরুণ ভক্তেরা যোগদান করতেন। একদা নরেন্দ্রনাথের উপাসনা দেখার জন্য ঠাকুর ভক্তগণসহ স্বেচ্ছায় সিমুলিয়ায় রাজমোহনের গৃহে শুভাগমন করেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি নরেন্দ্রাদি ভক্তগণের উপাসনা দেখেন এবং নরেন্দ্রনাথের গান শোনেন। এই উপলক্ষে ভাগ্যবান রাজমোহন তাঁর বাড়ীর অন্দরমহলে ঠাকুরকে সম্বর্ধনা সহকারে নিয়ে যান এবং জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

*

যোগজীবন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত, স্বনামধন্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পুত্র। প্রথম জীবনে তিনি তাঁর পিতা-মাতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

*

পঞ্চানন

জনৈক তরুণ ভক্ত। মন্মথ গুণ্ডা, তথা মন্মথ ভট্টাচার্যকে স্বামী অখণ্ডানন্দ দু'বার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে যান এবং সেই দু'বারই পঞ্চানন তাঁদের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন।

রামজয়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃবন্ধু, ভুরসুবো গ্রামের জমিদার মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তথা মাণিকরাজার ভ্রাতা। বাল্যকালে ঠাকুর তাঁর পিতার সঙ্গে প্রায়ই মাণিকরাজার বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন এবং বাড়ীর সকলেই বালক গদাধরকে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ) প্রাণাধিক ভালবাসতেন। গদাধরের আকৃতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে রামজয়, গদাধরের পিতা ক্ষুদিরামকে জানিয়েছিলেন যে, গদাধরের মধ্যে দেব-অংশ বিরাজমান। বলা বাহুল্য, গদাধর রামজয়ের খুব প্রিয় ছিলেন।

*

ঝুনো সরষে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভাগ্যবান ভক্ত এবং সরকারী কর্মচারী আশুতোষ রায়। তিনি খুব খর্বকায় ছিলেন বলে ঠাকুর তাঁকে আদর করে "ঝুনো সরষে" বলে ডাকতেন। কলকাতায় থাকাকালীন তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন। একদা ঠাকুর তাঁর হাতের ওজন পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে, তবে একটু বিলম্ব হবে।

পরবর্তীকালে, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি সরকারী কাজ উপলক্ষে কলকাতা থেকে আসামের শিলং-এ বদলী হয়ে গেলেও, সেখানে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত কথামৃত পাঠ ও কীর্তনাদি করতেন। কিন্তু শিলং থেকে পূর্ববঙ্গে ঢাকায় অফিস স্থানান্তরিত হওয়ায়, তাঁর কথামৃত-পাঠ প্রভৃতি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি কেবলমাত্র সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের উৎসবাদিতে যোগদান করা ছাড়া আর কিছুই পৃথকভাবে করতে পারতেন না। অবশেষে ঢাকা থেকে বিহারের রাঁচীতে পুনরায় অফিস স্থানান্তরিত হওয়ায়, সেখানে ঠাকুর-সম্পর্কীয় সবরকম আলোচনা ও কথামৃত পাঠ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

এই অবস্থায় রাঁচীতে তিনি একদিন গভীর রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় কার ডাক শুনে জেগে ওঠেন এবং শোনেন যে পরিচিত কণ্ঠে কে যেন তাঁকে "ও, ঝুনো সরষে" বলে ডাকাডাকি করছেন। ঐ ডাক শুনে তিনি চমকে ওঠেন; কারণ ঐ নামে তাঁকে ঠাকুর ছাড়া আর কেউই ডাকতেন না। সেদিন মাঘী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি দেখেন যে, ঠাকুর সশরীরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ঠাকুর তাঁকে বলেন—"এখানকার কিছু কথা হত; তা ঢাকায় না হয় দরকার ছিল না, এখানে ওটি বন্ধ কেন করলে? উটি কোরো না।"

এই কথা ক'টি বলে এবং তাঁকে দর্শন দিয়ে ঠাকুর অন্তর্হিত হলে পরম ভাগ্যবান ঝুনো সরষে, মহাপ্রয়াণের পরেও ঠাকুরের এই অপ্রত্যাশিত কৃপার পরিচয় পেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েন।

*

মোহিত

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জনৈক ছাত্র। তিনি যখন দুটো পাশের পড়া পড়ছিলেন, তখন দু-একবার ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন। মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত একদা ঠাকুরের কাছে মোহিতের ঈশ্বরানুরাগের বিষয় উল্লেখ করলে ঠাকুর বলেছিলেন—"তা হতে পারে, তবে অত উঁচুঘর নয়। শরীরের লক্ষণ তত ভাল নয়; মুখ থ্যাবড়ানো।"

*

নবকুমার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জনৈক সঙ্গী। তিনি বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসতেন। একদা ঠাকুরের কাছে ভক্তসমাগম দেখে, ঘরের দরজার কাছ থেকেই দম্ভভরে চলে যাওয়ায়, ঠাকুর তাঁকে "অহঙ্কারেব মূর্তি" বলে মন্তব্য করেছিলেন।

*

ভুপেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জনৈক তরুণ ভক্ত। ঠাকুরের দ্বিজ নামক অপর ভক্তের পিতা যেদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন, সেদিন ভূপেনও সেখানে উপস্থিত থাকায়, ঠাকুর ক্রীড়াচ্ছলে ভূপেনের পিঠে চাপড় দিয়ে স্নেহ প্রকাশ করেছিলেন।

*

ক্ষেত্রনাথ

দক্ষিণেশ্বরে ৺রাধাগোবিন্দের পূজারী ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, মা-ভবতারিণীর তৎকালীন বেশকারী গদাধর, তথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের, নিত্য যোগাযোগ ছিল। একদা অসাবধানভাবশতঃ ক্ষেত্রনাথের হাত থেকে

৺গোবিন্দের বিগ্রহটি পড়ে গেলে একটি পা ভেঙ্গে যায়। এই ঘটনায় ক্ষেত্রনাথের ওপর মন্দির-কর্তৃপক্ষেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে সরাসরি বরখাস্ত করেন। কিন্তু ঠাকুর ক্ষেত্রনাথ কর্তৃক ঐ ভাঙ্গা-বিগ্রহের পা নিজে জুড়ে দিয়ে পুনরায় সেটি পূজার জন্য ব্যবস্থার নির্দেশ দিলে, রাণী রাসমণি ঠাকুরকেই ক্ষেত্রনাথের স্থলে ৺রাধাগোবিন্দের পূজারী নিযুক্ত করেছিলেন।

*

বঙ্কিম

মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পরিচিত এবং বাগবাজারের স্কুলের একটি অল্পবয়স্ক ছাত্র। একদা ঠাকুর এই ছেলেটিকে স্কুলে দূর থেকে দেখে মাষ্টারমশাইকে বলেছিলেন যে, ছেলেটি ভাল। এমনকি এরপর দক্ষিণেশ্বরে মাষ্টারমশাই গেলে, ঠাকুর তাঁর কাছে এই ছেলেটির বিষয়ে খোঁজ নিয়েছিলেন এবং তাকে দক্ষিণেশ্বরে না নিয়ে যাওয়ায় আক্ষেপ করেছিলেন।

*

কালী-ভুলু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগত দুটি ভাই—কালী আর ভুলু। হুগলী জেলার আঁটপুর নিবাসী রামপ্রসাদ মিত্র তাঁদের পিতা। কলকাতার ঝামাপুকুরে যখন রামপ্রসাদ বাস করতেন, সে সময় ঠাকুরও তাঁর সাধক জীবনের পূর্বাবস্থায় প্রায় দু'বছর ঝামাপুকুরে ছিলেন এবং মাঝে মাঝে রামপ্রসাদের ঝামাপুকুরের বাড়ীতেও বেড়াতে যেতেন। সেই সময় রামপ্রসাদের দুই পুত্র—কালী আর ভুলুর সঙ্গে ঠাকুরের বিশেষ পরিচয় ও হৃদ্যতা হয়। দুটি ভাই-ই ঠাকুরের খুব অনুগত ছিলেন এবং ঠাকুরও তাঁদের যথেষ্ট স্নেহ করতেন। একদা কালী ও ভুলুর ঐকান্তিক আগ্রহে, ঠাকুর তাঁদের আঁটপুরের মিত্র বাড়ীতে প্রসিদ্ধ ৺দুর্গাপূজার সময় যেতে রাজী হন এবং কালী ও ভুলুই প্রথম আঁটপুরে ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের ত্যাগীসন্তান স্বামী প্রেমানন্দ তথা বাবুরাম মহারাজের বাড়ীও এই আঁটপুরেই ছিল।

*

সত্যচরণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী-সন্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের পূর্বাশ্রমের পুত্র। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, তথা শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ (রাখাল মহারাজ)

ঠাকুরের কাছে নিজেকে সমর্পণের পূর্বেই বিবাহ করেছিলেন। ঠাকুরের গৃহী-ভক্ত মনোমোহন মিত্রের ভগ্নী শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবীর সঙ্গে রাখালের বিবাহ হওয়ায় শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের সহায়তায় ঠাকুরের সঙ্গে রাখালের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

বিবাহের পর একদা স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী দেবীকে নিয়ে রাখাল ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে গেলে, ঠাকুব সহাস্যে তাঁদের দুজনের মনের বাসনা জানতে চান। বিশ্বেশ্বরী তাঁর নির্বাসনার কথা জানালেও, রাখাল কিন্তু একটি পুত্র লাভেব বাসনা প্রকাশ করেন। এই সময় ঠাকুর রাখালকে পুত্র লাভের জন্য আশীর্বাদ করেন এবং পরে সত্যই তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রটির নাম "সত্যচরণ" রাখা হয়। পুত্রটিকে নিয়ে বিশ্বেশ্বরী দেবী যেদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসেন, সেদিন ঠাকুর ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করেন এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে টাকা দিয়ে ছেলেটির মুখ দেখার জন্য নির্দেশ দেন। একদা প্রসঙ্গক্রমে যোগীন মা, বলরাম বসু প্রভৃতি ভক্তগণকে ঠাকুর জানিয়ে-ছিলেন যে, দুর্ঘটনায় অকালে পরলোকগত ঠাকুরের পরমভক্ত অধরলাল সেন পুত্ররূপে রাখালেব কাছে জন্ম নিয়েছেন। বলা আবশ্যক, এই জন্মেও একটি দুর্ঘটনার জের হিসাবে সত্যচরণের মৃত্যু হয়েছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ছেলেটির মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তার মা বিশ্বেশ্বরী দেবী তথা রাখালের স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ ছেলেটিকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং তাকে দেখাশোনাও করতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বরানগর মঠে কিছুদিন তাকে রেখে নিজে লেখাপড়া শেখাতেন; এমন কি ভবিষ্যতে ছেলেটি বড় হলে, তাকে মঠে এনে সাধু করার ইচ্ছাও স্বামী বিবেকানন্দ পোষণ করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিশোর অবস্থাতেই একদা খেলা করার সময় মাটিতে পুঁতে রাখা একটি খুঁটির ওপর অসাবধানতাবশতঃ পড়ে গিয়ে ছেলেটি বুকে দারুণ আঘাত পায় এবং সেই আঘাতের ফলেই তার হৃদরোগ হয়। চিকিৎসার জন্য তাকে তখন রাখাল মহারাজের মাতুলালয়ে (কাঁসারি পাড়ার সেনদের বাড়ীতে) রাখা হয়। এই সময় রাখাল মহারাজ প্রতিদিন সেনদের বাড়ীতে গিয়ে সন্তানটিকে দেখে আসতেন। যদিও তিনি কোন প্রকার বাহ্যিকভাব প্রকাশ করতেন না, তবু তাঁর মন সেই সময় বড় চঞ্চল হয়ে থাকত। প্রায় দু'বছর রোগভোগের পর মাত্র ১০ বছর বয়সে এই ছেলেটি, অর্থাৎ সত্যচরণ দেহত্যাগ করে এবং এই ঘটনায় রাখাল মহারাজ খুব ব্যথিত হন। এরপর তিনি তাঁর জন্মভূমি, বৈমাত্রেয় ভাই বা আত্মীয়স্বজনের কোনও উল্লেখ করতেন না এবং তাঁদের সকলের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করেন।

দ্বাদশ স্তবক

ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকালের দ্বিতীয় গুরু এবং উচ্চস্তরের মহিলা-সাধিকা। পূর্ববঙ্গের যশোহর জেলায় এক উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে যোগেশ্বরী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। বৈষ্ণব এবং তন্ত্র উভয়শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং সাধনার দ্বারা শাস্ত্র নিহিত সত্য তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন। আলুলায়িত দীর্ঘ কেশা, গৈরিক বস্ত্র পরিহিতা রূপবতী, বিদুষী, প্রৌঢ়া এই সন্ন্যাসিনী "ভৈরবী ব্রাহ্মণী"রূপে পরিচিতা ছিলেন। ঈশ্বর দর্শনের প্রবল ব্যাকুলতা তাঁকে বাল্যকাল থেকেই সংসারে আসক্তি শূন্য করে; তাই যৌবনে যোগিনী সেজে তিনি তন্ত্রসাধনায় নিমগ্না হন এবং অচিরে সিদ্ধিলাভ করেন। এরপর তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতা কর্তৃক আদিষ্টা হয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধানে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হন ও ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গের বরিশাল নিবাসী দু'জন উচ্চদরের সাধক—চন্দ্র ও গিরিজাকে তিনি প্রথম দীক্ষাদান করলেও তাঁরা কেউই সাধনার পথে বেশীদূর অগ্রসর হতে না পারায়, তাঁদের ঈশ্বর দর্শন হয়নি; কতকগুলি বিশেষ শক্তি বা সিদ্ধাই লাভ করার পরেই তাঁরা যোগভ্রষ্ট হয়েছিলেন। এরপরই শ্রীশ্রীজগন্মাতার আদেশ লাভ করে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অকস্মাৎ দক্ষিণেশ্বরে একাকিনী উপস্থিত হন এবং মাতৃভাবে ঠাকুরকে পুত্রস্বরূপ গ্রহণ করেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি দক্ষিণেশ্বরের পাশে আরিয়াদহ গ্রামে, গঙ্গার তীরে "দেবমণ্ডল" ঘাটের চাঁদনীতে বাস করতেন এবং সেখান থেকে প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন।

ঠাকুরের আচরণে ও ক্রিয়াকলাপে নিঃসন্দেহ হয়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণী প্রথম ঠাকুরকে "অবতার" বলে ঘোষণা করেন। এমনকি, রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসের আয়োজিত বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সভায় শাস্ত্রসম্মত যুক্তি সিদ্ধান্ত ও প্রমাণের দ্বারা তিনি তাঁর অভিমতকে সর্বসমক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ঠাকুর ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে তন্ত্রনির্দিষ্ট প্রধান চৌষট্টি প্রকারের কঠিন সাধনা করেন এবং তাঁকে মহিলা-গুরুরূপে বরণ করেন; ভৈরবী ব্রাহ্মণীও ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে নিজের আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণ করেন। ব্রাহ্মণী প্রায় ছয় বছর দক্ষিণেশ্বরে বাস করেছিলেন এবং ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরেও ভ্রমণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তাঁকে নিজের শাশুড়ীর মত সম্মান করতেন এবং "মা" বলে সম্বোধন করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার নানা স্মৃতি বহন করে ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করার পর, একাকিনী নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং অবশেষে ৺কাশীধামে এসে

তপস্যায় নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে তীর্থ দর্শনের সময় ঠাকুর যখন কাশীতে আসেন তখন সেখানে আবার ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়। সেখান থেকে ঠাকুরের সঙ্গে ভৈরবী শ্রীবৃন্দাবনে তীর্থ দর্শনে যান এবং ঠাকুরের উপদেশে সেখানে শেষ অবধি বাস করেন। ঠাকুর সেখান থেকে চলে আসার অল্পকাল পরেই এই মহাসাধিকা এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহিলা-গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবী শ্রীবৃন্দাবনে মহাযোগে আত্মলীলা সম্বরণ করেন। ঠাকুরের সাধকজীবনের বিশিষ্ট স্থান অধিকারিণী ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে ঠাকুর "যোগমায়ার অংশ" বলে নির্দেশ করেছিলেন।

*

চন্দ্রমণি দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভাগ্যবতী জননী। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় তাঁর পরম অবদান অনস্বীকার্য। দেব-দ্বিজে ভক্তি-পরায়ণা, অতিথি-বৎসলা চন্দ্রমণির পতিভক্তি ও অমায়িক ব্যবহার তাঁকে মূর্তিমতী লক্ষ্মীতে পরিণত করেছিল। গর্ভাবস্থায় নানাপ্রকার দেব-দেবী দর্শন ও অনুভূতি লাভের পর গদাধরের (শ্রীরামকৃষ্ণ) জন্মের পর থেকেই তিনি গদাধর সম্পর্কে অনেক দৈব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং তাঁর স্নেহশীতল পক্ষপুটের ছায়ায় গদাধরকে রক্ষা করেন। ছয় মাসের শিশু গদাধর ষোল বছরের ছেলের মত আকৃতি নিয়ে, মাতাকে দর্শন দিয়ে প্রথম তাঁর শৈশব লীলা শুরু করেছিলেন।

গদাধর অল্পবয়সে পিতৃহীন হওয়ায়, চন্দ্রমণি একাধারে তাঁর পিতা ও মাতা-রূপে গদাধরকে পালন করেন এবং গদাধরও একান্তরূপে মায়ের অনুগত হন। মাতৃভক্ত গদাধর তাঁর উপনয়নের সময় স্বীয় জননীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ না করে, পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শূদ্রাণী ধাত্রীমাতা ধনীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা নেওয়ার জন্য জেদ করায়, সত্য-রক্ষার্থে চন্দ্রমণি গদাধরকে সেকাজে অনুমতি দেন। এমনকি, গদাধরের বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধানে নিরাশ হওয়ার পর, চন্দ্রমণি গদাধরের নির্দেশ মতই পাত্রী সারদাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন।

একদা বাল্যকালে কৌতুক ছলে গদাধর সন্ন্যাসীর মত বেশ ধারণ করায়, মাতা চন্দ্রমণি মনে ব্যথা পেয়েছিলেন; সেজন্য পরবর্তীকালে মাতৃভক্ত গদাধর মাতার অসাক্ষাতে শ্রীমৎ তোতাপুরীর কাছ থেকে সন্ন্যাস-দীক্ষা নিলেও, পাছে মা মনে কষ্ট পান সেজন্য মস্তক মুণ্ডন করেননি বা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করেননি। এখানে উল্লেখ্য, ঠাকুরের সন্ন্যাস-দীক্ষার সময় চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের

কাছেই বাস করতেন। এমনকি সন্ন্যাস-গ্রহণের ফলে কাঁধের পৈতা (উপবীত) ত্যাগ করায় পাছে মা সেটা লক্ষ্য করেন, তাই পৈতার স্থলে বাম কাঁধে সাদা চাদর জড়াতেন।

ঠাকুরের সাধনকালের অধিকাংশ সময় চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ছিলেন এবং নহবৎ-ঘরে বাস করতেন। ঠাকুরও মা চন্দ্রমণিকে কাছে পেয়ে বেশ আনন্দে থাকতেন এবং স্বীয় মাতা ও জগন্মাতা ভবতারিণীকে সমজ্ঞান করতেন। চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন ঠাকুর প্রতিদিন তাঁকে প্রণাম করতে যেতেন এবং "মা, কেমন আছ" বলে প্রতিদিন তাঁর খবর নিতেন। চন্দ্রমণি যতদিন জীবিতা ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত ঠাকুর নহবৎ-ঘরে গিয়ে তাঁর কাছে বসে আহার করতেন। ঠাকুরের মাঝে মাঝে পেট খারাপ হলে চন্দ্রমণি বলতেন —"মা-কালীর ভোগ খেয়োনি; বৌমাকে বলব মাছের ঝোল আর কাঠের জ্বালে চাট্টি ভাত রেঁধে দেবে।" বলা আবশ্যক, চন্দ্রমণিও ঠাকুরকে দুটো একটা মুখরোচক তরকারী নিজে রেঁধে খাওয়াতেন এবং ঠাকুর সেই রান্না খেয়ে খুব তৃপ্তি পেতেন।

একদা তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে বৃন্দাবনে গিয়ে ঠাকুর সেখানকার উচ্চস্তরের সাধিকা, বৃদ্ধা বৈষ্ণবী গঙ্গামাতার সংস্পর্শে আসেন এবং সেখানে তাঁর আশ্রয়েই থেকে যাওয়ার বন্দোবস্ত করেন। কোন প্রকারেই যখন ঠাকুরকে বৃন্দাবন থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব ছিল না, তখন ভাগ্নে হৃদয়রাম তাঁকে, তাঁর মা চন্দ্রমণির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃভক্ত সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে চন্দ্রমণির কাছে ফিরে আসতে সম্মত হন। জীবনের শেষ কয়েক বছর চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছেই ছিলেন এবং শেষ সময়ে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত না থাকায়, ঠাকুর নিজে হাতেই চন্দ্রমণির সকল প্রকার সেবা-শুশ্রূষা সম্পাদনা করে পরম তৃপ্তি পেতেন। চন্দ্রমণির জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি ঠাকুর তাঁর সেবা করেন এবং "অবতার-শ্রীরামকৃষ্ণ" তাঁর মায়ের কাছে পূর্বের "গদাই"রূপেই বিরাজ করেন।

চন্দ্রমণির মৃত্যুর পূর্বে একদিন রাত্রে ঠাকুর চন্দ্রমণির ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেন; কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল সেখানে উপস্থিত থাকলেও, ঠাকুরের অদ্ভুত ভাষার এক অক্ষরও বুঝতে পারেন নি। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৮৫ বছর বয়সে চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছেই দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁকে অন্তর্জলি করা হয় এবং ঠাকুর তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। এই সময় গর্ভধারিণী চন্দ্রমণির চরণ দুটি মস্তকে ধারণ করে বিস্ময়ানন্দে ঠাকুর বলেছিলেন —"মা, তুমি কে গো? আমায় গর্ভে ধারণ করেছ! তুমি সাধারণ মা নও।"

ঠাকুর সন্ন্যাস গ্রহণ করায়, তাঁর দ্বারা পারলৌকিক কাজ নিষিদ্ধ বলে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল (মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বরের পুত্র) চন্দ্রমণির মুখাগ্নি ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মাতৃশোকে কাতর পরম মাতৃভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তবুও জননীর জন্য বার বার তর্পণ করার চেষ্টা করেও হাতে জল ধারণ করতে পারেননি, হাতের আঙুল অসাড় হয়ে সমস্ত জল পড়ে গিয়েছিল। "পরমহংস" অবস্থায় তাঁর পক্ষে আর কোন শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা সম্ভবপর নয় বুঝে, তিনি বিশেষ কাতর হয়ে পড়েন এবং পঞ্চবটীর দিকে গঙ্গাতীরে নির্জনে বহুক্ষণ মায়ের জন্য রোদন করে অশ্রুজলে মায়ের তর্পণ করেন।

পরবর্তীকালে ভক্তদের কাছে ঠাকুর বলেছিলেন—"সংসারে বাপ-মা পরম গুরু। যতদিন বেঁচে থাকেন, যথাশক্তি তাঁদের সেবা করতে হয়; আর মরে গেলে যথাসাধ্য শ্রাদ্ধ করতে হয়। যে দরিদ্র, কিছু নেই, শ্রাদ্ধ করার ক্ষমতা নেই, তাকেও বনে গিয়ে তাঁদের স্মরণ করে কাঁদতে হয়—তবে তাঁদের ঋণ শোধ হয়। যতক্ষণ মা আছেন, তাঁকে দেখতে হবে। যতক্ষণ নিজের শরীরের খবর আছে, মা'র খবরও নিতে হবে।"

বলা বাহুল্য, অবতার শ্রীরামকৃষ্ণকে গর্ভে ধারণ করে যেমন চন্দ্রমণি ধন্য হয়েছিলেন, তেমন রত্ন-প্রসবিনী চন্দ্রমণির সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণকে বুকে ধরে জগৎ-সংসার ধন্য হয়েছে

*

শ্যামাসুন্দরী দেবী

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জননী এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্বশ্রূমাতা। উভয়ের পরিচয়েই ভাগ্যবতী শ্যামাসুন্দরী ভক্তমণ্ডলীর কাছে বিশেষ সমাদৃতা হয়ে আছেন। ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণির জীবনে পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে যেমন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, পরমা প্রকৃতি সারদাদেবীর আবির্ভাবের পূর্বেও তেমন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল শ্যামাসুন্দরীর জীবনেও।

বিবাহের পর কন্যা সারদার সন্তানাদি না হওয়ায় শ্যামাসুন্দরী একদা দুঃখ প্রকাশ করলে ঠাকুর সে কথা শুনতে পেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তাঁর কন্যা সারদার এত সন্তান হবে যে, "মা"—ডাকে সে অস্থির হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, জগজ্জননীরূপে সারদাদেবী ভক্ত সন্তানদের "মা" "মা" ডাকে বিহ্বল হয়ে পড়তেন পূর্বে ঠাকুরের অস্বাভাবিক অবস্থা লক্ষ্য করে শ্যামাসুন্দরী তাঁর "ক্ষ্যাপা জামাইয়ের" জন্য মনে খুব কষ্ট পেতেন এবং কন্যা সারদার ভাবী

দুঃখময় জীবনের কথা চিন্তা করে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শাশুড়ী-জামাইয়ের মধ্যে এমন একটি মধুর সম্বন্ধ হয়, যা পরে ভক্ত ভগবানের সম্পর্কে পরিণত হয় এবং শ্যামাসুন্দরী নিজে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পট পূজাও করেন।

একদা শ্যামাসুন্দরী আহার করার পূর্বে ভাতের "ডেলা" পাকিয়ে হাতে রেখে মনে মনে ইষ্টকে নিবেদন করার সময়, ঠাকুর হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে "আমাকে দাও" বলে হাত পাতেন এবং ভাতের ডেলাটি আহার করে চলে যান। এই ঘটনায় ঠাকুর শ্যামাসুন্দরীর কাছে ইষ্টরূপে ধরা দেন এবং শ্যামাসুন্দরীও জামাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করে ধন্য হন।

*

ভুবনেশ্বরী দেবী

বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী ও ভারত-আত্মা স্বামী বিবেকানন্দের ভাগ্যবতী জননী তিনি ছিলেন কলকাতার সিমুলিয়া নিবাসী দেওয়ান ভবানীচরণ বসুর পৌত্র ও রামতনু বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল বসুর একমাত্র সন্তান। এটর্নী বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন তাঁর স্বামী। তিনি সুরূপা, ভক্তিপরায়ণা, কাযকুশলা ও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ তিনি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করতেন এবং অনেক স্থান আবৃত্তি করতে পারতেন। তাঁর স্মৃতি-শক্তি এবং ধারণা শক্তি এত প্রবল ছিল যে, স্বামী, পুত্র প্রভৃতির কাছ থেকে শুনে শুনে তিনি অনেক বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি বাংলায় কবিতাও লিখতেন এবং কিছু কিছু ইংরাজীও জানতেন। তাঁর প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে তিনি তৎকালীন প্রচলিত বিখ্যাত প্যারীচরণ সরকারের "ফাষ্ট বুক অফ রিডিং" পড়াতেন। পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গেও তিনি ধীরে ধীরে ইংরাজীতে কিছু কিছু কথা বলতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি অশেষ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সন্তানদের তিনি সবদাই সাহসী ও পরোপকারী হতে শিক্ষা দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়াও তাঁর অপর দুই পুত্র—জ্ঞানতপস্বী পরিব্রাজক মহেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গদেশের বরেণ্য সন্তান ছিলেন। স্বামীজী অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন; তাই বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দরূপে খ্যাত হবার পরেও জননীর সন্তুষ্টি ও মানত পূজা রক্ষার জন্য তিনি জননীর আদেশে কালীঘাটের ৺কালী মন্দিরে গড়াগড়ি দিয়ে প্রদক্ষিণ করেছিলেন। ভুবনেশ্বরীর সন্তানগুলি সবাই মায়ের অনুগত ছিলেন এবং অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় পুত্রদের ওপর মায়ের প্রভাব যথেষ্ট ছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ভুবনেশ্বরী দেবীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। প্রতিবেশী ও আত্মীয়-ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে ঠাকুরের বহুবার শুভাগমন হওয়ায়, প্রধানতঃ সেখানেই ঠাকুরের সান্নিধ্যে তিনি আসেন। সেখানে তিনি প্রায়ই ঠাকুরের কথামৃত পান করতে যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর মাতামহী এবং প্রমাতামহীও ঠাকুরের সঙ্গলাভ করেছেন। এমনকি, শিশুপুত্র ভূপেন্দ্রনাথকে কোলে নিয়েও ভুবেনেশ্বরী মাঝে মাঝে ঠাকুরের কীর্তন শুনতে যেতেন এবং ঠাকুরও ভুবনেশ্বরীকে স্নেহ করতেন।

একদা ভুবনেশ্বরীর "আহ্নিক" করার চেলী কাপড়খানি ছিঁড়ে যাওয়ায়, তিনি নরেন্দ্রনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ) একখানি গরদের কাপড় কিনে দিতে বলেন ; কিন্তু সেই সময় নরেন্দ্রনাথের কোন কাজকর্ম, বা রোজগার না থাকায় তিনি মায়ের কথা শুনে বিষণ্ণভাবে শুধু নিরুত্তর থাকেন। এদিকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে জনৈক ভক্ত একথালা মিছরী ও একখানি গরদের কাপড দিয়ে প্রণাম করে যাওয়ায়, অন্তর্যামী ঠাকুর সেগুলি তুলে রাখেন এবং দু'-একদিন বাদেই ভ্রাতুস্পুত্র রামলালকে দিয়ে কলকাতায় ভুবনেশ্বরীর কাছে তা পাঠিয়ে দেন। ঠাকুরের স্নেহের দান সেই গরদের কাপড়খানি পেয়ে বিস্মিত হয়ে ভুবনেশ্বরী রামলালকে বলেছিলেন—"এখানে কথা হয়েছে, আর দক্ষিণেশ্বরে তখনই টেলিগ্রাফ হল !" বলা বাহুল্য, সংসারের নিদারুণ দারিদ্র্য ঘোচাতে মায়ের সন্তুষ্টির জন্য একদা নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন এবং ঠাকুরের নির্দেশে মা-ভবতারিণীর কাছে উপস্থিত হয়ে দারিদ্র্যের কথা ভুলে, বিবেক-বৈরাগ্য প্রার্থনা করেছিলেন।

ঠাকুরের অসুস্থতার দরুন কাশীপুরে অবস্থানকালীন নরেন্দ্রনাথ একদা অপর দু'জন গুরুভ্রাতা—স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী শিবানন্দসহ বুদ্ধগয়ায় গিয়ে তপস্যা শুরু করলে, ভুবনেশ্বরী নরেন্দ্রনাথের জন্য খুব উদ্বিগ্ন হন এবং তাঁর আত্মীয়, ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের পিতা নৃসিংহচন্দ্র দত্তকে সঙ্গে নিয়ে কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন। ঠাকুর অপ্রতিভ হয়ে তাঁকে জানান যে, তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথ গয়ায় চলে গেলেও, শীঘ্রই ফিরে আসবে। ঠাকুরের কাছে সান্ত্বনাবাক্য শুনে সেদিন ভুবনেশ্বরী আশ্বস্ত হন এবং সত্যই কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথ পুনরায় কাশীপুরে ফিরে আসেন।

আরো একবার ভুবনেশ্বরী কাশীপুর থেকে নরেন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে আনার জন্য ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন ; কারণ, সেবারে অনেকদিন নরেন্দ্রনাথ বাড়ী ছেড়ে কাশীপুরে ছিলেন। ভুবনেশ্বরী কিছু বলার আগেই নরেন্দ্রনাথকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঠাকুরই ভুবনেশ্বরীকে অনুরোধ করলে,

সবাই বিস্মিত হন। অগত্যা নরেন্দ্রনাথ মায়ের সঙ্গে বাড়ীতে রওনা হলেও, বাগবাজার অবধি এসে আবার কাশীপুরে ফিরে যান। সেই সময় ভুবনেশ্বরী নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুরের বাড়ী ফেরার উপদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে নরেন্দ্রনাথ উত্তর দেন—"তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) চোরকে বলেন চুরি করতে এবং গৃহস্থকে বলেন সজাগ থাকতে।" (বলা আবশ্যক, ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের দিন অবধি নরেন্দ্রনাথ কাশীপুরেই ছিলেন।) এর কয়েকদিন পরেই ঠাকুরের দেহরক্ষা হলে, তাঁর পূতাস্থি যখন ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছির উদ্যানবাটীতে সমাধিস্থ করা হয়, তখন ভুবনেশ্বরীও সেখানে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানের সঙ্গে ভুবনেশ্বরীর যোগাযোগ ছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি-দিবস উপলক্ষে তিনি প্রতিবৎসর সেখানে চাঁদা দিতেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের ভুবনেশ্বরী নিজ সন্তানরূপে স্নেহ করতেন এবং তাঁরাও ভুবনেশ্বরীকে পরম শ্রদ্ধা করতেন। ভুবনেশ্বরীর জীবদ্দশাতেই তাঁর বীরপুত্র স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের খবর শুনে তিনি অত্যন্ত শোকার্ত হন এবং জনৈক আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে বিলাপ করতে করতে বেলুড় মঠে উপস্থিত হলে, মঠের সাধুরা তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে সাশ্রুনেত্রে বিদায় দেন। পরবর্তীকালে উত্তর ভারত, পুরী প্রভৃতি স্থানে ভুবনেশ্বরীর কয়েকবার তীর্থ ভ্রমণকালে প্রতিবারই মঠের কোন সাধু বা ব্রহ্মচারী তাঁর সঙ্গে যেতেন; একবার স্বামী ব্রহ্মানন্দও তাঁকে পুরীতে তীর্থ দর্শন করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি ও উৎসব উপলক্ষে বেলুড়মঠকে ভুবনেশ্বরী বাৎসরিক দশ টাকা চাঁদা দিতেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ অথবা স্বামী প্রেমানন্দ নিজে তাঁর কাছ থেকে তা আনতে যেতেন। শেষদিন পর্যন্ত বেলুড়মঠের সাধুদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক বজায় ছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সঙ্গলাভকারিণী এবং স্বামী বিবেকানন্দের রত্নপ্রসূ জননী ভুবনেশ্বরী দেবী ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

*

রঘুমণি দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা স্বামী বিবেকানন্দের মাতামহী। তিনি ছিলেন কলকাতার সিমুলিয়া নিবাসী দেওয়ান ভবানীচরণ বসুর পৌত্র এবং রামতনু বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল বসুর ধর্মপত্নী। কলকাতার বিডন ষ্ট্রীটের ঘোষ পরিবারের গোপালচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তাঁর পিতা। কলকাতার ৭নং রামতনু

বসু লেনের নিজস্ব বাড়ীতে তিনি বাস করতেন। রঘুমণি পরম বৈষ্ণবী ছিলেন। একদা পুরী থেকে দ্বারকা অবধি এই ভক্তিমতী মহিলা পদব্রজে ও রেলপথে তীর্থ দর্শন করেছিলেন।

রঘুমণির বাড়ীতে তাঁরই আত্মীয় এবং ঠাকুরের পরমভক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রথম জীবনে বসবাস করতেন এবং স্বামীজী তথা নরেন্দ্রনাথও পাঠ্যাবস্থায় সেখানে থাকতেন। তাঁদের সেই বাড়ীতে থাকাকালীন ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের সেখানে কয়েকবার শুভাগমন হয় এবং সেই সময়েই রঘুমণি প্রথম ঠাকুরেব সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেন। ঠাকুর সে বাড়ীতে এলেই রঘুমণি ও তাঁব মাতা (স্বামীজীব প্রমাতামহী) বাইমণি দেবীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরাও ঠাকুরকে সম্মান করতেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে স্বামীজীর ইংরাজ শিষ্য গুডউইন একবার বঘুমণির পা ছুঁয়ে হিন্দুমতে প্রণাম করায়, পরম বৈষ্ণবী রঘুমণি নিজেকে অপবিত্র জ্ঞান করে গঙ্গাস্নান করেছিলেন; কিন্তু গুডউইনেব ভক্তির পরিচয় পেয়ে তিনি পরে আবার নিজ কৃতকার্যের জন্য অনুশোচনাও করেছিলেন।

*

রাইমণি দেবী

স্বামী বিবেকানন্দের প্রমাতামহী। তিনি তাঁর কন্যা রঘুমণিসহ কলকাতার ৭নং রামতনু বসু লেনের বাড়ীতে বাস করতেন। সে বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন হলেই ঠাকুর নিজেই অন্দরমহলে প্রবেশ করে এই অতি বৃদ্ধা ভক্তিমতী মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং রাইমণিও ঠাকুরকে সম্মান করতেন।

*

মাতঙ্গিনী দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দের ভাগ্যবতী জননী এবং ঠাকুরের পরম ভক্ত গৃহী সন্তান বলরাম বসুর শ্বশ্রূমাতা। জামাতা বলরামের সঙ্গে মাতঙ্গিনী দেবী কয়েকবার ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং বলরামের বাড়ীতেও ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ হয়। ঠাকুর তাঁর মধ্যে ঈশ্বর নির্ভরতার পরিচয় পেয়ে, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তিনিও ঠাকুরের প্রতি খুব ভক্তিপরায়ণা ছিলেন।

একদা মাতঙ্গিনীর কাছে তাঁর পুত্র বাবুরামকে (পরবর্তীকালে স্বামী

প্রেমানন্দ) ভিক্ষা চাইলে, ভক্তিমতী মাতঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তাবে রাজী হন এবং নিজেকে সেজন্য ভাগ্যবতী বলে মনে করেন। বিনিময়ে তিনি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন—"বাবা, এই ভিক্ষা দিন, যেন ভগবানে আমার ভক্তি থাকে, আর আমার যেন পুত্রকন্যার শোক পেতে না হয়।" ঠাকুর তাঁর সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাঁকে কৃতার্থ করেন। বস্তুতঃ ঠাকুরের দেহরক্ষার পর বহুকাল বাদে স্বামী প্রেমানন্দের একসময় এমন কলেরা হয় যে, তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন এবং তাঁর প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। তাঁর অবস্থা দেখে চিকিৎসকগণ এবং অপর সকলের যখন ধারণা হয় যে, শীঘ্রই তিনি দেহত্যাগ করবেন, ঠিক সেই সময়েই তিনি আশ্চর্যরূপে জ্ঞান ফিরে পান এবং সকলকে বিমর্ষ দেখে বলেন—"ভয় নেই, এ দেহ এখন যাবে না; আমার মা এখনো বেঁচে আছেন।" বলা আবশ্যক, তাঁর বৃদ্ধা মাতা মাতঙ্গিনী তখনো জীবিতা ছিলেন।

মাতঙ্গিনী শুচিবাইগ্রস্তা ছিলেন বলে ঠাকুর একদা তাঁকে রহস্য করে প্রেসক্রিপশান দিয়েছিলেন—"যেখানে লোক হাগে, সেখানকার মাটি এনে তিলক কাটবে।" ভক্তিমতী মাতঙ্গিনী ঠাকুরের এই রঙ্গভরা আদেশকে লঘু ভাবে তুচ্ছ না করে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন এবং এই কঠিন রসিকতাকে ভক্তি সহকারে বাস্তবে পরিণত করেন। একদিন শেষরাত্রে গঙ্গাস্নান সেরে তিনি গঙ্গামাটির তিলকের বিনিময়ে সত্যসত্যই কপালে "গু"য়ের তিলক কেটে ফিরে এলে, তাঁর দৌহিত্রী সেই তিলক দেখে বলেন—"ও দিদিমা, তুমি যে "গু" দিয়ে তিলক কেটেছ; ছিঃ কী দুর্গন্ধ!" বলাবাহুল্য, মাতঙ্গিনী নির্বিকার চিত্তে ঠাকুরের রঙ্গভরা আদেশ পালন করার ফলে, তারপর থেকেই তাঁর শুচিবাই চলে গিয়েছিল।

ঠাকুরের প্রতি পরম ভক্তিপরায়ণা মাতঙ্গিনী ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের নিজ সন্তানজ্ঞানে স্নেহ করতেন এবং তাঁদের ঈশ্বরীয় পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতেন। তাঁর আঁটপুরের বাড়ীতে ত্যাগী সন্তানদের একবার উল্লেখযোগ্য মহামিলন ঘটে এবং সেদিন থেকেই তাঁরা প্রকৃত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জন্য প্রস্তুত হন। পরবর্তীকালেও রামকৃষ্ণমিশনের সাধুগণ সর্বদা তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করতেন।

বিশ্বেশ্বরী দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ তথা শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষের পূর্বাশ্রমের স্ত্রী। তিনি ছিলেন ঠাকুরের অন্যতম গৃহীভক্ত

মনোমোহন মিত্রের ভগিনী এবং ঠাকুরের মহিলা ভক্ত শ্যামাসুন্দরী দেবীর (মিত্র) কন্যা। তিনি ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

রাখালের সঙ্গে কন্যা বিশ্বেশ্বরীর বিবাহ দিয়ে শ্যামাসুন্দরী রাখালের বালিকা বধূ, তথা নিজ কন্যা বিশ্বেশ্বরীকে নিয়ে প্রথম যেদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান, সেদিন ঠাকুর বিশ্বেশ্বরীকে নিজের কাছে এনে পা থেকে মাথা অবধি তাঁর শারীরিক গঠনভঙ্গী তন্ন তন্ন করে দেখেন এবং তাঁকে "দেবী শক্তি" বলে নির্দেশ করেন। পরে নহবৎ-ঘরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর কাছে বিশ্বেশ্বরীকে পাঠিয়ে টাকা দিয়ে মুখ দেখার জন্য শ্রীশ্রীমাকে বলে পাঠান।

একদা রাখাল ও বিশ্বেশ্বরী দুজনে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলে ঠাকুর সহাস্যে তাঁদের দুজনের মনের বাসনা জানতে চান। বিশ্বেশ্বরী তাঁর নির্বাসনার কথা বলেন; কিন্তু রাখাল একটি পুত্রলাভের কামনা করেন। ঠাকুর রাখালের বাসনা পূরণের জন্য আশীর্বাদ করায় সত্যই পরে তাঁর একটি পুত্র সন্তান (সত্যচরণ) জন্মগ্রহণ করে। পুত্রটিকে নিয়ে বিশ্বেশ্বরী যেদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসেন, সেদিন ঠাকুর ছেলেটিকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে আদর করেন এবং শ্রীশ্রীমাকে টাকা দিয়ে ছেলেটির মুখ দেখার জন্য নির্দেশ দেন। বলা আবশ্যক, বিশ্বেশ্বরীর গর্ভাবস্থা থেকে ঠাকুরের ভাবনা ছিল এবং তাঁর যাতে সুপ্রসব হয়, তার ব্যবস্থাদির প্রতিও ঠাকুরের বরাবর লক্ষ্য ছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য একদা রাখাল দেশের বাইরে উত্তরাঞ্চলে বহুদিন থাকা-কালীন বিশ্বেশ্বরী স্বামীর কোন সংবাদ না পেয়ে বিশেষ মর্মাহত হন এবং সেই সময়েই একটি দুঃস্বপ্ন দেখার পর আত্মহত্যা করেন। কিছুকাল পরে বিশ্বেশ্বরীর পুত্রটিরও মৃত্যু হয় এবং রাখাল পরিপূর্ণ বৈরাগ্য অবলম্বন করে পরবর্তীকালে "স্বামী ব্রহ্মানন্দ" রূপে বিরাজ করেন।

*

ভবতারিণী দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত ও "বসুমতী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী। জনৈক ভক্ত পরিবারের এই কন্যাটি শৈশবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের খুব প্রিয় ছিলেন এবং তাঁর অন্নপ্রাশনের সময় ঠাকুর তাঁর শ্রীহস্তে তাঁকে আহার করিয়েছিলেন; এমনকি, ঠাকুরই তাঁর নাম "ভবতারিণী" রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ঠাকুরের বিশেষ স্নেহের পাত্রী এই মহিলা ভক্তটির বিবাহের ব্যবস্থাও ঠাকুরই নিজে করেছিলেন। ভক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথম জীবনে নিজের বিবাহে অসম্মতি জানালেও

অবশেষে ঠাকুরের অনুমতিক্রমে ঠাকুরেরই পরিচিতা ও স্নেহধন্যা ভবতারিণীকে তিনি বিবাহ করেন এবং বিবাহের পর থেকেই উপেন্দ্রনাথের সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে।

ভবতারিণীর দেহের রং খুব কালো ছিল বলে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভবতারিণীর বিবাহে স্বামী বিবেকানন্দের তথা নরেন্দ্রনাথের বিশেষ আপত্তি ছিল এবং ভবতারিণীও সে কথা জেনে খুব অভিমানে থাকতেন। সেজন্য একদিন স্বামীজী তাঁদের বাড়ীতে এসে সুপারি খেতে চাইলে, ভবতারিণী তাঁকে সুপারি দিতে অস্বীকার করেন। স্বামীজী ব্যাপারটি বুঝে যখন সহাস্যে তাঁকে বলেন—"উপেন-ঠাকুরের গলায় যখন ঝুলেছ, তখন সুপারি কেন, তোমার হাতের রান্নাও খেতে হবে"—তখন ভবতারিণীর অভিমান দূর হয়। বলা আবশ্যক, ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের অপর ভক্তগণের বহু লীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষীরূপা ভবতারিণী, ঠাকুরের অশেষ কৃপা লাভ করেছিলেন এবং শেষদিন অবধি ঠাকুরকেই নিজ ইষ্টজ্ঞানে পূজা করেছিলেন।

স্বামী উপেন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পর, ভবতারিণী বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং কলকাতার বিলাসবহুল নিজ বাড়ী ও সংসার ত্যাগ করে শেষ জীবনে কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্নিকটে বাস করতে থাকেন। কাশীতে থাকাকালীন তিনি আনন্দের সঙ্গে ঠাকুরের জপ-ধ্যানে রত থাকতেন এবং এই সময় সর্বদাই তিনি ঠাকুরের জ্যোতিঘন মূর্তি দর্শন করতেন। শেষদিন অবধি তিনি ঠাকুরের গান রচনায় এবং ভজনগান গেয়ে নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন এবং সমস্ত ভোগবিলাস ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতেন। আহার হিসাবে ঠাকুরকে নিবেদিত কাঁচা দুধ মধ্যরাত্রে একবার মাত্র প্রসাদ স্বরূপ গহণ করা ছাড়া, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনি এক ফোঁটা জলও পান করতেন না, বা কারোর ছোঁয়া কোন জিনিসও গ্রহণ করতেন না। পরিধানের মধ্যে তিনি কেবলমাত্র সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের পরিত্যক্ত ছেঁড়া গেরুয়া, বা ছেঁড়া কম্বল ব্যবহার করতেন। কাশীতে তিনি "বসুমতী-মা" নামে সকলের শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন এবং তথাকার রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের খুব অন্তরঙ্গ ছিলেন। সাধুরাও এই বৃদ্ধা তপস্বিনীকে দর্শন করার জন্য ভক্তদের তাঁর কাছে পাঠাতেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে পরিপূর্ণা, পরম অনুরাগিণী ভক্ত ভবতারিণী দেবী শতাধিক বছর বয়সে কাশীতেই দেহত্যাগ করেন

*

নিকুঞ্জ দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা মহিলা ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত ও কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্ত্রী এবং আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ভগিনী-সম্পর্কীয়া। ঠাকুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে তিনি ঠাকুরের অশেষ কৃপালাভ করেন।

একদা সাংসারিক কলহের জন্য আত্মঘাতী হবার সঙ্কল্প নিয়ে মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত গৃহত্যাগ করলে, নিকুঞ্জ দেবী তাঁর মানসিক অবস্থার কথা বুঝতে পারেন এবং স্বামীকে রক্ষার জন্য তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর সঙ্গে নিজেও বার হয়ে পড়েন। সেই সময় তাঁরা দুজনে বরানগরে মাষ্টারমশাইয়ের ভগ্নীপতি ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, কবিরাজ ঈশানচন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নেন এবং পরে শ্যামপুকুরে তেলিপাড়ায় একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করতে থাকেন। বরানগরে থাকাকালীনই ঠাকুরের সঙ্গে মাষ্টারমশাইয়ের প্রথম যোগাযোগ হয় এবং এই সময়েই নিকুঞ্জ দেবী ঠাকুরের পরিচয় জানতে পারেন।

পরবর্তীকালে মাষ্টারমশাইয়ের একটি ৭।৮ বছরের পুত্রের মৃত্যু হওয়ায়, নিকুঞ্জ দেবী খুব কাতর হয়ে পড়েন এবং পুত্রশোকে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। তিনি কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন, কখনো-বা অপর সন্তানদের ওপর অত্যাচার করেন, আবার মাষ্টারমশাই ঠাকুরের কাছে থাকলে খুব হাঙ্গামা করেন। এই নিদারুণ অবস্থায় মাষ্টারমশাই নিকুঞ্জদেবীকে কয়েকবার কাশীপুরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে আনায় তিনি কিছুটা প্রকৃতিস্থা হন পুত্রশোকাতুরা নিকুঞ্জ দেবী একদা আত্মহত্যার চেষ্টা করলে, মাষ্টারমশাই পুনরায় তাঁকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসেন এবং ঠাকুর তাঁকে অপঘাতে মৃত্যু থেকে সাবধান করেন

ঠাকুরের উপদেশে নিকুঞ্জ দেবী তাঁর কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে কিছুদিনের জন্য কাশীপুরে এসে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বাস করেন। পরে শ্রীশ্রীমা ঐ মেয়েটিকে "মানময়ী" বলে ডাকতেন। কাশীপুরে কিছুদিন বাস করার পর, শোকসন্তপ্তা নিকুঞ্জ দেবী ক্রমশঃ শান্ত হন এবং ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ স্নেহ, প্রীতি ও কৃপালাভে ধন্য হন। এমনকি, ঠাকুর কাশীপুরে তাঁকে দিয়ে ভিক্ষা করিয়ে ঈশ্বরীয় পথে তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটান। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, শ্রীশ্রীমা যখন বৃন্দাবনে যান, তখন নিকুঞ্জ দেবীও বাড়ীতে শিশু-কন্যা ফেলে, প্রাণের টানে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে গমন করেছিলেন। বস্তুতঃ একাধারে ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পরম স্নেহাদর লাভ করে নিকুঞ্জ দেবীর জীবন সার্থক হয়েছিল।

কৃষ্ণভামিনী দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত বলরাম বসুর স্ত্রী এবং ঠাকুরের অন্তরঙ্গ-পার্ষদ ও ত্যাগী-সন্তান স্বামী প্রেমানন্দের ভগ্নী। ঠাকুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে তিনি ঠাকুরের অশেষ কৃপালাভ করেন।

ভক্ত বলরাম বসুর পরিবারস্থ সবাই যেমন ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন, তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণভামিনীও তেমন ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করতেন। ঠাকুরের কৃপালাভের পর তাঁর পুত্র জন্মগ্রহণ করায়, তার নাম "রামকৃষ্ণ" রাখা হয়, যেহেতু পুত্রকে ঐ নামে ডাকলে, ঠাকুরেরই নাম করা হবে। অপর লোকেরাও ভগবানের নাম উচ্চারণের জন্য কৃষ্ণভামিনীকে "রামকৃষ্ণের মা" অথবা "রামের মা" বলে ডাকতেন।

ভক্ত বলরামের বাড়ীতে যখনই ঠাকুর সপার্ষদ অবস্থান করতেন, কৃষ্ণ-ভামিনীই তাঁদের সকল প্রকার যত্ন ও সেবার ভার নিতেন। বিত্তবানের তনয়া বা জায়া হিসাবে কোনদিনই তাঁর মধ্যে কোন গরিমা প্রকাশ পেত না। এমনকি, শৌচাগারের দুর্গন্ধে পাছে ঠাকুরের কষ্ট হয়, সেজন্য কৃষ্ণভামিনী তাঁর স্বামী বলরামসহ সানন্দে বাড়ীর বারান্দায় ঠাকুরের মলমূত্রাদি মার্জনে কৃতার্থবোধ করতেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের মিষ্ট দুধ খাওয়ার ইচ্ছা হলে, তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের দ্বারা কোন গোয়ালাবাড়ী থেকেই খাঁটী দুধ সংগ্রহ করতে পারেননি। এদিকে সেইদিনই কৃষ্ণভামিনীরও তাঁর বাড়ীর খাঁটি মিষ্ট দুধ ঠাকুরকে খাওয়াবার ইচ্ছা জাগে, সেজন্য বাড়ীর সেই দুধ নিয়ে ভক্ত যোগীন মার সঙ্গে সেই রাত্রেই কৃষ্ণভামিনী বাগবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান এবং পরম ভক্তিতে ঠাকুরকে সেই দুধ পান করিয়ে পুনরায় সেই রাত্রেই বাগবাজারের বাড়ীতে ফিরে আসেন। কৃষ্ণভামিনীর ভক্তিতে ঠাকুর এত মুগ্ধ ছিলেন যে, তাঁর অসুখের সংবাদ শুনে ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে একদা দক্ষিণেশ্বর থেকে, আর একবার শ্যামপুকুর থেকে কৃষ্ণভামিনীকে দেখে আসার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে, কৃষ্ণভামিনীর কন্যা ভুবনমোহিনীর মৃত্যুতে কৃষ্ণভামিনী অত্যন্ত শোকার্তা ও রোগগ্রস্তা হয়ে পড়ায়, তাঁকে কিছুদিনের জন্য বিহারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁর অনুরোধেই শ্রীশ্রীমাও তাঁর সঙ্গে যান। পরম ভক্তিমতী কৃষ্ণভামিনীর সম্পর্কে একদা ঠাকুর বলেছিলেন যে, তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর অষ্টসখীর প্রধানা। বলা বাহুল্য, পরমভক্ত বলরাম বসুর স্ত্রী, তথা

স্বামী প্রেমানন্দের ভগ্নী এবং ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা ও স্নেহধন্যা পরম ভাগ্যবতী কৃষ্ণভামিনীর পুত্র-কন্যাগণও ঠাকুরের ভক্তরূপে পরিণত হয়েছিলেন।

*

নিস্তারিণী দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা মহিলা ভক্ত তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী। স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াতের ফলে, ঠাকুরের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তির সঞ্চার হয় এবং ঠাকুরও তাঁকে পরম স্নেহ ও কৃপা করেন।

একদা নবগোপালের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষে ভক্তিমতী নিস্তারিণী, ঠাকুরকে নিজহাতে মিষ্টান্ন ভোজন করাবার সৌভাগ্য অর্জন করেন, কিন্তু সেই সময় ঠাকুরের শ্রীমুখের ভেতর থেকে একটি বস্তু কণ্ঠ অবধি এসে সেই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করছে দেখে, নিস্তারিণীর দেহ কাঁপতে থাকে, পরে ঠাকুরের আদেশে তিনি তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করে কৃপালাভ করেন।

একদা কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরের কাছে একটি বিড়াল কয়েকটি বাচ্চাসহ আশ্রয় গ্রহণ করায়, ঠাকুর খুব বিব্রত বোধ করেন এবং নিস্তারিণীকে সেগুলি বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পালন করবার জন্য অনুরোধ জানান। ঠাকুরের এই দানকে তিনি ঠাকুরের বিশেষ অনুগ্রহরূপে গ্রহণ করেন এবং সযত্নে তাদের পালন করেন, এমনকি, তিনি কারুকে তাদের প্রহারাদি করতেও দিতেন না।

ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে নিস্তারিণী অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্না নারীতে পরিণত হন। একদা শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবনে তীর্থদর্শনে গিয়ে ৺রাধারমণ বিগ্রহের পাশে নিস্তারিণীকে দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে দেখেছিলেন, যদিও সে সময় নিস্তারিণী বৃন্দাবনে অনুপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীকালে, স্বামী বিবেকানন্দ নিস্তারিণীর হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরের বাড়ীতে যেদিন ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছিলেন, সেদিন তাঁকে নিস্তারিণী নিজের হাতে কয়েক চামচ পোলাও খাইয়ে দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছিলেন। স্বামীজী তাঁকে "বৌদিদি" সম্বোধনে আপ্যায়িত করতেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ তাঁর বাড়ীতে পদার্পণ করে, তাঁর ভক্তিতে মুগ্ধ হতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের অপর ত্যাগী সন্তানেরাও নিস্তারিণীর মাতৃহৃদয়ের স্নেহস্পর্শে আকৃষ্ট হয়ে, অনেক সময় অসুস্থ অবস্থায় তাঁর গৃহে অবস্থান করতেন এবং সেখানে ঔষধ, পথ্য ও সেবাদির দ্বারা অচিরে নিরাময় হতেন। শেষ বয়সে বৃদ্ধা অবস্থায় ঠাকুরের ভক্তিমতী এই সাধিকা "ছিন্নমস্তার"

ভাবে ভাবিতা ছিলেন এবং অপবিত্র কারুর স্পর্শ সহ্য করতে পারতেন না; সেই সময় বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁর সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রত্নগর্ভা নিস্তারিণীর পুত্রদেরও ঠাকুর বিশেষ স্নেহ করতেন এবং তাঁর এক পুত্র পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণমিশনে যোগদান করে "সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন; তিনি "নীরদ মহারাজ," তথা "স্বামী অম্বিকানন্দ" নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

*

কৃষ্ণপ্রেয়সী দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্যা মহিলা ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের স্ত্রী। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তিনি ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হন। পরমভক্ত স্বামী রামচন্দ্রের মত কৃষ্ণপ্রেয়সীও ঠাকুরকে ইষ্টজ্ঞানে হৃদয়ে গ্রহণ করেন এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হন। রামচন্দ্রের বাড়ীতে ঠাকুরের বহুবার শুভাগমন হওয়ায়, তিনি স্বয়ং ঠাকুর ও তাঁর ভক্তগণকে সেবা ও আপ্যায়নের বিশেষ সুযোগ পেতেন, এমনকি, প্রতি বৎসর ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তেরা ঠাকুরকে যে-কাপড়খানি পরাতেন, সেটি সুন্দর চাপারঙে মনের মত করে এই ভক্তিমতী মহিলা নিজেই ছুপিয়ে দিয়ে পরমতৃপ্তি পেতেন। ঠাকুরও কৃষ্ণপ্রেয়সীকে খুব স্নেহ করতেন।

*

জগদম্বা দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা মহিলা ভক্ত। তিনি ছিলেন রাণী রাসমণির কনিষ্ঠা কন্যা এবং ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। রাণী রাসমণির তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীর সঙ্গে প্রথমে মথুরানাথের বিবাহ হয়, কিন্তু করুণাময়ীর মৃত্যু হলে রাণীরাসমণি পুনরায় মথুরানাথের সঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বার বিবাহ দেন।

শ্রীমতী জগদম্বা দেবী, ঠাকুরের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণা ছিলেন এবং স্বামী মথুরানাথের মত তিনিও ঠাকুরকে "বাবা" বলে সম্বোধন করতেন, এমন কি, স্বামীর সঙ্গে নিজেদের শয্যায় নিঃসঙ্কোচে তিনি ঠাকুরকেও শুতে দিতেন। ঠাকুরের প্রতি সেবা-যত্নের তিনি কোন ত্রুটী রাখতেন না এবং ঠাকুরের যখন যেটি প্রয়োজন, সব সময় সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। এমনকি, ঠাকুরের কামারপুকুরে থাকাকালীন যাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়, সেজন্য

প্রয়োজনীয় সব কিছু জিনিস নিজহাতে গুছিয়ে তিনি পাঠিয়ে দিতেন। ঠাকুরের কথার প্রতি তাঁর বিশেষ আস্থা থাকায়, মথুরানাথের সঙ্গে ঠাকুর কোথাও বেড়িয়ে এলে, জগদম্বা ঠাকুরের মুখ থেকে মথুরানাথের বিষয়ে সেখানকার সংবাদ সংগ্রহ করে নিশ্চিন্ত হতেন। ঠাকুরও এই মহিলা ভক্তটিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁর সরলতার জন্য প্রশংসা করতেন।

একদা জগদম্বার গ্রহণী রোগ হওয়ায় এবং কলকাতার বড় বড় ডাক্তারেরা তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করায়, মথুরানাথ উন্মত্তপ্রায় অবস্থায় কলকাতার জানবাজারের বাড়ী থেকে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের শরণাপন্ন হন এবং তাঁর একান্ত ভক্ত জগদম্বার প্রাণরক্ষার জন্য কাতর প্রার্থনা জানান। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সে সময় মথুরানাথকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, তাঁর স্ত্রী ভাল হয়ে যাবে। ঠাকুরের মুখে আশ্বাসবাণী শুনে মথুরানাথ বাড়ীতে ফিরে এসেই দেখেন যে, তাঁর স্ত্রীর সেই সাংঘাতিক অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন হয়েছে; ক্রমে ক্রমে জগদম্বা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। ঠাকুর এই সম্পর্কে বলতেন—"সেদিন থেকে জগদম্বা দাসী ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে লাগল, আর ওর ঐ রোগটার ভোগ (নিজ শরীর দেখিয়ে) এই শরীরের ওপর দিয়ে হতে লাগল, জগদম্বা দাসীকে ভাল করে, ছ-মাস কাল পেটের পীড়া আর অন্যান্য যন্ত্রণায় ভুগতে হয়েছিল।" বলা বাহুল্য, জগদম্বার রোগ নিজের দেহে ধারণ করে ঠাকুর তাঁর পরমভক্ত জগদম্বার প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন এবং জগদম্বাও ঠাকুরের কৃপায় সে যাত্রায় জীবন ফিরে পেয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য অনুরূপ এক ঘটনায় ঠাকুর একদা জনৈক কুষ্ঠরোগীর দেহে হাত বুলিয়ে তার ব্যাধি নিরাময় করেছিলেন, কিন্তু সেদিন সর্বক্ষণ হাতের যন্ত্রণায় ঠাকুর অস্থির হয়ে পড়েছিলেন এবং বলেছিলেন—"তার রোগ সেরে গেল, কিন্তু তার ভোগটা (নিজ শরীর দেখিয়ে) এইটের ওপর দিয়ে হয়ে গেল।"

*

বামাসুন্দরী দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত ও কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের জননী। পুত্র দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভক্তিমতী বামাসুন্দরী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে তাঁর কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। বামাসুন্দরীকে ঠাকুর নিজ জননীর মত সম্মান করতেন এবং বামাসুন্দরীও ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে এসে তাঁদের সম্পর্কে উচ্চধারণা

পোষণ করতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামাসুন্দরীর কাছ থেকে স্বেচ্ছায় বাতাসা চেয়ে নিয়ে খেয়ে তাঁকে কৃতার্থ করেন।

একদা ঠাকুরের চরণে পড়ে দেবেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেও ঠাকুর রামাসুন্দরীর মানসিক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন্দ্রনাথকে সন্ন্যাস গ্রহণে নিরস্ত করেন, কারণ দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ইতিপূর্বে পরলোকগমন করায় তখন রামাসুন্দরী খুব শোকার্তা ছিলেন। বলা আবশ্যক, ঠাকুর রামাসুন্দরীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁদের ধন্য করেছিলেন।

*

শ্যামাসুন্দরী দেবী (মিত্র)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা উচ্চশ্রেণীর মহিলা ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত মনোমোহন মিত্রের জননী এবং ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের পূর্বাশ্রমের শ্বশ্রূমাতা ঠাকুর মহিলা ভক্তদের মধ্যে শ্যামাসুন্দরীকে উচ্চ আধারের ভক্তরূপে গণ্য করতেন এবং ঠাকুরের প্রতিও শ্যামাসুন্দরীর অচলা ভক্তি ও অটুট বিশ্বাস ছিল তাঁর একমাত্র পুত্র মনোমোহনের মাধ্যমেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর কাছে যাতায়াত শুরু করেন পরমভাগ্যবতী শ্যামাসুন্দরী, ঠাকুরকে তাঁর নিজবাড়ীতে এনে মিষ্টান্নাদি আহার করিয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন।

একদা মনোমোহনের অসুস্থা কন্যা মাণিকপ্রভার প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা দেখা দিলে, শ্যামাসুন্দরী তাঁর হতাশাগ্রস্থ পুত্র মনোমোহনকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে পাঠান এবং তার সাধনভূমি থেকে কিছু মাটী নিয়ে আসার জন্য আদেশ করেন। মনোমোহন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে সে কথা গোপন রাখলেও, অন্তর্যামী ঠাকুর স্বেচ্ছায় ভাগ্নে হৃদয়রামের দ্বারা সেখানকার কিছু মাটী ও ফুল বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোমোহনকে আদেশ দান করেন এবং সে যাত্রায় মাণিকপ্রভার বিপদ কেটে যায়।

একদা কন্যা বিশ্বেশ্বরীর বিবাহের পর শ্যামাসুন্দরী কন্যাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন এবং জামাতা রাখালচন্দ্রকে (পরবর্তীকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু রাখাল চন্দ্র তাতে কিছুতেই সম্মত না হয়ে দক্ষিণেশ্বরেই থেকে যান। বলা আবশ্যক, শ্যামাসুন্দরীর অপর দুই জামাতা— শশীভূষণ দে এবং বলরাম সিংহও ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন।

একদা পতিবিয়োগের পর শ্যামাসুন্দরী, ঠাকুরের আমন্ত্রণে তাঁর ছেলে মেয়েদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে প্রসাদের জন্য আসেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে এক জায়গাতেই আহারে বসেন। সেই সময়ে ঠাকুর সহসা তাঁর নিজের ভোজন-পাত্র থেকে একটি মাছের মুড়ো, বিধবা শ্যামাসুন্দরীর পাতে তুলে দিলে, তিনি বিনা দ্বিধায় তা আহার করেন। পরে পুত্র মনোমোহন তাঁর মাকে বিধবা-অবস্থায় মাছ খাওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করলে শ্যামাসুন্দরী উত্তর দেন যে, সেই মাছ ঠাকুরের প্রসাদ; সুতরাং তাতে কোন অপরাধ নেই। এই প্রসঙ্গে আবো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পতিবিয়োগের পরেও শ্যামাসুন্দরী লালপেড়ে ধুতি ও হাতে বালা পরতেন বলে অনেকে নানাকথা বলত; কিন্তু ঠাকুর, ভক্তদের কাছে কথাপ্রসঙ্গে শ্যামাসুন্দরীর ঐরূপ আচরণের জন্য তাঁকে উচ্চসাধিকারূপে সমর্থন জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, একদিন ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে মহোৎসবের সময় নাম কীর্তন শুনতে শুনতে মহাভাগ্যবতী শ্যামাসুন্দরী দেহত্যাগ করেন।

দেহত্যাগের পরেও ঠাকুরের পরম ভক্তিমতী শ্যামাসুন্দরী একদা পুত্র মনোমোহনকে একটি বিশেষ কারণে স্বপ্নে দর্শন দেন। কাঁকুড়গাছির উদ্যানে ঠাকুরের পবিত্র দেহাবশেষ সমাহিত করা হলেও, রোদ-বৃষ্টি নিবারণের জন্য সেখানে প্রথম অবস্থায় কোন আচ্ছাদন ছিল না, তাই পরলোকগতা শ্যামা-সুন্দরী স্বপ্নে পুত্র মনোমোহনকে জানান্ যে, সেখানে ঠাকুরের বড কষ্ট হচ্ছে। বলা আবশ্যক, এই ঘটনাব পবেহ ভক্তগণের সমবেত প্রচেষ্টায় সেখানে মন্দিব নির্মিত হয়।

*

সারদাসুন্দরী দেবী (সেন)

ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ ভক্তিপরায়ণা মহিলা। তিনি ছিলেন ঠাকুরের পরম ভক্ত, ব্রাহ্মনেতা আচায কেশবচন্দ্র সেনের জননী। তিনি বহুবার ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তাঁর দর্শন ও কৃপালাভ করে ধন্য হন।

কেশবচন্দ্রের নিদারুণ পীড়ার সংবাদ শুনে, একদা ঠাকুর নিজেই তাঁর কলকাতার বাড়ী "কমল কুটীরে" কেশবচন্দ্রকে দেখতে গেলে, কেশব-জননী সারদাসুন্দরী একটু দূর থেকে ঠাকুরকে প্রণাম করে, অসুস্থ পুত্র কেশবের নিরাময়ের জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানান এবং আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। কিন্তু সেইবার ঠাকুর সরাসরি তাঁকে আশীর্বাদ না করে "মা-সুবচনী আনন্দময়ীকে" ডাকার জন্য সারদাসুন্দরীকে উপদেশ দেন এবং গম্ভীর স্বরে বলেন—"আমার

কি সাধ্য ! তিনিই আশীর্বাদ করবেন।" বলা আবশ্যক, এর কিছুকাল পরেই কেশবচন্দ্রের দেহত্যাগ হয়েছিল। শোকাতুরা সারদাসুন্দরী তারপরেও ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং অপর পুত্র নবীনচন্দ্রের বাড়ীতে, অথবা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে কয়েকবার এসেছিলেন। এমনকি, শোক নিবারণের জন্য তিনি তাঁর কন্যাসহ মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গেলে, ঠাকুর নানা উপদেশ দানে এবং সঙ্গীতাদিতে সারদাসুন্দরীর প্রাণে সান্ত্বনা দিতেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তিনি বাড়ীর ছেলেদের নিয়ে উপস্থিত হলে, ছেলেরা সেখানে ঠাকুরের সামনে হরিনাম করে এবং তিনি তাদের প্রদক্ষিণ করে হাততালি দিতে থাকেন, কেশবচন্দ্রের শোক তিনি অনেকটা সামলাতে পেরেছেন দেখে ঠাকুর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কেশব-জননী সারদাসুন্দরী সেদিন দক্ষিণেশ্বরে একাদশী পালন করেন এবং মালা নিয়ে জপ করেন। ঠাকুর তাঁর এই ভক্তির পরিচয় পেয়ে বিশেষ খুশী হন।

কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে ঠাকুর গেলে, তিনি ঠাকুরের আব্দার মত ঠাকুরকে জিলিপী, কুলপী বরফ প্রভৃতি এবং অন্যান্য উপাদেয় আহার্য বস্তু খাইয়ে খুব আনন্দ পেতেন।

ঠাকুরের অসুস্থতার খবর পেয়ে, সারদাসুন্দরী তাঁর পুত্রবধূ (কেশবচন্দ্রের স্ত্রী) ও পৌত্রদের নিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, ঠাকুর তাঁদের দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন এবং অনেক স্নেহমাখা কথা বলেছিলেন। ঠাকুর সারদাসুন্দরীকে "মা" বলে সম্বোধন করতেন।

*

গিরিবালা দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা মহিলা ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের মহাসাধিকা ভক্ত শ্রীশ্রীগৌরী মায়ের জননী এবং হাওড়া জেলার শিবপুর নিবাসী পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ভক্তিমতী স্ত্রী। গিরিবালা বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং তাঁর রচিত "নামসার" ও "বৈরাগ্য সঙ্গীতমালা" নামক দুটি পুস্তক তৎকালে প্রকাশিত হয়। সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং তাঁর সুকণ্ঠে স্বরচিত সঙ্গীত শ্রবণে সবাই মুগ্ধ হতেন। আধ্যাত্মিক জগতে অসাধারণ অনুভূতিসম্পন্না গিরিবালা তাঁর কন্যা মৃড়ানী, তথা গৌরী-মাকেও ধর্ম জগতে উৎসাহিত করেন। এমনকি, তাঁর আত্মীয়গণ যখন বলপূর্বক মৃড়ানীর বিবাহের ব্যবস্থা করেন, তখন

গিরিবালা বিপন্না কন্যাকে বিবাহের রাত্রে এক মাসীমার বাড়ীতে পলায়নে সাহায্য করেন। প্রকৃতপক্ষে মাতার সহায়তায় কন্যা মৃড়ানী পরবর্তী জীবনে "গৌরী-মা" রূপে বিরাজ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সন্ন্যাসিনী অবস্থায় তীর্থ ভ্রমণকালে গৌরী-মা স্বীয় জননী গিরিবালার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে কলকাতায় তাঁকে দেখতে এলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধান পান এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। এই সময় কন্যার আকর্ষণেই গিরিবালাও বিশেষ অনুরাগ বশতঃ কয়েকবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁকে দর্শন করে ও তাঁর কথামৃত পান করে মুগ্ধ হন। এমন কি, ঠাকুরকে গিরিবালা তাঁর মধুর কণ্ঠে গান শুনিয়েও তৃপ্ত করেছিলেন। বলা বাহুল্য, আধ্যাত্মিক জগতের গিরিবালা, ঠাকুরের পূত সঙ্গ লাভ করে আরও উচ্চ আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেছিলেন এবং সন্ন্যাসিনী কন্যার মাতা রূপে ধন্য হয়েছিলেন।

*

হেমাঙ্গিনী দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা, তাঁরই পিসতুতো জ্যেষ্ঠা ভগিনী। তিনি ছিলেন ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের জননী এবং কামারপুকুর গ্রামের নিকটবর্তী শিহড় গ্রামের বাসিন্দা।

একদা হেমাঙ্গিনীর শিহড় গ্রামের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন ও অবস্থান কালে, হেমাঙ্গিনী তাঁর কনিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব দর্শন করে, নিজে বড় ভগ্নী হয়েও ফুল-চন্দন দিয়ে তাঁর চরণ পূজা করেন। এই সময় ঠাকুর হেমাঙ্গিনীর মস্তকে চরণ রেখে ভাবাবেশে তাঁকে কৃপা করেন এবং কাশীতে তাঁর মৃত্যু হবে বলে আশীর্বাদ করেন। বলা আবশ্যক, পরবর্তীকালে ভক্তিমতী হেমাঙ্গিনী কাশীতেই দেহত্যাগ করেছিলেন।

*

কালীপদ-গৃহিণী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্যা মহিলা ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত কালীপদ ঘোষ, তথা "দানা-কালী"র স্ত্রী। স্বামীকে উচ্ছৃঙ্খল জীবন থেকে সুপথে ফিরিয়ে আনা উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে।

স্বামী কালীপদ প্রথম জীবনে সুরাপায়ী অবস্থায় উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন শুরু

পরায়, তাঁর মনে একেবারেই শান্তি ছিল না। সেজন্য স্বামীকে সুপথে ফেরাবার উদ্দেশ্যে তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের শরণাপন্ন হন এবং ঠাকুরকে প্রণামপূর্বক স্বামীর কদাচারের কাহিনী তাঁর কাছে নিবেদন করেন। রসিক ঠাকুর সব শুনে প্রথমে কালীপদ-গৃহিণীকে নহবৎ-ঘরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে রক্ষ করে "ওষুধ" নেবার জন্য পাঠিয়ে দেন। বিপন্না নারী সেই মত শ্রীশ্রীমায়ের শরণাপন্ন হলে, শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের রসিকতা বুঝতে পারেন এবং কালীপদ-গৃহিণীকে আশ্বস্ত করার জন্য একটি পূজার বেলপাতা দেন। যাইহোক, পরে ঠাকুর তাঁর ব্যাভিচারী স্বামীর মতিগতি ফেরাবার ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্বামী ভবিষ্যতে ঠাকুরের কাছেই আসবেন—একথা তাঁকে জানালে, তিনি নিশ্চিন্ত হন। সত্যই পরবর্তীকালে ঠাকুরের কৃপায় কালীপদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে এবং তিনি ঠাকুরের পরম ভক্তে পরিণত হন। এখানে উল্লেখ্য শ্যামপুকুরে অসুস্থ অবস্থায় থাকাকালীন ৺কালীপূজার রাত্রে যেদিন ভক্তরা ঠাকুরকে ৺কালীজ্ঞানে পূজা করেন, সেদিন ঠাকুরের পূজার ও সেবার যাবতীয় দ্রব্যাদি এই ভক্তিমতী মহিলা নিজের বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, ভক্তিমতী কালীপদ গৃহিণী শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করে কৃতার্থ হন।

*

দেবেন্দ্র-গৃহিণী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা পরম ভক্তিমতী মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত, কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের স্ত্রী। অতীব পতিভক্তি-পরায়ণা দেবেন্দ্র-গৃহিণী একমাত্র পতিসেবাকেই তাঁর ধর্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ সাধ্বী-স্ত্রীরূপে দেবেন্দ্রনাথের সংসারে বিরাজ করতেন। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, তিনিই ঠাকুরের সেবার ভার নিয়ে নিজহাতে রন্ধন দ্বারা তাঁকে আহার করিয়ে তৃপ্তি পেতেন এবং ঠাকুরের প্রতি অতীব ভক্তি প্রদর্শন করতেন। ঠাকুরের আদেশে পরবর্তীকালে তিনি স্বামীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরেও ঠাকুরের কাছে যেতেন। স্বামীর প্রতি দেবেন্দ্র-গৃহিণীর অতীব নিষ্ঠার জন্য ঠাকুর তাঁর ওপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁর এই অসীম পতিভক্তির জন্য অপর ভক্তদের কাছে তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।

*

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগিনী মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত চুনীলাল বসুর ভক্তিমতী স্ত্রী। স্বামী চুনীলাল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী ভক্তে পরিণত হওয়ায়, তিনিও স্বামীর অনুসরণে ঠাকুরের ভক্তে পরিণত হন নিজ বাড়ীতে ও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হন।

*

বিজয়কৃষ্ণ-গৃহিণী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের পরম ভক্ত আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর স্ত্রী শ্রীমতী যোগমায়া দেবী। স্বামীর সঙ্গে প্রথমাবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তিনি যেতেন। তাঁর মাতাও ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন।

*

কাপ্তেন-গৃহিণী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্যা নেপালী মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের ভক্তিমতী স্ত্রী। স্বামীর অনুসরণে তিনি বহুবার ঠাকুরের সান্নিধ্য এবং স্নেহ লাভ করেন। কাপ্তেনের বাড়ীতে বহুবার ঠাকুরের শুভাগমন হওয়ায়, এই সদাচারিণী ব্রাহ্মণী মহিলা ঠাকুরকে নিজ বাড়ীতে আপ্যায়ণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং নানাবিধ উপাদেয় আহার্য বস্তু ঠাকুরকে ভোজন করিয়ে কৃতার্থ হন। স্বামীর সঙ্গে তিনি নিজেও ঠাকুরকে নানাভাবে সেবা করেছিলেন এবং ঠাকুরও তাঁর সেবা ও যত্নে তাঁর প্রতি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। কাপ্তেন-গৃহিণী একটি "গোপাল" ঠাকুর পূজা করতেন এবং গীতাপাঠ করতেন। প্রথমে তিনি কৃপণ-স্বভাবের ছিলেন—পরে ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে সেই স্বভাবের অনেক পরিবর্তন হয়।

*

গোবিন্দ-গৃহিণী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা, কলকাতার পটলডাঙ্গা নিবাসী ৺গোবিন্দচন্দ্র দত্তের ভক্তিমতী বিধবা স্ত্রী এবং ঠাকুরের মহিলা-ভক্ত। দত্ত মশাই কামারহাটীর গঙ্গার তীরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভক্তিমতী স্ত্রী কলকাতা ছেড়ে কামারহাটীর ঠাকুর বাড়ীতে এসে বাস করতে থাকেন এবং সেখানকার পূজার তত্ত্বাবধানে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। এই সময় ধর্মপ্রাণা দত্ত-গৃহিণী কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন, ভূমিতে শয়ন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, এক সন্ধ্যা ভোজন, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি দ্বারা সর্বদা ঈশ্বরীয় পথে অবস্থান করতেন।

কামারহাটীর পরম ভক্তিমতী মহিলা অঘোরমণি দেবী, তথা "গোপালের মার" সঙ্গে গোবিন্দ-গৃহিণীর বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনে তিনি একদিন গোপালের মার সঙ্গে নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁর পূত সঙ্গ লাভ করে মুগ্ধ হন। ঠাকুর সেদিন তাঁদের সাদরে নিজের ঘরে বসিয়ে ভক্তিতত্ত্বের নানা উপদেশ দেন এবং ভজন গান শুনিয়ে তাঁদের তৃপ্ত করেন। গোবিন্দ-গৃহিণী সেদিন ঠাকুরের প্রতি বিশেষ ভক্তিবশতঃ তাঁর কামারহাটীর ঠাকুর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালে, ঠাকুর তাতে সম্মত হন। পরে একদিন গোবিন্দ-গৃহিণীর ঠাকুর বাড়ীতে এসে বিগ্রহের সামনে ঠাকুর সংকীর্তন ও নৃত্য করেন এবং সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করার পর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান।

*

কৃষ্ণকিশোর-গৃহিণী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন আড়িয়াদহ নিবাসী ভক্ত এবং "রামনামে সিদ্ধ" কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্যের স্ত্রী। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তিনি ঠাকুরকে ইষ্টরূপে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণকিশোরের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, কৃষ্ণকিশোর-গৃহিণী তাঁর জন্য উপাদেয় আহার্য বস্তু তৈরি করে দিতেন এবং ঠাকুরও তা তৃপ্তি সহকারে আহার করে তাঁকে কৃতার্থ করতেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁর এমন প্রগাঢ় ভক্তি ছিল যে, স্বামী কৃষ্ণকিশোর ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে কখনো কোন তর্ক করলে, তিনি স্বামীকে বলতেন—"ওঁর সঙ্গে ওরকম করো না, উনি হলেন আমাদের ইষ্টদেব স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র।" বলা বাহুল্য, তাঁর এই প্রকার পরম ভক্তিতে ঠাকুর মুগ্ধ হতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কৃষ্ণকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রামপ্রসন্ন তাঁর মাতাকে প্রথমদিকে ঠিকমত দেখাশোনা না করায়, ঠাকুর রামপ্রসন্নের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

*

মহেন্দ্র পাল-গৃহিণী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সিঁথি নিবাসী পরমভক্ত কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পালের ভক্তিমতী স্ত্রী। দীর্ঘায়ু এই মহিলা-ভক্তটি স্বামী মহেন্দ্রনাথের মাধ্যমে ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছিলেন।

*

হরমোহন-জননী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ ভক্তিপরায়ণা মহিলা। তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত হরমোহন মিত্রের জননী। তিনি কয়েকবার ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। দরিদ্র হরমোহন কলকাতার সিমলা পল্লীতে মাতুল রামগোপাল বসুর বাড়ীতে প্রথম জীবনে মানুষ হন। এই সময়েই তাঁর জননী ঠাকুরের সংস্পর্শে আসায়, তিনি ভক্তিমতী জননী কর্তৃক ঠাকুরের কাছে যাওয়ার জন্য বিশেষ উৎসাহিত হন। হরমোহন-জননী ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে নিজের জীবন ধন্য করার পর, পুত্র হরমোহনকেও তাঁর কাছে পাঠাবার ফলেই, হরমোহনের জীবনে ঠাকুরের কৃপালাভ করা সম্ভব হয়েছিল।

*

নারায়ণ-জননী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা, ঠাকুরের তরুণ ভক্ত নারায়ণের জননী। কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্কুলের ১৭।১৮ বছর বয়সের নারায়ণ, ঠাকুরের পরম স্নেহভাজন ভক্ত ছিলেন এবং পুত্র নারায়ণের বিষয় নিয়েই তাঁর মা ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ঠাকুরের কাছে নারায়ণের যাতায়াতে বাড়ীর লোকেদের বিশেষ আপত্তি থাকায়, তারা নারায়ণকে অত্যন্ত প্রহার করত। একদা নারায়ণের মা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসে নিবেদন করেন, যাতে নারায়ণকে বিবাহে রাজী করানো যায়; কিন্তু ঠাকুর সে প্রস্তাবে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। বরং তিনি নারায়ণের মাকে উপদেশ দেন যে, নারায়ণের ওপর যেন বেশী পীড়ন করা না হয় এবং ভগবানের দিকে যদি ওর মন যায়, তবে ওর মনটিকে যেন ঘুরিয়ে দেওয়া না হয়। বলা আবশ্যক, নারায়ণের মা ঠাকুরের আদেশ পালন করেন এবং নারায়ণ নির্ভয়ে ঠাকুরের আশ্রয়ে থাকার সুযোগ পান।

*

যদু-জননী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত যদুলাল মল্লিকের জননী। ভক্ত যদুলালের গৃহে ঠাকুরের কয়েকবার আগমন উপলক্ষে তিনি ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে কৃতার্থ হন। তিনিও যেমন ঠাকুরকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন, ঠাকুরও তেমন তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। কোন কারণে তাঁর সংবাদ পেতে দেরী হলে, ঠাকুর খুব চিন্তিত হতেন; এমনকি, কখনো কখনো তাঁর সংবাদ নিতে যদুলালের বাড়ীতে ঠাকুর নিজেই উপস্থিত হতেন। ভক্তিমতী এই মহিলাটির প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল।

*

হরিপ্রসন্ন-ভগিনী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, তথা শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের জনৈকা বয়োজ্যেষ্ঠা ভগিনী। তিনি দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাস্নান করতে গেলেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পেতেন, কিন্তু "পাগল" জ্ঞানে তাঁর সংশ্রব এড়িয়ে চলতেন। সেই সময় হরিপ্রসন্ন ছাত্রাবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে প্রায়ই যাতায়াত করতেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে রাত্রিবাসও করতেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাসের পর হরিপ্রসন্ন বাড়ীতে ফিরে এলে, তাঁর এই দিদি যখন জানতে পারেন যে, হরিপ্রসন্ন গতরাত্রে ঠাকুরের কাছে ছিলেন তখন তিনি হরিপ্রসন্নকে ভর্ৎসনা করে বলেন—"ওরে, তার কাছে যাসনি; সে লোকটা পাগল। আমি প্রায়ই ঐ ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে যাই; তার সব দেখেছি, সব জানি"। বলা বাহুল্য, হরিপ্রসন্ন তাঁর দিদির এই ভর্ৎসনা শুনে শুধু হেসেছিলেন এবং ক্রমশঃ বেশীমাত্রায় ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর দিদি ঠাকুরের সংশ্রব থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে গিয়েছিলেন।

*

উপেন্দ্র-মাতুলানী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগিনী মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের পরমভক্ত ও "বসুমতী"-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মাতুলানী এবং চাকদহ-নিবাসী জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভক্তিমতী স্ত্রী। দরিদ্র উপেন্দ্রনাথ শৈশবে চাকদহের মাতুলালয়ে মানুষ হন এবং নিঃসন্তান মাতুলানী তাঁকে পুত্রবৎ পালন করেন। কলকাতার বটতলায় আপার চিৎপুর রোডে

বৃন্দাবন বসাকের পুস্তকের দোকানে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে উপেন্দ্রনাথ যখন প্রথম জীবনে চাকরী করতেন, সেই সময় মাতুলানীর সহায়তাতেই উপেন্দ্রনাথের পক্ষে টাকা ধার করে ঐ দোকানটি কেনা সম্ভব হয়েছিল এবং পরে তিনি ঐ দোকানের দ্বারাই তাঁর আয়ের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে দরিদ্র উপেন্দ্রনাথের মিলনের পর, উপেন্দ্রনাথের বাড়ীতে নিত্য নারায়ণ পূজা হয় জেনে, ঠাকুর একদিন নারায়ণের প্রসাদ খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং উপেন্দ্রনাথও তাতে স্বীকৃত হন। উপেন্দ্রনাথ মাতুলানীকে সে কথা জানালে, ঠাকুরের প্রতি পরম ভক্তিমতী মাতুলানী, উপেন্দ্রনাথকে দিয়ে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্য নারায়ণের প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়ে কৃতার্থ হন। সেদিন সেখানে নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তগণ উপস্থিত থাকায়, ঠাকুর সেই প্রসাদ নিজে সানন্দে গ্রহণ করেন এবং তাঁদেরও দেন। এরপরেও উপেন্দ্রনাথের ভাগ্যবতী মাতুলানী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বশতঃ প্রসাদ পাঠিয়েছিলেন এবং প্রতিবারেই ঠাকুর তাঁর সুন্দর রান্নার জন্য বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। এইভাবে তিনি ঠাকুরের স্নেহলাভ করে ধন্য হন।

দক্ষিণেশ্বরে উপেন্দ্রনাথের যাতায়াতে প্রতিবেশীদের আপত্তি ছিল, তাই তাদের পরামর্শে উপেন্দ্রনাথের মাতুল জগবন্ধু একদা উপেন্দ্রনাথকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঠাকুরের পরম অনুরাগিনী ভক্ত মাতুলানীই, সে যাত্রায় উপেন্দ্রনাথকে রক্ষা করেন এবং তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতে উৎসাহ দেন। বলা বাহুল্য, এই ভক্তিমতী মহিলার সহায়তায় পরবর্তীকালে উপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরমভক্তে পরিণত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

*

ত্রয়োদশ স্তবক

রাণী রাসমণি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রখ্যাত মহিলা-ভক্ত। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশপরগণা জেলার হালিশহরের কাছে "কোনা" নামক গ্রামে পিতৃগৃহে, দরিদ্র মাহিষ্য বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় মায়ের কাছে তাঁর ডাক-নাম ছিল "রাণী"; পরবর্তীকালে দানশীলা রূপেও তিনি জনগণের কাছে "রাণী" নামে অভিহিতা হন এবং ইতিহাসে "রাণী রাসমণি" নামে পরিচিতা হন।

※

কলকাতার জানবাজারে বিত্তশালী জমিদাব পুত্র বাজচন্দ্র দাশের সঙ্গে রাসমণির বিবাহ হয় এবং তাঁব আগমনেব পব থেকেই শ্বশুবকুলেব আরও আর্থিক উন্নতি হওয়ায়, তিনি অল্পদিনেই সৌভাগ্যবতী হিসাবে গণ্য হন। স্বামী রাজচন্দ্রও তৎকালীন ইংরাজ সবকারেব কাছ থেকে "রায় বাহাদুর" উপাধি পান এবং সহধর্মিনী রাসমণির উৎসাহে নানা দানকার্যে ব্রতী হন। স্বামীর মৃত্যুর পর শোকাতুরা অপুত্রক রাসমণি, তাঁব জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসের ওপর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি পবিচালনার ভার দিয়ে, নিজে দেবার্চনা, উৎসব, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতিতে মন দেন। রাসমণির বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসবাদি প্রায় সব রকম পূজার প্রচলন ছিল এবং তিনি প্রায়ই তীর্থ ভ্রমণে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। কাঙাল, ফকীর, দীন-দরিদ্র প্রভৃতিকে রক্ষার জন্য তিনি অকাতরে দান করতেন এবং তাঁর অর্থে জনসাধারণের কল্যাণেব জন্য বহু রাস্তা, ঘাট, বাজার, খাল প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল। এ ছাড়া জলকর রোধ, নীলকর উৎপীড়ন রোধ, গোরা সৈন্যদের অত্যাচার-রোধ প্রভৃতি দুঃসাহসিক কাজে তিনি বিশেষ তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভক্তিমতী রাসমণি তাঁর জমিদারির কাজে ব্যবহৃত শীলমোহরে—"কালীপদ-অভিলাষী রাসমণি"—এই কথাটির উল্লেখ রাখতেন।

একদা ৺কাশী দর্শনের ইচ্ছায় যাত্রা করার আগের দিন রাত্রে, রাসমণি স্বপ্নে ৺কালীমাতার কাছ থেকে গঙ্গার তীরে মন্দির নির্মাণ এবং ৺মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ পান। ফলে, তিনি কাশী যাত্রা স্থগিত রাখেন এবং গঙ্গার পূর্বতীরে চব্বিশপরগণা জেলায় দক্ষিণেশ্বরে ৬০ বিঘা জমি কিনে সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। প্রায় ১০ বছর সময় ধরে সেখানে ৺ভবতারিণী, ৺রাধা-গোবিন্দ এবং দ্বাদশ ৺শিবের মন্দিরাদি নির্মিত হয় এবং এইটিই রাসমণির জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

মন্দির প্রতিষ্ঠা হলেও কোন ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, শূদ্রাণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

মন্দিরে পূজা করতে রাজী না হওয়ায় রাসমণি যখন অত্যন্ত বিপন্না, তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্রজ শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রানুসারে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠার ও পূজার ভার গ্রহণ করেন এবং ৺স্নানযাত্রার দিন মহাসমারোহে ঐ কাজ সম্পন্ন করেন। বলা আবশ্যক, ঐ দিন তরুণ গদাধরও (পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ) রামকুমারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। পরে রাসমণি ৺ভবতারিণীর পূজক হিসাবে রামকুমারকে এবং দেবীর বেশকারী হিসাবে গদাধরকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে ৺রাধা-গোবিন্দ-মন্দিরের ৺গোবিন্দ-মূর্তির একটি চরণ ভেঙ্গে যাওয়ায় সেটি গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া সাব্যস্ত হলে, গদাধরের উপদেশে তা নিবারণ হয় এবং গদাধরই উক্ত ভাঙ্গাচরণ নিপুণভাবে জুড়ে দেওয়ায়, আবার ঐ মূর্তিকে পূজার ব্যবস্থা হয়। এর ফলে, রাসমণি ও মথুরানাথের ইচ্ছায় গদাধর ৺রাধা-গোবিন্দজীর পূজক নিযুক্ত হন; পরবর্তীকালে ঐ পূজার ভার রামকুমার গ্রহণ করেন এবং গদাধর স্বয়ং দেবীর পূজার ভার গ্রহণ করেন।

এই সময় অদ্ভুত ও অভিনব পূজা পদ্ধতি দেখে, গদাধরের, তথা ছোট ভট্‌চাযের বিরুদ্ধে দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ীর কর্মচারীরা নানা অভিযোগ উপস্থিত করলে, রাসমণি স্বয়ং এই বিষয়ে তদন্তের পর ছোট ভটচাযের প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীলা হন। ৺দেবী দর্শনে দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে বসে রাসমণি একটি মোকদ্দমার বিষয়ে চিন্তা করতে থাকায়, ঠাকুর নিজহাতে তাঁর দেহে আঘাত ও তাঁকে ভর্ৎসনা করেন, কিন্তু রাসমণি নিজ অপরাধ বুঝে অনুতপ্ত হন এবং কর্মচারীদের ঠাকুরের বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করেন।

রাসমণি আজীবন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর সব কাজে রাসমণির সম্মতি থাকায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পক্ষে নির্বিঘ্নে সকল প্রকার সাধন-ভজন করা সম্ভবপর হয়েছিল। ভাবীকালে ঠাকুরের সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের ভূমিকা রাসমণিই প্রস্তুত করেছিলেন একাধারে শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব মন্দির-গুলির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, এই পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও উদ্যান ঠাকুরের অবতার-লীলার প্রধান কেন্দ্রস্থল হওয়ায়, ঠাকুরের নামের সঙ্গে ভক্তিমতী রাসমণির কীর্তিও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে। ঠাকুর রাণী রাসমণিকে মা-জগদম্বার "অষ্টসখীর এক সখী" বলে নির্দেশ করেছিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিরস্মরণীয়া মহিলা-ভক্ত রাণী রাসমণি, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

*

গৌরী-মা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা সন্ন্যাসিনী ভক্ত। প্রকৃত নাম শ্রীমতী মৃড়ানী চট্টোপাধ্যায়। আনুমানিক ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতার ভবানীপুরে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃগৃহ ছিল হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে। পিতার নাম পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, মাতা শ্রীমতী গিরিবালা দেবী। পরবর্তী জীবনে "সন্ন্যাস" গ্রহণের পর মৃড়ানীর নাম "গৌরীপুরী" হওয়ায়, ভক্তসমাজে তিনি "গৌরী-মা" নামে অভিহিতা হন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর কাছে তিনি ছিলেন "গৌরদাসী"।

প্রথম জীবনে তিনি ৺কালীমাতার ভক্ত ছিলেন এবং বৈরাগ্যভাবে বাল্যকাল অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি আজীবন নিরামিশাষী ছিলেন। মাত্র ১০ বছর বয়সে এক ব্রাহ্মণ-সাধক তাঁকে বৈষ্ণবভাবে দীক্ষাদান করেন; কিন্তু এরপরেই এক অপরিচিতা রমণী তাঁকে একটি দামোদর-নারায়ণ শিলা অর্পণ করায়, তিনি সেই শিলাকে জীবন্ত দেবতা জ্ঞানে পূজা করা সুরু করেন।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয়েরা তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করায়, তিনি প্রথমতঃ বিবাহে আপত্তি জানান, অবশেষে বিবাহের রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ রেখে আপাততঃ আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন এবং পরে বাড়ী থেকে পলায়ন করেন। অতঃপর তিনি আত্মগোপন করে সন্ন্যাসিনীর বেশে পাগলিনীর মত নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে থাকেন, এই সময় তাঁর গলায় দামোদর-শিলা এবং ঝোলায় মা-কালী, গৌরাঙ্গদেবের ছবি প্রভৃতি থাকত। নানা তীর্থ ভ্রমণকালে হরিদ্বারের পথে একদল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে মিলিত হলে, এই সাধু সঙ্ঘে তিনি "গৌরী-মায়ী" নামে অভিহিতা হন।

বৃন্দাবনে ভ্রমণকালে তিনি যখন তাঁর ধর্ম পিতা রাধামোহন বসুর (শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত বলরাম বসুর পিতা) কাছে অবস্থান করতেন, তখন ভক্ত বলরাম বসুর কাছেই তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রথম শোনেন; কিন্তু সে বিষয়ে তখন তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। পরে অসুস্থা মাকে দেখার জন্য কলকাতায় বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে থাকাকালীন তিনি অনেকের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব কথা শোনা সত্বেও, তাঁর মনে তখনো বিশেষ কোন ছাপ পড়েনি। সে সময় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি তাঁর এত অনুরাগ ছিল যে, নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্তি দেখলে তিনি তাঁকে ভাসুর জ্ঞানে ঘোমটা দিতেন এবং নবদ্বীপকে নিজের শ্বশুরবাড়ী বলতেন।

এমতাবস্থায় একদিন তাঁর ইষ্ট দামোদর-শিলাকে পূজার সিংহাসনে বসাতে গিয়ে তিনি সেখানে মানুষের দু'খানি জীবন্তচরণ দর্শন করেন, অথচ দেহের আর

কোন অংশ দেখেন নি। দামোদরকে তুলসী দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ তুলসী সেই চরণ দুখানিতে পড়তে দেখে তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তিন-চার ঘণ্টা পরে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলেও, তাঁর মনে হতে থাকে যে, কে যেন তাঁর হৃদয়কে সুতায় ধরে টানছে। পরের দিনই ঠাকুরের কয়েকজন ভক্ত অযাচিতভাবে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গেলে, তিনি সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে দেখেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে বসে আপনমনে সুতো জড়াচ্ছেন ও গান গাইছেন, কিন্তু ভক্তেরা ঘরে ঢোকা মাত্রই ঠাকুরের সুতো জড়ানো শেষ হয়। সবিস্ময়ে তিনি আরো লক্ষ্য করেন যে, আগের দিনে ঠাকুরের এই সজীব চরণ দুটিই তিনি পূজার সিংহাসনে দেখেছিলেন। এই ঘটনার দিন থেকেই তিনি তাঁর অন্তরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করেন এবং তাঁর একান্ত অনুরক্ত ভক্তে পরিণত হন।

পরম ভাগ্যবতী গৌরী-মা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভের ও সেবার অধিকারিণী হন এবং কিছুকাল দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গেও বাস করেন। গৌরী-মার গান শুনে ঠাকুরের সমাধি হত। ঠাকুর তাঁকে মহাতপস্বিনী, ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী বলে নির্দেশ করেছিলেন। গৌরাঙ্গ-ভক্ত গৌরী-মা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করতেন এবং এই দু'জন অবতারকে অভেদ জ্ঞান করতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার সময় গৌরী মা বৃন্দাবনে থাকায়, তাঁকে দেখার জন্য ঠাকুরের মন চঞ্চল হয়, কিন্তু শেষ অবধি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি বলা আবশ্যক, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর শ্রীশ্রীমাকে বৈধব্যচিহ্ন ধারণ করতে গৌরী-মা নিষেধ করেছিলেন এবং শ্রীশ্রীমাকে স্বয়ং লক্ষ্মী বলে ঘোষণা করেছিলেন।

মাতৃজাতির কল্যাণে শহরে থেকে কাজ করার জন্য গৌরী-মাকে ঠাকুর পূর্বে নির্দেশ করেছিলেন, সেইমত পরবর্তীকালে তিনি প্রাচীন আদর্শে মহিলাদের শিক্ষাদানের জন্য একটি সন্ন্যাসিনী-সঙ্ঘ ও মাতৃ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে উত্তর কলকাতায় ২৬নং মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটে শ্রীশ্রীমায়ের নামে "শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম" প্রতিষ্ঠার দ্বারা সেখানে চিরজীবনের পতিরূপে "দামোদর"কে স্থাপন করেন। গৌরী-মার প্রেরণায় অনেক মহিলা-ভক্ত সন্ন্যাসিনী হন, আবার অনেকেই আদর্শ গৃহিণী বা জননীরূপে গড়ে ওঠেন।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, শিব-চতুর্দশীর রাত্রে কলকাতায় নিজ প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসাধিকা ভক্ত শ্রীশ্রীগৌরী-মা দেহরক্ষা করেন। কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাশ্মশানে তাঁর সমাধি-মন্দির আছে।

*

যোগীন-মা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা (পরবর্তীকালে সন্ন্যাসিনী) ভক্ত। প্রকৃত নাম শ্রীমতী যোগীন্দ্রমোহিনী দেবী। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী উত্তর কলকাতার ৫৯/১নং বাগবাজার ষ্ট্রীটে, পিতার বাড়ী মিত্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরের কাছে তিনি ছিলেন "গণুর মা" ; শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তিনি ছিলেন "মেয়ে যোগেন", আর ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি ছিলেন "যোগীন-মা"। ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত বলরাম বসু ছিলেন তাঁব মামাশ্বশুর-সম্পর্কীয়। চব্বিশপরগণা জেলার খড়দহের প্রসিদ্ধ জমিদার মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বংশের পোষ্যপুত্র অম্বিকাচরণ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ; কিন্তু বিবাহিত জীবনে উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর জন্য তিনি সুখী হতে না পারায়, তাঁর একমাত্র কন্যা "গণুকে" নিয়ে তিনি বাগবাজারে তাঁর পিতার গৃহে চলে আসেন।

ভক্ত বলরাম বসু, তথা তাঁর মামাশ্বশুরের বাড়ীতেই তিনি প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন এবং পরে মহিলা ভক্তদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করেন। ঠাকুরও তাঁর বাড়ীতে শুভাগমন করেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন নতুনভাবে শুরু হয়। যোগীন-মা পূর্বে তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিলেও, ঠাকুর নিজের দেহ দেখিয়ে তাঁর মধ্যেই ইষ্টচিন্তা করার নির্দেশ দিয়ে যোগীন-মাকে বিশেষ কৃপা করেন। এরপর থেকেই ধ্যানের সময় তিনি ঠাকুরকেই দর্শন করতেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর সমাধিও হত।

পরে একসময় যোগীন-মার উচ্ছৃঙ্খল স্বামী অম্বিকাচরণ বিশ্বাসও ঠাকুরের কাছে এসে একেবারে বদলে যান এবং তাঁর কন্যা গণু, জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণ যোগীন-মার আকর্ষণেই ঠাকুরের কাছে আসেন। স্বামীর মৃত্যুর পর যোগীন মা জপ-ধ্যানে বিশেষভাবে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন এবং ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গরূপে চিহ্নিত হন। যোগীন-মার বৃন্দাবনে থাকাকালীন ঠাকুরের দেহরক্ষা হয়, এই সময় বৃন্দাবন থেকে এসে তিনি বেলুড়ের ভাড়া বাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গিনী হন এবং সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের "পঞ্চতপা" ব্রত সাধনায় তিনিও অংশগ্রহণ করেন। ঠাকুরের তিরোধানের পরেও তিনি ঠাকুরকে ও শ্রীশ্রীমাকে অভিন্নরূপে দেখার জন্য ঠাকুরের কাছ থেকে আদেশ পান এবং তাঁর জীবনে অনেক অলৌকিক দর্শনও হয়।

পরবর্তীকালে যোগীন-মা তাঁর নিজের বাড়ীতে জনৈক তন্ত্রসাধক ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছ থেকে "কৌল-সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন এবং পরে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী সারদানন্দের কাছে "বৈদিক-সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন। শেষ জীবনে

তিনি মাতা, কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র প্রভৃতি আপনজনদের মৃত্যুতে খুব দুঃখ পান। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঠাকুরের উপদেশমত পরবর্তীকালে "গোপালভাবে" সাধনা করেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রিতা শ্রীযুক্তা যোগীন-মা কলকাতায় দেহরক্ষা করেন।



গোলাপ-মা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত। প্রকৃত নাম শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী, ওরফে গোলাপ-সুন্দরী দেবী। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি "গোলাপ-মা" নামে পরিচিতা ছিলেন।

অকালে স্বামী বিয়োগ, শিশুপুত্র বিয়োগ এবং বিবাহিতা কন্যা "চণ্ডীর" বিয়োগের পর তাঁর জীবনে নিদারুণ শোক নেমে আসে এবং শোকের জ্বালায় তিনি জ্বলতে থাকেন। এই সময় তাঁর পাড়ার প্রতিবেশী ঠাকুরের অন্যতম মহিলা-ভক্ত শ্রীযুক্তা যোগীন-মা, এই শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর প্রাণে শান্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তাঁকে নিয়ে যান। ঠাকুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে এবং তাঁর কথামৃত পান করে গোলাপ-মা প্রাণে অনেক শান্তি পান এবং শোকের জ্বালা ক্রমশঃ কমতে থাকে। এরপর ভক্তিমতী গোলাপ-মার আমন্ত্রণে ঠাকুর তাঁর বাড়ীতে গিয়েও তাঁকে আরও শান্ত করেন এবং নিজবাড়ীতে করুণাময় ঠাকুরকে পেয়ে তিনি শোকের ব্যথা ভুলে আনন্দে অধীর হয়ে পড়েন।

পরবর্তীকালে ঠাকুরের করুণায় গোলাপ-মা দক্ষিণেশ্বরে নহবত-ঘরে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বাস করার সুযোগ পান এবং সেখানে ঠাকুরের সরাসরি সেবা করার অধিকার পেয়ে কৃতার্থ হন। এই সময়েই তিনি ঠাকুরের বিশেষ কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছিলেন এবং ঠাকুরের উপদেশ ও আশীর্বাদে তিনি আধ্যাত্মিক-ভাবে উচ্চস্তরে উঠেছিলেন। পরে শ্যামপুকুর ও কাশীপুরেও তিনি অসুস্থ ঠাকুরের যথাসাধ্য সেবা করেছিলেম।

ঠাকুরের তিরোভাবের পর ভাগ্যবতী গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমায়ের সেবার ভারও গ্রহণ করেন এবং নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন। শেষ জীবনে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে (উদ্বোধন মঠ) বাস করেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের সেবার সঙ্গে জপ-ধ্যানেও নিযুক্ত থাকেন। অবশেষে শ্রীশ্রীমায়ের তিরোভাবের পর



তিনি বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে সাধু-ব্রহ্মচারীদের সেবা ও পরিচর্যার ভার গ্রহণ করেন এবং একসঙ্গে শাসন ও সোহাগের দ্বারা সকলের সঙ্গে শেষদিন অবধি ঠিক মায়ের মতনই ব্যবহার করেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ সেবিকা শ্রীযুক্তা গোলাপ-মা কলকাতায় দেহরক্ষা করেন।

*

গোপালের মা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা (পরবর্তীকালে সন্ন্যাসিনী) ভক্ত। প্রকৃত নাম অঘোরমণি দেবী। আনুমানিক ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে চাব্বিশ পরগণা জেলার কামারহাটীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি "গোপালের মা" নামে পরিচিতা ছিলেন। মাত্র ৯ বছর বয়সে বিবাহ হওয়ার পর এবং মাত্র একবারই স্বামীকে দেখার পর তিনি খুব অল্প বয়সেই নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন এবং কামারহাটীতে পিতার গৃহেই বাস করতে থাকেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চাইতে তিনি বয়সে প্রায় ১৪ বছরের বড় ছিলেন এবং ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও প্রায় বিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। কামারহাটীতে তাঁর পিতার বাড়ীর কাছেই গঙ্গাতীরে একটি ৺রাধাকৃষ্ণ-মন্দিরে তাঁর ভ্রাতা পূজক ছিলেন এবং পরে তিনি সেখানেই একটি অন্দরমহলের ঘরে বাস করতেন। শ্বশুরকুলের গুরুর কাছে তিনি "গোপাল মন্ত্রে" দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং প্রায় ৩০ বছর একটি নির্দিষ্ট ঘরে জপ-ধ্যানে অতিবাহিত করেন। শ্বশুরবাড়ী থেকে প্রাপ্ত জমিজমা ও গহনাপত্র বিক্রয় করে, সেই অর্থে তিনি কোন প্রকারে নিজের খরচ চালাতেন এবং মন্দিরের যাবতীয় কাজে সাহায্য করতেন।

একদা মন্দিরের মালিক দত্ত-গৃহিণীর সঙ্গে অঘোরমণি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হন। তারপর থেকেই অঘোরমণি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং ঠাকুরও তাঁর কামারহাটীর কুটীরে শুভাগমন করেন। একদিন গভীর রাত্রে জপের সময় অঘোরমণি সহসা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান এবং তাঁর হাতটি ধরার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণের স্থানে তিনি একটি সত্যকারের দশমাসের বালকমূর্তি দর্শন করেন ; ঐ মূর্তি একহাত তুলে গোপালের ন্যায় তাঁর কাছে ননী খেতে চান। সেইদিন থেকেই অঘোর-মণির সঙ্গে সেই চিন্ময় বালকের জীবন্ত মূর্তির মত অভিনব লীলা শুরু হয় এবং অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণরূপী চিন্ময় গোপাল তাঁর কাছ থেকে

ক্ষীর, ননী, নাড়ু, সন্দেশ প্রভৃতি চেয়ে চেয়ে খেতে থাকেন এবং ভক্তিমতী অঘোরমণিও সে সবগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে তুলে খাওয়ান। তখন থেকে অঘোরমণি প্রবল বাৎসল্য রসের মহিমায় সকলের কাছে "গোপালের মা" রূপেই অভিহিতা হন। অবশ্য ক্রমাগত শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে গোপাল দর্শনের ফলে, তিনি তার পরে চিন্ময়-গোপালের দর্শন পেতেন না; তিনি ঠাকুরকেই "গোপাল" বলে ডাকতেন এবং ঠাকুরও তাঁকে যশোদা-জ্ঞানে সম্মান করতেন। এমনকি ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ঠাকুর একদা এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর কোলে "গোপালভাবে" বসে তাঁকে বিশেষ কৃপা করেন এবং মহাভাগ্যবতী অঘোরমণি তথা গোপালের মা তাঁকে পরম মাতৃস্নেহে আদর করেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও গোপালের মা সর্বত্র গোপাল অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতেন এবং তাঁর সঙ্গে আপনমনে জীবদ্দশাকালীন অবস্থার মত নানা কথা কইতেন। স্বামী বিবেকানন্দকেও তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি "নরেনের মেয়ে" মনে করতেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই স্বামীজীর অকালে দেহত্যাগের সংবাদ শোনামাত্রই তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যান এবং তার ফলে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একটি হাত ভেঙ্গে যায়। স্বামীজীর বিদেশী ভক্তেরাও গোপালের মাকে খুব সম্মান করতেন এবং ঠাকুরের অপরাপর ত্যাগী সন্তানেরা "গোপালের ছেলে" অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান হিসাবে তাঁর খুব প্রিয় ছিলেন।

এখানে বলা আবশ্যক, কোন নির্দেশ পেয়েই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, দেহত্যাগের ১০।১২ বছর আগে থেকেই গোপালের মা গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করতেন এবং নিজেকে "সন্ন্যাসিনী" বলে পরিচয় দিতেন। অন্তিম অবস্থায় গোপালের মাকে ভগিনী নিবেদিতা উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ১৭নং বোস পাড়া লেনের বাড়ীতে নিয়ে এসে যথাসাধ্য তাঁর সেবা করেন। এই সময় শ্রীশ্রীমা তাঁকে দেখতে এলে তিনি গোপাল অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-জ্ঞানে শ্রীশ্রীমায়ের চরণধূলি নেন এবং রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় সর্বদা উচ্চৈঃস্বরে "রামকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করতে থাকেন। আজীবন গঙ্গাপ্রীতির জন্য শেষ সময়ে ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং নগ্নপদে তাঁকে নিয়ে গঙ্গাতীরে যান এবং স্বহস্তে তাঁর শয্যা রচনা করে শয্যাপার্শ্বেই অবশিষ্ট কটা দিন নিজেই থাকেন। গোপালের মার দেহত্যাগের পর নিবেদিতা তাঁর জপের মালা নিজে গ্রহণ করেন এবং তাঁর পূজিত শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো পরবর্তীকালে বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে রাখা হয়।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মা-যশোদা শ্রীমতী

অঘোরমণি দেবী তথা গোপালের মা অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় গঙ্গাগর্ভে কলকাতায় দেহরক্ষা করেন।



লক্ষ্মী-দিদি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ঠাকুরের কৃপাধন্যা মহাসাধিকার প্রকৃত নাম শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি চট্টোপাধ্যায়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ৺সরস্বতী পূজার দিন তিনি কামারপুকুরে পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বরের কন্যা এবং রামলালের ভগিনী। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী হিসাবে ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি ছিলেন "লক্ষ্মী-দিদি"। পিতা রামেশ্বরের মৃত্যুর পর অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়; কিন্তু বিবাহের ২।১ মাস পরেই তাঁর স্বামী চিরদিনের মত নিরুদ্দেশ হওয়ায়, তাঁর পক্ষে আর বিবাহিত জীবন যাপন করা বা সংসার করা সম্ভব হয়নি। ১২ বছর অপেক্ষা করার পর তিনি স্বামীর শ্রাদ্ধাদি কাজ সম্পন্ন করেন এবং পিতৃগৃহেই বাস করতে থাকেন। প্রথম জীবন তাঁর খুব আর্থিক অনটনে কাটে এবং অবশেষে তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে চলে আসেন।

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন ঠাকুরের আশ্রয়ে ভক্তিমতী লক্ষ্মী-দিদি নিজের ধর্মীয় জীবন উচ্চস্তরে গঠন করেন এবং সাধন-ভজনে অধিকতর মনোনিবেশ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের পার্শ্বসঙ্গিনী হিসাবে তিনি সর্বদা তাঁর কাছেই থাকতেন. শ্রীশ্রীমা ও লক্ষ্মী-দিদি সে সময় নহবত-ঘরে একত্রে বাস করতেন বলে ঠাকুর রহস্য করে তাঁদের "শুক-সারী" বলে ডাকতেন। পূর্বে উত্তরদেশীয় এক সন্ন্যাসীর কাছে লক্ষ্মী দিদি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেও, এই সময় ঠাকুর তাঁর জিহ্বায় "রাধা-শ্যাম" বীজমন্ত্র লিখে এবং মুখেও তা উচ্চারণ করে তাঁকে পুনরায় দীক্ষাদান দ্বারা বিশেষ কৃপা করেন। লক্ষ্মী-দিদি ঠাকুরকে গুরু, ইষ্ট ও অবতার রূপে জ্ঞান করতেন; ঠাকুরও স্বপ্নযোগে তাঁকে মা-শীতলার অংশরূপে জানতে পেরে কাশীপুরে থাকাকালীন দু'বার লক্ষ্মী-দিদিকে শীতলা-জ্ঞানে পূজা করেছিলেন।

একদা ঠাকুর তাঁর নিজের খাওয়ার পাতে লক্ষ্মী-দিদিকে খেতে বলেন, কিন্তু পাতে একটু মাছের ঝোল থাকায়, বিধবা ব্রাহ্মণী লক্ষ্মী-দিদি খেতে ইতস্তত: করলে ঠাকুর তাঁকে প্রসাদ জ্ঞানে তা আহার করতে বলেছিলেন। এমনকি, একাদশীতেও ভরপুর আহার করার জন্য ঠাকুর তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঠাকুর তাঁকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, অপর কোন ঠাকুর-

দেবতাকে মনে না পড়লে, তিনি যেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকেই স্মরণ করেন। কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্মী-দিদি ঠাকুরের কাছ থেকে ভাব-সম্পদে পূর্ণ হয়েছিলেন এবং তিনি প্রায়ই ভাব-রাজ্যে সমাধিস্থ থাকতেন। মহাভাবময়ী সুগায়িকা লক্ষ্মী-দিদি অধিকাংশ সময় ভজন, কীর্তন ও হরিনামে বিভোর থাকতেন এবং এই সঙ্গীতের দ্বারা শ্রীশ্রীমা এবং অপর সবাইকে মুগ্ধ করতেন। ঠাকুরের তিরোধানের পর, তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং শেষ বয়সে পুরীধামে তাঁর নিজ ভক্তগণ নির্মিত "লক্ষ্মী-নিকেতনে" বাস করতে থাকেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশতঃ এই গৃহের শিরোদেশে "জয় প্রভু রামকৃষ্ণ" কথাটি লেখা থাকে।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহপুত্তলী শ্রীমতী লক্ষ্মী-দিদি পুরীধামে দেহরক্ষা করেন।

*

ভানু-পিসী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগিণী মহিলা ভক্ত। তিনি ছিলেন বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রাম নিবাসী সদ্গোপ বংশীয় ক্ষেত্র বিশ্বাসের বিধবা কন্যা এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর বাল্য-সঙ্গিনী। গ্রাম-সম্পর্কে শ্রীশ্রীমা তাঁকে "পিসী" বলে ডাকতেন। প্রায় কুড়ি বছর বয়সে তিনি বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে বরাবরের মত আশ্রয় নেন, তাঁর একটিমাত্র কন্যার ছোট বেলাতেই মৃত্যু হয়েছিল।

ভানু-পিসী খুব ভক্তিমতী এবং বৈষ্ণব ভাবের সাধিকা ছিলেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে জয়রামবাটীতে শ্বশুর বাড়ী গেলেই, ভানু-পিসী তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে যেতেন এবং ঠাকুরও মাঝে মাঝে এই ভক্তিমতী ভানু-পিসীর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে গান গেয়ে শোনাতেন। ভানু-পিসী নিজেও একজন সুগায়িকা ছিলেন। ঠাকুর ভানু-পিসীর বাড়ীতে গেলে, তিনি তাঁর ঘরের দুধ, দই, ঘোল প্রভৃতি ঠাকুরকে খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন। শ্রীশ্রীমায়ের বাল্য-সঙ্গিনী হিসাবে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে নানা রঙ্গ-কৌতুক করলেও তাঁর মধ্যে অসাধারণ পুরুষের স্বরূপ চিনতে পেরে ভানু-পিসী ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা—উভয়কেই অশেষ ভক্তি করতেন। এমনকি, শ্রীশ্রীমাকে একবার তিনি চতুর্ভুজারূপে দর্শনও করেছিলেন।

পরবর্তীকালে, বৃদ্ধ বয়সে ভানু-পিসী শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে কলকাতায় ও কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে বাস করেছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্তগণ ভানু পিসীকে খুব শ্রদ্ধা

করতেন। শেষ বয়সে তিনি ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার কথা বলতেই বেশী ভালবাসতেন এবং নিত্য শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করতেন। এমনকি, ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পরেও এই মহাভাগ্যবতী মহিলা, ঠাকুরকে কয়েকবার প্রত্যক্ষ দর্শন করেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের জীবদ্দশাতেই ভানু-পিসী দেহত্যাগ করেন।

*

প্রসন্ন-দিদি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগিণী মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার বিধবা ভক্তিমতী কন্যা। প্রকৃত নাম প্রসন্নময়ী, ঠাকুর এই বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাকে "প্রসন্ন-দিদি" বলে সম্বোধন করতেন।

পিতৃবন্ধু ধর্মদাস লাহার বাড়ীতে ঠাকুর (তৎকালে গদাধর) বাল্যকালে যাতায়াত করতেন এবং সেই সময় সে বাড়ীর সকলেই গদাধরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। প্রসন্নময়ী গদাধরের অন্তর্নিহিত মহাভাব লক্ষ্য করে তাঁকে সত্য সত্যই কোন দেবতা বলে অভিমত প্রকাশ করতেন এবং বয়সে ছোট হলেও গদাধরের কথাগুলি পালন করতেন। গদাধরের গান শুনে তিনি মোহিত হতেন এবং গদাধরকে স্নেহদান করে তিনি নিজে ধন্য হতেন।

একদা বাল্যকালে দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাওয়ার পথে বালক গদাধর অচৈতন্য হয়ে পড়ায়, প্রসন্নময়ী গদাধরকে "দেবী বিশালাক্ষী" জ্ঞানে সম্বোধন ও পূজা করে তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিলেন। একদা ঠাকুরের কামারপুকুরের বাড়ীর লোকেরা প্রচণ্ড অভাব ও দুরবস্থার সম্মুখীন হওয়ায়, করুণারূপিণী প্রসন্নময়ী লাহাবাবুদের দৈনিক অতিথি সেবার সময় ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের মারফৎ প্রতিদিন তাঁদের সংসারে অন্নপ্রসাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করেন, এবং সেই দুর্দিনে তাঁদের সাময়িকভাবে রক্ষা করেন।

প্রসন্নময়ীর উদার ও সরল আচরণে ঠাকুর মুগ্ধ হতেন এবং তাঁকে বিশেষ সম্মান করতেন। বহু সদগুণের জন্য ভাগ্যবতী প্রসন্নময়ী ঠাকুরের কাছে বরাবরই একজন আদর্শ মহিলারূপে শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছে বরাবরই পরম স্নেহের পাত্র ছিলেন। প্রসন্নময়ীর সরলতা, উদারতা, পবিত্রতা, ধর্মপ্রাণতা এবং অমায়িকতার জন্য ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে এমন উচ্চধারণা পোষণ করতেন যে, পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য মহিলা ভক্তদের কাছে "প্রসন্ন-দিদির" কথা উল্লেখ করে তিনি বার বার শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন।

ভিক্ষামাতা ধনী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাগ্যবতী মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের কামারপুকুর গ্রামের কর্মকার-জাতীয়া বিধবা মহিলা। ঠাকুরের জন্মসময়ে বাড়ীর ঢেঁকিশালের সূতিকাগারে ঠাকুরের মাতা চন্দ্রমণির সহচরীরূপে তিনি ধাত্রীমাতার কাজ করেন। ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হবার পরমুহূর্তেই সদ্যজাত শিশু, নির্দিষ্ট স্থান থেকে সরে উনুনের পাশে ছাইগাদায় চলে যাওয়ায়, মাতা চন্দ্রমণি শিশুকে দেখতে পাননি; পক্ষান্তরে ধনীই শিশুকে খুঁজে ভস্মমাখা অবস্থায় উনুনের পাশ থেকে কুড়িয়ে আনেন এবং এই পৃথিবীতে অবতার-পুরুষের প্রথম শ্রীমুখ-দর্শন ও প্রথম তাঁকে কোলে তুলে নেবার পরম সৌভাগ্য অর্জন করেন।

শৈশবকালে গদাধরকে (পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ) ধনীই দেখাশোনা করতেন ও বিশেষ যত্ন এবং স্নেহ করতেন। গদাধরও ধনীর খুব অনুগত ছিলেন। একদা বালক গদাধরের কাছে ধনী প্রার্থনা জানান যে, উপনয়নের সময় গদাধর যেন তাঁর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেন এবং গদাধরও সে সময় ধনীর প্রার্থনা মঞ্জুর করে রাখেন। যথাকালে উপনয়নের সময় গদাধর ধনীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার ও অন্যান্যেরা কুলধর্ম বিরুদ্ধ এই প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি করেন; কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য গদাধর বিষম জেদ করায়, অবশেষে গদাধরের প্রস্তাব স্বীকৃত হয়। সত্যনিষ্ঠ বালক, ভিক্ষামাতারূপে কামারকন্যা ধনীর কাছ থেকেই প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করে পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং ধনীকে "মা" ডেকে তাঁর হৃদয় তৃপ্ত করেন। এমনকি, ধনীর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি, ধনীর স্বহস্তে প্রস্তুত রান্না কেড়ে খেয়ে, এই মহাভাগ্যবতী মহিলাকে কৃতার্থ করেন। বস্তুতঃ ঠাকুরের সঙ্গে ভক্তিমতী ধাত্রীমাতা ও ভিক্ষামাতা ধনীর একটি মধুর সম্পর্ক ছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ধনীর দেহত্যাগের পর তাঁর ভায়ের স্ত্রী, ধনীর ব্যবহৃত একখানি "চৈতন্য-ভাগবত" তাঁর এক আত্মীয়কে দান করেন; কিন্তু তিনি সেটি অযত্নে রাখায় ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ভক্তিমতী লক্ষ্মী-দিদি স্বপ্নে সেই অমূল্য পুস্তকের কথা জানতে পারেন এবং উক্ত আত্মীয়ের কাছ থেকে সেটি উদ্ধার করেন। লক্ষ্মী-দিদি পরে সেই গ্রন্থখানি আর এক গৃহত্যাগী শিষ্যকে সযত্নে রক্ষা করার জন্য ভার দিয়েছিলেন।

*

তপস্বিনী গঙ্গামাতা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগিনী, শ্রীবৃন্দাবনের সিদ্ধ-প্রেমিকা ও বর্ষিয়সী বৈষ্ণব-সাধিকা। তিনি নিধুবনের আশ্রমে বাস করতেন। দীর্ঘকাল যাবৎ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সাধন ব্রতে তিনি আত্মনিয়োগ করেন এবং "ললিতা" সখীরূপে তিনি সেখানে সকলের পূজিতা হন।

পরমভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ ভ্রমণকালে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে এই সিদ্ধ-প্রেমিকা, বৃদ্ধা তপস্বিনী গঙ্গামাতাকে দর্শন করেন এবং তাঁর উচ্চ অবস্থা লক্ষ্য করে ঠাকুর মোহিত হন। গঙ্গামাতাও ঠাকুরকে দর্শন মাত্রই তাঁর মহাভাবের পরিচয় পেয়ে, ঠাকুরকে "স্বয়ং শ্রীরাধিকা" জ্ঞান করেন এবং স্নেহভরে "দুলালী" নাম রাখেন। গঙ্গামাতার হৃদয়ের সেবা ও ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে ঠাকুর কয়েকদিন তাঁর আশ্রমে বিনা দ্বিধায় বাসও করেন। সে সময় গঙ্গামাতা স্বহস্তে আহারাদি প্রস্তুত করে ঠাকুরকে ভোজন করাতেন এবং সর্বদাই ঠাকুরের সঙ্গে তত্ত্ব কথায় দিন যাপন করতেন। মনের মত পরিবেশ পেয়ে ঠাকুর বাকী জীবন সেখানেই কাটাবার জন্য মনস্থ করলে, ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস, ভাগ্নে হৃদয়রাম প্রভৃতি সহযাত্রিগণ খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন; কিন্তু ঠাকুরের নিজের বৃদ্ধমাতা চন্দ্রমণি দেবীর কথা তাঁকে স্মরণ করালে, ঠাকুর অবিলম্বে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর মাতার কাছেই ফিরে আসা স্থির করেন। বিদায়ের সময় গঙ্গামাতা ঠাকুরকে পরিত্যাগ করতে অরাজী হওয়ায়, আকুলভাবে ঠাকুরের হাত ধরে টানাটানি করেন, নিকটস্থ দণ্ডায়মান ভাগ্নে হৃদয়রামও ঠাকুরকে নিয়ে যাবার জন্য টানতে থাকেন এবং এই অবস্থায় ঠাকুর ক্রন্দন করতে থাকেন অবশেষে ঠাকুরের চোখে জল দেখে গঙ্গামাতা তাঁকে ছেড়ে দেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ঠাকুরের কাছে তিনি আশীর্বাদ প্রার্থনা করায়, ঠাকুর তাঁকে অভয় দান করে কলকাতায় যাত্রা করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী তুরীয়ানন্দ তথা হরি মহারাজ তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে বৃন্দাবন গিয়ে গঙ্গামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং হরি মহারাজের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে গঙ্গামাতা তাঁকে বিশেষ আশীর্বাদ করেছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের কাছে বর্ষাণা নামক স্থানে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপুণ্যবতী ও তপস্বিনী গঙ্গামাতার দেহরক্ষা হয়।



কাশীর মেয়ে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা অজ্ঞাতনামা জনৈকা প্রাচীন মহিলা-ভক্ত। তিনি কাশী থেকে সহসা দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হন এবং নিজেকে "কাশীর মেয়ে" বলে পরিচয় দেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের এমন কঠিন আমাশয় রোগ হয় যে, দিবারাত্র মলত্যাগের ফলে তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েন এবং প্রতিবার জলশৌচের ফলে তাঁর মলদ্বারে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তখন দক্ষিণেশ্বরের ৺কালী মন্দিরের কাছে ভক্ত শম্ভুনাথ মল্লিকের নির্মিত একটি পৃথক চালা ঘরে বাস করতেন এবং সেখান থেকে এসে ঠাকুরের শুশ্রূষা করে আবার চলে যেতেন। ঠিক এই সময়েই কাশী থেকে এই অজ্ঞাতনামা প্রাচীন-মহিলাটি যেন দৈব নির্দেশে অকস্মাৎ কয়েকদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন এবং মেয়ের মত স্বেচ্ছায় ঠাকুরের সকল প্রকার সেবার ভার গ্রহণ করেন। এমনকি, মলদ্বারের ক্ষতে সেঁক দেওয়ার কাজও তিনি নির্বিকার চিত্তে নিজের হাতে করে, ঠাকুরকে অনেকটা সুস্থ করেন এবং তাঁর শারিরীক যন্ত্রণার অনেক লাঘব করেন। কিন্তু তাঁর একার পক্ষে ঠাকুরের সকল প্রকার সেবা-শুশ্রূষা ঠিকঠিক মত করা সব সময় সম্ভব ছিল না, সেজন্য তিনি ঠাকুরের কাছে-কাছে সর্বদা থাকার জন্য শ্রীশ্রীমাকেও পার্শ্ববর্তী চালাঘর থেকে পুনরায় নিকটবর্তী নহবত-ঘরে নিয়ে আসেন এবং আন্তরিক পরিচর্যায় ঠাকুর সে-যাত্রায় আরোগ্য লাভ করেন।

ঠাকুরের সামনে ইতিপূর্বে শ্রীশ্রীমা কখনও মাথার ঘোমটা না খোলায় কাশীর এই মহিলাই একরাত্রে শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুরের ঘরে এনে তাঁর মাথার ঘোমটা খুলে দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করেন। সে রাত্রে ঠাকুর ভগদ্ভাবে বিভোর হয়ে তাঁদের দুজনকে নানা ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়েছিলেন এবং সেদিন সেইভাবে রাত শেষ হয়ে ভোর হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন বাদে ঠাকুরের আরোগ্যলাভের পরেই তাঁর সেবার কাজ শেষ করে এই ভক্তিমতী প্রাচীন-মহিলাটি চিরদিনের মত দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যান।

বলা আবশ্যক, একমাত্র কাশীর মেয়ে ছাড়া তাঁর আর কোন পরিচয়ই পাওয়া যায়নি, অথবা তাঁর অতীত বা ভবিষ্যতের কথাও জানা যায়নি। তিনি কে, কার নির্দেশে এলেন, কেনই-বা এলেন, আবার কেনই-বা কোন পরিচয় না দিয়ে চলে গেলেন, এ-সব কথা অজ্ঞাতই আছে। পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীমা যখন কাশীতে তীর্থে যান, তখন অনেক চেষ্টা করেও তিনি সেখানে কোথাও তাঁর সন্ধান পাননি।

ভৈরবী (দ্বিতীয়)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহিলা-গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবী ছাড়াও, এই দ্বিতীয়-ভৈরবী পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। যে সময় শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ছিলেন, সেই সময় এই দ্বিতীয়-ভৈরবীর আবির্ভাব হয়। এই দ্বিতীয়-ভৈরবী যেদিন আসেন. সেদিন তাঁর আসার আগেই ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে এই ভৈরবীকে দেবার জন্য একখানি কাপড় লুকিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঐদিন ৺কালীমন্দিরে ভোগ রাগের পর ভৈরবী এলে, ঠাকুর তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলেন এবং ভৈরবীও কিছুদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে থেকে যান।

এই সময় ভৈরবী শ্রীশ্রীমাকে সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, কিন্তু তাঁর মাথা-গরমের দরুন তিনি শ্রীশ্রীমাকে মাঝে মাঝে শাসাতেন যে, তাঁর জন্য পান্তাভাত না রাখলে, তিনি শ্রীশ্রীমাকে ত্রিশূল দিয়ে বধ করবেন। ভীতিগ্রস্তা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এই কথা শুনে ঠাকুর অবশ্য তাঁকে অভয় দিতেন। ভৈরবী বাইরে থেকে মাঝে মাঝে এত ভিক্ষা করে আনতেন যে, তাতে মন্দিরের এষ্টেটের খাজাঞ্চী আপত্তি জানাতেন এবং তাঁকে বাইরের ভিক্ষা বন্ধ করে সেখানেই আহারের ব্যবস্থার জন্য আহ্বান করতেন, কিন্তু তাতে ভৈরবী খাজাঞ্চীকেও ধমক দিয়ে শাসন করতেন। ঠাকুর কিন্তু এই সব ঘটনায় নির্বিকার থাকতেন এবং তাঁকে ঠিক ঠিক ভৈরবী জ্ঞানে সম্মান করতেন।

কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে বাস করার পর এই দ্বিতীয়-ভৈরবী সেখান থেকে চিরদিনের মত চলে যান। তিনি আর ফিরে আসেননি, অথবা ঠাকুরের সঙ্গেও ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীর মত আর কোথাও তাঁর দেখা হয়নি।

*

রাণী কাত্যায়নী

উত্তর কলকাতার পাইকপাড়ার প্রখ্যাত জমিদার ও স্বনামধন্য ভক্ত লালাবাবু, তথা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের ভক্তিমতী স্ত্রী। একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি পরম শ্রদ্ধাসহকারে জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর তীর্থঙ্করের (মতান্তরে বুদ্ধদেবের) একটি সুন্দর ছোট মর্মর মূর্তি নিবেদন করেছিলেন। ঠাকুর পরম ভক্তিমতী রাণী কাত্যায়নীর নিবেদিত সেই মূর্তিটি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে-ছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে সযত্নে সেটি রেখে দিয়েছিলেন।

বলা আবশ্যক, আজও তা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ব্যবহৃত ঘরে রক্ষিত আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রাণী কাত্যায়নীর জামাতা-সম্পর্কীয় গোপালচন্দ্র ঘোষ কাশীপুর উদ্যানবাটীর সত্বাধিকারী ছিলেন এবং ঠাকুরের অসুখের সময় তাঁর ভক্তেরা গোপালচন্দ্রের উদ্যানবাটী ভাড়া নিয়েছিলেন।

*

চতুর্দশ স্তবক

যদুর মাসী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা বৃদ্ধা মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত যদুলাল মল্লিকের মাসীমা। ভক্ত যদুলালের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের যোগাযোগ হয় এবং তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের চরম উৎকর্ষ ঘটে। বাৎসল্যভাবে আপ্লুতা এই বৃদ্ধা মহিলা, ঠাকুরকে সন্তানের ন্যায় নিজের পাশে বসিয়ে সজল নয়নে আহার করিয়ে তৃপ্তি পেতেন এবং ঠাকুরও পাঁচ বছরের শিশুর মত তাঁর কাছে আলুথালু অবস্থায় বসে আনন্দ পেতেন। এই বৃদ্ধাকে দেখার জন্য মাঝে মাঝে ঠাকুর নিজেই ভক্ত যদুলালের বাড়ীতে এসে সরাসরি অন্দর মহলে প্রবেশ করতেন এবং তাঁর বাৎসল্য-মাধুর্য আস্বাদন করে তাঁকে কৃতার্থ করতেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের গৃহীভক্ত কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারকে ঠাকুর কয়েকটি রসগোল্লা খেতে দেন এবং জানান যে তাঁর এক মহিলা-ভক্ত ঐ রসগোল্লাগুলি পাঠিয়েছেন। ঠাকুর সেইদিনই ঐ মহিলার কাছে যাবেন শুনে দেবেন্দ্রনাথ সন্দেহাকুল মনে কাম-কাঞ্চনত্যাগী ঠাকুরের সঙ্গে ঐ মহিলাটির সম্পর্ক জানার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হন; কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে তিনি ভক্ত যদুলালের বাড়ীতে গিয়ে যদুলালের ঐ বৃদ্ধা মাসীর সঙ্গে ঠাকুরের মধুর বাৎসল্যভাবের স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শন করে একাধারে লজ্জিত ও বিস্মিত হন।

একদা এই ভক্তিমতী মহিলা ৺শিবপূজা করার সময় ৺শিবের মূর্তির বদলে কেবলই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি দর্শন করতে থাকেন এবং ৺শিবের উদ্দেশে নৈবেদ্য নিবেদন করতে গিয়ে তিনি শুধু ঠাকুরের কথাই চিন্তা করতে থাকেন। এমন সময় সহসা শিবস্বরূপ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে জনৈকা মহিলা ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলে, ভক্তিমতী মাসী ঠাকুরকে এবার সত্যই সেই নৈবেদ্য নিবেদন করে ঠাকুরের কৃপালাভ করেন।

*

যোগীন-মার খুড়ী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা বৃদ্ধা মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের প্রসিদ্ধ মহিলা-ভক্ত শ্রীযুক্তা যোগীন-মার বিধবা, বৃদ্ধা, ভক্তিমতী খুড়ীমা। তিনি ঠাকুরের অযাচিত করুণা লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে যোগীন-মা'র সঙ্গে যেদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে যান, সেদিন একাদশী থাকায় তিনি নির্জলা-উপবাসী ছিলেন; আগের দিনও বাড়ীতে কি একটি বিশেষ কাজের জন্য তাঁর অন্ন খাওয়া হয়নি। সেজন্য পর পর দুদিন

উপবাসের দরুন বৃদ্ধা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে শ্রীশ্রীমায়ের নহবত-ঘরের কাছে বসে পড়ে হাঁফাতে থাকেন। তার কষ্ট দেখে শ্রীশ্রীমা তাঁকে সরবৎ খাওয়াবার চেষ্টা করলে বৃদ্ধা তাতে আপত্তি করেন এবং সর্বাগ্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য তাঁর ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করেন। এই সময় বৃদ্ধার শারিরীক কাতরতা দেখে ঠাকুর নিজেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বৃদ্ধাকে সযত্নে ধরেন, বৃদ্ধাও ঠাকুরের স্পর্শ ও দর্শন লাভ করে শান্ত হন। পরে প্রেমময় ঠাকুর ঘরের শিকা থেকে চিনি নামিয়ে গঙ্গাজলে সরবৎ তৈরী করে বৃদ্ধার মুখে ধরে স্বয়ং খাইয়ে দেন। ঠাকুরের কাছ থেকে এই দুর্লভ কৃপা অযাচিতভাবে লাভ করে বৃদ্ধা সেদিন কৃতার্থ হন।

যোগীন-মার মাতামহী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা বৃদ্ধা ভক্তিমতী মহিলা। তিনি ছিলেন ঠাকুরের প্রসিদ্ধ মহিলা-ভক্ত শ্রীযুক্তা যোগীন মার বৃদ্ধা মাতামহী। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি একদা ঘটনাচক্রে তাঁর প্রত্যক্ষ সঙ্গলাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে তিনি যেদিন দক্ষিণেশ্বরে প্রথম যান, সেদিন তিনি তাকে নিশ্চয়ই "সাধুর বেশে" দেখতে পাবেন বলে আশা করেছিলেন কিন্তু সাধারণ গৃহীর বস্ত্র পরিহিত অচেনা ঠাকুরকে তিনি "শ্রীরামকৃষ্ণ" বলে ধারণা করতে পারেন নি। তাই ঠাকুরের কাছে তিনি তাকেই জিজ্ঞাসা করেন—"পরমহংস কোথায় ?" নিজেকে "পরমহংস" রূপে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত ঠাকুর তাকে বলেন—"খুঁজে দ্যাখো"। বৃদ্ধা সেখানে খোঁজাখুঁজি করে কোন সাধু সন্ন্যাসীকে দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে গিয়েছিলেন।

দ্বিজর ছোট দিদিমা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা ভক্তিমতী মহিলা। তিনি ছিলেন ঠাকুরের তরুণ ভক্ত দ্বিজর ছোট দিদিমা, বাল্যকালে তিনিই দ্বিজকে মানুষ করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অসুস্থতার খবর শুনে তিনি একদা ঠাকুরকে দেখতে যান। তাঁর পরিচয় জানতে পেরে ঠাকুর তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন এবং বলেন যে, দ্বিজ যেন গোপনে ঈশ্বরকে ডাকে, আর তার বাবা যেন তা জানতে না পারেন। বলা আবশ্যক, ঠাকুরের কাছে দ্বিজর যাতায়াতে তার বাবা তার

ওপর খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন। দ্বিজর ভক্তিমতী ছোট দিদিমাকে কাছে পেয়ে ঠাকুর ভক্ত দ্বিজকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

*

দ্বিজর ভগিনী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা ভক্তিমতী মহিলা। তিনি ছিলেন ঠাকুরের তরুণ ভক্ত দ্বিজর ভগিনী। ঠাকুরের প্রতি অনুরাগবশতঃ তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে দ্বিজর ভগিনী দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ছোট দিদিমার সঙ্গে অসুস্থ ঠাকুরকে দেখতে গিয়েছিলেন।

*

গোলাপ মার ভগিনী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত গোলাপ-মা, ওরফে অন্নপূর্ণা দেবীর বিধবা ভগ্নী। এই ভক্তিমতী মহিলা, ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। ঠাকুর যেদিন বাগবাজারে গোলাপ-মার বাড়ীতে শুভাগমন করেন, সেদিন এই বিধবা ব্রাহ্মণী গোলাপ-মার অনুপস্থিতিতে ঠাকুরকে সবপ্রথম বিশেষ সমাদর করেছিলেন, কারণ, সেই মুহূর্তে গোলাপ-মা ঠাকুরের খোঁজে নন্দ বসুর বাড়ীতে গিয়েছিলেন এবং পরে সেখান থেকে ঘুরে এসে স্বীয় বাড়ীতে ঠাকুরের দর্শন পান।

*

বিজয়কৃষ্ণের শাশুড়ী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ ভক্তিপরায়ণা মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন রামচন্দ্র ভাদুড়ীর ভক্তিমতী স্ত্রী এবং আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শ্বশ্রূমাতা। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি প্রায়ই যেতেন এবং তাঁর উপদেশ শ্রবণ করতেন।

একদা তিনি ঠাকুরকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন বলরাম বসু প্রমুখ ভক্তদের বলে দেন যে, সাকার পূজার দরকার নেই, নিরাকার সচ্চিদানন্দকে ডাকলেই চলবে। এই কথায় ঠাকুর রুচিভেদ বা অধিকারভেদ সম্পর্কে তাঁকে উপদেশ দিয়ে জ্ঞানদান করেছিলেন। আর একবার তিনি ঠাকুরকে জানান যে তাঁর এমন অবস্থা তখনো হয়নি যাতে তিনি সকলের পাতে খেতে পারেন। ঠাকুর তাতে তাঁকে পুনরায় উপদেশ দিয়েছিলেন—"সকলের পাতে খেলেই কি জ্ঞান-

হয়? কুকুর যা তা খায়, তাই বলে কি কুকুর জ্ঞানী?" এইভাবে নানা উপদেশ পেয়ে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ক্রমশঃ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ক্রমাগত ঠাকুরের পূতসঙ্গ লাভ করে তাঁর ভক্তি ক্রমশঃ বর্ধিত হয় এবং পরিশেষে তাঁর এমন অবস্থা হয় যে পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কোন ত্যাগী সন্তানকে দেখলেই তিনি তাঁকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করতেন। তাঁদের বয়স কম, সুতরাং তাঁদের প্রণাম করা উচিত নয় বলে নিষেধ করলেও তিনি তা শুনতেন না; কারণ তাঁরা ঠাকুরের সন্তান। শেষদিন অবধি এই মহিলা ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগিনী ভক্ত ছিলেন।

*

বিজয়কৃষ্ণের কন্যা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত স্বনামধন্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কন্যা। প্রথম জীবনে তাঁর পিতা-মাতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

*

কেশবচন্দ্রের কন্যা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠাকন্যা সুনীতি দেবী প্রথমাবস্থায় কয়েকবার ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে বা দক্ষিণেশ্বরেও তিনি ঠাকুরের পূতসঙ্গ লাভ করেছিলেন। কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের সঙ্গে কেশবচন্দ্র তাঁর কন্যার বিবাহ দেওয়ায় তৎকালে ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু কন্যার কল্যাণার্থে পিতার কাজকে সমর্থন জানিয়ে ঠাকুর সেদিন কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদীদের নিরাশ করেছিলেন।

*

বিশ্বম্ভরের কন্যা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্যা ৬।৭ বছরের বালিকা। অল্পবয়স হলেও বালিকাটি খুব ভক্তিমতী ছিল। একদা ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে রথের পুনর্যাত্রা উপলক্ষে ঠাকুরের শুভাগমন হলে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে এই বালিকাটিও সেদিন সেখানে উপস্থিত হয় এবং ঠাকুরকে নমস্কার করে। ঠাকুর সে সময় বাইরের বারান্দার দিকে অগ্রসর হওয়ায় বালিকাটির নমস্কার তিনি লক্ষ্য করেন নি। ঠাকুর পুনরায় ঘরে ফিরে এলে বালিকাটি সেকথা তাঁর কাছে উত্থাপন করে এবং ঠাকুর

তাঁর অন্যমনস্কতার কথা স্বীকার করেন। তখন বালিকাটি পুনরায় ঠাকুরের দুটি পায়ে নমস্কার করলে ঠাকুর ঐটুকু বালিকার ভক্তিতে অভিভূত হন এবং হাসতে হাসতে মাটি অবধি মাথা অবনত করে তৎক্ষণাৎ বালিকাটিকে প্রতিনমস্কার জানান। "বিশ্বম্ভরের কন্যা" নামে পরিচিতা পরম ভাগ্যবতী এই বালিকাটিকে ঠাকুব এবপর স্নেহবশে কয়েকটি "হাসির গান" শুনিয়ে আরও আনন্দ দান কবেন।

*

ভক্তিমতী দুই জা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ভক্ত-পরিবারের দুই ভায়ের বধূ—দুই জা। ঠাকুরের সান্নিধ্যে আগতা, অবগুণ্ঠনবতী এই দুই মহিলা ভক্তের বয়স ২২।২৩ এর মধ্যে এবং দুই জনেই ছেলের মা। তাঁরা একদা ঠাকুরের কাছে "মন্ত্র" নেবার বাসনা প্রকাশ করায়, ঠাকুর সস্নেহে তাঁদের বলেন—"আমি তো মন্ত্র দিই না। মন্ত্র দিলে শিষ্যের পাপ তাপ নিতে হয়। মা আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছেন।" ঠাকুর এই ভক্তিমতী দুই মহিলাকে শিবপূজা করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্যও নির্দেশ করেছিলেন। সেদিন তাঁরা উপবাসী অবস্থায় ঠাকুরের কাছে আসায়, ঠাকুর তাঁদের বলেছিলেন—"তোমরা উপবাস করে এসেছ কেন? খেয়ে আসতে হয়। মেয়েরা আমার মার এক একটি রূপ কিনা! তাই তাদের কষ্ট আমি দেখতে পারি না, জগন্মাতার এক একটি রূপ! খেয়ে আসবে, আনন্দে থাকবে।" অতঃপর ঠাকুরের আদেশে সেদিন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল এই দুই বধূকে নানাবিধ আহার করালে ঠাকুব খুব তুষ্ট হন।

রুক্মিণী দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা মহিলা ভক্ত! তিনি ছিলেন ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামের বেনেপাড়ার সমৃদ্ধশালী ও ভক্তিমান সীতানাথ পাইনের অন্যতমা কন্যা। বালক অবস্থায় ঠাকুর (তৎকালীন গদাধর) সীতানাথের বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন এবং সেই সময় রুক্মিণী ও তাঁর অপর ভাইবোনদের সঙ্গে ঠাকুরের বেশ হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। তাঁরা গদাধরকে এমন ভাগবতজ্ঞানে গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁদের বাড়ীতে পাঠ বা সঙ্গীত করার সময় কখনো কখনো গদাধরের ভাবাবেশ উপস্থিত হলে, তাঁরা বালক গদাধরকে শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন্ত বিগ্রহজ্ঞানে পূজা করতেন। ভক্তিমতী রুক্মিণীও

বালক গদাধরকে ইষ্টের মত অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মিশে সেই সময় আনন্দলাভ করেছিলেন।

*

নন্দিনী দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা মহিলা ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত মণিলাল মল্লিকের ভক্তিমতী বিধবা ভগ্নী (মতান্তরে কন্যা)। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তিনি তাঁর কৃপা লাভ করেন এবং তাঁর ভক্তে পরিণত হন। নন্দিনীর ঘরে এমন কয়েকখানি ছবি ছিল, যা দেখলে ঈশ্বরীয়ভাবের উদ্দীপন হয়। ঠাকুর সেগুলি দর্শন করে নন্দিনীর প্রশংসা করেছিলেন এবং ভক্তদের সেই ছবিগুলি দেখে আসার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন।

একদা নন্দিনী ঠাকুরকে জানান যে, ধ্যান করার সময় তাঁর একটি ছোট ভাইপোর মুখ কেবলই মনে পড়তে থাকায়, তাঁর পক্ষে ভগবানের ধ্যান করা সম্ভব হয় না এবং সেজন্য তিনি মনে বড় অশান্তি পান। তাতে ঠাকুর তাঁকে উপদেশ দেন যে, নন্দিনী যেন সেই ভাইপোটিকেই "গোপালরূপা" ভগবানের মত মনে করেন এবং গোপালজ্ঞানে তাকে খাওয়ানো, পরানো প্রভৃতি সেবা করেন। ঠাকুরের উপদেশ পালন করে নন্দিনীর বিশেষ মানসিক উন্নতি হয়েছিল; এমনকি, ঠাকুরের কৃপায় তাঁর ভাব-সমাধিও হত।

*

ভুবনমোহিনী দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা বালিকা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ গৃহীভক্ত বলরাম বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন তাঁর মাতুল। ভক্ত বলরামের বাগবাজারের বাড়ীতে বহুবার ঠাকুরের আগমন হয় এবং বহুবার তিনি সেখানে অবস্থান করেন। এই অবস্থানের সময়েই এই ভক্তিমতী বালিকা ভুবনমোহিনী প্রথম জীবনেই ঠাকুরের সংস্পর্শে বহুবার আসেন এবং সেই অল্প বয়সেই ঠাকুরের কৃপা লাভ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভুবনমোহিনী অপরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেছিলেন।

*

কৃষ্ণময়ী দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা বালিকা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ গৃহীভক্ত বলরাম বসুর কনিষ্ঠা কন্যা। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী প্রেমানন্দ

ছিলেন তাঁর মাতুল। ভক্ত বলরামের বাগবাজারের বাড়ীতে বহুবার ঠাকুরের শুভাগমন হওয়ায়, প্রথম জীবনেই ভক্তিমতী বালিকা কৃষ্ণময়ী ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং সেই অল্প বয়সেই ঠাকুরের কৃপা লাভ করেন।

পরবর্তীকালে, বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে যাবার সময়, কৃষ্ণময়ী নিজ বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যে ছবিখানি নিত্য পূজা করতেন, সেইটি এবং জপের মালা সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানে কৃষ্ণময়ী তাঁর নিজস্ব একটি পৃথক পবিত্র ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য পূজার ব্যবস্থার জন্য শাশুড়ীকে অনুরোধ করলে, শ্বশুরালয়ে সেইমত ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এবং তাতে কৃষ্ণময়ীর মনের বাসনা পূর্ণ হয়। এই ভক্তিমতী মহিলার সম্পর্কে ঠাকুর বলেছিলেন— "কৃষ্ণময়ীর চোখ দুটি ঠিক ভগবতীর চোখের মত।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নববধূ কৃষ্ণময়ীর নিষ্ঠা ভক্তিতে তাঁর সাহেবী ভাবাপন্ন স্বামী ও শ্বশুরকুল পরবর্তীকালে ধর্মে এতই অনুরক্ত হন যে, সিমলা, দার্জিলিং প্রভৃতি স্বাস্থ্যনিবাসে বেড়াতে যাওয়ার পরিবর্তে, তাঁরা কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে যাওয়া শুরু করেন এবং অবশেষে সবাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তে পরিণত হন।

*

দাক্ষায়ণী দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের পরমভক্ত নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের সহোদরা ভগিনী। তিনি "নদিদি" নামে পরিচিতা ছিলেন। ভক্তিমতী দাক্ষায়ণী কয়েকবার ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং তাঁর অনুরাগিণী ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন।

*

মহামায়া দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত কালীপদ ঘোষ, তথা "দানা-কালীর" কনিষ্ঠা ভগ্নী। শ্যামপুকুরে অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুরের থাকাকালীন, ভক্তিমতী মহামায়া তাঁর সান্নিধ্যে এসে ধন্য হয়েছিলেন। একদা শ্যামপুকুরে ৺কালীপূজার রাত্রে ভক্তগণ ঠাকুরকে ৺কালী-জ্ঞানে পূজা করেন এবং সেই সময় এই ভক্তিমতী মহিলা, ঠাকুরের প্রসাদের জন্য দানা-কালীর বাড়ী থেকে সুজির পায়স নিয়ে এসে ঠাকুরকে নিবেদন করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ব্রজবালা দেবী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা, কালীঘাট অঞ্চলের মহিলা-ভক্ত। একদা তিনি তাঁর শিশুপুত্র "শিবকালী"কে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ছেলের মঙ্গলের জন্য যান। প্রথমে তিনি সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মনের ইচ্ছা জানালে, শ্রীশ্রীমা শিশুটিকে ঠাকুরের কাছে ছেড়ে দিতে বলেন। ব্রজবালা শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশমত শিশুটিকে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে গুটি গুটি একেবারে ঠাকুরের কোলে গিয়ে ওঠে এবং ঠাকুর তাকে স্নেহভরে একটি সন্দেশ খেতে দেন। ইতিমধ্যে ব্রজবালা সেখানে উপস্থিত হয়ে ছেলেটির দুষ্টুমির জন্য শাসন করলে, ঠাকুর তাঁকে নিষেধ করেন এবং ছেলেটির নাম "শিবকালী" শুনে ঠাকুর তিনবার "শিবকালী" নাম উচ্চারণ করে, এই নাম রাখার জন্য ব্রজবালার প্রশংসা করেন।

*

মাণিকপ্রভা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত মনোমোহন মিত্রের অন্যতমা কন্যা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, তথা শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তাঁর পিসেমশাই। তাঁর একমাত্র ভ্রাতা গৌরীমোহন পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করে "ব্রহ্মচারী মাতৃকা চৈতন্য" রূপে অভিহিত হন। তাঁর পিতামহী শ্যামাসুন্দরী দেবীও ঠাকুরের কৃপাধন্যা ভক্ত ছিলেন।

একদা অসুস্থা মাণিকপ্রভার প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা দেখা দিলে, শ্যামাসুন্দরী তাঁর হতাশাগ্রস্ত পুত্র মনোমোহনকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে পাঠান এবং তাঁর সাধনভূমি থেকে কিছু মাটি নিয়ে আসার জন্য আদেশ করেন। মনোমোহন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে সে কথা গোপন রাখলেও, অন্তর্যামী ঠাকুর স্বেচ্ছায় ভাগ্নে হৃদয়ের দ্বারা সেখানকার কিছু মাটি ও ফুল বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোমোহনকে দান করেন এবং ঠাকুরের কৃপায় মাণিকপ্রভার সে যাত্রায় বিপদ কেটে যায়। ভক্ত মনোমোহনের কন্যা হিসাবে মাণিকপ্রভা বহুবার ঠাকুরের স্নেহলাভ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, বিবাহের পর অপরিণত বয়সে মাণিকপ্রভার মৃত্যু হয়।

*

গণু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের প্রসিদ্ধ মহিলা-ভক্ত শ্রীযুক্তা যোগীন-মার একমাত্র কন্যা। গণুর পরিচয়েই

ঠাকুর যোগীন মাকে "গণুর মা" বলে ডাকতেন। যোগীন-মার বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষে শৈশবে যেমন গণু ঠাকুরের স্নেহলাভ করেছিলেন, বিবাহের পরেও তেমন যোগীন-মার আকর্ষণে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে কয়েকবার আসেন। গণুর ধনবান স্বামীকেও গণু একবার ঠাকুরের কাছে নিয়ে এলেও, তিনি ঠাকুরের মহিমা কিছুমাত্র উপলব্ধি করতে না পারায়, আর দ্বিতীয়বার আসেননি। ভক্তিমতী গণু কিন্তু চিরদিন ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন।

*

আশা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্যা, দক্ষিণেশ্বরের অল্পবয়স্কা ভক্তিমতী বালিকা। সে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে প্রায়ই ফুল তুলতে আসায় ঠাকুরের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। একদা একটি কালো পাতাওয়ালা গাছ থেকে সুন্দর একটি লালরঙের ফুল তুলে হাতে নিয়ে তার ভাবান্তর হয় এবং সে হাউ হাউ করে কেঁদে বলতে থাকে - "এমন লাল ফুল, তার এমন কালো পাতা! ভগবান তোমার একি সৃষ্টি!" তার ঐ কান্না শুনে ঠাকুর তার কাছে এসে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে কেবল কাঁদতেই থাকে। ভক্তিমতী এই বালিকার প্রতি ঠাকুর তখন স্নেহপরবশ হয়ে অনেক কথা তাকে বুঝিয়ে বলতে থাকেন এবং ঠাকুরের স্নেহমাখা কথাগুলি শুনে অবশেষে সে শান্ত হয়। বলা বাহুল্য, আকস্মিকভাবে ঠাকুরের স্নেহলাভ করে বালিকা আশা সেদিন ধন্য হয়েছিল।

*

পঞ্চদশ স্তবক

নটী বিনোদিনী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা মহিলা ভক্ত এবং তৎকালীন প্রখ্যাত অভিনেত্রী। নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র পরিচালিত নাট্যশালায় নটীরূপে বিনোদিনী নিয়মিত অভিনয় করতেন এবং দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করতেন। অভিনয় উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়।

একদা কলকাতার ষ্টার থিয়েটারে গিরীশচন্দ্রের বিখ্যাত "চৈতন্য লীলা" নাটকের প্রধান ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় কালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অপূর্ব অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন এবং বিশেষ প্রশংসা করেন। সেই নাটকে পতিতা স্ত্রীলোকেরা অভিনয় করেছে শুনে ঠাকুর বলেন—"আমি তাদের মা-আনন্দময়ী দেখব। তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলেই-বা। শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।" সেদিন অভিনয় শেষে বিনোদিনী ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের চরণ বন্দনা করেন এবং আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হন। এই দর্শনের পর থেকেই বিনোদিনী, ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে অন্তরে গ্রহণ করেন এবং মনে মনে ঠাকুরের প্রতি ভক্তিতে পূর্ণ থাকেন।

শ্যামপুকুরে অসুস্থ ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য একদা বিনোদিনী বিশেষ উতলা হন; কিন্তু সে সময় ঠাকুরের কাছে কোন মহিলাকে পাঠানো সাময়িক ভাবে নিষিদ্ধ থাকায়, বিনোদিনী ঠাকুরের দ্বার-রক্ষক স্বামী নিরঞ্জনানন্দের কড়াপাহারা অতিক্রম করতে বিশেষ অসুবিধায় পড়েন। পরে ঠাকুরের অপর গৃহীভক্ত কালীপদ ঘোষ, তথা দানা-কালীর সহায়তায় পুরুষের বেশ ধারণ করে তিনি ছদ্মবেশে প্রাণের টানে অসুস্থ ঠাকুরকে দেখার উদ্দেশ্যে সকল বাধা অতিক্রম করেন এবং শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ঢুকে দোতলায় ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। ঠাকুর তাঁর ব্যাকুলতা দর্শন করে, তাঁকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য উপদেশ দেন এবং "মা, তোমার চৈতন্য হোক" বলে আশীর্বাদ করেন। ঠাকুরের কৃপালাভ করে সেদিন বিনোদিনী ঠাকুরের চরণে মস্তক স্পর্শ করে সজল নয়নে বিদায় নিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে, বিনোদিনীর জীবনে পরিবর্তন আসে এবং অবশেষে তিনি তপস্যাময় জীবন যাপন শুরু করেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ-পার্ষদগণের সঙ্গে বেলুড় মঠে যথা সম্ভব যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন।

*

গায়িকা নেপালী-ব্রহ্মচারিণী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা, নেপালদেশের ভক্তিমতী মহিলা এবং সুগায়িকা। তিনি চিরকুমারী ছিলেন এবং সমগ্র গীত-গোবিন্দের গান তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। ঠাকুরের অন্যতম নেপালী ভক্ত কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের দেশের এই ব্রহ্মচারিণী গায়িকা একদা নেপাল থেকে কলকাতায় কিছুদিনের জন্য বেড়াতে আসেন। এই সময় কাপ্তেনের মাধ্যমেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং ঠাকুরকে গান শুনিয়ে তিনি ধন্য হন। ভক্তিমতী ব্রহ্মচারিণীর গান শুনে ঠাকুর মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং উপস্থিত কয়েকজন ভক্তের চোখে জল এসেছিল। ব্রহ্মচারিণীকে সবাই দেবী বলে মানতো; তিনি বিয়ে করেননি কেন, প্রশ্ন করায় ব্রহ্মচারিণী ঠাকুরকে বলেছিলেন—"ঈশ্বরের দাসী, আবার কার দাসী হবো!" ঠাকুর ব্রহ্মচারিণীর ভক্তির খুব প্রশংসা করতেন।

*

কীর্তনী পান্নাময়ী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা, বিখ্যাত মহিলা কীর্তনীয়া। তৎকালে তাঁর কীর্তনের জন্য খুব নাম-ডাক ছিল এবং পান্নার কীর্তন শুনে সবাই মুগ্ধ হত। কলকাতার জানবাজারের রানী রাসমণির বাড়ীর বাবুদের আমন্ত্রণে তিনি দক্ষিণেশ্বরে কীর্তন গাইতে যেতেন এবং এই সময় ঠাকুর তাঁর সুমধুর কীর্তন শুনতেন। ঠাকুর তাঁর কীর্তন শুনে প্রশংসা করতেন এবং তাঁর সরলতার কথাও উল্লেখ করতেন। পান্না যে ঠাকুরকে খুব মানতেন, সে কথাও তিনি ভক্তদের কাছে প্রকাশ করেছেন।

*

কীর্তনী সহচরী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা, প্রবীণা ও প্রসিদ্ধা মহিলা-কীর্তনীয়া। দক্ষিণেশ্বরের উৎসবাদিতে তিনি কীর্তন পরিবেশন করতেন এবং তাঁর অপূর্ব ভক্তিরসাশ্রিত কীর্তন শুনে ঠাকুরের মুহুর্মুহুঃ ভাব-সমাধি হত। একদা পঞ্চবটীতলায় সহচরীর মুখে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণের কীর্তন শুনে ঠাকুর দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিস্থ হলে, ভক্তেরা তাঁর কণ্ঠে পুষ্পমাল্য পরিয়ে দেন এবং পাছে তিনি পড়ে যান, সেজন্য তাঁকে ধরে রাখা হয়। কীর্তন শেষে ঠাকুর এই ভক্তিমতী ও মহাভাগ্যবতী সহচরীকে নমস্কার জানিয়েছিলেন।

*

কীর্তনী বিধু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা, তৎকালীন সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্তা মহিলা-কীর্তনীয়া। একদা ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে তিনি ঠাকুরকে কীর্তনগান শোনাবার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং কীর্তন শেষে ঠাকুর শিশুসুলভ স্বাভাবিক সরলতায় নিঃসঙ্কোচে বিধুর সঙ্গে আলাপ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানে উপস্থিত দু'-একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিধুর সঙ্গে ঠাকুরকে কথা কইতে দেখে, তাঁদের নিজস্ব মনোভাব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করেন যে, সম্ভবতঃ বিধু পূর্ব থেকেই ঠাকুরের আলাপী বন্ধু এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই ঠাকুর তাঁর সঙ্গে "রঙ্গ-রস" করছেন। এমনকি, এক ব্যক্তি উপরোক্ত ধারণা চুপি চুপি অপর একজনের কাছে প্রকাশ করে সভাস্থল ত্যাগ করলেও, ঠাকুর এই বিষয়ে নির্বিকার ছিলেন।

*

কীর্তনী প্রেমী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা, মধ্যবয়সী ধৃষ্ট স্বভাবের গ্রাম্য মহিলা-কীর্তনীয়া। তিনি কামারপুকুরের বাসিন্দা ছিলেন। একদা ঠাকুরের কামার-পুকুর গ্রামের বাড়ীর বৈঠকখানায় কীর্তনের আসর হয়েছিল এবং ঠাকুর সেখানে বসে সেই কীর্তন শুনছিলেন। এমন সময় প্রেমী "আমার এ প্রেম রাখব কোথা" —এই কথাটি সুর করে গাইতে গাইতে সহসা কীর্তনের আসরে এসে উপস্থিত হন এবং বাহুতুলে, অঙ্গভঙ্গী সহকারে তালে তালে পা ফেলতে থাকেন। ঠাকুর প্রেমীর এই বাচালতা প্রথম দিকে সহ্য করলেও, এরপর প্রেমী যখন সেই আসরে মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে ঠাকুরের কাছে এসে পুনরায় "আমার এ প্রেম রাখব কোথা" বলে কীর্তন গাইতে থাকেন, তখন ঠাকুরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়! তিনি তাড়াতাড়ি আসর ছেড়ে উঠে যান এবং নিকটবর্তী পুকুরের ধারের ছাইগাদা থেকে একটি পরিত্যক্ত ভাঙ্গা ধুচুনী কুড়িয়ে নিয়ে পুনরায় ফিরে আসেন। এরপর প্রেমীকে সেইটি দিয়ে বলেন—"এই ভাঙ্গা ধুচুনীতে রাখো; তোমার যেমন প্রেম, এ পাত্রটি তারই উপযুক্ত।" বলা বাহুল্য, ঠাকুরের এই সময়োচিত ও যথোপযুক্ত আচরণে কীর্তনী প্রেমী তৎক্ষণাৎ আসর ছেড়ে পলায়ন করেন এবং উপস্থিত সবাই ঠাকুরের এই শিক্ষাপ্রদ কৌতুকে খুব খুশী হয়।

*

বারবণিতা লছমীবাঈ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা, তৎকালীন রূপসী বারবণিতা ও কলকাতার মেছুয়াবাজারের অধিবাসিনী।

ঠাকুরের সাধনকালে অখণ্ড ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের ফলে ঠাকুরের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটতে পারে—এই আশঙ্কায় ঠাকুরের পরমভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস তাঁর ব্রহ্মচর্য ব্রত ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে তৎকালীন বিশিষ্ট হাবভাবভঙ্গী সম্পন্না, বাজারের সেরা বারবণিতা লছমীবাঈকে এই কাজে প্ররোচিত করেন। একদা কলকাতার মেছুয়াবাজারের একবাড়ীতে লছমীবাঈ, ঠাকুরকে প্রলুব্ধ করার জন্য অগ্রসর হলে, লছমীবাঈকে দেখা মাত্রই ঠাকুর তার মধ্যে জগন্মাতাকে দর্শন করেন এবং "মা" "মা" সম্বোধন করে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। ঠাকুরের এইরূপ সন্তান তুল্য আচরণে লছমীবাঈয়ের অন্তরে বাৎসল্যের সঞ্চার হয় এবং সে নিজেকে অপরাধিনী ভেবে ঠাকুরের চরণে বার বার প্রণাম করে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় নেয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়রাম, বা অপর দু'একজন ভক্ত এইভাবে পতিতা মহিলা দ্বারা আরো কয়েকবার ঠাকুরের চারিত্রিক দৃঢ়তার সম্পর্কে পরীক্ষা করে প্রতিবারই সবাই নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন।

*

বারবণিতা রমণী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা, দক্ষিণেশ্বর নিবাসিনী ভাগ্যবতী বারবণিতা। বারবণিতা হলেও রমণী খুব ভক্তিমতী ছিল এবং তার অন্তরে বাৎসল্যভাব ছিল। পরমভক্তি সহকারে সে মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করতে আসতো এবং তাঁর প্রতি অকৃত্রিম বাৎসল্যভাব প্রকাশ করত। এমনকি, এই ভক্তিমতী পতিতা কর্তৃক পরম নিষ্ঠা সহকারে প্রদত্ত চাল-কড়াই ভাজা, ঠাকুর সাদরে গ্রহণ করে রমণীকে কৃতার্থ করতেন এবং তার প্রবল আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে ঠাকুর এই ভাগ্যবতী বারবণিতাকে "মা" বলে সম্ভাষণ করতেন।

এই রমণী সম্পর্কে ঠাকুর একদা ভক্তদের কাছে বলেন—"একদিন কালীঘরে আসনে বসে মাকে চিন্তা করছি; কিছুতেই মার মূর্তি মনে আনতে পারলুম না। পরে দেখি কি—রমণী বলে একটা বেশ্যা ঘাটে চান্ করতে আসত, তার মত হয়ে পূজার ঘটের পাশ থেকে উঁকি মারছে! দেখে হাসি আর বলি, 'ওমা, আজ তোর রমণী হতে ইচ্ছে হয়েছে—তা বেশ, ঐরূপেই আজ পূজো নে'। ঐরকম করে বুঝিয়ে দিলে—'বেশ্যাও আমি—আমা ছাড়া কিছু নেই'।"

ঘোষপাড়ার মহিলা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য তরুণভক্ত হরিপদের সঙ্গে ঘোষপাড়ার মতে "রাগকৃষ্ণ" সাধনের এই মহিলাটির যোগাযোগ হয়েছিল। মহিলাটি বাৎসল্য-ভাবে হরিপদকে নিজের কোলে শোয়াতেন এবং নিজের হাতে খাবার খাইয়ে দিতেন। ঠাকুর এ সকল বৃত্তান্ত শুনে হরিপদকে সাবধান করে দেন এবং এই মহিলাটির কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য উপদেশ দেন; এমনকি, তাতেও নিশ্চিন্ত না হয়ে ঠাকুর একদিন এই মহিলাটিকে দক্ষিণেশ্বরে ডেকে পাঠান। মহিলাটি ঠাকুরের কাছে এলে, ঠাকুর তাঁর হাবভাব দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারেননি; তাই তিনি এই ঘোষপাড়ার মহিলাকে নিষেধ করেছিলেন, তিনি যেন হরিপদের প্রতি কোন কু-ভাব না আনেন।

*

সরী পাথর

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা, কামারপুকুর-নিবাসিনী মহিলা-ভক্ত। তিনি "ঘোষপাড়ার মতে"র সাধিকা ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম—সরস্বতী, ডাক নাম "সরী"। "পাথর" তাঁর পদবী। সরীর সাধনার কথা শুনে একদা ঠাকুর, ভাগ্নে হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে সরীর বাড়ীতে স্বেচ্ছায় শুভাগমন করেন। সরীর বাড়ীর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখে ঠাকুর সেদিন সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ভক্তিমতী সরী অযাচিতভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর বাড়ীতে পেয়ে, পরম আন্তরিকতা সহকারে ঠাকুরকে কড়াই-মুড়ি খেতে দিয়ে আপ্যায়ন করেন এবং ঠাকুরও তা আহার করে সরীকে কৃতার্থ করেন।

*

শঙ্করী কামারণী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা, কামারপুকুর-নিবাসিনী মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের ভিক্ষা-মাতা কর্মকার-জাতীয়া ধনীর ভগ্নী। কামারপুকুরে ভিক্ষামাতার বাড়ীতে ঠাকুরের যাতায়াতে তাঁদের বাড়ীর সকলের সঙ্গে ঠাকুরের একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং শঙ্করীও ঠাকুরের একজন ভক্তে পরিণত হন। পরম ভক্তিমতী শঙ্করীর মনে ঠাকুরকে নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াবার ইচ্ছা জাগায়, তিনি একদিন তাঁকে রান্না করে খাইয়েছিলেন এবং ঠাকুরও সেদিন আহার করে তৃপ্তি পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, ভক্তগণের কাছে এই প্রসঙ্গে ঠাকুর শঙ্করীর রান্নায় "কামারে-কামারে গন্ধ" বলে রসিকতা করেছিলেন।

ভৈরবী ধাই

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুরের বাসিন্দা। তিনি কেওড়া বা হাড়ী জাতীয়া মহিলা ছিলেন এবং গ্রামে ধাত্রীর কাজ করতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন কামারপুকুরে জন্মগ্রহণ করেন, সেদিন এই ভৈরবী ধাই এসে নাড়ীচ্ছেদন করেন এবং অবতার পুরুষের জন্মলগ্নে ধাত্রীর কাজ করে ধন্য হন।

*

ভুবনমোহিনী ধাত্রী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা, কলকাতার জনৈকা ধাত্রী এবং মহিলা-ভক্ত। তিনি ঠাকুরকে খুব ভক্তি করতেন এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যেতেন। একদা ভুবনমোহিনী পঁচিশটি আম আর কিছু সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে খাওয়াতে যান। কিন্তু যে সব ডাক্তার, কবিরাজ, ধাত্রী প্রভৃতি রোগীর যন্ত্রণা দেখেও তার কাছ থেকে টাকা গ্রহণ করে, তাদের দেওয়া জিনিস ঠাকুর খেতে পারতেন না। তাই সেদিন ঐ পর্যায়ের পেশাদার-ধাত্রী ভুবনমোহিনীর খাবার না খেয়ে, "পেটভার" আছে বলে ঠাকুর তাঁকে এড়িয়ে যান, অবশ্য সেদিন ঠাকুরের সামান্য কিছু পরিমাণে পেটভারও ছিল।

*

বৃন্দে ঝি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা, দক্ষিণেশ্বরের ভাগ্যবতী পরিচারিকা। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের পরিচর্যার কাজে বৃন্দে দক্ষিণেশ্বরে নিযুক্ত হয় এবং ঠাকুরের অনেক ভক্তকে দর্শন করে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যান, তখন এই বৃন্দের কাছেই তিনি ঠাকুরের সম্পর্কে আগে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। এই সময় বৃন্দে, মাষ্টারমশাইকে জানিয়েছিল যে, ঠাকুর অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে বাস করছেন এবং কোন বই-টই তিনি পড়েন না—সবই ওঁর মুখে। বৃন্দের কাছে এই কথা শুনে মাষ্টারমশাই সেদিন প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, যাঁর পূত সঙ্গলাভের আশায় দেশদেশান্তর থেকে মানুষ অধীর হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসতো, সেই অবতার পুরুষের সব সময় পরিচর্যার ভার পেয়ে বৃন্দে ধন্য হয়েছিল।

পরবর্তীকালে, কর্ম থেকে অবসর নেবার পরেও মহাভাগ্যবতী বৃন্দে

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছেই আহারাদি করত; কিন্তু কোনদিন আহারে একটু দেরী হলে, বা ত্রুটি হলে বৃদ্ধা বৃন্দে খুব হৈ চৈ করত। সেজন্য বৃন্দেকে সময়মত বা ঠিকমত খেতে দেওয়ার জন্য ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে নির্দেশ করতেন। ঠাকুর একদা কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের জানিয়েছিলেন যে, বৃন্দেকেও তিনি সাক্ষাৎ ভগবতীরূপে দেখেন।

*

ভগবতী ঝি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা রাণী রাসমণির বাড়ীর পুরাতন দাসী। কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থদর্শন, সাধু-বৈষ্ণবদের সেবা প্রভৃতি নানা সৎ কাজে সে অর্থ ব্যয় করত এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে যেত; কিন্তু প্রথম জীবনে তাব স্বভাব ভাল ছিল না।

একদা দক্ষিণেশ্বরে ভগবতী দাসী ঠাকুরকে দর্শন করতে এসে তাঁর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করায় ঠাকুরের শরীর বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালার মত অস্থির হয়ে ওঠে; তিনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাজল নিয়ে নিজের চরণ ধুয়ে ফেলেন এবং "গোবিন্দ" নাম স্মরণ করতে থাকেন। অতঃপর ঠাকুর ভগবতীকে ভবিষ্যতে দূরে থেকে প্রণাম করার নির্দেশ দেন; কিন্তু পাছে এই নির্দেশের ফলে ভগবতীর মনে কোন কষ্ট হয়, এজন্য করুণাময় ঠাকুর নিজেই সেদিন অযাচিত-ভাবে কয়েকটি গান গেয়ে শুনিয়ে তাকে কৃতার্থ করেন।

ভাবিনী-ঠাকরুণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা, মহাভাগ্যবতী ব্রাহ্মণী। তিনি ছিলেন উত্তর কলকাতার নেবু বাগানের বাসিন্দা ভামিনীর মাতা। তাঁর হাতের রান্না খুব উপাদেয় ছিল। ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন হলেই রান্নার জন্য এই ব্রাহ্মণীর ডাক পড়ত এবং তিনি এসে রান্না করে ঠাকুরকে খাওয়াতেন। ভাবিনী-ঠাকরুণের হাতের রান্না ঠাকুর খুব তৃপ্তি সহকারে আহার করতেন এবং উচ্ছসিত প্রশংসা করতেন। রান্না খাইয়ে ঠাকুরকে আনন্দ দান করে ভাবিনী-ঠাকরুণও খুব আনন্দ পেতেন। মহাভাগ্যবতী এই ব্রাহ্মণীকে ঠাকুর "বৈকুণ্ঠের রাঁধুনী" বলে ভক্তগণের কাছে উল্লেখ করেছিলেন। দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালে তাঁর গঙ্গায় শরীর গিয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন।

*

খেতির মা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুর নিবাসিনী সূত্রধর বংশীয়া মহিলা-ভক্ত। ঠাকুরের বাল্যকালে তিনি "গদাধর"কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। একদা খেতির মার মনে খুব ইচ্ছা জাগে যে, তিনি একদিন গদাধরকে তাঁর বাড়ীতে এনে কিছু খাওয়ান। কিন্তু "ছোটজাত" হিসাবে তাঁর বাড়ীতে বসে ঠাকুর খাবেন কিনা – এই সন্দেহ হওয়ায় খেতির মা তাঁর প্রতিবেশিনী ও ঠাকুরের ভিক্ষা মাতা ধনী কামারনীর ভগ্নী ভক্তিমতী শঙ্করীর মাধ্যমে একদা ঠাকুরের মনোভাব জানার চেষ্টা করেন। কৃপাসিন্ধু ঠাকুর (তৎকালে বালক গদাধর) তৎক্ষণাৎ রাজী হন এবং সূত্রধর বংশীয়া ভক্তিমতী খেতির মার বাড়ীতে গিয়ে তাঁর দেওয়া ভোজ্য গ্রহণ করে তাঁকে কৃতার্থ করেন।

*

রতির মা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা গোঁড়া বৈষ্ণবী ভক্ত। তিনি প্রথম প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে খুব যাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরকে মান্য করতেন। কিন্তু যেদিন তিনি ঠাকুরকে মা-কালীর প্রসাদ গ্রহণ করতে দেখেন, সেদিন থেকেই তিনি ঠাকুরের কাছে যাওয়া বন্ধ করেন এবং এই গোঁড়ামীর জন্য ঠাকুর তাঁর নিন্দাও করেন।

একদা মন্দিরের অপর পূজক হলধারী ঠাকুরকে মায়ের "রূপ-টুপ" দর্শন সব মিথ্যা বলায় ঠাকুরের মনে খুব দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, ঠাকুর সে কথা মা-ভবতারিণীকে জানালে, মা রতির মা'র বেশে ঠাকুরের কাছে এসে বলেন— "তুই ভাবেই থাক।" কথাপ্রসঙ্গে এই ঘটনা ঠাকুর ভক্তদের কাছে বলেছিলেন।

*

বৃন্দার মা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুর নিবাসিনী ভক্তিমতী ব্রাহ্মণী মহিলা-ভক্ত। শৈশবে বালক গদাধরকে তিনি পরম স্নেহ করতেন। বৃন্দার মার হাতের রান্না খেতে গদাধর খুব ভালবাসতেন; তাই এই ভক্তিমতী ব্রাহ্মণী প্রায়ই গদাধরকে নিজের বাড়ীতে এনে নানাবিধ হাতের রান্না খাওয়াতেন এবং গদাধরও মহা খুশী হতেন। এমনকি মাঝে মাঝে গদাধর বিনা আহ্বানেই বৃন্দার মা'র বাড়ীতে গিয়ে স্বেচ্ছায় তাঁর হাতের রান্না চেয়ে খেতেন। বলাবাহুল্য, ঠাকুরের প্রতি বাৎসল্যভাবের দরুন বৃন্দার মা ধন্য হন।

কালীর মা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মাতা, চন্দ্রমণির পরিচারিকা। দক্ষিণেশ্বরে চন্দ্রমণি থাকাকালীন কালীর মাকে তাঁর সেবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং চন্দ্রমণির শেষ সময় অবধি কালীর মা তাঁর সেবা করেছিল। চন্দ্রমণির দেহরক্ষার পরেও কালীর মা, ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পরিচর্যা করত। দক্ষিণেশ্বরে প্রচণ্ড ভাবাবস্থায় মাঝে মাঝে ঠাকুরের শরীর অসাড় হয়ে গেলে, কালীর মার সহায়তায় শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতেন; কোনদিন অস্বাভাবিক অবস্থা লক্ষ্য করলে কালীর মার মাধ্যমেই ভাগ্নে হৃদয় প্রভৃতি ভক্তগণকে শ্রীশ্রীমা ডেকে পাঠাতেন। ঠাকুরের পরিচর্যা করে কালীর মা ধন্য হয়।

*

হাবীর মা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা জনৈকা মহিলা ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের জনৈক পুরুষ ভক্তের স্ত্রী এবং হাবীর মা নামেই তাঁর পরিচয়। ঠাকুরের কাছে যাতায়াতের ফলে হাবীর মা, ঠাকুরের স্নেহলাভ করেন। তাঁর দুই ভাইও ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন।

*

মিস্ পিগট্

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা বিদেশিনী আমেরিকান মহিলা। তিনি খ্রীষ্টান-পাত্রী ছিলেন। একদা বিদেশীয় কুক সাহেব, আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে গেলে, পিগট্ও তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের কাছে যান। সেদিন ঠাকুরকে ষ্টীমারে চড়িয়ে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করার সময়, মিস্ পিগট্ও উপস্থিত ছিলেন এবং ষ্টীমারের মধ্যে ঠাকুরের সমাধি দর্শন করেছিলেন।

*

পাগ্লী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা উন্মাদিনী, সুগায়িকা, মহিলা-ভক্ত। সে, সব সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর থাকত এবং মনে মনে মধুর-ভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে পেতে চাইত। আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাকে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে গান শোনাবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন, কারণ সে

সুন্দর ভক্তিমূলক গান গাইতে পারত; কিন্তু তার হাবভাব একটু অস্বাভাবিক থাকায়, সবাই তাকে "পাগ্লী" বলে ডাকত। তার প্রকৃত নাম জানা যায়নি।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে পাগ্লী, ঠাকুরের কাছে গিয়ে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করায় ঠাকুর তাকে প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে, তার "মধুরভাব" এবং সেই মধুরভাবেই সে ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্টা। কিন্তু ঠাকুরের মাতৃভাবের সাধনের কথা শুনেও পাগ্লী তাঁকে ছাড়তে চাইত না, বরং খুব উপদ্রব করত এবং তাঁব করুণা ভিক্ষা চাইত। এই ঘটনায় ঠাকুর তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে তিরস্কার করায়, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী পাগ্লীকে তাঁর নহবত-ঘরে ডাকিয়ে ঐরূপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দেন; কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হয়নি।

পরে অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর যখন কাশীপুরে অবস্থান করছিলেন, তখন এই পাগ্লী কাশীপুরেও যাতায়াত শুরু করে এবং অসুস্থ ঠাকুরকে পূর্বের মত খুব বিব্রত করে। কাশীপুরের বাগানে সে দৌড়ে গিয়ে ঠাকুরের ঘরে তাঁকে দেখার জন্য ঢুকে পড়ত এবং সেজন্য কোন কোন ভক্তের কাছে মাঝে মাঝে সে প্রহারও পেত। পাগ্লীর প্রচণ্ড উপদ্রবে অসুস্থ ঠাকুরের খুব কষ্ট হতে থাকায়, ঠাকুরের তরুণ ভক্ত নিত্যনিরঞ্জন (পববর্তীকালে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) পাগ্লীকে মেরে ফেলার চিন্তাও করেন; কিন্তু ঠাকুর করুণামাখা হৃদয়ে ভক্তদের নিবৃত্ত করতেন, যাতে পাগ্লীকে বাধা দেওয়া না হয়। এরপর পাগ্লী কেবল ঠাকুরকে নমস্কার করে ভক্তদের ভয়ে চলে যেত। কিন্তু কিছুদিন পরেই পাগ্লীকে নিয়ে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। সে একদিন হঠাৎ অসুস্থ ঠাকুরকে পুনরায় এমন মাত্রাতিরিক্ত বিরক্ত করে যে, অসহায় ঠাকুর অতঃপর ভক্তদের আদেশ করেন যে, পাগ্লীকে যেন পুলিশের হেফাজতে রেখে আসা হয়। তখন দুই তরুণ ভক্ত (পরবর্তীকালে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ) পাগ্লীকে ধরে নিকটবর্তী কাশীপুর থানায় জমা দিয়ে আসেন। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে থানা থেকে তাকে ছেড়ে দিতেই, পাগ্লী পুনরায় কাশীপুর-উদ্যানে ফিরে আসে। কিন্তু পাগলামীর বদলে সে এই সময় ঠাকুরের কাছে গিয়ে সুমধুর কণ্ঠে এমন একটি মাতৃসঙ্গীত ঠাকুরকে শোনায় যে, তাতে ঠাকুর সমাধিস্থ হন। কিন্তু অসুস্থ শরীরে ঠাকুরের সমাধি উচিত নয় বিবেচনা করে সেইদিনই তরুণ ভক্ত নিত্যনিরঞ্জন (পরবর্তীকালে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) কাঁচি দিয়ে পাগ্লীর লম্বা চুল খানিকটা কেটে দিলে, সে চিরদিনের মত কাশীপুর ছেড়ে চলে যায় এবং আর কোনদিন তাকে দেখা যায়নি।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক, ভক্তপ্রবর গিরীশচন্দ্র একদা কাশীপুরে ঠাকুরকে পাগ্‌লীর সম্পর্কে বলেছিলেন—"সে পাগ্‌লী ধন্য! পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে মারই খাক, আপনাকে তো অষ্টপ্রহর চিন্তা করেছে! সে যে-ভাবেই করুক, তার কখনও মন্দ হবে না।"

*

নট-নটীবৃন্দ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে কলকাতার ষ্টার থিয়েটারে (৬৮ নং বিডন ষ্ট্রীট) বিভিন্ন সময়ে অভিনয় দেখাবার যাঁরা সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল বসু এবং অভিনেত্রী বিনোদিনী সরাসরি ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এই দুজন ছাড়াও "চৈতন্য-লীলা", "প্রহ্লাদ-চরিত্র", "নিমাই-সন্ন্যাস" প্রভৃতি নাটকগুলিতে নিম্নলিখিত নট-নটীবৃন্দ অভিনয় শেষে ঠাকুরকে দর্শন করেন, অথবা তাঁর চরণধূলি গ্রহণ করেন :—

নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামতারণ সান্যাল, পরাণকৃষ্ণ শীল, অঘোরন থ পাঠক, অবিনাশচন্দ্র দাস, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল মিত্র, অতুলচন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরী, শ্রীমতী বনহারিণী, শ্রীমতী গঙ্গামণি, শ্রীমতী কিরণ বালা, শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি এবং শ্রীমতী ভূষণকুমারী।

বলা বাহুল্য, থিয়েটারে ঠাকুরের শুভাগমনে রঙ্গালয় ধন্য হয় এবং নট-নটীবৃন্দের জীবন সার্থক হয়।

পরিশিষ্ট

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমনের স্থানগুলি

কলকাতা

রাণী রাসমণির বাড়ী – জানবাজার।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বাড়ী – শাঁখারীটোলা।

আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ী "কমলকুটীর" – রাজাবাজার (আপার সার্কুলার রোড, বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। এখন ভিক্টোরিয়া স্কুল; নতুন বাড়ীতে কলেজ। পুরানো বাড়ীর দোতলায় কেশবচন্দ্রের শয়ন ঘর ও নীচে পূজার ঘর)।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়ী – রাজাবাজার (ব্রাহ্মপাড়া)।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের উদ্যান – কাঁকুড়গাছি।

রামচন্দ্র দত্তের উদ্যান-বাড়ী – কাঁকুড়গাছি। (বর্তমানে 'যোগোদ্যান-মঠ'। ঠাকুরের দেহাবশেষ সর্বপ্রথম এখানেই সমাধিস্থ করা হয়)।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাড়ী – বাদুড়বাগান।

নবগোপাল ঘোষের বাড়ী – বাদুড়বাগান।

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ময়দার কল – হাতীবাগান।

ভূধর চাটুজ্যের বাড়ী – পটলডাঙ্গা।

আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের পৈতৃক বাড়ী – কলুটোলা।

বারবণিতা লছ্মী বাঈয়ের বাড়ী – মেছুয়াবাজার (ঠাকুরকে পরীক্ষার জন্য মথুরানাথ বিশ্বাস নিয়ে গিয়েছিলেন)।

স্বামী সুবোধানন্দের বাড়ী – ঠনঠনিয়া (২৩ নং শঙ্কর ঘোষ লেন)।

ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ীর বাড়ী – ঠনঠনিয়া।

জ্ঞান চৌধুরীর বাড়ী – ঠনঠনিয়া।

গোবিন্দ চাটুজ্যের বাড়ী – ঝামাপুকুর (এখানে কিছুদিন ঠাকুর বাস করেছিলেন)।

রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ী – ঝামাপুকুর (১নং ঝামাপুকুর লেন – প্রথম অবস্থায় ঠাকুর এখানে পূজা করতেন)।

রামপ্রসাদ মিত্রের বাড়ী – ঝামাপুকুর (এখানে ভক্ত দুটি ভাই কালী-ভুলুর সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয়)।

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী – ঝামাপুকুর (বর্তমানে ১৯নং কেশব সেন ষ্ট্রীট)।

আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়ী – ঝামাপুকুর (২৭ নং ঝামাপুকুর লেন। অসুস্থ বিজয়কৃষ্ণকে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন)।

রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ী—ঝামাপুকুর (বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট)।

ঝামাপুকুর টোল—ঝামাপুকুর (বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট—এখানে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের কাছে ঠাকুর পড়তেন ; বর্তমানে 'রাধাকৃষ্ণের ঠাকুর বাড়ী')।

খোলার ঘর—ঝামাপুকুর (বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট—জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের সঙ্গে ঠাকুর বাস করতেন। লাহাদের বাড়ীর উল্টোদিকে রাস্তার উত্তরে ; (পরে 'হেয়ার প্রেস' হয়েছিল)।

নকুড় বাবাজীর মুদীর দোকান—ঝামাপুকুর (গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন—এখানে ঠাকুর মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতেন)।

স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ী (বহিরাঙ্গন)—সিমুলিয়া (৩ নং গৌর মোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট)।

স্বামী বিবেকানন্দের মাতামহীর বাড়ী—সিমুলিয়া (৭নং রামতনু বসু লেন—স্বামীজীর সঙ্গে ঠাকুর মাঝে মাঝে মিলিত হতেন)।

রাজমোহনের বাড়ী—সিমুলিয়া।

রামচন্দ্র দত্তের বাড়ী—সিমুলিয়া (১১নং মধু রায় লেন—বর্তমানে বাড়ী ভেঙ্গে রাস্তা হয়েছে)।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ী—সিমুলিয়া (অক্সফোর্ড মিশনের পিছনে)।

মনোমোহন মিত্রের বাড়ী—সিমুলিয়া (পূর্বে ২৩নং, বর্তমানে ৬৪নং সিমুলিয়া ষ্ট্রীট)।

মহেন্দ্র গোস্বামীর বাড়ী—সিমুলিয়া (বর্তমানে ৪০/৪১নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন)।

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারীর বাড়ী—সুতাপটী (বড়বাজার)।

মণিলাল মল্লিকের বাড়ী—সিঁদুরিয়া পটী (৮১নং চিৎপুর রোড—বর্তমানে রবীন্দ্র সরণী)।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী—জোড়াসাঁকো।

মহারাজা স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের বাড়ী—পাথুরিয়াঘাটা।

খেলাৎ ঘোষের বাড়ী—পাথুরিয়াঘাটা।

যদুলাল মল্লিকের বাড়ী—পাথুরিয়াঘাটা (৬৭নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট)।

জয়গোপাল সেনের বাড়ী—পাথুরিয়াঘাটা (মাথাঘসা পল্লী—বর্তমানে রতন সরকার স্কোয়ার)।

কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ী—নন্দনবাগান (গ্রে ষ্ট্রীট—বর্তমানে অরবিন্দ সরণী)।

অধরলাল সেনের বাড়ী—শোভাবাজার (৯৭নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট)।

কবিরাজ গঙ্গা প্রসাদ সেনের বাড়া – কুমারটুলী (৯।১নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট – গঙ্গাতীরে অবস্থিত)।

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী – নতুনবাজার।

কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়ী - আহিরীটোলা (নিমু গোস্বামী লেন)।

মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভাড়াটিয়া বাড়ী – কম্বুলিয়াটোলা (বর্ত্তমানে অজ্ঞাত)।

ছোট নরেনের বাড়ী—তেলিপাড়া (৩৩।এ, তেলিপাডা লেন)।

কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের বাড়ী – শ্যামপুকুর (২৫নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট)।

কালীপদ ঘোষ, তথা দানাকালীর বাড়ী – শ্যামপুকুর (২০নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট)।

গোকুল ভট্টাচার্যের বৈঠকখানা বাড়ী—শ্যামপুকুর (৫৫নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। বর্ত্তমানে ৫৫।এ, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট; অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর দোতলার ঘরে বাস করতেন)।

প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী – শ্যামপুকুর (৪০নং রামধন মিত্র লেন)।

বিদ্যাসাগর মশায়ের মেট্রোপলিটন স্কুল—শ্যামপুকুর (শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের অনতিদূরে ভূপেন বসু এ্যাভিনিউতে। বর্ত্তমান ষ্টেটবাস গুমটির পাশে প্রাচীর ঘেরা স্থানে পূর্বে ছিল। মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সন্ধানে ঠাকুর গিয়েছিলেন)।

কালী ডাক্তারের বাড়ী – শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়ের কাছে)।

নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের বাড়ী – বাগবাজার (বর্ত্তমানে গিরীশ এ্যাভিনিউ)।

বলরাম বসুর বাড়ী – বাগবাজার (৫৭নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট – বর্ত্তমানে "বলরাম-মন্দির"; ৭নং গিরীশ এ্যাভিনিউ)।

চুনীলাল বসুর বাড়ী – বাগবাজার (৫৮বি, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট)

অমৃতবাজার পত্রিকার মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের বাড়ী – বাগবাজার

নন্দলাল বসু ও পশুপতি বসুর বাড়ী – বাগবাজার।

দীননাথ বসুর বাড়ী – বাগবাজার।

কালীনাথ বসুর বাড়ী – বাগবাজার।

তেজচন্দ্র মিত্রের বাড়ী – বাগবাজার।

গোলাপ-মার বাড়ী – বাগবাজার।

যোগীন-মার বাড়ী – বাগবাজার (৫৯।১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট)।

দীননাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী – বাগবাজার (বাগবাজার পুলের কাছে)।

গঙ্গাতীরে নতুন বাড়ী—বাগবাজার (দুর্গাচরণ মুখার্জী ষ্ট্রীট—চিকিৎসার জন্য ঠাকুর প্রথম এখানে উঠেছিলেন, অপছন্দ হওয়ায় বলরাম বসুর বাড়ীতে চলে গিয়েছিলেন)।

বেণীমাধব পালের উদ্যান বাড়ী—সিঁথি (বর্তমানে "পালের বাগান" নামে পরিচিত)।

নৈনানের ঠাকুরদের প্রমোদ উদ্যান—সিঁথি (স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ)।

মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাড়ী—কাশীপুর।

গোপাল চন্দ্র ঘোষের উদ্যান বাড়ী—কাশীপুর (৯০নং কাশীপুর রোড। অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ)।

আদি ব্রাহ্ম সমাজ—জোড়াসাঁকো (চিৎপুর রোড, বর্তমানে রবীন্দ্র সরণী)।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ—ঠনঠনিয়া (কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বর্তমানে বিধান সরণী)।

নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ—মেছুয়াবাজার (বর্তমানে কেশব সেন ষ্ট্রীট)।

মেথডিষ্ট চার্চ—ধর্মতলা ষ্ট্রীট (বর্তমানে লেনিন সরণী। ভক্ত মথুরানাথের সঙ্গে ঠাকুর গিয়েছিলেন)।

লং সাহেবের গীর্জা—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট (বর্তমানে রাজা রামমোহন সরণী। ভক্ত মথুরানাথের সঙ্গে ঠাকুর গিয়েছিলেন)।

গেঁড়াতলার মসজিদ—মেছুয়াবাজার (জনৈক ফকীরকে ঠাকুর আলিঙ্গন করেছিলেন)।

কালী মন্দির—কালীঘাট।

কালী মন্দির—ঠনঠনিয়া।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির—বাগবাজার।

সর্বমঙ্গলা মন্দির—কাশীপুর।

জৈন মন্দির—বড়বাজার (৪২।২ নং আপার চিৎপুর রোড, বর্তমানে রবীন্দ্র সরণী)।

মদনমোহন মন্দির—বাগবাজার।

ময়ূর-মকুটধারী বিগ্রহ মন্দির—বড়বাজার।

কালী মল্লিকের ঠাকুর বাড়ী—সিঁদুরিয়া পটী (হ্যারিসন রোড—বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড)।

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা—জোড়াসাঁকো (ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট)।

কলুটোলার হরিসভা—কলুটোলা (ট্রপিক্যাল স্কুলের উল্টোদিকে কালীদত্তের

বাড়ী। বর্তমানে ৩২।২ নং দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট। এখানে 'চৈতন্য-আসনে' দণ্ডায়মান অবস্থায় ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন)।

জোড়াসাঁকোর হরিসভা – জোড়াসাঁকো।

বৈষ্ণবদের আখ্ড়া – গরাণহাটা (বর্তমানে নিমতলা স্ট্রীট)।

নবরসিক সম্প্রদায়ের আখ্ড়া – কাছিবাগান, মাণিকতলা।

বারোয়ারীতলা – হাটখোলা (প্রখ্যাত যাত্রাগায়ক নীলকণ্ঠের "কৃষ্ণযাত্রা" শুনতে ঠাকুর গিয়েছিলেন)।

বারোয়ারীতলা – আহিরীটোলা (দুর্গামণ্ডপে প্রতিমা দর্শন করতে ঠাকুর গিয়েছিলেন)।

কোম্পানীর বাগান – বিডন স্ট্রীট (বর্তমানে "রবীন্দ্রকানন"; এখানে ঠাকুরের মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে)।

নাথের বাগান – শোভাবাজার।

বেঙ্গল ফটোগ্রাফারের ষ্টুডিও – রাধাবাজার (এখানে ঠাকুরের ফটো তোলা হয়েছিল)।

ষ্টার থিয়েটার – বিডন স্ট্রীট (পূর্বে এখানে অবস্থিত ছিল। এখানে গিরীশচন্দ্রের অভিনয় দেখতে ঠাকুর গিয়েছিলেন)।

মিনার্ভা থিয়েটার – বিডন স্ট্রীট (এখানে গিরীশচন্দ্রের অভিনয় দেখতে ঠাকুর গিয়েছিলেন)।

আলীপুর চিড়িয়াখানা – আলীপুর (শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগে স্বামীজীর সঙ্গে সিংহ দর্শন করতে ঠাকুর গিয়েছিলেন)।

গড়ের মাঠ – ময়দান (মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে উইলসনের সার্কাস দেখতে ঠাকুর গিয়েছিলেন)।

লাট সাহেবের বাড়ী (ভাগ্নে হৃদয়ের সঙ্গে বাইরে থেকে বাড়ী দেখে ঠাকুর বলেছিলেন 'মাটীর ঢিপি')।

কেল্লা ও যাদুঘর (ভক্ত মথুরানাথের সঙ্গে ঠাকুর গিয়েছিলেন)।

জগন্নাথ ঘাট ও কয়লা ঘাট (ঠাকুর গঙ্গায় নেমেছিলেন)।

কাশীপুর মহাশ্মশান – কাশীপুর (এখানে ঠাকুরের নশ্বরদেহের আহুতি ও শেষকৃত্য হয়। বর্তমানে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশান"। ঠাকুরের সমাধি-বেদী প্রতিষ্ঠিত)।

চব্বিশ পরগণা

দক্ষিণেশ্বরে—৺কালীমন্দির; ৺শিবমন্দির; ৺বিষ্ণুমন্দির; পঞ্চবটীতলা; বকুলতলা প্রভৃতি সাধনস্থলগুলি।

নিকটবর্তী মস্‌জিদ (ইস্‌লাম ধর্ম সাধনার সময় 'নমাজ' পড়তে ঠাকুর যেতেন)। সিপাহী কোয়ার সিং-এর আস্তানা; মেথর পাড়ায় রসিক মেথরের বাড়ী; যদুলাল মল্লিকের বাগান-বাড়ী; শম্ভুচরণ মল্লিকের বাগান-বাড়ী; শম্ভুচরণ নির্মিত শ্রীশ্রীমায়ের চালাঘর; স্বামী যোগানন্দের পিতা নবীন চৌধুরীর বাড়ী; নবীন নিয়োগীর বাড়ী; নবকুমার চাটুজ্যের বাড়ী; বিশ্বাসদের বাড়ী (উলোর জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঠাকুর সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন)।

আড়িয়াদহে—কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্যের বাড়ী, গঙ্গাতীরে বাগান-বাড়ী (পণ্ডিত পদ্মলোচনের সঙ্গে ঠাকুর সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন); গঙ্গার ঘাট (সাধুদর্শন করতে ঠাকুর গিয়েছিলেন); দেবমণ্ডলের ঘাট (ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মাধ্যমে গুরুভ্রাতাদ্বয় গিরিজা ও চন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম মিলন); শিবতলা শ্মশান ঘাট (মাতা চন্দ্রমণিকে দাহ করতে ঠাকুর নিয়ে গিয়েছিলেন); বৈষ্ণবদের গদাধরের পাটবাড়ী।

আলমবাজারে—রাম চাটুজ্যের বাড়ী; নটবর পাঁজার বাড়ী; যুগলবাবুর বাড়ী।

বরানগরে—কবিরাজ ঈশানচন্দ্র মজুমদারের বাড়ী, কথক-ঠাকুরদাদার বাড়ী; হরমোহনের বাড়ী; মণিলাল মল্লিকের বাগান-বাড়ী; জয়মিত্রের ঠাকুর-বাড়ী; ভাগবত আচার্যের পাটবাড়ী; কুঠীঘাটায় ৺দশমহাবিদ্যা মন্দির; ফাগুর দোকান।

বেলঘোরিয়ায়—জয়গোপাল সেনের বাগান-বাড়ী, "তপোবন" (কেশব-চন্দ্রকে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন); দেওয়ান গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী।

কামারহাটীতে—গোপালের মা'র বাড়ী; গোবিন্দ দত্তের ৺রাধাকৃষ্ণ-মন্দির।

পানিহাটীতে—বৈষ্ণবদের চিড়া-মহোৎসব প্রাঙ্গণ; মণিমোহন সেনের বাড়ী ও ঠাকুরবাড়ী; বৈষ্ণবদের পাটবাড়ী; রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী; নিতাই মল্লিকের বাড়ী; মতিশীলের ঠাকুরবাড়ী ও ঝিল।

খড়দহে—৺শ্যামসুন্দর মন্দির।

ব্যারাকপুরে—চানকে ৺অন্নপূর্ণা মন্দির।

হাওড়া

বালীতে—কবিরাজ শশীভূষণ সান্যালের বাড়ী; কালাচাঁদ মুখুজ্যের বাড়ী; তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের বাড়ী; হরিসভা; ⁄কল্যাণেশ্বর-মন্দির।

লিলুয়ায়—নেপালীদের কাঠের গুদাম (কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সঙ্গে ঠাকুর গিয়েছিলেন)।

হুগলী

কামারপুকুরে—পৈতৃক বাড়ী; চিনু শাঁখারীর বাড়ী; শ্রীরাম মল্লিকের বাড়ী; শম্ভু কুমোরের বাড়ী; মধু যুগীর বাড়ী; কৃষ্ণবিহারী কর্মকারের বাড়ী; গণেশ ঘোষালের বাড়ী; সীতানাথ পাইনের বাড়ী; দুর্গাদাস পাইনের বাড়ী; ধর্মদাস লাহার বাড়ী; ধনী-কামারনীর বাড়ী; খেত্তির মা'র বাড়ী; বৃন্দার মা'র বাড়ী; সরী পাথরের বাড়ী; লাহাবাবুদের পান্থনিবাস; লাহাবাড়ীর নাটমন্দিরে পাঠশালা; ভূতির খাল; হালদার পুকুর; মাণিক রাজার আম্রকানন।

ভুরসুবো গ্রামে—জমিদার মাণিক রাজার বাড়ী।

আনুড় গ্রামে—⁄বিশালাক্ষীর মন্দির।

গৌরহাটী গ্রামে—কনিষ্ঠা ভগ্নী সর্বমঙ্গলার শ্বশুরবাড়ী।

শিহড় গ্রামে—ভাগ্নে হৃদয়রামের বাড়ী।

বেল্‌টে গ্রামে—নটবর গোস্বামীর বাড়ী।

বালি-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামে—ভক্ত মোদকের বাড়ী।

শ্যামবাজার গ্রামে—ঈশানচন্দ্র মল্লিকের বাড়ী।

কয়াপাঠ গ্রামে—কীর্তনানন্দে ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে মেতে ছিলেন।

কোতলপুর গ্রামে—ভদ্রদের বাড়ী (সপ্তমী পূজায় আরতি দেখতে ঠাকুর গিয়েছিলেন)।

আঁটপুর গ্রামে—রামপ্রসাদ মিত্রের বাড়ী (কালীভুলুর সঙ্গে ⁄দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঠাকুর গিয়েছিলেন)।

কোন্নগরে—নবাই চৈতন্য মিত্রের বাড়ী; মনোমোহন মিত্রের বাড়ী।

মাহেশে—রথতলা (রথযাত্রায় ⁄জগন্নাথ দর্শন করতে ঠাকুর গিয়েছিলেন)।

বল্লভপুরে—⁄রাধাবল্লভ মন্দির।

ভদ্রকালীতে—শিবু আচার্যের শ্বশুরবাড়ী।

বাঁকুড়া

জয়রামবাটীতে – নিজ শ্বশুরালয়; ভানুপিসীর বাড়ী; সিংহবাহিনীর মন্দির।

বিষ্ণুপুরে – ৺মৃন্ময়ী দুর্গা মন্দির; ৺রাধাগোবিন্দজীর মন্দির; লাল-বাঁধ (এখানে ৺সর্বমঙ্গলাকে ঠাকুর দর্শন করেছিলেন)।

বর্ধমান

শহরে – বর্ধমান রাজবাড়ী।

কালনায় – ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রম।

নদীয়া

নবদ্বীপে – শ্রীচৈতন্যদেবের মন্দিরাদি দর্শন; গঙ্গায় ভাবাবেশে গৌর নিতাই দর্শন।

রাণাঘাটে – ভক্ত মথুরানাথের জমিদারী মহল।

সোনাবেড়ে গ্রামে – ভক্ত মথুরানাথের পৈতৃক ভিটা।

তালামাগরো গ্রামে – ভক্ত মথুরানাথের কুলগুরুর বাড়ী (হাতীর পিঠে চেপে ঠাকুর বেড়িয়েছিলেন)।

কলাইঘাট গ্রামে – (ঠাকুর গ্রামের লোকদের মথুরানাথকে দিয়ে খাইয়েছিলেন ও বস্ত্রদান করিয়েছিলেন)।

বঙ্গদেশের বাইরে

কাশীধামে – ৺বিশ্বনাথ মন্দির; ৺অন্নপূর্ণা মন্দির, ৺কেদারনাথের মন্দির; ৺দুর্গা মন্দির; বেণীমাধবের মন্দির; মণিকর্ণিকা ঘাট; পঞ্চগঙ্গার ঘাট; কেদার ঘাট; কেদার ঘাটের কাছে রাজাবাবুর বাড়ী; চৌষট্টি যোগিনী ঘাটের কাছে মদনপুরা পল্লীতে বীণাবাদক মহেশচন্দ্র সরকারের বাড়ী।

বৃন্দাবন ধামে – ৺গোবিন্দ মন্দির; ৺গোপীনাথ মন্দির; ৺মদনমোহন মন্দির; ৺বাঁকাবিহারী মন্দির; ৺কাত্যায়নী মন্দির; ৺গোপেশ্বর; গোবর্ধন গিরি; রাধাকুণ্ড; শ্যামকুণ্ড; রাধাকুণ্ডে চতুরা পাণ্ডার আশ্রম; নিধুবনে তপস্বিনী গঙ্গামাতার আশ্রম।

মথুরা ধাম, প্রয়াগ ধাম ও ত্রিবেণী এবং বৈদ্যনাথ ধামে (দেওঘর) – ঠাকুর তীর্থ দর্শনে গিয়েছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ (১ম—২য় খণ্ড)—স্বামী সারদানন্দ।

আমার জীবন কথা—স্বামী অভেদানন্দ।

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ।

সৎকথা—স্বামী অদ্ভুতানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-মালিকা (১ম—২য় খণ্ড)—স্বামী গম্ভীরানন্দ।

শ্রীশ্রীমাসারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ (১ম খণ্ড)—স্বামী গম্ভীরানন্দ।

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা (১ম—২য় খণ্ড)—উদ্বোধন প্রকাশিত।

স্বামীজীর পদপ্রান্তে—স্বামী অব্জজানন্দ।

বলরাম-মন্দিরে সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী জীবানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণের যারা এসেছিল সাথে—স্বামী অমিতানন্দ।

শ্রীম-দর্শন (১ম—১৫দশ খণ্ড)—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য

সারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।

ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।

প্রেমানন্দ-প্রেমকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।

জীবন-পরিক্রমা—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।

লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্মচারী অরূপ চৈতন্য।

মহিমবাবু—ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ (৩য় খণ্ড)—শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্রীশ্রীনগেন্দ্র উপদেশামৃত—শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (১ম—৫ম খণ্ড)—শ্রীম-কথিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত—শ্রীরামচন্দ্র দত্ত।

শ্রীমৎরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ—শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী (১ম—৩য় খণ্ড)—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।
স্বামী বিবেকানন্দ—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
মনীষী স্মরণে—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।
পরমহংস দেব—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত—শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী।
শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি কথা—শ্রীহরিহর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত।
শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী স্মরণে—শ্রীকরালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়।
নিবেদিতা লোকমাতা (১ম খণ্ড)—শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু।
সহাস্য বিবেকানন্দ—শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু।
বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (১ম খণ্ড)—শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু।
বিশ্ববিবেক—শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত।
গিরিশচন্দ্র (দে'জ সংস্করণ)—শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে)—শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত।
স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়।
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশামৃত (জীবনী সম্বলিত)—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ।
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (১ম—৪র্থ খণ্ড)—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ—শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
ভারতের সাধক (৯ম খণ্ড)—শ্রীশঙ্করনাথ রায়।
পরিব্রাজক-জীবনী ও বাণী—কাশী যোগাশ্রম।
নূতন বাংলা অভিধান (চরিতাবলী অংশ)—শ্রীআশুতোষ দেব।
উদ্বোধন পত্রিকা—১৩৮১, আষাঢ়।

———